সংরাগ
সম্ভূত
সত্য

সংরাগ সম্ভূত সত্য

বুক-লিঙ্কস্
কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :

১লা জানুয়ারী, ১৯৬২

প্রকাশিকা :

অনিতা দেবী :

বুক লিঙ্কস্

৩১/ডি/ ৩১, হরিনাথ দে রোড,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

স্বস্তিক মুদ্রণালয়

২৭/১ বি, বিধান সরণী,

কলিকাতা ৬

পুস্তক বাঁধাই :

ধর ব্রাদার্স :

৪, রামমোহন রায় রোড

কলিকাতা-৬

আমার
সোনাই ও সিতানকে

আমার কথা

বিশ্বায়নের বিশ্ব ব্যবস্থায় সময় নেই আত্ম উপলব্ধির আত্ম জিজ্ঞাসার। অলিখিত প্রতিযোগিতা প্রত্যেকের সাথে। আত্মবিশ্বাস নেই, নেই আত্মতৃপ্তির অবসর। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে হৃদয়ের বিকাশ হওয়ার বদলে সঙ্কীর্ণতা গ্রাস করছে। ফলশ্রুতি অবিশ্বাস, ঘৃণা বিদ্বেষ রক্তের হোলিখেলা ক্রমবর্দ্ধমান।

এমত এক পরিবেশে, অতি সাধারণ ঘটনা, অথচ জীবনের মূল মন্ত্রকে আশ্রয় করে আমার আন্তরিক প্রথম প্রয়াস যার মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করেছি মানুষকে মর্যাদা দিতে যেখানে ধনদৌলত ধর্ম কূল বা বংশ বড় কথা নয়, বড় কথা সুখী হওয়া সুখী করা।

আমি কৃতজ্ঞ মানুষের কাছে, কুমায়ুনের কাছে, প্রভাস বিশ্বাস, আমার প্রকাশক মুদ্রক এবং তার সাথে জড়িত সকল মানুষের কাছে এবং সর্বোপরি পাঠকের কাছে।

আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন, প্রয়োজন অবসরের প্রতিদিন।

নিবেদক

লেখক

প্রথম অধ্যায়

লেখাটা শুরু করি। গড়িমসি করতে করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। বয়সকালে এ রকম হতো না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে কর্মক্ষমতার শুধু নয় ইচ্ছাশক্তিরও ঘাটতি হয়। বর্তমানে আমি সেই অবস্থায় আছি। কথায় কথায়, আমার সম্প্রতি গড়ে ওঠা বন্ধুদের কাছে নানান্ কথার মাঝে নিজের কথা বলা শুরু করেছি, মাঝে মাঝে তার অংশ বিশেষ টুকে রাখা—এখানেই আমার যত আলস্য। অগত্যা মগজে ধোঁয়া দিয়ে বসলাম, ছড়ানো-ছিটানো ইহ জীবনের কথা—শেষ হবে কিনা জানিনা। কোন্‌কালে কোন ব্যক্তি তার কোন্ কাজ শেষ করতে পেরেছে! অনেক কিছু করার পরও মন বলে-আহারে! আসল কাজটাই তো করা হল না! আসলে, কোনটা আসল আর কোনটা বা নকল-শপথ করে বলা যায় কি! তাছাড়া স্বয়ং অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী বা শিল্প-সাহিত্য-কাব্য-কলার সাত-সমুদ্দুর স্বয়ং কবিগুরুকে বলতে শুনি বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি—তখন ভরসা পাই। মনে হয় আমার বলা বা লেখা যদি অসমাপ্ত রয়েই যায়। আমার শ্রোতৃবন্ধুরা নিশ্চয় নিজ গুনে ক্ষমা করে নেবেন।

স্বল্প পরিসর এ জীবন। দেখার বা জানার সীমানা অতি সংক্ষিপ্ত। তবুও বলার নেশা থেকেই আমার এই নির্ভীক প্রয়াস। এই নেশা আদিম। গল্প বলার নেশা থেকেই আমরা পাই, বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াস, অডিসির মত মহাকাব্য। এ তো গেল জানার সাধারণ জগৎ। এ ছাড়াও পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, জলে-স্থলে, দেশে-উপদেশে, যেখানেই মনুষ্য সমাজের বাস ছিল বা আজো আছে, সেখানেই নানান ভাষায়, নানা আঙ্গিক জাতি-উপজাতি বৃন্দের কত-না-জানা-অজানা গল্প-উপাখ্যান সেই সৃষ্টির আদিকাল হতে আজো ফল্গুধারার ন্যায় বহমান-তার খবর ক'জন রাখে! গণ্ডির বাইরে পা রাখবো? না বাবা না-কে জানে কি হবে। গল্প বলার লোক যেমন কমে যাচ্ছে-গল্প শোনার লোক হ্রাসমান-আজকের এই অতি দ্রুত জীবনে। আবার গল্প বা শোনার পরিবেশ বা আঙ্গিকের বদল তো আছেই। সেদিনের সেই ঠাকুমা দিদিমাদের দিন, যারা নাতি নাতনির পাশে শুয়ে রাক্ষস-ক্ষোক্কোশ, ভুত-পেত্নি, রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প বলতেন—শেষ। এখন গল্প শোনায় বেলাদিরা, টিন্‌টিন্ ও স্পাইডার ম্যান্‌রা, লেটেস্ট হ্যারিপটার!

তবুও জীবনে গল্প বলার মাদকতা?—একটা সময়ে আসে। সবার না হলেও অনেকের মধ্যে। অবশ্য, যদি হাজার ধান্দার মাঝে সামান্য অবসর মেলে। আফিং অপেক্ষা মানবমনে এ মাদকতার প্রভাব কোন অংশে কম নয়। যদিও আফিং বর্তমানে অচল। শরৎবাবুর দিন শেষ। শরৎবাবুর সাথে সাথে আফিং বিদায় নিয়েছে-অর্থাৎ সে আফিংও নেই এবং মৌজও নেই। আফিং-এর পূর্ণবাসন হয়েছে নূতন মোড়কে। যার নাম নেশা সর্বনাশা।

ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে, হিমালয়ের পাদদেশে এই পর্বতমালার নাম কুমায়ুন পর্বতমালা বা কুমায়ুন রেঞ্জ। গায়ে গা ঘেঁসে ছোট বড় অসংখ্য পর্বত। হিমালয়ের প্রহরী যেন—যার ওপর গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শৈলশহর আর পাহাড় জুড়ে ছোট বড় বিভিন্ন

গ্রাম; পাহাড়ি আদিবাসিদের বাসভূমি দীর্ঘদিনের। উত্তরাঞ্চল, হিমাচল প্রদেশের শৈলশহর গুলোতে পর্যটকের আগমন বছর জুড়ে। এই পর্বতমালায় বৃষ্টি হয় শষ্য হয় ফল ফলে, বরফ জমে, বরফ গলে জল হয়, ছোট ছোট ঝর্ণা দিয়ে জল নামে দৃষ্টিনন্দন, সবুজ বনানীর আচ্ছাদনে ঢাকা থাকে পর্বতমালা, বর্ণালী ফুল ফোটে, পাখী ডাকে—এর আকর্ষণ তীব্র এবং সর্বজন বিদিত। পাহাড়ের বুকের ওপর সোজা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো—ওক, বাজ্, সগুন দেওদার আদি-দৃষ্টিনন্দন। গাছের ভিড়ে কোনো একটা গাছের ডালে বসে পাতার আড়ালে বসা একটা পাখী মনের সুখে কিম্বা দুঃখে না বাসনায় জানিনা, ডাকছে কুক্উ....কুক্উ....কুক্উ....দিনে ও রাতে, অবসর দিয়ে বারে বারে মিষ্টি ডাক, যেন একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতা মেশানো। নিঃশব্দ নিঃস্তব্ধ কুমায়ুনের বুকে একটি গ্রাম। মিষ্টি ঐ পাখীর ডাক ব্যঞ্জনাময়। স্পর্শ করছে আমার মনোভূমি। মৃদু অথচ শিহরিত-জানিনা পরিবেশ না আমার মানসিক নিঃসঙ্গতা এর জন্য দায়ী। পাহাড়ি গ্রাম, শহর বেশি দূর নয়, যে কারণে শহরের স্পর্শ বা প্রভাব আছে এ গ্রামে। এখানকার, একটা আধুনিকতার কিছু কিছু উপকরণ দিয়ে সাজানো লজের কাঁচ ঢাকা জানালা দিয়ে আমার দৃষ্টি প্রসারিত। জানালার সামনের উল্টো দিকের পাহাড় সবুজ পাতায় ছাওয়া গাছে ঢাকা। তার ওপরে নীল রঙের আকাশ, কোথাও কোথাও জলশূন্য সাদা, ঘোলাটে, বর্ণালী মেঘ ভেসে আছে। সূর্যের কিরণে ঐ মেঘগুলো রঙিন, কিরণ লেগেছে সবুজ বনানীতে। নিচের পাকদণ্ডি দিয়ে অবসন্ন পদক্ষেপে ঘরে ফিরছে ঘাসের বোঝা নিয়ে কুমায়ুনী রমণী বর্ণহারা রঙিন শাড়ী পরনে, তার ওপর বেঢপ সোয়েটার। পায়ে জুতা বা চপ্পল। শীতের জায়গা-শীতের আবরণ জরুরী।

লাবণী ওরফে কিউটি ঘুরতে বেড়িয়েছে। মানসদা ওর নাম রেখেছেন লাবনী। বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় ওর নাম লাবনী খান্। কেউ ওর পরিচিতি জানতে চাইলেও নিজেকে লাবনী নামে পরিচয় দেয়। আমরা, বিশেষ করে আমি ওকে কিউটি, ছোট করে মিষ্টি করে কিউ বলে ডাকি। আমার বা আমার জীবনের বর্তমান পর্বের গল্পের নায়িকা কিউটি ওরফে লাবনী। এক এবং অভিন্ন। মননে কিনা জানিনা। শৈশবে, ছোট শিশুকে, বৌদির সাথে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতেন মানসদা। লালটুকটুকে ভীষণ সুন্দর, মিষ্টি মেয়ে লাবনী। হাঁটতো, খেলতো, ছুটতো, পড়ে যেতো দাঁড়াতে জানত না, সদায় হাসতো। কোন কিছু ফেলে দিয়েছে টান মেরে, ধরতে গিয়ে, দুঃখ নেই, নিজেও পড়েছে—কষ্ট বোধ নেই, আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে দুষ্ট হাসি দিয়ে আমাদের ভোলাবার চেষ্টা—সেই থেকে কিউটি। সেই থেকেই আমাদের কাছে লাবনীর নতুন নামকরণ কিউটি। সে কিউটি বড় হলো, আদুরে হলো, আমরা ওর লাবনী নাম ভুলে গেলাম। লাবনী হয়ে গেল কিউটি, পরবর্তী জীবনে আমার বড় আদরের, বড় ভালবাসার আমার একান্ত আপনার কিউ। কিউ আমার রক্তে নতুন করে সৃষ্টি করলো প্লাবন। আমি পুনরায় নতুন জীবন পেলাম। বুঝলেন শ্রোতৃবৃন্দ, পান্নাবাবু, কৌশিকবাবু, মনিশঙ্কর বাবু ও আপনারা। এই বেবি আমার কিউটির মেয়ে।

একদিন, দিনেরবেলা বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ আলো উধাও। ধেয়ে এল মেঘ, তার কিছু সময়ের মধ্যে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি। আমাদের চেনা আকাশ, বর্ষণ শীতের নয় শরতের। ভাষা মেঘে বৃষ্টি রাস্তার এপারে হয় ওপারে হয়না। এ বৃষ্টি ও সেরকম। তবে তফাৎ আছে। লজের ছাদ টিনের। ববফ জমে কংক্রিটের ছাদ খারাপ হয়ে যায়, বরফ

জমে ঘর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হয় এবং কংক্রিটের ছাদের ওজন অপেক্ষাকৃত বেশি সে কারণে বাড়ির ছাদ টিনের। বৃষ্টি ঝরেছে বড় বড় ফোটার সাথে বরফকুচি। টিনের ছাদে বৃষ্টি বিন্দু বরফকুচির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দের মুখরতা-নতুন অভিজ্ঞতা। সামনের পিচের কালো রাস্তা সাদা বরফ কুচিতে সাদা হয়ে ঢেকে গেছে। জানালার কাঁচ দিয়ে সেই মনোরম দৃশ্য দেখলাম বিস্মিত চোখে। সাতসকালে এই বৃষ্টি বাড়িয়ে দিল শীতলতা। ভাল করে শাল জড়িয়ে নিলাম। অল্প সময়েই বৃষ্টি থেমে গেল। উধাও সেই কালো মেঘ। সোনালি রোদের হাসি বৃষ্টিভেজা সবুজ পাতায়। আবেশে উজ্বল গাছ শাখাপ্রশাখায় লতায় পাতায়। মনোরম এই প্রাকৃতিক পরিবেশ। বৃষ্টি ধোওয়া পিচের রাস্তা যেন সদ্য স্নানের শেষে এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী-যে এখনো তোয়ালে বোলায়নি সিক্ত শরীরে। এমনি এ পরিবেশে যদি সেই অজানা পাখী মিলন পিয়াসে কুক্‌-উ...শব্দে তার প্রেমিক বা প্রেমিকাকে আবেশ কণ্ঠে ডাকে, তার মিঠে সুর বড় বেরসিকের প্রাণেও রোমাঞ্চ জাগাবেই। নিশ্চিত বলা যায়। ডাকছে। হ্যাঁ ডাকছে সোনালি আলোয় আর গাছের পাতার সবুজের সমারোহে ঐ পাখীর ডাক আমার হৃদয় স্পর্শ করলো। পাশে বসা কিউকে লক্ষ্য করলাম-সে উদাস। কিছু সময় পর কিউ একা ঘুরতে বেরোলো। প্যান্টের ওপর কার্ডিগান চাপিয়ে। দেখলাম কিউ হাঁটছে-ছুটছেনা হাঁটছে-না নাচছে বলা মুশকিল। তবে কিউ এর চলায় নাচের ছন্দ মেশানো ছিল অবশ্যই। প্রকৃতি, পরিবেশ মানুষের জীবনে, মনে প্রভাব বিস্তার করে।

দিগ্‌ ঘর পরিষ্কার করছে। বাসন পত্তর, বালিশ বিছানা। ওর বৌ বেরিয়ে গেছে, ছেলে গেছে। ঘর পরিষ্কার করে দিগ্‌ বাগানে নামবে। গাছে জল দিতে হবেনা তবুও পরিচর্য্যা করতে হবে। আমি সিগ্রেট ধরালাম। শূন্য মন। ভাষাগত ভাবে এই মনের অবস্থা কোন শব্দে যথার্থ হবে জানিনা। সোজা চোখে, পূর্ণ নজরে কুমায়ুন দেখছি। প্রকৃত অবসর যাপনের মন নিয়ে এখানে আসা। বড়ই ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে জীবন শেষ হয়ে এল। একমাত্র মাঝখানে কয়েকদিন ক্লান্ত বা অবসন্ন ছিলাম। তার অর্থ এই নয় যে অবকাশ ছিল। জীবনে, কাজের ফাঁকে বিশ্রাম দরকার শুধু শরীর বিশ্রাম নিলেই হবেনা, মনের বিশ্রাম কম জরুরী নয়। এমন সময় কিউ ঘরে ঢুকলো ভেজানো দরজা ঠেলে, দিগ্‌ শুকনো ডাস্টার দিয়ে বাসন পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখছিল। হঠাৎ কিউ ফিরে এল কোলে কুকুর ছানা। দেশী কুকুর, যেহেতু ঠাণ্ডা জায়গা, কুকুর ছানার গায়ের লোম দীর্ঘ এবং ঘন। কিউ এর সাথে কুকুর-ছানাটির পরিচয় হয়ে গেছে। পালিয়ে যায়না, কুঁই-কুঁই শব্দ করেনা। বরং কিউ কোলে নিয়ে আদর করলে আদর খায়, কিউ এর দিকে জুলজুল চোখে চেয়ে দেখে। কিউ ওকে রাস্তা থেকে ঘরে নিয়ে এসে বিস্কুট, পাঁউরুটি খাওয়ায়। কিউ আর কুকুর ছানাটি খেলা করে। আজও এসেছে। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে গায়ের লোম। কিউ বুকের কাছে চেপে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে গায়ের জল, আদর করছে গালে গাল ঘসে। আরাম পাচ্ছে কুকুর ছানাটি। মাঝে মাঝে গলা দিয়ে কুঁই কুঁই শব্দ। কিউ এর আদরে আর তোয়ালে স্পর্শে ভিজে লোম শুকোতে দেরি হলনা। এবার শুরু হল ওকে খাওয়ানোর পালা। বিস্কুট-কুকুর-ছানাটি যত না খাচ্ছে, কচি কচি দাঁতে, ছড়াচ্ছে বেশি। বিস্কুটের গুড়োয় ভরে গেল ঘরের মেঝে। আমি অর্দ্ধনির্মিলিত চোখে দেখছি, ভাল লাগছে। দিগ্‌ ঠোটের কোলে হাসি জাগিয়ে বাগানে গেল।

স্থির যৌবন সমৃদ্ধ কিউ এর শরীর। গায়ে লেপটে আছে উন্নতমানের সিন্থেটিক টপ্। কিউ এর উদ্ধত স্ফীত স্তনযুগল প্রস্ফুটিত অত্যন্ত উগ্র চেহারায়। তিন যুগ পার হয়ে গেছে কিউ এর শরীরে, যৌবন এখনো স্বমহিমায় বিদ্যমান, অপসৃত হয়নি সামান্যতম গরিমা, বরং কিছুটা বিনীত ও পরিশীলিত। তেমনি নিতম্বদ্বয়কে জড়িয়ে ধরেছে জীনের প্যান্ট। ষাট পেরোনো এ বয়সে কিউ এর শারীরিক বর্ণনা, এরকম স্পষ্টতঃ, আমার উচিৎ নয়। আমি স্বীকার করেও নিরুপায়। কারণ এই কিউই আমার মনের বার্দ্ধক্যকে ফিরিয়ে দিয়েছে নবযৌবনে। মাঝে মাঝে ওকে রাগাবার জন্য প্রশ্ন করি, আমার মত বুড়োকে নিয়ে এভাবে মজেছো, তোমার বয়সের হিসেব রাখো—কিউ কপটভঙ্গিতে উত্তর দেয় 'জানিনা'। কিউ জানে তবুও না বলে, আমি জানি, তবুও জিজ্ঞাসা করি, কিউ যদি জেনেও ইচ্ছা করে ভুলে থাকে এবং খুশি হয়, থাকুক না! তবুও বলছি রোহিতের চেয়ে ও বড়। অন্ততঃ এক দু বছরের। রোহিত ইঞ্জিনিয়ার। পাশ করে, তিন বছর চাকীর হয়ে গেল। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও করেছে। যাক্‌গে, বয়স দিয়ে কি হবে! বছর বা মাসের হিসাবে বয়স বাড়লেও শরীর ও মনের বয়স সকলের একই ফর্মুলায় বাড়েনা। এই যে কুকুর ছানাটি, রাস্তার কুকুরের ছানা, কিউ ওকে নিয়ে এক মনে খেলছে—দেখলে কে বলবে ওর বয়স হয়েছে, কে বলবে কদিন আগেই জীবন বিতৃষ্ণ হয়ে নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করতো! শরীর ও মন দিয়ে কিউ কুকুর ছানাটিকে নিয়ে এই মুহূর্তে আনন্দে আছে, আরামে আছে, সুখে আছে, থাকুক না, আদর করছে, চুমু দিচ্ছে, আঙুল দিয়ে মুখ ফাঁক করে খাওয়াবার চেষ্টা করছে, করুক না। আমার কি? আমার শরীর শির শির করবে কেন? কেনই বা এ বৃদ্ধ মনে ঠিক ঈর্ষা নয় অথচ ঈর্ষা ঈর্ষা ভাব জাগবে? কেন?—অনুচিত।

চেয়ারে আধো হেলান দিয়ে বসে। লজের চেয়ার বেশ বড় এবং অর্দ্ধহেলানো। কেদারা ও আরাম-কেদারার মাঝামাঝি আকৃতির। বসেও ঝিমিয়ে নেওয়া যায়। হাতে খোলা বিদেশী জার্নাল। একজন গবেষক উড়িষ্যার আদিবাসী অধ্যুসিত একটা অঞ্চলের ওপর কাজ করেছে। সেখানকার জনজীবন, কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ, জন্মের মৃত্যুর হার, গড় আয়ু, মাতৃত্বের চেহরা, শিশুদের মৃত্যু অপুষ্টির ওপর অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে কাজ করেছে, সংগৃহিত তথ্যাদিসহ কারণ অনুধাবন করেছে কিন্তু উত্তরণ বা এর থেকে কি ভাবে উন্নত অবস্থায় পৌঁছানো যায়—সে ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনার রূপরেখা দেয়নি। পড়ছিলাম। এ ছাড়াও পরিবেশ দূষণ, যুদ্ধ পরবর্তী রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ইত্যাদির ওপর লেখা আছে, পড়া হয়নি। বার বার মনযোগের ব্যাঘাত ঘটছে, পড়া শেষ হচ্ছেনা, এই যে এখন ইচ্ছা না হলেও খুলে বসেছিলাম, বই খোলা, খোলাই রয়ে গেছে, পড়া হচ্ছেনা, আমি কিউ এর কুকুর ছানাকে দেখছি, কিউকে দেখছি। অবশ্যই কিউকে বেশি করে দেখছি, গভীর ভাবে দেখছি। কিউ এর শরীর দেখছি, কিউ এর মন দেখছি। জার্নাল পড়া হচ্ছেনা। খোলা রয়ে গেছে। কিউ কুকুরছানাটির কচি মুখ ফাঁক করেছে, দুটি আঙুল দিয়ে মুখে বিস্কুট দিচ্ছে, টস্‌টসে লাল আঙুল ওর মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আঙুলে লালা লেগে যাচ্ছে, প্যান্টের পেছনে মুছে নিচ্ছে, কুকুর ছানাটি খাচ্ছেনা, কপট আদুরে বকুনি দিচ্ছে-খা-খা নইলে মারবো। কোল থেকে নেমে ছানাটি ছুটছে টেবিলের নিচে, চেয়ারের পেছনে---কিউ ধরবার জন্য ছুটছে, লাফাচ্ছে কিউ এর শরীর নাচছে, লাফাচ্ছে—এর

পর পড়াই মন বসে। কিউ ছানাটিকে বুকে চেপে ধরে, একান্ত মেয়েলি গলায় আদর করছে—উষ্ণ এবং মিষ্টি সুরে ও স্বরে, আমার চোখ বড় এবং উজ্বল হয়ে দর্শন করছে সে-মধুর দৃশ্য, উৎফুল্ল হচ্ছে হৃদয়। বড় দুর্লভ এ দৃশ্য। এতদিন এ রকম মধু-মাখা দৃশ্য আমি কলকাতায় দেখিনি। জানালার কাঁচ দিয়ে সূর্যের ছটা তির্যক ভাবে মেঝেয় পড়েছে আমার গায়ে লেগেছে এবং কিউকে স্পর্শ করেছে। স্পর্শ করেছে ওর গণ্ডদেশ, ওর রক্তাভ গাল। গাছের পাতা সূর্য-আলোয় উজ্জ্বল, আনন্দিত। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আসা ঐ তির্যক ছটায় "ওম্-ওম্" আরাম লাগছে, উপভোগ করছি। উপভোগ করছি—আদর খাচ্ছে ছানাটি, কিউ এর আদর-কিউ এর শরীরের আদর-কিউ এর মনের আদর। কত আদরই না জমে আছে ও-হৃদয়ে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে কুকুর ছানাটি শুধু নয় কিউ ও আদর খাচ্ছে—নিজের আদর নিজে গ্রহণ করছে। কখনো কখনো জীবনে এ-রকম হয়, মানুষ নিজেকে নিজে আদর করে সুখ পায়, তৃপ্তি পায়। হয়তো আমার মনের ভুল হতে পারে। তবুও শীতের দেশে, হালকা উষ্ণ আলোয় কিউ আর কুকুর ছানার নিবিড় সান্নিধ্য আমার অন্তরে প্রচণ্ড সুখানুভূতির সৃষ্টি করেছে। আঃ কি আরাম!

কয়েকদিন হল কলকাতা থেকে এসেছি। কিউ আর আমি। বিশ্রাম ও স্থান পরিবর্তন। এক ঘর, এক কাজ, একই রকম ব্যস্ততা, হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। অবশেষে কুমায়ুন রেঞ্জের ওপর এই গ্রাম, কোলাহল মুক্ত, দূষণমুক্ত, শান্ত, সুস্থ্য পরিবেশ। সমতল থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে পিচ রাস্তার ওপর দিয়ে ছোট বাস, জিপ ও মারুতি গাড়িগুলো পাহাড় বেষ্টিত এই গ্রামগুলোতে ভ্রমণপিপাসু মানুষগুলোকে নিয়ে আসে। সবুজ পাতার চাদর-মুড়ি দেওয়া একটা গ্রামের একটা বিখ্যাত কোম্পানির লজে একমাসের জন্য আমরা এসেছি। আমার পরিচিত এক সরকারী অফিসারের সৌজন্যে এই লজটা আমরা পেয়েছি। সুসজ্জিত। শোবার ঘর, বসার ঘর, কিচেন, ঝোলানো বারান্দা, সামনে ফুল বাগান-সযত্নে লালিত, রঙ বেরঙের ফুল ফুটে আছে। আছে নেপালী কেয়ারটেকার কাম গার্ডেনার কাম সারভেন্ট কাম কুক। পিলারের ওপর লজ, নিচে পিলারের ফাঁকে অস্থায়ীভাবে নির্মিত একটুকরো ঘরে নেপালী কেয়ারটেকার দিগ্ বাহাদুর তার স্ত্রী ও ছেলে নিয়ে শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায়-বারো মাস থাকে। নেপালীরা বেশির ভাগই বাহাদুর। তবে বাহাদুর কিনা জানিনা, বিশ্বস্ত এবং বিনয়ী নিশ্চয়। এই দিগ্‌বাহাদুর বাজার করে, ঘর পরিষ্কার করে, বাসন পরিষ্কার করে, রান্না করে, দরকার হলে সাহেব-মেমসাহেবদের গাও টিপে দেয়। যে কোন ফায়-ফরমাস হাসিমুখে পালন করে। ডাল, তরকারী, মাংস ভাত রুটী করতে পারে, করেও। যেমনি করুক, চলে যায়। খাদ্যরসিক আমি নই, যা পাই, যেখানে পাই, যার হাতে হোক, আমার আপত্তি নেই। এ বিষয়ে বাছ বিচার আমার আগে ছিলনা আজো নেই। দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন সময় বহুবার গেছি, হোটেলের পরিবেশিত নানান দেশের নানা ধরনের খাবার খেয়েছি, বাঙালি জিভে সুস্বাদু-স্বাদবিহীন সব রকমই ছিল—অসুবিধা হয়নি, যা পেয়েছি খেয়েছি পেটপুরে। বাহাদুর এ কদিন যা করে দিচ্ছে, খাচ্ছি, আমার অসুবিধা হচ্ছেনা, মাঝে মাঝে সখ করে কিউটি রান্না করে, হাত ভাল। মুখ বদলায়। মানসদার স্ত্রী, বৌদির কাছ থেকে শেখা।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। গাছে ফল আসার সময়, একদা ফলের জন্য বিখ্যাত ছিল এ পাহাড়। সুস্বাদ আপেল হত, এখন আপেল হয়, খাওয়ার মত নয়, আপেলের জন্য

যে রকম শীতলতা দরকার, এখন নেই, গরম হয়ে গেছে পাহাড়। এদের কথায় বাজ্, ওক্ গাছ কেটে ফেলার জন্য পাহাড়ের আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। ঝাঁকরা, মাঝারি সাইজের গাছ, পাহাড়ের দুপাশ জুড়ে, পাতার ফাঁকে শাখায় ঝুলছে-আরু ন্যাসপাতি, পিচ্ খোমানি ইত্যাদি, সবুজ ডুমুরের মত। কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ পাথর, সেখানে গাছ নেই। আছে অনেক চির দেওদার গাছ-খাড়া এক পায়ে। মাথার চার পাশে ছড়ানো ডাল, চুলের মত পাতার গড়ন-যেন ছাতা মাথায় কোন লোক। লালে লাল ফুলের ব্রাশ গাছ, ব্রাশের ফুল থেকে লাল রঙের স্কোয়াশ তৈরী হয়। খেতে মন্দ নয়। অসংখ্য ওক্, ডালিম, লতানো গোলাপ, ঝাউ, গুল্মাদি শোভিত এ পাহাড় বড়ই মনোরম। আর আছে বয়সের হিসাব নেই এমনই ওক্-বড় গাছ, যার পাতার দু পিঠের দু রঙ, বিকালে পাতাগুলো উল্টে সূর্যের কিরণ গ্রহণ করে। উষ্ণতা শোষণ করে নেওয়া এ গাছের পাতার বৈশিষ্ট। হিমালয়ের ঠাণ্ডা হাওয়া দেওদারের পাতার মধ্যে দিয়ে যখনই দ্রুত চলাচল করে দিনে ও রাত্রে, আওয়াজ হয়—শোঁ....শোঁ....শন্....শন্। যে আওয়াজ দীঘা বা পুরীর সমুদ্রের ধারে ঝাউ বনে হয়, সমুদ্রপারে ঢেউ এর শব্দে, ঝাউ বনের শব্দে সৃষ্টি হয় অপূর্ব সুর-লহরী। সেই সুরলহরী এ পাহাড়েও শোনা যায়।

গ্রীষ্ম অনুপস্থিত কুমায়ুনের এই পাহাড়ী গ্রামে। গ্রীষ্ম থমকে দাড়ায় পাদদেশে। বাংলা দেশের শীতের ঠাণ্ডা এখানে গ্রীষ্মকালে। যে কারণে সোয়েটার খুলতে পারিনা গা থেকে। মাফ্লার গলায় জড়ানো, পায়ে জুতো মোজা। গায়ে সূর্যের আলো পড়েছে তবুও গায়ে শাল জড়ানো, নইলে শীত করে। স্নান করা, মুখ ধোওয়া গরম জলে নইলে দাঁত ব্যথা করে। খাবার জলে গরম জল মিশিয়ে নিই। আমি একা নই, কিউও গরম জলে স্নান করে গায়ে ক্রিম, পারফিউম বুলিয়ে বাথরুম থেকে বেরোয়। কিউএর ত্বকের গন্ধের সাথে পারফিউমের গন্ধ মিশে এক অদ্ভুত তৃপ্তিদায়ক মদিরতার সৃষ্টি হয়, প্রবেশ করে আমার খোলা নাক চোখ মুখ দিয়ে হৃদয়ে, হৃৎপিণ্ডে, শিরা-উপশিরায়, সৃষ্টি হয় রোমাঞ্চ। আমি মোহিত হই, আবিষ্ট উজ্জীবিত হই। পলকহীন চেয়ে চেয়ে দেখি-ওর মাথা ভরা চুল, গলায় পিঠে জমা থাকে দুএকবিন্দু জল, তোয়ালেকে লুকিয়ে মুক্তোর মত কিউএর গায়ে ঝলমল করে টল্‌টল্ করে। কিউ পাশে এলে আঙুলের ডগায় জলবিন্দু স্পর্শ করে আঙুল ভেজে, মন ভেজে। লম্বা নিঃশ্বাসে কিউ এর গায়ের সুগন্ধ গ্রহণ করি, বৃদ্ধ এ মনে পূর্বরাগের সুর; সেতারের আলাপ ধ্বনিত হয়। ফেলে আসা প্রথম যৌব্যনের স্পর্শের আস্বাদনে যে শিহরণ জাগতো—এ যেন তারই অনুরনন। পূণর্জীবন কিনা জানিনা, আমি আমার অনুভূতির কথা বলছি। অকপটে। নারী মহিমাময়ী। নারী কুহকিনী, নারী জীবনের যে বহ্নি, যা পুরুষের জীবনে বেঁচে থাকার বাসনা জাগিয়ে রাখে। কিউ আমার সৃষ্টির সঞ্জিবনী।

লক্ষ্য করলাম, পার্কে বসে বসে আর স্বল্প দিনের পরিচিত বন্ধুদের কারো কারো চোখে শ্রবণে তৃপ্তির ঝলক, কারো কারো চোখে নিন্দাসূচক বিস্ময় (ছিঃ ছিঃ)। স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক। আবেগে অনেক গুলো কথা বলার পর স্বল্প বিরতি। যে কোন কথক কিছু বলার পর থামে, শুনতে চায় হ্যাঁ, হ্যাঁ....হুঁ হুঁ....। আবার বলা শুরু করে বা বন্ধ করে। আমার লক্ষ্য সেই উদ্দেশ্যে। এটা তো স্বাভাবিক কোন কিছুই বা কোন ঘটনাই সকলের কাছে সমান ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়না। অতএব কুমায়ুনের আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, কিউএর আমার সম্পর্ক সকলের ভাল লাগবে—এতো হতে পারেনা। কিন্তু বলার

নেশায় আমি বুঁদ, থামায় কি করে। আর কিউ এর কথা আমার বলতে ভাল লাগে যে! কিউ এর কথা বলার মধ্যে তৃপ্তি আছে। এই বয়সেও কিউ এর কথা বলে আমি আনন্দ পাই। আমি জানি আমার শ্রোতৃবৃন্দেরও পায়। আমি অকপট-অনেকে নয়। সে রকম পরিবেশ হলে ফেলে আসা অনেক গোপন কথাও গড় গড় করে বেরিয়ে পড়ে। কোনো বাধাই মানেনা। আবার অনেকে নিজের মনে নিজে বলে তৃপ্ত হয়।

জীবন দীর্ঘ নয়। নাতিদীর্ঘ এ জীবনের প্রতিদিনের একই কথার একই কাজের পুনরাবৃত্তি, মানুষ কখনো সখনো অসুস্থ হয়ে পড়ে, ড্যাম্প ধরে যায় বা স্যাঁৎসেঁতে হয়ে যায়, সে সময়ে সামান্য উষ্ণতা স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনে, জীবনের ছন্দে আবার দোলা লাগে। আমার গল্প সেই মুহূর্তগুলোকে নিয়েই। জীবন বহতা, বদ্ধ নয়, ছোট ছোট হিল্লোল, সকালের বা সদ্য সূর্যের আলোর ঝিকিমিকি সুন্দর। গন্তব্য একই জায়গায়, আগে কিম্বা পরে, পঞ্চভূতে লীন হয়ে যাওয়া। তাই বিষণ্ণতা কেন?

যাক, যে কথা বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলাম, আবার সে কথায় ফিরে যাই। কিউ এর কুকুরছানা নিয়ে খেলা বা কুকুর ছানাকে মোছানো, খাওয়ানো, আদর খাওয়ানো, আদর খাওয়া তো দিনভর চলতে পারেনা। অবশেষে সে সময়ের মত বিরতি হল। বোধ হয় কুকুর ছানাটির যতই ভাল লাগুক তার তো মানুষের আদর, বেশি সময় ভাল লাগবেনা। তাছাড়া মায়ের কথা মনে পড়েছে, সুযোগ পেলেই ছোট ছোট চারটি পা ফেলে, লেজের আন্দোলন করতে করতে ঘর ছেড়ে রাস্তায়। সেখান থেকে পিটপিট চোখে তাকিয়ে আদরকারিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন; যদি মানুষের ভাষা জানতো বলতে পারতো আমি ধন্য, এমন আদর আমি এর আগে পাইনি, আমি আবার আসব, ফিরে ফিরে আসবো। কুকুর ছানাটির পিট্‌পিট্ চোখে চলতে চলতে ফিরে ফিরে তাকানো আর লেজের মৃদু সঞ্চালন প্রমাণ করে যে ভালবাসা, স্নেহ মানুষ কেন, যে কোন জীবই অনুভব করে, তৃপ্তি পায় এবং উপভোগ করে।

কুকুরছানাটি নিয়ে এতক্ষণ চট্‌কা-চট্‌কি করার পর সেটি পলায়ন করতে সমর্থ হল, কিউ অনুভব করল তার গরম লাগছে। লাগবেই তো। খুলে ফেলল গায়ের জ্যাকেট। পরনে জীনের টাইট প্যান্ট, কোমরের ওপর সামান্য চর্বির আভাস। লম্বা হাতা কোমর পর্যন্ত টপ। ঈষৎ অবনত স্তনভার বৃন্তদ্বয় সুস্পষ্ট। জ্যাকেট খোলার পর দেখলাম ওর গণ্ডদেশে স্বেদ জমেছে। চুলের ব্যাণ্ড খুলে ফেলে চুল সমেত মাথা দোলানোর সাথে সাথে দুলে উঠল বন্ধনির মধ্যে বন্দি স্তনযুগল। অপূর্ব! ঘন চুল আলগা হতেই ছড়িয়ে পড়ল কাঁধ পর্যন্ত, সযত্নে ট্রিম্ করা। এতক্ষণ কুকুর ছানাকে নিয়ে পরিশ্রম করার পর লাল গাল আরো লাল-এক জাতিয় আপেলের এ রকম রঙ হয়।

—ক্ষিদে পেয়েছে। বসন্ত তোমার ক্ষিদে পায়নি? এখানে আসার পর ক্ষিদের প্রকোপ বেড়ে গেছে।

কুকুর ছানা গেছে। আমি যে চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় আছি, কিউ এসে আমার চেয়ারের পেছনে এসে দাড়ায়, চেয়ারের ওপর ভর দিয়ে। দুহাতের গরম নরম তালুতে আমার গাল চেপে ধরে, নরম বুকে চেপে ধরে আমার মাথা, ঘন ঘন চাপ দিতে থাকে মাথায়, শরীর দোলে, নরম বুক পিষ্ট হয় আমার মাথায়। আমি চোখ বন্ধ করে আছি, আরাম! আহা আরাম, মনে মনে বলি—এতক্ষণে আমার কথা মনে পড়ল! আর বিড় বিড় করে কুকুর ছানাটির মত কুঁই কুঁই, আদুরে গলায়—ক্ষিদে পেয়েছে, বসন্ত আমার

ক্ষিদে পেয়েছে!—পাবেই তো। এটা তো ক্ষিদে পাওয়ার বয়স। তারওপর পাহাড়ের জলে ভাল হজম হয়। পাহাড়ের জল, পাহাড়ের হাওয়া, ওপর-নিচ ওঠা-নামা করে হেঁটে বেড়ানো ক্ষুধার্ত বয়সে, ক্ষুধার্ত শরীরে—ক্ষিদের দোষ কি। আমার মত বুড়ো নাকি যে হজম শক্তি কমে যাবে! ক্ষিদের দোষ কি?

—বোসো। সামনে বোস। খাবার ব্যবস্থা করছি।

—কে? তুমি?

কিউ একটা চেয়ার নিয়ে সামনে বসে, মুখোমুখি। হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে। আমার দুটি হাত ওর নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নেয়। মুখে উজ্জ্বল সরল হাসি। যে হাসিতে মিশেছিল খুশি, নির্ভরশীলতা এবং শরীর মনের ভাললাগার প্রকাশ।

—দিগ্ বাহাদুর—কোথায় সে?—ওকে ডাকি। খাবার বানিয়ে দিক। কি খাবে?—তুমি ডাকো না।

—আমার গলায় জোর নেই।

—নিশ্চয় বাগানে আছে।—বাহাদুর ও দিগ্‌বাহাদুর।

—জী।

—শুনতে পেয়েছে। আসছে, কি খাবে? সকালে কোথায় ঘুরলে?—এক ঘণ্টা হবে?

—তা হবে। ঘরে বসে থেকে কি করবো? তুমি ঘরে বসে থাকতে পারো, আমার ভাল লাগেনা—

—নিশ্চয় ঘুরবো। ঘুরতে, বেড়াতে তো এসেছি। নিশ্চয় বসে থাকার জন্য নয়। সকাল-বিকাল বেড়ালে চেহারা বদলে যাবে। আমার ইচ্ছা হয়, কিন্তু শরীরে সয়না। আজ সকালে কি কি দেখলে বোলো।—বাহাদুর আসছে ব্রেকফাস্ট বানাবে।

—যা দেখার আছে। গাছ-গাছের ফল-পাহাড়ের চূড়া, ফলের গাছ আর দু এক জন পাহাড়ী মানুষ, তাদের বিস্ময়ে ভরা দৃষ্টি। আর বলতে পারবনা। ক্ষিদে পেয়েছে—

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে কিউ। দিগ্ ঘরে ঢোকে। গোলাম হাজির, আদেশ করো—বিনীত সপ্রশ্ন দৃষ্টি। হাতে নিড়ানি জাতিয় একটা বস্তু। কিউ কিচেন ঢুকে এক প্যাকেট কুড়কুড়ে নিয়ে আসে।

—তুম্ যাও।

—জী।

দিগ্ ঘাড় কাত করে বাগানে ফিরে যায়। কিউ কুড়কুড়ের প্যাকেট নিয়ে সেই চেয়ারে-আমার সম্মুখে। ধীরে দুটি আঙুল প্যাকেটে ঢুকিয়ে কুড়কুড়ে বের করে মুখে দেয় একটা একটা করে। দুধের মত সাজানো দাঁতে মুড়মুড় করে খায়। পাতলা ঠোঁট সিক্ত হয়, আন্দোলিত হয়। চোখে হাঁসি তৃপ্তির, পা দোলায়, আমার হাঁটুর সাথে ওর হাঁটু স্পর্শ করা। দোলে আমার হাঁটু। এই সাত সকালে, নরম রোদে কিউএর ভিজে লাল নরম ঠোঁটের মৃদু আন্দোলনে, কুড়কুড়ের মুড়মুড় আওয়াজ দৃষ্টিনন্দন, অতি মনোরম-দারুন মিষ্টি। বদ্ধ কলকাতার ফ্ল্যাট থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত যৌবন সমৃদ্ধ সুন্দর পরিবেশ গুনে চিতাকর্ষক কিউটির মন এবং শরীর। রোদের স্পর্শের আমেজের আরাম কিউ এর চঞ্চল বাঙ্ময় তনু, হাঁটুতে হাঁটুতে স্পর্শ ধীরে ধীরে আমার মনের শীতলতা অপসৃত হচ্ছে। শীরা-উপশীরা-ধমনী, হৃদয়, মস্তিকের কোষে কোষে অনুভব করছি ঈষৎ উষ্ণ প্রস্রবণ, অনুভব করছি এ বৃদ্ধ দেহে পুলক, শিহরণ। জানিনা আমার এ শারীরিক ভাল লাগা

কিউ অনুভব করছে কি-না! এই কিউটিই তো আমার মনের ও শরীরের মজে যাওয়া সুখানুভূতি গুলোকে নতুন করে জীবন দান করেছে। এ যেন সেই মহৌষধি যা মৃতকে জীবনদান করে। কিউটিই তো সেই রমণী, সেই প্ররণা যার প্রভাবে পুরুষ স্বপ্ন দেখে, পুরুষ সৃষ্টির উল্লাসে মত্ত হয়, যা উজ্জীবিত করে, যা বেঁচে থাকার কষ্টকে আনন্দধারায় রূপান্তরিত করে। কিউ প্রেরণাদাত্রী, কিউ মোহময়ী, কিউ ধাত্রী, কিউ মহামানবি। আমার সৃষ্টির সত্ত্বা ও প্রেরণা। কিউ হচ্ছে সেই নারীসত্ত্বা যা পুরুষের জীবনের দূর্গম যাত্রা করে সুগম, জীবনকে দেয় মহৌত্তর ঐশ্বর্য্য। পৌরুষের কাঠিন্যে আর নারীর কমনীয়তায় জীবনতরী অতিক্রম করে মনুষ্য সমাজ তথা তাবৎ মানবিক বিশ্ব। এক যুগের ওপর আমি আছি কিউটির সাথে। কিউটি আছে আমার কাছে। আমার সান্নিধ্যে যেমন কিউটির মনের নবজন্ম হয়েছে আর কিউটির নতুন মনের স্পর্শে আমি ফিরে পেয়েছি সৃষ্টির প্রেরণা। একদা অবসন্ন এ হৃদয় হারিয়েছিল কাজ করার উৎসাহ। নিরুৎসাহ গ্রাস করেছিল সমস্ত কর্মশক্তি। ইচ্ছাশক্তির মৃত্যু হয়েছিল। মনের দিক থেকে স্থবির হয়ে গিয়েছিলাম। অথচ আমার স্বপ্ন, আমার কাজের মধ্যে সমস্ত তৃপ্তি, রুচী ও রোহিতের কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়েছে, যে কাজেও আমি অবসন্ন হয়ে প্রায় পরিত্যাগ করতে চলেছিলাম। দিশাহীন অনঢ় জীবনে নেমে আসছিল ক্লান্তি। এমনি একটা সময়ে এল কিউটি। কিউকে আমি ভালবাসি, কিউকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিউ এর নারীত্বের স্পর্শে ধীরে ধীরে ফিরে পেলাম সেই আগের উৎসাহ, কাজের আনন্দ। আমি আবার সেই অতিতের আমিকে বর্তমানে পেলাম। কিউএর যাদুকাঠির স্পর্শে জেগে উঠল আমার মৃতপ্রায় আত্মা। আমার পুনরুত্থান ঘটল। কুমায়ুন পাহাড়ের অলস অবসরে নিজের কথা মনে আসে, প্রশ্ন আসে নিজের মনে, উত্তর পাই একটাই তুমি কিউটির সৃষ্ট। তোমার সৃষ্টির প্রাণপ্রতিষ্ঠা কিউ করেছে। সশ্রদ্ধ চোখে আমি কিউ এর দিকে চেয়ে দেখি, কিউএর দেহের অভ্যন্তরে যে শক্তি লুকিয়ে আছে তার সন্ধান করি। আমি ওর হাস্যোজ্বল চোখে খুঁজে পায় শ্রষ্টার নিপুন কর্মকুশলতা। আমি আবিষ্ট হই। আমার আত্মা অভিভূত হয়। সংরাগ। চিরসত্য।

—বসন্ত, তুমি পাথুরে নিষ্প্রাণ পাহাড়টা বাছলে কেন। যেখানে ক্ষিদে পেলেও খাবার মেলেনা।

—তোমার খারাপ লাগছে? তাহলে চলো অন্য কোথাও চলে যাই।

—এখানে মনোরঞ্জনের কি আছে? ক্লাব নেই, সিনেমা হল নেই, থিয়েটার হল নেই। এখানকার মানুষ জনের সাথে কথা বলা যায় না।

—কলকাতায় তুমি সিনেমা হলে বা থিয়েটার দেখতে লাষ্ট কবে গেছ, বলতে পারো? কলকাতায় তোমার পুরানো কোনো বন্ধু বান্ধবের সাথে যোগাযোগ আছে বলে মনে হয়না। আমি তো বলছি আমি ক্লান্ত হয়ে পালিয়ে এসেছি।

—কিসের ক্লান্তি?

—ব্যস্ততা। কলকাতায় থাকলে আমায় কোন সময় একা থাকতে দেয়? দেয়না। ফোনের পর ফোন, মেসেজের পর মেসেজ। দেশের ও বিদেশের হাজারো লোকের হাজার বায়না। সকলেই আমার কাছ থেকে পেতে চায়, কেউ লেখা, কেউ বক্তব্য, কেউ প্রবন্ধ কারোর সেমিনার ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্ত দিন ওদের সাথে ইন্টার অ্যাক্ট করতে করতে সময় ফুরিয়ে যায় এক মুহূর্তও নিজের জন্য সময় পায়না। তাই—

—সেজন্যেই কি—

—হ্যাঁ, সত্যিই তাই। তার ওপর দেখলাম, তোমারও বেড়ানোর ইচ্ছা হয়েছে।

—এই নির্জন পাহাড়!

—নির্জনতা প্রয়োজন।

—মাঝে মাঝে অবসর, মাঝে মাঝে নির্জন পরিবেশ, নির্জন সময় না পেলে কেউই নিজেকে এক্সপ্লোর করতে পারেনা। আমার এক বন্ধু বলতেই, সেএকজন সরকারি হোমরাচোমরা লোক এই লজ বুক করেদিল। এটা একজন বড় কোম্পানির মালিকের নিজস্ব লজ, সে ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করেনা। আমার কিন্তু জায়গাটা পছন্দ হয়েছে। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, সুস্থ আবাহাওয়া, লোকেরা বিনয়ী।

—বিনয়ী বলে বিনয়ী—বিনয়ের অবতার। চেনা নেই, জানা নেই, যার সাথে দেখা হবে বলবে নমস্তে মাজি—নমস্তে; মাজি-নমস্তে। আরে বাবা তোমরা মানুষ আমিও মানুষ, এরা নিজেদেরকে মানুষ বলে ভাবেনা।

—নমস্কার করা সৌজন্যের খাতিরে, শিষ্টাচারের বৈশিষ্টে। বিনয় প্রকাশ, শিষ্টতা সহকারে আপ্যায়ন, আমাদের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতির গরিমা, ভারতীয়দের আদিম সভ্যতার সাক্ষ্য।

—আমার মনে হয় এরা সামন্তপ্রথায় নিজেকে দাস হিসাবে মনে করে।

—গরীব এরা, মালিকের জমিতে কাজ করে, বাগানে কাজ করে, অতিত কাল হতে আজো। মাথা নিচু করে, নমস্কার জানিয়ে, মাথা নিচু করে মালিকের সাথে কথা বলতে হতো, হয়তো সেই অভ্যাস আজো বজায় আছে। খারাপ কি? বিনয় চারিত্রিক গুন।

—আমাকে সকাল বিকাল নমস্কার করার কি হ'ল?—আমি কি মনিব?

—তুমি মনিবদের দলের। ঠিক আছে আমি বলে দেবো তোমায় 'হ্যালো ম্যাডাম বলে ডাকতে।

হাসতে হাসতে বলি। কিউও হাসতে হাসতে উত্তর দেয়।

—যাও জানিনা! তোমার কিছু বলতে হবেনা।

—বলবো না। বলবো না। বেশ!

—বেশ না কচু।

হেসে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল আমার মুকের কাছে তুলে দেখায়। জিভের ডগা বের করে দেখায়, ডান হাতে আস্তে চিমটি কাটে।—কিশোরীর অনুকরণ।

—উঃ ছাড়, লাগেনা।

—লাগুক, লাগার জন্যই—বুঝলেন মশায়!

—নিশ্চয় আরাম—

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমার আরামের জন্যই—

নকল আওয়াজ, দুষ্টুমির হাসি, সকালের রোদের মত উষ্ণ। উঠে দাড়িয়ে কোমর দুলিয়ে হাততালি, গলায় খুশির অব্যক্ত ঝর্ণা।

কিউটির স্বাভাবিক প্রকৃতি। হাসিতে ভরা ভীষণ জীবন্ত ও তাজা মেয়ে। মেয়ে বললে সঠিক হবেনা। মেয়ে না বলে মহিলা বললে হয়, কিম্বা রমণী। যদিও কোনদিন কিউটিকে মহিলা বা রমণী হিসাবে ভাবতে ইচ্ছা করেনা। মেয়ে, আদুরে করে সুইট গার্ল বলে ডাকতে আমার সম্মতি আছে। মহিলা বললে দূরের আর রমণী ডাকলে 'কাছের' বলে

মনে হয়না। কিউ যে আমার মনের বড় কাছের। সে কারণে কিউ বা কিঁউটি ছাড়া অন্য কোন বিশেষ্য পদে কিউটিকে ডেকে তৃপ্তি পাইনা।

দরজার বাইরে মুখ বের করে দিগ্ বাহাদুর ডাকে। দিগ্ এসে মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড়া করে নমস্তের ভঙ্গিতে অপেক্ষা করে নির্দেশের।

—চপ্ করতে পারবে? ডিমের ডেভিল? পেঁয়াজী?

দিগ্ হকচকিয়ে ওঠে, নিরুত্তর। যেন বড় অপরাধ করে ফেলেছে। দিদিমনি যে জিনিষগুলোর নাম বলল সে কোনোদিন শোনেনি—চপ্-ডিমের ডেভিল....। ঘাড় দোলায়। অর্থাৎ না। সে রোটি বানাতে পারে, সবজি-ডাল। বাবুদের জন্য চিকেন— লেকিন্, সম্প্রতি আলুদম বানাতে শিখেছে।

—পেঁয়াজি করতে পারবে?—বেশন আছে?

দিগ্ এবারও নিরুত্তর। অর্থাৎ জানে না।

--জী।....জী নেহি।

ও জানেনা। তুমি ওকে বুঝিয়ে দাও। চেষ্টা করুক, পারবে, না হয় খেতে ভাল হবেনা।

—ছাতু আছে?

----ছাতু দুকানমে মিলেগা। লাউঁ?

—যাও, যাও, পয়সা লেকে যাও।

দিগ্ বাহাদুর নিজের প্যান্টে হাত মুছে টাকা নিয়ে বেশন আনতে যায়।

দিগ্ বাহাদুর কেয়ারটেকার কাম গার্ডেনার কাম কুক কাম সারভেন্ট নেপালে জন্ম। কুমায়ন-উত্তরাঞ্চলের এই গ্রামগুলো হতে নেপালের দূরত্ব বেশি নয়। সেখানকার বেশির ভাগ লোক গরীব। শৈশব পেরোতেই কাজের খোঁজে অনেকেই সীমান্ত অতিক্রম করে এদেশে আসে। পেটের ক্ষুধা মেটাতে। বিশ্বস্ত এরা। যে কারণে চৌকিদার বা কোথাও কোথাও দারোয়ান হিসাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এরা কাজ পায়। মজুরী কম দিলেও চলে। খাটতে পারে অক্লান্ত। পাহাড় অঞ্চলে দারোয়ানগিরির সাথে সাথে মালীর কাজ, ফলের বাগানে দিনমুজুরের কাজ, রাজমিস্ত্রির যোগানের কাজ, মুটের কাজ ইত্যাদি করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পতিতালয়ে নেপালি মেয়েদের সংখ্যাটা তুলনামূলক ভাবে অধিক। এই দিগ্ বাহাদুরও হয়তো জীবনের প্রথম ভাগে বা অনেকদিন আগে কখনো বাসে, কখনো হেঁটে পাহাড় অতিক্রম করে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলকে কর্মস্থান হিসাবে গ্রহণ করেছে। সাদি করেছে। রয়ে গেছে বর্তমানে এই কোম্পানি লজে। দিগ্‌বাহাদুরের জন্ম নেপালে কর্ম্ম ভারতে এবং মরাও ভারতে হবে। রক্তবীজ বড় হবে, বাড়বে ভারতে। এরকম অনেক আছে। আমাদের দিগ্‌বাহাদুর নেপালী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব খুইয়ে লজের চৌকিদার, বাগানে ফুলের চাষ করে, দুবেলা দু টুকরো রুটি অথবা দুমুঠো ভাত পরিবার সমেত জোটে। পরিবার ও কাজ করে, নির্মাণ কর্মীর মজুর, যতদিন কাজ থাকে। শহর থেকে বাবুরা বা সাহেবরা এলে বাড়তি বাবুদের ফায়ফরমাস খাটে, রান্নাবান্না ধোয়ামোছা সব, দরকার হলে বাবু-বিবিদের গা মাসাজ করে। পরিনামে বাবুদের খাবারের অবশিষ্ট অংশে ওদের মুখের স্বাদ বদল হয়, দুএকটা পুরানো কাপড় জামা জোটে। বাবু দয়ালু হলে বকশিষ, নইলে বাঁধা মাইনে যা জীবিকা নির্বাহের পক্ষে অপ্রতুল। দিগ্ গেছে বেশন কিনতে। ওর বছর সাতেকের ছেলে ব্যাগ

কাঁধে স্কুলে। বৌ-ছেলেকে খাইয়ে দিগ্‌বাহাদুরের খাবার চাপা দিয়ে, নিজেরটা রেঁধে নিয়ে ঠিকেদারের কাজে গেছে। বিকালে ফিরে জামাকাপড় ধুয়ে স্নান সেরে, ডালরোটি কাঠ জ্বালিয়ে বানিয়ে খেয়ে অন্ধকার কুঠুরিতে এক কম্বলের নিচে সকলে নীদ্রা যাবে। ভারতবর্ষে এসে ওদের অন্ততঃ অনাহারে মরতে হয়না। দিগ্‌ ফিরে এল এবার তৈরি হবে পরীক্ষামূলক কিউএর সাধের পেঁয়াজি।

—দিগ্‌ চার পাঁচ টো পিঁয়াজ ছিলো, সাফা করো।

—জী।

দিগ্‌ পেঁয়াজ কাটে। কিউ বেশন গোলে, নুন কাঁচালঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে মাখে। ও নিজের হাতে করবে। গ্যাস জ্বালে, ফ্রাইং প্যানে তেল ঢালে। গরম তেলে পেঁয়াজি বানায়। গরম তেল আর ভাজা পেঁয়াজের মিষ্টি গন্ধ নাকে আসে, কানে আসে দিগ্‌ আর কিউ এর টুকরো আলাপ। পেঁয়াজির গন্ধে মুখে জল আসে, বিশেষ করে এই ঠাণ্ডা দেশে।

উত্তরে হিমালয়ের গা ঘেঁসে এই পর্বতমালা। হিমালয়ের অনেক শৃঙ্গে সারা বছর বরফ জমা থাকে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দুএকটা শৃঙ্গ দেখা যায়। বরফের স্পর্শে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে কুমায়ুন কে বছর ভর শীতল রাখে। যে কারণে গ্রীষ্মেও শীতলতা বিদ্যমান। ফ্যাক্টারি নেই, গাড়ির সংখ্যা কম, কোনো কোনো জায়গায় গাড়ি যায়না, গাড়ি চলার পথ তৈরি হয়নি। পরিবেশ দূষণমুক্ত। ঝর্ণার জল সঞ্চয় করে শোধন করে পরিবেশিত হয়, জল হজমের সহায়ক। যে কারণে যা খাওয়া যায়, তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়। এটা ওটা খাওয়ার ইচ্ছা হয় রসনাতৃপ্তির জন্য। বাংলাদেশের ভোজন বিলাসি বাঙালিদের জন্য বিশেষ করে। কিউ এর বয়স কম, মনে আনন্দ আছে। ওর ওটা এটা—পেঁয়াজী, কষামাংস, পরোটা ইত্যাদি খাওয়ার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। সাথে ব্র্যাণ্ডি কিম্বা হুইস্কি হলে সোনায় সোহাগা। সে কারণে কিউটির পেঁয়াজি খাওয়ার বাসনা হওয়া যুক্তিসঙ্গত। অনেকে পাহাড়ে এসে সংযম হারায়, বিশেষ করে যখন মদ্যপান করে। কিউটি এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। যাই করুক বা যাই খাক সংযম মেনে। কিউটিকে নিয়ে দূর্ভাবনা নেই।

আরামে ভাজা হচ্ছে পেঁয়াজি। কিউ ভাজছে, দিগ্‌ দেখছে একমনে। মাঝে মাঝে দিগ্‌কে কিউ আধা বাংলা আধা হিন্দিতে বোঝাচ্ছে। মাঝে মাঝে গলা দিয়ে এক কলি বা দুকলি সুর বেরুচ্ছে হৃদয়ে খুশির সুরের আলাপন। আমার চোখ গাছের পাতায় মন কিউএর পেঁয়াজিতে কখনো কখনো নিজের মধ্যে। বাবার প্রেরণায় নিজের মনের ইচ্ছামত পড়াশুনা করেছি। উচ্চ উপার্জনের লক্ষ্যে নয়, বরং নিজের পছন্দে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ডক্টরেট, ঘুড়েছি মানুষের মধ্যে দূঃস্থ, পীড়িত, অসহায় মানুষের দূঃখ দূর্দশার প্রতি ছিল মমত্ববোধ। অসহায় মানুষের দারিদ্র, ব্যধির কারণ অনুসন্ধ্যান ছিল গবেষণার বিষয় আর সেখান থেকেই নির্দ্ধারিত হয়ে গিয়েছিল আমার কর্মজীবনের লক্ষ্য। মা ছিলনা, বাবার স্নেহের প্রাবল্যে, মানবিকতার মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে আমার শিক্ষাকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। শুরু করি অধ্যাপনা দিয়ে। স্বাধীন ভারতবর্ষের দরিদ্র নগ্ন চেহারা আমায় পীড়া দিত। কলেজ জীবন থেকে কলকাতার বিভিন্ন বস্তিতে, ফুটপাথের মানুষদের কাছে যেতাম তাদের সাথে মিশতাম, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হত, ওদেরকে বোঝাতাম। গবেষণার অনেক উপাদান আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান

থেকে উদ্ধৃত। সেখানে থেকে বেছে নিলাম নিষ্পাপ মানব শিশুর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা, প্রতিকারের পরামর্শ দেওয়া, বা বিশ্বের মানব সমাজের কাছে তুলে ধরা। এটাই ছিল আমার তপস্যা বা ব্রত এবং জীবিকা। যে কারণে জীবনের অনেক মূল্যবান সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশ্বের অনুন্নত দেশে-আফ্রিকায়, এশিয়ায়, লাতিন আমেরিকায় এমন কি উন্নত দেশ আমেরিকা, ইউরোপ ফ্রান্স গ্রীস ছিল আমার কাজের ক্ষেত্র। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সরকারি বেসরকারি তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন পাঠাগার থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে শুরু করে এমন কোন বড় সমাজ সেবামূলক সংস্থা নেই যে আমি যাইনি। দেশের বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার আলোচনা সভায়, সেমিনারে আমার বক্তব্য তুলে ধরেছি। বিভিন্ন পত্রিকায় আমার লেখা মুদ্রিত হয়েছে, আলোচিত হয়েছে সমালোচিত হয়েছে। বিভিন্ন আলোচনায় বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মতামত, বক্তব্য শুনেছি গ্রহণ করেছি, অবশেষে স্বীকৃতি এসেছে বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা থেকে। এর পর কাজের ভিড়ে মানুষের মাঝে হারিয়ে গেছি। রুচীর কাছে পর হয়েছি, রোহিত সরে গেছে দূরে। এখনো অবসর নেই। নিয়মিত আহ্বান আমি গ্রহণ করতে পারিনা। বার্দ্ধক্য আমার কর্মক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, নিচ্ছে ক্রমাগত। সে কারণে কুমায়ুনে আমার স্বেচ্ছায় আত্মগোপন ও বিশ্রাম। কারণ কলকাতায় আমার বিশ্রাম নেই। অসংখ্য অনুরোধ লেখার জন্য, বক্তব্য রাখার জন্য, মতামত জানাবার জন্য এমন কি ইদানীং উদ্বোধন করার জন্যও। যদিও সব কাজের মূলে আছে কিউ। কিউ আমার সেক্রেটারি কাম অ্যাসিস্ট্যান্ট। বিগত দশ বছরে পূণর্জীবন পেয়ে আমার যা কিছু কাজ কিউ এর প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। কিউ বুদ্ধিমতি মেয়ে। আমার সংগৃহিত তথ্য আমার ভাবনা সাজানো, লিপিবদ্ধ করা, স্থান মত পরিবেশন করা, কম্পুউটারে এন্ট্রি করা, এডিট করা, প্রিন্ট করা—সব ওর কাজ। বিভিন্ন সংস্থার সাথে করস্‌পণ্ডেন্স করা, আমার প্রোগ্রাম সিলেক্ট করা কিউ আমার নিজস্ব ফ্ল্যাট কাম্ অফিস কাম কিউ এর ঠিকানায় বসে, বিগত দশ বছর ধরে করছে। বুদ্ধিমতি মেয়ে। দিন রাত্রি পরিশ্রম করে ও নিজেকে তৈরি করেছে বর্তমানে আমার বিষয়ের ওপর ওর প্রচণ্ড দখল। ও বলে দিতে পারে সোমালিয়ায় কত শিশু জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে সুস্থ্যভাবে জীবিত ক'জন। বলতে পারবে ঝাড়খণ্ডে বা কালাহাণ্ডিতে কতজন গর্ভবতী মহিলা অপুষ্টিতে ভোগে। বলতে পারবে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ কত পরিবার দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে, বলতে পারবে কতজন বিকলাঙ্গ শিশু ভারতবর্ষে জন্মায় তার কারণ কি, এবং প্রতিকারের উপায়। বিগত দশ বছরের সমস্ত কাজের কিউ অনুপ্রেরণা, সংযোজনা। আমার পূণরুত্থানের পরের ইতিহাসের রচয়িতা কিউ। প্রেরণা কিউ। আমার স্বীকৃতির মূলে কিউ। এমন কি আমি কিউ ছাড়া স্বাভাবিক জীবন যাপনেও অসহায়। যে কিউ আমার গল্পের নায়িকা এবং প্রকৃত নায়িকা। আমি ভালবাসি কিউকে। আমি শ্রদ্ধা করি কিউকে। আমার যা কিছু কিউ-সম্ভূত।

অথচ আমার স্ত্রী আছে, রুচী। হায়দ্রাবাদে। একমাত্র ছেলে রোহিত, পড়াশুনার পর ওখানে রয়ে গেছে, চাকরি করে। রোহিতের কাছে ওর মা রুচী থাকে। অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়েছে অনেক আগে। রোহিত ছাড়া রুচী থাকতে পারেনা। যে কারণে রোহিত চাকরি পেয়ে ফ্ল্যাট নেবার পর রুচী চলে গেছে সাদার্ণ এভিনিউ এর ফ্ল্যাট খালি করে। আমি ওখানে থাকি, কিউ এর ফ্ল্যাটে থাকি—অভ্যাস হয়ে গেছে। অসুবিধা হয়না।

একদিনে নয় রোহিতের জন্মের পর থেকে রুচী ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে রোহিতকে আশ্রয় করেছে, রোহিত তখন শিশু। রুচী এবং আমাদের মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্ক, যে সম্পর্কে দীর্ঘ ব্যবধান, তাতে আমরা উভয়েই একে অপরকে ছারা থাকতে অভ্যস্ত। অথচ আমাদের মধ্যে সম্পর্ক অটুট এবং সুন্দর। আমরা একে অপরের খোঁজ খবর রাখি। একে অপরের সাথে পাশাপাশি বসে কথা বলি—ছোট বড়, ঘরের, বাইরের অনেক কথা। এরপর লাবণীর আগমন, মানসদার পালিতা কন্যা কিম্বা কন্যাসম এক বুক দুঃখ নিয়ে অসহায়, জীবন বিমুখ, বিশ্বভূবনে যার আপন বলতে কেউ নেই, যাকে আমরা উভয়েই মর্মবেদনা দিয়ে সুস্থ্য করেছি, যে বর্তমানে আমার মর্মচরী। এতেও আমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক—না, দাম্পত্য সম্পর্ক না বলে মানবিক সম্পর্কে কোন বিঘ্ন ঘটেনি। রুচী, আমার স্ত্রী, আছে রুচীর মত, আমি আছি আমার মত। প্রতিটি দিন এক এক করে পিছনে চলে যাচ্ছে, আমাদের জীবনের ছায়া দীর্ঘ হতে হচ্ছে দীর্ঘতর। আমরা সকলে আমাদের মত সুখে আছি দুঃখে আছি।

এক প্লেট পেঁয়াজি নিয়ে, কিউ, চোখ মুখ লাল করে টিপয়ের ওপর রেখে, এক মুখ পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে আমার সামনে বসে। এর মধ্যে গড়্ গড়্ করে কত কিছু দেখে নিলাম। আমার অতিত সজীব হয়ে ফিরে এল অবসন্ন নির্জন আবাসে।

মনের ও চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি কিউ এর প্রতি। আমার সামনে কিউ উপবিষ্ট। দিগ্ এখনো কিচেনে। সকালের আলোর মত ঝলমলে ওর মুখ, দুগোছা চুল নেমে এসেছে কপালের দুপাশে। পেঁয়াজি বানানোর আনন্দ যেন বিশ্বজয়ের আনন্দের সমতুল্য। অনাবিল খুশির এ আনন্দ। যে আনন্দ পাওয়ার জন্য বেশি ঘাম ঝড়াতে বা খুব একটা প্রচেষ্টা করতে হয়নি। অত্যন্ত সহজ লভ্য। মানুষের জীবনে এ জাতিয় সহজ আনন্দ আসে এবং বারে বারে। মানুষ নির্বোধ, যদি এই আনন্দমুখর অবসরগুলো সঞ্চয় করে রাখতে পারতো তবে দুঃখের পরিসর কমে যেত। কিন্তু হয়না। সঞ্চয় করতে পারেনা। সহজ লব্ধ সুখ, সহজ লব্ধ আনন্দ, আমাদের কঠোর এবং দীর্ঘ আকাঙ্খার অবসান ঘটায়না, আমরা অতৃপ্ত থেকে যাই এবং ভাসমান দুঃখদরিয়ায়। এবং অনায়াসে সুখের মূহুর্তগুলোর স্থান দখল করে দুঃখ, রচনা করে দূর্ভেদ্য গণ্ডি এবং মানুষ দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ করে, হাহুতাশ করে। বর্তমান জীবন ব্যস্ত, প্রায় অবসর বিহীন। ব্যস্ততা, প্রতিযোগিতা হরণ করছে মানুষের অবকাশ বা অবসর। অতিদ্রুত। মানুষ পায়রা বা ঘুড়ি উড়িয়ে সময় নষ্ট করা বা চিত্তের বিশ্রামের জন্য তো তার কিছু সময় বা অবসর চায়। নয়তো বিশ্রামহীণ চিত্ত অচিরে বিকল বা অসুস্থ হতে পারে। তাতে চিত্তের দোষ দেওয়া যায়না। এটা নিয়ে হে শ্রোতৃবৃন্দ ভাবার দরকার নেই কি? বড় দ্রুত সময় এগিয়ে যাচ্ছে। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে যে সময়টুকু, যাকে আমরা জীবন বলি-শৈশব-কৈশোর-যৌবন-সংসার-বার্দ্ধক্য যেন একটার পর একটা সিড়ি-অতিক্রম করে আমরা চলে যাই, একটা সিড়ি হতে অন্য সিড়ি একে অপরের সাথে জুড়ে আছে, আমাদের পা এক সিড়ি হতে অন্য সিড়িতে আপনা থেকেই এগিয়ে যায়। জীবনযুদ্ধে যেকোন পায়ের স্বাভাবিক গতি পরিবর্তন করে একই সিড়িতে দুটো পা রেখে যে এক মূহুর্ত জিড়িয়ে নেব বা নিচে বা ওপরের দিকে চেয়ে দেখব, সে অবকাশ নিলে হয় তুমি পিছিয়ে যাবে বা স্টেপ ফেল্ করবে অথবা পিছে থেকে কেউ ধাক্কা দিয়ে তোমাকে সিড়ি থেকে ফেলে দেবে। বলবে পথ ছাড়ো। তুমি পথ আটকাবার কে? বেসামাল হয়ে পতন হবে কিম্বা

হারিয়ে যাবে এক অন্ধকার জগতে। অতএব সিঁড়ি ভেঙে ওপরে, আরো ওপরে ওঠো—এগিয়ে চলো, চলো—আজকের মন্ত্র। পিছনে তাকিও না। কোথায় যাচ্ছো? কেন যাচ্ছো? কিজন্য যাচ্ছো? কি পাচ্ছো? কি তোমার পাওনা? কি পাওনি? কেন পাওনি? এ সব সালতামামি বাতিল। এরপর যদি সুখ সঞ্চয়ের অবসর চাও, সুখ দীর্ঘতর করতে চাও, তোমার অতিতের পাতাগুলো খুলে দেখতে চাও, যদি অবসর নিয়ে ভবিষ্যতের আনন্দের জন্যই যদি বর্তমানকে অস্বীকার করো, দেখবে, তুমি সংসারের মানদণ্ডে বাতিল। দেখবে তোমার সাথের যারা উঁচুতে উঠে গেছে, তুমি রয়ে গেছে নিচে, ওপরের যারা, বলবে তুমি হেরো, অপরাজিতের দলে। তোমার দুঃখ বাড়বে। মনে হবে ওদের কথা ঠিক। তোমার দ্বন্দ্ব তোমায় অস্থির করবে, মনে হবে অসহায়, বেদনা তারা পাখা বিস্তার করবে। অতএব যারা ছুটছে তারা সঠিক, তুমি ছোটো-ছোটাটাই সঠিক এ জীবন সমুদ্র পার হবে অচিরে উত্তাল তরঙ্গ অভিঘাতে।

গ্রন্থি বিহীন ভাবনা। অস্বাভাবিক ভাবনা। অতিতে মাঝে মাঝে উদয় হত, হারিয়ে যেত, এই সকালে আবার এ ভাবনা গুলো এসে হাজির। ভেবেছিলাম ওদের মৃত্যু ঘটেছে। না মরেনি, বেঁচে আছে, মনে হয় বেঁচে থাকবে। মাঝে মাঝে আবোল তাবোল চিন্তার উথাল পাথাল আবির্ভাব হবে, উধাও হবে। সকলের হয়? কে জানে! নাও হতে পারে। যেমন কোন জমিতে ধান হয় তুলোর চাষ হয়না। আবার তুলোর জমিতে ধান চাষ হয়না। অথচ দুটো জমিতেই চাষ হয় জমির বৈচিত্র্যের গুণে। জীবন বিচিত্র। এবং অবশ্যই সত্য।

পেঁয়াজির প্লেট চিন্তার সূত্রতা ছিন্ন করল। কিউ বর্তমান। বর্তমানে ফিরে এলাম।

—দিগ্‌কে দিয়েছো?

—তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি খাও।

কিউ হাতের তালুতে একটা গরম পেঁয়াজি নাড়াচাড়া করে সরাসরি মুখে পুড়ে দেয়। এক কামড়।

—আঃ আঃ কি গরম! জিভ পুড়ে গেলো।

—পোড়ালে তো? নিজের মুখটা। লোকে পোড়ামুখি বলবে। আস্তে আস্তে খাও।

—দারুন হয়েছে। তুমি খেয়ে দেখো। ডেলিসাস্।

—ঠাণ্ডা হোক খাবো। আমি তোমার মত মুখ পোড়াতে রাজি না।

কিউ পেঁয়াজি খাওয়ায় এত মনযোগী যে আমার রসিকতাও বুঝতে পারল না। উঃ আঃ শব্দে পেঁয়াজি কামড় দিচ্ছে।

উঃ...আঃ...আঃ শব্দ করছে, পেঁয়াজি কামড়াচ্ছে, দাঁতের চাপে মুচ্‌চ্-মুচ্‌চ্ শব্দ। গরম এর জন্য কষ্টে না তৃপ্তির আনন্দে কিউ এর গলার শব্দ বুঝতে পারছিনা, মনে হয় দুটি কারণেই। কারণ ওর চোখের হাসিতে তৃপ্তির আনন্দ। আমি নিজে খাবো কি, কিউ এর খাওয়া দেখে অনেক বেশি পরিতৃপ্তি। গরম পেঁয়াজির মিষ্টি গন্ধ, পেঁয়াজির তেলে আর জিভের রসে টস্‌টসে ঠোঁট, ঈষৎ রাঙা একজোড়া চোখ হাসিমাখা-মধুর-মধুময়। সত্য বলছি এই মুহূর্তে পেঁয়াজিতে কামড় না দিয়ে কিউ এর ভেজা ঠোঁটে কামড় দেওয়ার ইচ্ছা আমার মধ্যে প্রবল। অথচ কিউ এই মুহূর্তে আমার মনের ইচ্ছা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ। কিউ পেঁয়াজি খাচ্ছে তৃপ্তি পাচ্ছে এবং সাথে ইচ্ছা ওর হাতে বানানো পেঁয়াজি খেয়ে আমি তার গুণ গাই। সকল মেয়েই এই স্বীকৃতি চায়।

—বসন্ত তুমি খাও।...খাচ্ছোনা কেন? কত কষ্ট করে বানালাম—সব কি আমার একার জন্য? তাহলে বানাতাম! তুমি আছো বলেই তো আমার ইচ্ছা হল। খাও।

—খাচ্ছি। তুমি খাওনা। পরে খাচ্ছি। তোমার তেলে ভাজা খাওয়া দেখতে ভাল লাগছে। খেতে আরম্ভ করলে দেখার আনন্দ মিস্ করব।

—তুমিও খাওয়া শুরু করো। খেতে খেতে দেখো। নইলে আমিও খাবনা। বলে দিলাম।

—বসন্ত তুমি এমন রোমান্টিক কবে হয়ে গেলে?

—রোমান্স?—না বাবা, না। এ বয়সে আর যাই হই, কবি বা রোমান্টিক হওয়া অসম্ভব। কিন্তু একথা না বলে পারছিনা যে এ পাহাড়, যৌবনের প্রথম পরশে কুমারী মনে যে অজানা কোমল অথচ শিহরিত পুলক সঞ্চার করে শরৎপ্রাতে প্রথম প্রভাত কিরণ যেমন শিশির স্নাত ঘাসের ডগায় মুক্তোর হাসি ফোটায়, তোমার শরীরে ও মনে সেই প্রভাব বিস্তার করেছে, যা আমি প্রত্যক্ষ করছি অবাক চোখে।

—সেই কাব্য! সামনে পেঁয়াজি ঠাণ্ডা হচ্ছে, তুমি কবিতা বলছো বাংলার উঠতি বয়সের যুবকদের মত, না চোখে সুরমা মাখা কোন যুবরাজের মত? বসন্ত, পেঁয়াজি নাও।—দিগ্, তুম্ খায়া?

—জী! বহুত্ আচ্ছা হ্যায়।

—গ্যাসে দুধ বসানো আছে। গরম হো গিয়া। তুম্ সাহাব আর হামার জন্য কফি বানাও।

—জী।

—চিনি কম ঢালো।

—জী।

দু আঙুল দিয়ে এক টুকরো পেঁয়াজি মুখে দিই। এখনো গরম আছে। ভাল খেতে হয়েছে।

—উঃ কি ঝাল!

—বেশি করে ঝাল দিয়েছি! গুড়ো লঙ্কা ছাড়াও কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি কুচিয়ে। কেন, ভাল হয়নি?

—নিশ্চয় ভাল হয়েছে। খাশা। দারুণ।

খেতে খেতে মুখ টিপে হাসি। সূর্যের আলোয় ওর ভিজে ঠোঁট আরো চক্চকে আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মনোরম। শিল্পী হলে ক্যানভাসে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পারতো।

দুহাতে দুটি বড় পটে গরম কফি টিপয়ে দিগ্ রাখলো। ধোঁয়া বেড়োচ্ছে। তার সাথে পোড়া কফির সুগন্ধ। তোয়ালেতে হাত মুছে, কফির পটে মেজাজে চুমুক দিই। কিউ এখনো পেঁয়াজি শেষ করতে পারেনি, খাচ্ছে। আমার মনের ভিতর বিক্ষিপ্ত চিন্তার ইতঃস্তত বিচরণ। কখনো মৃদু ইচ্ছা ওর ঠোঁটে কামড় দেওয়া, কখনো বা ওর ছবি এঁকে রাখা ইত্যাদি। কিন্তু কে এই কিউ? কি এমন সম্পর্ক আমার সাথে কিউ এর যাকে দেখে আমার আদিম, শারীরিক ইচ্ছার উদয় হচ্ছে। যদিও কিউ এর সাথে আমার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে বহু পূর্বেই। প্রয়োজনে বললে সবটা বলা হবেনা বরং সঠিক হবে সামগ্রিক অবস্থা, এ সম্পর্ক স্থাপনে, আমাদের উভয়ের শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে

সহযোগিতা করেছে। অবশ্য ইচ্ছা না থাকলে সম্ভব হতোনা নিশ্চয়। এবং যে কোনো ইচ্ছার পিছনে শারীরিক ও জাগতিক কারণ থাকবেই। তবুও প্রশ্ন কিউ আমার কে? কিসের সম্পর্ক আমার সাথে? কি এর সংজ্ঞা? কিউ এবং আমার মধ্যে যে সম্পর্ক—সে তো নিশ্চয় সামাজিক নয়, নৈতিক নয়। কিউ আমার আশ্রিতা, কন্যাসমা, কিউ আমার সেক্রেটারি, তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন, বিশেষ করে বয়সের বিচারে, ভারতীয় ভাবধারায়, ভারতীয় সংস্কৃতির বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং শাস্তি দায়ক। তবুও শরীর ও মনের অমোঘ নিয়মে, আমরা উভয়ে উভয়ের সাথে শারীরিক ভাবে লিপ্ত হয়ে, উপভোগ করি, তৃপ্তি পায়, স্বর্গীয় আনন্দ দেহ ও মনকে আচ্ছন্ন করে।

—এ সম্পর্কের নাম একটাই হওয়া উচিৎ, সেটা হচ্ছে মানবিক। কিউ একজন মানবি আমি মানব। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই, কোনো ছলনা নেই। সম্পূর্ণ আন্তরিক এবং একে অপরের পরিপূরক ও গভীর। কিউ ও আমি এক মুহূর্তও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কথা ভাবতে পারিনা। তাই যেখানেই যাই কিউ আমার সাথে, অন্যের কাছে ওর পরিচিতি সেক্রেটারি। কিউ আমার সকল সময়ের সাথী, বিশেষ করে যেদিন থেকে রুচী চলে গেছে রোহিতের কাছে। কিউ আমার সুখ দুঃখ, ভালমন্দ, সুখ সাচ্ছন্দ—সকল কিছুর কর্ত্রী। হয়তো আমার অপরিহার্যতা কিউ এর কাছে সমার্থক। অর্থাৎ কিউ আর আমার সম্পর্ক যথার্থ পারস্পরিক এবং সামাজিক, নৈতিক বিচারের ঊর্দ্ধে।

—বসন্ত বেড়োবেনা? চলো ঘুড়ে আসি। ভাল লাগবে, সুন্দর ওয়েদার। খাওয়া দাওয়া হল। বেড়ালে হজম হবে, ভাল লাগবে।

—বেশ তো বসে আছি। তোমার হাতের তেলে ভাজা আর দিগের মিষ্টি কফি, এবার একটা সিগ্রেট ধরাবো, তুমিও বোসো। একবার তো ঘুড়েছো।

—দিগ্ কম চিনি দিয়ে চা কফি করতে পারেনা। এরপর থেকে চিনি-ছাড়া করতে বলব, প্রয়োজন মত চিনি মিশিয়ে নেব। চলো কিছু সময় ঘুড়ি। তোমার বেড়ানো দরকার—

—পায়ে ব্যথা হয়। বয়স হয়েছে, হয়তো বাত।

—ও হয়। বুড়োদের বাত হয়, তুমি বুড়োর বাত হবেনা। আমি কি তোমার মত বুড়ো নাকি? আমার বেড়াতে ভাল লাগে। বসে থাকলে বোর হয়ে যাব।

—চলো।

—বাঃ! কে বলেছে তোমাকে বুড়ো? তুমি বললেই হলো? আমি যতদিন আছি, তোমাকে বুড়ো হতে দেবনা! তুমি চিরযুবা।

—যাঃ, সময়ের কাজ সময় করবে, সময় কি আমার জন্য তার গতি রোধ করবে?

—করবে। করবে। চলো, জুতো নিয়ে আসছি, মাফলার নাও টুপি লাগবেনা।

অবশেষে জুতো গলিয়ে, মাফ্‌লার গলায় জড়িয়ে, আড়মোড়া ভেঙে চেয়ার ত্যাগ করি। কিউ আমার ডান হাত ওর বগলের নিচে চেপে ধরে। রাস্তায় পা বাড়ায়, দিগ্ দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানায়।

বয়স বাষট্টি। আমি রুগ্ন নই বরং বয়স অনুপাতে আমার হাঁটা চলা স্বাভাবিক। সোজা হয়ে হাঁটি অবশ্য দীর্ঘপথ বা খাড়াই বা চড়াই হাঁটতে গেলে হাঁপিয়ে উঠি।

পরিশ্রম করার শক্তি কমে গেছে। দুটি কারণে এক বয়স অন্যটি হাঁটা চলার অনভ্যাস। শরীরে অতিরিক্ত মেদ নেই। মাথার সামনে চুল হালকা, কাঁচা-পাকা। যৌবনে যেমন সোজা দৃঢ় হাঁটতাম, এখনো হাঁটবার সময় হাঁটু মুড়তে হয়না। হাঁটছি ধীরে কিউ এর বাহু বেস্টনিতে।

পাহাড়ে দিন দীর্ঘ। কলকাতার তুলনায় অনেকটা পশ্চিমে। সূর্য ডোবে দেরিতে। তার ওপর পাহাড়ের অপর পারে সূর্য গা ঢাকা দিলেও দিনের আলো রয়ে যায়, অস্তগামি সূর্য্যের আলোর ছটা তীর্যক ভাবে পাহাড়ের পিছন থেকে আকাশে দিনের উজ্বলতা বজায় রাখে। আমরা ঢালুর দিকে চলেছি। পিচ ঢাকা রাস্তার দুপাশে ফলের গাছ। দূরে বিভিন্ন পাহাড়ে বসতবাড়ি—দশ-বিশটা কোথায় বেশি বসতবাড়ি ও পরিবার সমূহকে নিয়ে আলাদা আলাদা বসতি। নিস্তব্ধ নিঝুম, পাহাড়ের মত শান্ত কলহমুক্ত জীবন, গম্ভীর। মাঝে মাঝে পাখীর ডাক বা গৃহপালিত পশুর ডাক যদিও শোনা যায়, মানুষের শব্দ কখনো শোনা যায়না। যে যার নিজের কুটিরে মা-বাবা-ভাই-বোন-কাকা জেঠা মিলেমিশে সকলের সাহচর্যে বাস করে শান্তিতে।

রোদ্দুর নেই তবুও আলো আছে। আলো কমে আসার সাথে সাথে গাছের পাতা ঝিরঝির করে কাঁপতে থাকে গা শিরশির করে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি অনেকটা পথ। যেহেতু ঝিরঝিরে হাওয়ায় শীতল হচ্ছে শরীর। একটা জায়গায় হাঁটা বন্ধ করলাম অর্থাৎ চলা বন্ধ করলাম। অস্তগামি সূর্যের আলোয় ভাসমান পশ্চিম আকাশের মেঘগুলো রঙ বদলাচ্ছে দ্রুত, বদলাচ্ছে গাছের পাতার রঙ, পাহাড়ের চূড়াসমুহ, দৃষ্টি নন্দন, চোখ ভরে দেখার আনন্দ, নিরবে দুজনে উপভোগ করতে লাগলাম। ক্লান্ত পায়ে ঘরে ফিরছে ঘাসের বোঝা মাথায় গুটি কয় পাহাড়ি রমণী। দুএকটা দাঁড়কাক ডাকছে কর্কশ স্বরে। চিত্তের একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

—জ্যাকেট গলিয়ে নাও।

—ঠিক বলেছো, শীত শীত করছে।

হাতে ঝোলানো কালো রঙের জ্যাকেট গায়ে গলিয়ে নেয়। হাতা টেনে নামায়। চেন বন্ধ করেনা—খোলা চেন্। স্মার্ট পোষাক। বাইরে বেড়োলে কিউ তার পোষাকের ফ্যাসান বদল করে। মোষ্ট মডার্ণ, আমার সাথে কলকাতার বাইরে অনেক বার যাওয়ার ফলে এ পরিবর্তন। বড় বড় সেমিনারে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সেক্রেটারী বা পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টান্টরা বেশ কেতাদুরস্ত। চলনে বলনে সকলেই যেন অংশ গ্রহণকারী প্রতিনিধিদের চেয়ে কম নয়। মনে হয় যেন তারা সব জেনে আছে। কিউ দেখে শিখেছে। এখন কিউ এর পরনে জিন্সের টাইট প্যান্ট, লাল টাইট টপ, গায়ে জ্যাকেট এবং পায়ে হাইহিল স্যু। কিউ যখন পাহাড়ি পথ দিয়ে হিলের আওয়াজ তুলে হাঁটে কিউ এর স্তনযুগল এবং নিতম্বদ্বয় হিল্লোলিত হয় চলার তালে। সহজেই আকর্ষিত হয় অন্যের দৃষ্টি। এই পাহাড়ের রমণীগণ স্ফিতকায়া নয়, লম্বাটে গড়ন। পায়ে হিল উঁচু জুতো নেই, গায়ের জামা লম্বাও ঢলঢলে। ওদের শরীরের গড়ন পোশাকের আচ্ছাদনে লুকিয়ে থাকে—প্রকাশিত হয়না, অন্যভাবে সুন্দরী সু-স্বাস্থ্যের অধিকারিণী কিউ এবং তার হাঁটা ছন্দোবদ্ধ, দৃষ্টিনন্দন এবং চিত্তাকর্ষক।

শীতলতা বাড়ছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিলাম। কিউএর দৃষ্টি আকাশে বিক্ষিপ্ত চিত্ত, নিস্তব্ধতা ভেঙে জানতে চায়।

—বসন্ত ওরা কি আনন্দে কিসের আশায় বেঁচে থাকে বলো তো? বনের ঘাস কাটা, ছাগল চড়ানো ছেলে মেয়ে মানুষ করা, স্বামীর সেবা করা একে জীবন বলে?

—তবে, কি বলে? পিস্‌ফুল-সম্পূর্ণ শান্ত জীবন। অকারণ উত্তেজনা নেই। আধুনিক উল্লাস নেই। প্রকৃতির সাথে নিজেদের জীবন যুক্ত করে, সুন্দর ভাবে ছেলে মেয়ে আত্মীয় পরিজন নিয়ে সুখে আছে। সুখের পিছনে বা অর্থহীন কামনার পিছনে ছোটা কিম্বা যুক্তিহীন হৈ হুল্লোরে মেতে থাকাই কি জীবন? তোমার এদের সম্বন্ধে ধারণা নেই তাই ভাবছো এ এক অন্য ধারা-মন্দ কি?

—মন্দ নয়? আমি একমত নই বসন্ত। এদের জীবনে শখ-আহ্লাদ বলে কিছু নেই। এমন কোন উপকরণ আছে যা থেকে এরা আনন্দ সংগ্রহ করতে পারে। বৈচিত্রহীন, একঘেঁয়ে জীবন—বোরড্।

—তোমার মনে হতে পারে। এরা বোরড্ হয়না। বাগানে কাজ করা। বনে বনে ঘাস কাটা, পশুপালন করা ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার করা, বিয়ে সাদী বাৎসরিক ধর্মীয়-অনুষ্ঠানে আনন্দ করা—সন্তুষ্ট এরা।

বাইরে থেকে এসে বাইরের মন নিয়ে কুমায়ুনী জীবনের সুখ-দুঃখ অনুভব করা সহজ নয়, সম্ভবও নয়।

চলো ফেরা যাক্, অন্ধকার হয়ে আসছে।

—চলো।

চড়াই। স্বভাবতঃই ধীর গতি। এতক্ষণ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দাড়িয়ে দুজনে এদের জীবন যাত্রা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আলোচনা করে এদের জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হচ্ছিল। আমার পড়া আছে, কিউ এর কাছে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ নতুন মানুষ নতুন জীবনধারা। তবুও বোঝবার চেষ্টা করছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করা।

পাহাড়ের গা কেটে মানুষের তৈরি পিচের রাস্তা, এক পাশে উঁচু ওপরের দিকে উঠে গেছে, এখান থেকে চূড়া দেখা যাচ্ছে না, অন্যপাশে ঢালু নেমে গেছে নিচে, পাদদেশ অদৃশ্য। অন্য পাহাড় থেকে দেখা যেত। যেমন আমরা এই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সামনের, ডানের, বাঁয়ের পাহাড় গুলোর চূড়া দেখতে পাচ্ছি। কোনো কোনোটার পাদদেশ, সবুজে মোড়া। মাঝে মাঝে নগ্ন পাহাড়, যেখানে সবুজ সৃষ্টি হয়নি, অর্থাৎ পাথুরে, চির, ওক্, বাজ নানান জানা অজানা গাছ, অন্ধকার নেমে আসায় সবুজ রঙ হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। রাত্রে ঐ অন্ধকারের দিকে তাকালে আমার মত শহুরে মানুষের গা ছম্‌ছম্ করে। মনে হয় ঐ অন্ধকারে বনের জন্তজানোয়ার বাঘ হায়েনারা বেড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু না, এ বনাঞ্চলে কোন নরখাদক জন্তু আছে বলে জানা নেই, মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক অবশ্য শোনা যয়। তবুও মনে আশঙ্কা জাগে। অথচ ঐ পাহাড়ের পাদদেশে অথবা পাহাড়ের মধ্যদেশে জঙ্গলের মাঝে মানুষ বাস করে। একটু পরেই ঘরের আলো জ্বলে উঠবে। আশ্চর্য্য হই ঐ পাহাড় চূড়ায় মানুষের বাস দেখে। ভাবি মানুষ ওখানে পৌছায় কি করে! অথচ ঐ পাহাড়গুলোতে সংসার পরিজন নিয়ে বাস করে পুরুষের পর পুরুষ ধরে। ভিন্ন ভিন্ন বসতির ভিন্ন ভিন্ন নাম। এখানেও গ্রাম পঞ্চ আছে, বিধান সভা, লোকসভার চুনাও হয়।

নিচের ঢালু থেকে ফল সমেত একটা গাছের ডাল রাস্তার ওপর পৌঁছে গেছে। তাকিয়ে দেখলাম দশ বারো ফুট উচ্চতা হবে। কিউ হাত বাড়িয়ে একটা ফল ছিঁড়ে নাকে শুঁকে আমার মুখের সামনে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করে—বলোতো এটা কি ফল? আমি ওর হাত থেকে চিনবার চেষ্টা করি।

—মনে হয় ন্যাসপাতি।

কিউ হাতে নিয়ে ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে চেনার চেষ্টা করে। মুখের কাছে নিয়ে যায়।

- কামড়াবে না। জিভে কস্ লেগে যাবে।

আটফুট দশ বারো ফুট উচ্চতার, পাহাড়ের দুপাশ জুড়ে ফলচাষ হয়। এখন ফল ধরার সময়। প্রচুর ফলেছে। ডালে ডালে ডুমুরের মত লেগে আছে। সবুজ রঙ। কিউ কচি সংগৃহিত ফলটা হাতের তালুতে রগড়ে রগড়ে মুখে পুড়ে কচ্ করে দাঁত বসিয়ে দেয়। এক কামড় দিয়ে আর কামড়ায়না, কিন্তু মুখের মধ্যে রয়ে গেছে। ফলের স্বাদ বুঝে ওর নাম জানতে চায়।

--যাঃ, কোনো টেস্ট নেই। কষা—মনে হয় ন্যাসপাতি, তুমি ঠিক বলেছো।

—ফেলে দাও।

ওর ছেলেমানুষি দেখে আমার হাসি পায়। সম্বরণ করি। এক পা এক পা করি ফিরছি। থামছি। অন্ধকার নামছে। কিন্তু পথ চলা যায়। অসুবিধা হচ্ছে না। শহরের মত রাস্তায় আলো নেই। ঠাণ্ডা জায়গা অন্ধকার নামার আগে যে যার ঘরে ফিরে যায়। সচরাচর বাইরে কেউ বের হয়না। দরজা জানালা বন্ধ। ঘরের আলো রাস্তায় পৌঁছায়না। যে কারণে অন্ধকারে পথ হাঁটার বিপদ আছে, তবুও প্রয়োজনে দুএকজনকে চলাচল করে এমন কি পাকদন্ডি দিয়েও। ওদের পা-চেনা পথে অসুবিধা হলেও যেতে হয়। ধীরে ধীরে চড়াই ভেঙে চলেছি লজের দিকে। প্রশ্বাসের গতি দ্রুত। হাঁপিয়ে যাই, বয়সের সাথে শরীরের ওজন বেড়েছে, শক্তি কমেছে। কিউ চলেছে স্বচ্ছন্দে, ওর কোন অসুবিধা নেই। ও চলেছে কোমর দুলিয়ে, হাত দুলিয়ে লম্বা পা ফেলে। কখনো আগে আগে কখনো পাশে পাশে। মাঝে মাঝে থামছি, লক্ষ্য করছি দিন ও রাত্রির সাথে সাথে প্রকৃতি, বনরাজি ও আকাশের পরিবর্তন। অন্ধকার নামছে নিঃশব্দে। বাংলার গ্রামে সন্ধ্যা নামলে তুলসি তলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে, গলায় কাপড় জড়িয়ে গাঁয়ের বধু গাল ফুলিয়ে শাঁখ বাজায়। এখানে শাঁখ বাজানো, প্রদীপ জ্বালার প্রচলন নেই। সূর্যের আলো সড়ে গেছে পাহাড়ের চূড়া থেকে। দু চারটে পাখী, তারাও ফিরে গেছে বাসায়, কলকাকলি হীন—নিঃশব্দ, শান্ত, স্নিগ্ধ। একটা দুটো করে তারা জেগে উঠছে সীমাবদ্ধ আকাশে। আঙুল দিয়ে কিউকে তারা দেখালাম—এ দেখো, আজ রাতের প্রথম তারা। দেখেছো?—কি, দেখতে পেলে না, আমার আঙুল সোজা দৃষ্টি রাখো।—হ্যাঁ দেখেছি।

লজে পৌঁছালাম যখন, কুমায়ুনের বুকে নেমে এসেছে পূর্ণ অন্ধকার। দরজা স্পর্শ করতেই দিগ্ দরজা খুলে দেয়। অপেক্ষায় ছিল। নিশ্চয় এতক্ষণে ওর বৌ নিজের কুটিরে ফিরেছে। কাঠ জ্বেলে বসিয়েছে ডাল নিশ্চয়। দু-এক টুকরো আলু কেটে দিয়েছে ডালে। দিগের দুটি হাত জোড়া, মস্তক নত।—নমস্তে।

—নমস্তে।

—তোমায় বলেছি না। আমাদেব দিনে বার বার নমস্তে মত্ বোলো—

—জী। —চায় বানায়ুঁ।

—বানাও।
—চিনি কম্ ঢালনা
—জী।
চেয়ারে বসি। জামা জুতো খোলার প্রয়োজন হয়না। প্রয়োজন হয়না বাইরে থেকে ফিরে হাত পা ধোওয়ার। প্রথমতঃ ধুলো নেই, দ্বিতীয়তঃ ঠাণ্ডা। প্রয়োজন হয়না পাখার নিচে বসা, গামছা বা তোয়ালে দিয়ে গা মোছা। পাখার ব্যবহার, ফ্রিজের ব্যবহারের প্রশ্নই আসেনা। কোন জিনিষ পচে যায়না, তাজা থাকে। চেয়ারে বসি আরাম করে। মাফ্‌লার খুলে কিউ এর হাতে ধরিয়ে দিই। হেঁটে ক্লান্ত হলেও নিজেকে সতেজ মনে হচ্ছে। অলস বসে থাকলে বরং অসমর্থ মনে হয়।
চেয়ারে জানালার পাশে। কাঁচের জানালা। পর্দা গোটানো, সামনে অন্ধকার। দূরের পাহাড়ে জ্বলে উঠেছে একটা দুটো ঘরের বাইরের আলো। পাহাড়গুলো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু ঢিবির মত। পাহাড়ের ছাদে তারা নক্ষত্র ফুটে উঠেছে অসংখ্য-উজ্বল, অনুজ্বল।
পটে করে চা ট্রেতে কাপ প্লেট ও স্ন্যাক্‌স্।
—কিউ চা। তাড়াতাড়ি এসো, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।
—আসছি।
একটা স্ন্যাক্‌সে কামড় দিই। কিউ ঘর থেকে পোষাক বদলে বেড়োয়। মুখ হাত পরিষ্কার করেছে। পরনে ঢোলা পাজামা, গায়ে কুর্তা। কুর্তার ওপর হাউস কোট ফেলা, ডিপ মেরুন রঙের। হাতে ক্রিমের কৌটো। মুখে হাতে গলায় লাগানো হয়নি। সামনে বসে। পটে থেকে চা ঢালে। আমাকে দেয়, নিজেরটা, প্লেট থেকে তিন চারটে স্ন্যাক্স নিয়ে একে একে মুখে দেয় দ্রুত।
—দিগ্ তুম্ চায় পিও।
—জী, পিয়ুংগা।
—পিও। ইসকে বাদ্ নিচে যাকে দেখো, তুম্‌হারা বিবি আয়ি কি নেহি।
—জী আয়ী।
—ঠিক আছে। তবুও নিচে যাও। বাদ্‌মে আকে খানে পকানা।
দিগ্ কিচেনের বাইরে দাঁড়িয়ে চা খায়। আমাদের চা পান শেষ। কেপ প্লেট উঠিয়ে দিগ্ বেসিনে ধুয়ে সাজিয়ে রেখে, দরজা ভেজিয়ে, সিড়ি দিয়ে নিচে যায়। কিউ সুগন্ধি ক্রিম বের করে আলতো হাতে গালে গলায় কপালে ঘঁসে। মিষ্টি গন্ধ ক্রিমের। আমি সিগ্রেট ধরিয়ে সুখটান লাগাই। কিউ কলকাতা থেকে আনা সাহিত্য পত্রিকা খুলে বসে। আটটা বাজে। শাল দিয়ে পা পর্যন্ত মুড়ে নিই। বেশ ঠাণ্ডা, মাঘের শীতের মত কন্‌কনে। টেবিলের ওপর ল্যাম্পটা অন্ করলাম। নোটবুক টেনে নিয়ে মনে হল কিছু টুকে রাখি। লেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। তবুও দুএকটা দুমাস, চার মাসে পাঠাতেই হয়, নইলে ওরা ছাড়েনা। অনেক দিনের সম্পর্ক, না বলতে পারিনা। আপাততঃ দিগের কাছ থেকে দুএকটা তথ্য পেয়েছি। এখানকার গ্রামবাসিদের সাথে সুযোগ পেলে আলাপ করবো—চোখে দেখে, কানে শুনে কিছুটা জানা যাবে। একদিন দিগ্ বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার দেশে ফিরতে ইচ্ছো করে কিনা। কোন উত্তর নেই। অর্থাৎ যেতে চায়। ইচ্ছা হয়। তবুও উপায় নেই। তার এক বোন বিমারিতে মারা গেছে। কথা শুনে বুঝলাম

নিউমোনিয়া। আর এক বোন দেশ ছেড়েছে। কোথায় আছে জানেনা। তবে শুনেছে কোনো শহরে আছে। হয়তো শহরের কোন গলির চোরা বালিতে আটকে গেছে, সেখান থেকে বেড়োবার পথ জানা নেই, জানতেও পারবেনা কোনোদিন। যখন দিগ্ বাহাদুর এ দেশে আসে, ওর বাবা মা বেঁচে ছিল। তাদের খবর দিগ্ জানে না। ইচ্ছা থাকলেও জানার উপায় নেই। তাদের তুলনায় দিগ্ ভাল আছে। বাবুদের কুটিরে সে থাকতে পাচ্ছে, বৌ আছে, ছেলে আছে, স্কুলে যায়, মেয়ে ছিল একটা বছর বারোর, দিল্লির কোনো সাহেব ঘরের কাজ করার জন্য নিয়ে গেছে। দীপাবলীর সময় সাহেবের সাথে আসার কথা। এবার ফিরে বৃটেনের একটা পত্রিকায় লেখা পাঠাতে হবে। অনেকদিনের সম্পর্ক ওদেব সাথে। বছরে দুটো জার্নাল বেড়োয়। নেকস্‌টা বেড়োবে অক্টোবরে। ওদের জার্নাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়। অত্যন্ত তথ্য নির্ভর। উন্নয়নশীল দেশের অর্থও সামাজিক অবস্থা, সেখানকার অধিবাসিদের জীবন, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ইত্যাদির ওপর লেখা। আমার ওপর ভার রয়েছে আমার বিষয়ভিত্তিক রচনা। অর্থাৎ ভারতবর্ষের অনগ্রসর এলাকা সমূহে শিশু মৃত্যুর হার, মৃত্যুর কারণ এবং প্রতিকারের উপায়। এর জন্য বর্তমান পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন প্রয়োজন, চায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

কিন্তু আজকাল নিজে বিশেষ কোথাও যেতে পারিনা। সবকারী তথ্যগুলো নির্ভরশীল নয়। সেন্‌সাস্ রিপোর্ট যেটা পাওয়া গেছে সেটা যথেষ্ট পুরোনো, বর্তমানের সাথে তথ্যের তফাৎ অনেক। তবুও সরকারি, বেসরকারি সংস্থার কাছে চিঠি লেখা, মেল করা, সংগ্রহ করা---যদিও কিউ এসবই করে, আমি গাইড করি। অতিতে এই তথ্য সংগ্রহে আমার জীবনের অনেক সময় ব্যয়িত হয়েছে। প্রচুর পরিশ্রম করেছি। কোথায় না গেছি, এশিয়ার, বিভিন্ন দেশে, আফ্রিকায়, লাটিন আমেরিকা, আরব দেশ সমূহে, ইউরোপে। ব্যহত হয়েছে সুস্থ্য সাংসারিক জীবন। রোহিত ও রুচী পর হয়ে গেছে। স্বীকৃতি মিলেছে বিদেশে, দেশে ইউনিসেফের কর্তা ব্যক্তিরা অন্ততঃ কাগজে কলমে শিশু মৃত্যু নিয়ে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন, বছরে বছরে শিশু দিবস পালিত হয়, সেখানেও আমার রিপোর্ট প্রচণ্ড গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। এই সব কারণে হঠাৎই বিখ্যাত হয়ে উঠলাম। পত্র পত্রিকায় আমার ছবি এবং আমার গবেষণা নিয়ে আলোচনা হতে থাকল। আমার বইয়ের চাহিদা বেড়ে গেল হু হু করে। দুটো তিনটে পুরস্কার ও জুটে গেল। আমি সম্পূর্ণ রূপে হারিয়ে গেলাম। বহু এন্ জিও আমার রিপোর্টের ওপর বিভিন্ন দেশে অনেক কাজ করছে, পয়সা কামাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকের দেওয়ার ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ একথা বোঝানো যায়না। এখনো কলম ধরে বসে আছি। মাথায় কিছু আসছে না। যে কারণে বিশ্বস্ত কিছু লেখা তৈরি করতে সময় লাগে, কষ্ট হয়। এখন যা কিছু লিখি কিউ এর উৎসাহে ও চেষ্টায়। ওর ভিতর দরদী হৃদয় আছে। অনুভূতি আছে।

লেখা থামিয়ে চোখ বন্ধ করলাম। ঘুমানোর জন্য নয়। নির্লিপ্ত, শান্ত পরিবেশে চঞ্চল চিন্তাগুলোকে সংযত করার প্রয়াসে। বয়সের ভারে ক্লান্ত মন। অথচ সেই পুরানো অভ্যাস, কিছু করার প্রয়াস আবার ব্যর্থতার গ্লানি আমায় গ্রাস করে, গ্রাস করছে। পাহাড়ে পালিয়ে এসেও মুক্তি নেই। মনে মনে নিজেকে বলি হে আমার অশান্ত চিত্ত শান্ত হও, বিশ্রাম নাও। প্রয়োজনে নিদ্রা যাও, দেখছো এই পাহাড় কেমন ঘুমিয়ে পড়েছে, আকাশের কোলে মাথা রেখে, শান্ত আকাশের উদার বুকে কেমন নিশ্চিন্তে তারাদল জেগে আছে। আর জেগে আছে কিউ এবং আমি। দিগের বৌ ও এখন কম্বলের

নিচে, ছেলেকে জড়িয়ে কম্বলের নিচে নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে দু'একজন শহুরে বাবু গাড়ির তীব্র আলোয় পাহাড়ের অন্ধকারের বুক চিড়ে নিঃশব্দে পিচ ঢালা পথ দিয়ে চলেছে হোটেলে বা অন্য কোনো লজে উদ্দাম রাত্রীর জন্য। চার পাশের দূরে দূরে বসতির বিদ্যুতের আলো জেগে ঘোষণা করছে—এখানেও জীবন আছে। দূর দূরান্তের দুর্গম পথের শেষে ঐ মানুষেরাও বেঁচে থাকে—কি কষ্টের জীবন ওদের! কিউ এর কথায় হয়তো ঠিক—ওরা বেঁচে থাকে কি করে! কোথাও এক দল পোকা গান জুড়েছে, বাড়িয়ে তুলেছে রাত্রির নিস্তব্ধতা। না, আর কোনো চিন্তা নেই। মাথার মধ্যে। পোকার গান, আমি তন্ময় হয়ে চোখ বুঁজে শুনছি। শুধু শুনছি। গান শোনার সময় এতদিনে হল!

গতরাত্রে রুচী ফোন করেছিল। হে শ্রোতৃবন্দ, নিশ্চয় মনে আছে রুচী আমার বিবাহিতা স্ত্রী, এবং বর্তমান। সে হায়দ্রাবাদে গেছে, আছে দীর্ঘদিন ধরে। রোহিত আমার ছেলে, সে ওখানে চাকরী করে, ভাল চাকরী, দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। হায়দ্রাবাদে কোম্পানির বড় ফ্ল্যাট। স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার পর থেকে প্রায়ই রোহিতের ফ্ল্যাটে থাকতে অভ্যস্ত। বলতে গেলে, সাদার্ণ এভিনিউ এর ফ্ল্যাট সাড়া বছর খালি পরে থাকে। রোহিত হওয়ার পর থেকে রুচী ও আমার মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল রুচী, তবুও একই ফ্ল্যাটে আমরা থাকতাম। কিন্তু হায়দ্রাবাদে রোহিত ফ্ল্যাট নেবার পর সাদার্ণ এভিনিউ এর ফ্ল্যাটে থাকার প্রয়োজনীয়তা রুচীর আর রইল না। যার যাতে শান্তি। এর জন্য কোনদিনই আমরা একে অপরকে প্রভাবিত করিনা, দোষারোপ করিনা।

তবুও রুচী যখন সাদার্ণ এভিনিউ থাকতো বলা যেতো স্বামীর ফ্ল্যাট, তার নিজের ফ্ল্যাট, স্বামীর সংসার তার নিজের সংসার। আজ রোহিতের সংসার রুচীর সংসার। অস্বাভাবিকতা কিছু নেই এর মধ্যে। তবুও যৌথ জীবন যাপনে কিছু দায়বদ্ধতা থাকে, আমাদের মধ্যে সেই দায়বদ্ধতা একেবারে নেই। কোন দিনই আমরা একে অপরের ইচ্ছাকে দমিত করিনা। আমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক কোন কালে অতি উষ্ণ কিম্বা শীতলতম ছিলনা। রুচী থাকতো তার অধ্যাপনা নিয়ে, রোহিতকে নিয়ে, আমি আমার গবেষণা নিয়ে। রোহিতের জন্মের পর থেকে রুচীর মনযোগ রোহিতকে নিয়ে কেন্দ্রিভূত হয়। আমাদের মধ্যে উষ্ণতা ধীরে অপসৃত হয়ে শীতলতা নেমে আসে এবং আমরা ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এই যে কিউ আর আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে যাই, কখনো কাজে কখনো ভ্রমণে, আমি প্রায়শই কিউএর ফ্ল্যাটে থাকি, এতে রুচীর মানসিক সন্তুলনে কোন ব্যাঘাত ঘটে বলে মনে হয়না। বরং নিশ্চিন্ত বোধ করে এই ভেবে যে প্রয়োজনে একজন আমার পাশে আছে। সে কারণে হায়দ্রাবাদ থেকে ফোনে নিত্য আমার খবরাখবর নেয়। আমিও ওদের খবর পাই।

কিউ ম্যাগাজিন রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। গালে হাত দিয়ে দেখলাম, সাড়া নেই। কম্বল টেনে ওকে ঢেকে দিলাম। দিগ্ নটায় ফিরল, আটা মাখা হয়েছে। দিনের মাংস চাপিয়েছে গ্যাসে, মাংসের গন্ধ বেরুচ্ছে। রুটী সেঁকবে একটা একটা করে, গরম রুটী আর মাংস। কিউ ঘুম ভেঙে খাবার টেবিলে। পিঠের ওপর গরম চাদর।

—দিগ্ তুম্‌হারা বিবি খানা খায়ি?

—জী।

—ইত্‌না জলদি?

—কিয়া করেগা সাব্। সুবা জলদি উঠ্‌না, সফাই করনা, খানা পাকানা হ্যায়।

— ঠিক।

রাতের খাবার খাইয়ে সেদিনের মত দিগ্ ফিরে যায় কুটিরে এক কম্বলের নিচে, বিবির পাশে বাচ্চার পাশে, গায়ের তাপে গরম কম্বলের নিচে গায়ে গায়ে স্পর্শ লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। বাইরের ঠাণ্ডা কম্বলের নিচে ঢুকবে—এ সাধ্যি ঠাণ্ডার নেই। কিউ শোবে আমার খাটে, খালি থাকবে ওর খাট। আমাকে জড়িয়ে ধরে, আদর করে, শরীরে শরীর দিয়ে উষ্ণতা সৃষ্টি করবে, বক্ বক করবে, আবার ঘুমিয়ে পড়বে আমার হাতে মাথা রেখে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সকাল হয়েছে ঘুম ভাঙা পাহাড়ে। উত্তর-পূর্বের দূরের একটা পর্বত চূড়ার ওপার থেকে প্রভাত সূর্য তারা ঢাকা অন্ধকার আকাশ করেছে আলোকিত। গ্রহ-নক্ষত্র-তারা রাজি রাত ভর পাহারা দিচ্ছিল যে ঘুমন্ত পৃথিবীকে, উধাও সূর্যের আলোয়। নির্মল নীল আকাশ প্রথম আলোয় উজ্জ্বল। সবুজ বনানি নতুন আলোয় শোভিত, মায়াবি তার রূপ। বিছানায় হেলান দিয়ে নতুন দিনের জন্ম উপভোগ করছি। মিলেছে অবকাশ-এই অবসরে নয়নাভিরাম দিনের জন্মলগ্ন অভিভূত করছে এ হৃদয়। একে একে অতিক্রম করেছি এমনি ফেলে আসা জন্মলগ্ন---হারিয়েছি ব্যস্ততায়। জীবনে চক্রে আবর্তিত হয়েছি, হচ্ছি---ফিরে তাকানোর সময় মেলেনি।

পাহাড়ের মাথা টপকে পাশের ওক্ গাছের মাথা অতিক্রম করে সূর্যের কিরণ কাঁচের জানালা ভেদ করে স্পর্শ করলো কিউটিব বালিস-বিছানা উন্মুক্ত ঘুমন্ত মুখমণ্ডল। আমার ঘুম ভেঙেছে যখন পৃথিবীর গা থেকে ধীরে ধীরে আঁধারের চাদর সড়ে যাচ্ছে। কম্বলের নিচে শরীর লুকিয়ে খোলা চোখে শূন্য মন সূর্য তর্পনে ব্যস্ত। প্রতিদিন নূতন সূর্য, তার সৃষ্ট সন্তানদের জন, সৃষ্টি করে নতুন প্রতিটি সকাল, সুন্দরের ডালা সাজিয়ে শুরু হয় নতুন একটা দিন, বিরাম বিহীন। অনাদি-অনন্তকাল হতে। আহ্বান করে জীবন পথিককে, বলে---হে পথিক, তুমি তোমার মনের মালা, নিত্যদিনের নতুন ফুলের বরণডালা থেকে, মনের রঙে চয়ন করে গেঁথে তোলো, সাজিয়ে তোলো।

এমনি করে পৃথিবী প্রকৃতি-জীবনে শুরু হল আরো একটি দিন। কুমায়ুনের এই পাহাড়ি গ্রামে। জানি, নিশ্চয় নিজের কুঠুরি ত্যাগ করে দিগ্ বাহাদুর লজের দরজার বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সাহেব, মেম সাহেব ঘুমাচ্ছে। আরামে ব্যাঘাত ঘটানোর তার ক্ষমতা নেই। সে পারে অপেক্ষা করতে। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার প্রতীক্ষার। সাহেব মেমসাহাবদের আরামের ব্যাঘাত ঘটানোর অধিকার বঞ্চিত সমাজ সৃষ্টির আদি মুহূর্ত হতে। মাথায় নেপালি টুপি, গায়ে ফুলহাতা ঢলঢলে সোয়েটার, ঢলঢলে প্যান্ট, পায়ে কাঁচা চামড়ার---তোবড়ানো জুতো। মেম্ সাহেবের ঘুম ভাঙলে দরজা খুলে চা বানাবে। গতরাত্রে কিউ অনেক দেরিতে ঘুমিয়েছে। হাজার কথা, হাজার সওয়াল---নূতন জায়গার নুতন মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল। বেসিক ফুড এখানে হয়না—যেমন ধান গম, সবজির চাষ হয়না---এদের চলে কি করে? উত্তর দিতে হয়, দিয়েছি, উদাহরণ সহকারে বুঝিয়েছি। কলকাতা এবং ভারতের অন্যান্য শহরেও চাষবাস হয়না। সেখানকার লোকেরা খেয়ে পরে বেঁচে আছে। গাম থেকে ফসল শহরে যায়। শহরের ক্রেতারা

সেগুলো ক্রয় করে বা কেনে। আবার সব রকমের ফল সব জায়গায় জন্মায়না—অথচ সবজায়গায়ই বিভিন্ন দেশের লোকেরা সেগুলো সংগ্রহ করতে পারে। যেমন আবহাওয়া বৃষ্টিপাত, জমির উৎকর্ষতার ওপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন ফসল, ফল ইত্যাদি। দার্জিলিংএ কমলা, হিমাচল, কাশ্মিরে আপেল, সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে নারকেল এবং সমতল ভূমিতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিও আবহাওয়ার জন্য ধান, গম জন্মায়। যেমন কুমায়ুনের এই অঞ্চলে ন্যাসপাতি হয়, পিচফল হয়, আখরোট হয়, শহরে বিক্রয় হয় এবং সেই টাকা দিয়ে এরা চাল আটা ডাল তেল, সবজি কেনে।

—এরা বড় গরীব।

—নিশ্চয়ই। ভারতবর্ষের অন্যান্য পাহাড়ি অঞ্চলের ন্যায় এরাও গরীব। জীবিকা নির্বাহের জন্য এদের হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়। শুধু পাহাড় নয়, সমতলেও দারিদ্র আছে। ভারতবর্ষের গ্রামে শহরে মোট জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। শহরের ফুট পাথে, বস্তিতে, লাইনের ধারে লাখো লোক করুন অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করে।

নিঃশব্দে আমার কথাগুলো শোনে, উপলব্ধি করে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাথে ঝালিয়ে নেয়। দীর্ঘদিন আমার কাজের সাথী কিউ। আমার সংগৃহিত তথ্য, আমার লেখার সাথে ওর পরিচয় খুব নিবিড়। এই পাহাড়ের বাস্তবতা, তথ্যের সাথে তুলনা করে নিচ্ছে। এর আগে কিউ আমার সাথে বিভিন্ন স্থানে গেছে, কিন্তু গ্রামে যাওয়া বা গ্রাম দেখার সুযোগ ওর হয়নি। যেখানে আমরা আছি-এটা কুমায়ুন রেঞ্জের একটা গ্রাম। পশ্চিমবাংলার গ্রাম বাংলার মানুষের সাথে এদের জীবনধারায় অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। দারিদ্র দুজায়গাতেই আছে। কিউ এর জন্মদাতা-বাবা ও মা-দুজনেই গ্রামের অধিবাসি ছিল—কিউ জানেনা। এরকমই কোন পাহাড়ি গ্রামে কিউএর পূর্বপুরুষেরা বাস করতো কিম্বা কিউএর পরিবারের লোকেরা বাস করে। জন্মের পর হতে, শৈশব, কৈশোর, যৌবনের প্রথম দিনগুলো কলকাতায় মানসদার কাছে মানুষ। মানসদা বাবা, বৌদি নিজের মা বলে জেনে এসেছে। কিন্তু যেদিন প্রথম জানতে পাবলো, ওর প্রকৃত পরিচয়, ওর জন্মের অজ্ঞাত পরিচিতি, সে সময়ের কিউএর মানসিক অবস্থার কথা এ লেখায় ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। কোনো উঁচু পাহাড় থেকে পতনের আঘাত সেই আঘাতের তুলনায়—অনেক কম যন্ত্রণাদায়ক। লাবনী যাকে বাবা বলে জানতো, সে তার বাবা নয়। যাকে মা বলে জানতো সে তার মা নয়—ঐ বাড়ি ঘর সংসার কোন কিছুর সাথে তার সম্পর্ক নেই, রক্তের সম্পর্ক নেই। সে জানেনা কে তার বাবা, কে তার মা, কোথায় তার বাবা মা, বাড়িঘর, কোন দেশের লোক, যাদের জানে তারা কেউ নয়! কৈশোরের সুন্দর পরিবেশ স্নেহশীল বাবা মার নির্ভয় আশ্রয়-মুহূর্তের মধ্যে ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। সুন্দর উজ্জ্বল পৃথিবী এক লহমায় অন্ধকার, অমাবস্যার চেয়ে ঘন অন্ধকারে হারিয়ে গেল। দিশেহারা বাক্‌রুদ্ধ লাবনী, কোথায় সে জানেনা। কে সে—জানে না! মানুষকে দেখলে মুখ তুলে তাকাতে পারতোনা, মায়ের কাছে যেতে কুণ্ঠায়, পা স্থবীরতা প্রাপ্ত হত। আর কোনোদিন মানসকে সে বাবা বলে ডাকতে পারেনি। জড়তা এসে গ্রাস আশ্রয় হতে চ্যুত হল। স্থান নেই আপনার, এই পৃথিবী লাবনীর জন্য এক টুকরো স্থানও নির্দিষ্ট করে রাখেনি। অবশেষে দীর্ঘদিনের স্নেহের, বন্ধনের দৃঢ়তায় এবং মানবিক আবেদনের দিকে চেয়ে মানস লাবনীকে স্থান করে দিল, আমাদের ফ্ল্যাটে, অবশেষে

আমার কাছে, কিউ জানে তার বাবা পাহাড়ি গ্রামের লোক, বাবার ছবি নেই, তবুও কিউ হয়তো বাবার চেহারা কল্পনা করে এই পাহাড়ের পুরুষ মানুষের মধ্যে বাবাকে খুঁজছে। কিউ এর আচরণ এবং অতিতে কিউএর উক্তি আমার কল্পনায় দুএকদিন, এরকমই কিউএব মানসলোকের ছবি চিত্রিত হয়েছে। আমার গায়ে কিউ তার শরীর স্পর্শ করে শুয়ে আছে। ওর কোমল হাতের নিঃশব্দ স্পর্শ বাঙ্ময়। ঘুমোয়নি। ওর দীর্ঘ এবং গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ব্যাকুলিত ধ্বনি।

—কি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এখানকার মেয়েরা। বয়স্কা বৃদ্ধরা-যাদের ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনিরা আছে, চলাফেরা করতে প্রায় অক্ষম, তারাও বসে থাকেন ন', কাজ করে। যেমন পারে, যতটুকু পারে, আলস্য ওদের চরিত্রে নেই।

—ঘরের বাইরের সব কাজে এরা অভ্যস্ত এবং উদ্যোগি। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা---

—আমি দেখেছি ছেলে মেয়ে মানুষ করা, রান্না-বান্না ঘরের কাজ করে, ঘরের পাশের এক চিলতে জমি থেকে এরা পাথর সরিয়ে কোদাল-খুরপি চালিয়ে মাটি কুপিয়ে. কুমড়ো লাগায়, টমেটো বোনে, পেঁয়াজ লাগায়, ফুলের গাছ—টবে প্লাস্টিকের প্যাকেটে, ঘরের চালায় গাছ লাগায়, ফুল ফোটায়। বৃদ্ধারা ছাগল পালে, ছাগল চরায়, কাঠ জোগাড় করে, বন থেকে ঘাস জোগাড় করে—সব মেয়েরা। সে তুলনায় পুরুষদের এত সক্রিয় দেখিনা।

—পশুচারণ-এদের আংশিক জীবিকা।

—পশু বলতে ছাগল চরাতে দেখেছি। বাংলা দেশের লোকেরা মাঠে ঘাটে গরু চরাতো, যারা চরাতো তাদের বলা হতো রাখাল ছেলে—এখানে যারা ছাগল চরায় তাদের কি বলা হবে---ছাগলমেয়ে না ছাগল বুড়ি! এখানকার কবিরা লিখবে— রাখালমেয়ে—সঙ্গে ছাগল!

কিউ মৃদু ঠাকুরের গানের কলি—রাঁখাল ছেলে সঙ্গে ধেনু....গেয়ে থেমে যায়।

—বুঝলে কিউ - এখানে ফল ছাড়া কোন ফসল হয়না, কলকারখানা নেই, চাকরী নেই—কি করবে? অগত্যা যার যতটুকু করার আছে, করে। গ্রামবাংলায় চাষের জমি আছে—চাষ হয়। এখানে ফল ও বনসম্পদ মুখ্য জীবিকা।

—বাঙালি মেয়েরা অনেক আরামে থাকে।

—পুরোপুরি সত্য নয়। সেখানকার কাজের ধারা ভিন্ন। রান্না-বান্না, ঝাড়ু-ধোওয়ামোছা ছাড়াও চিড়ে করা, মুড়ি করা, নাড়ু-মুড়কি অনেক কিছু, আগে ঢেকিতে ধান ভানতো, চাকীতে আটা পিষতো---এখন উঠে গেছে—কলে হয়।

—তুমি অনেক দিন আগের কথা বলছো—সুদূর অতিত।

—বর্তমানে ও আছে, কমে গেছে কাজের পরিধি একদিক থেকে, অন্যদিকে বেড়েছে—যেমন ছেলেমেয়ে কে পড়ানো—বিভৎস ব্যাপার।

কথা বলি। কিউ বলে, আমি শুনি। কিউ শোনে। মনে মনে সাজিয়ে নেয়। সময় পার হয়। আবার কথা আসে অন্ধকারে একই কম্বলের নিচে দুই-অসমবয়সি মানব-মানবির মধ্যে। চিন্তার জগৎ বিশাল—ব্যপ্তি অসীম।

—আচ্ছা বসন্ত---

—আবার নুতন কি এল মাথায়? ঘুম আসছে না?

—না। তোমার আসছে?

—কাল থেকে বেশি করে হাঁটবে। দিনে ঘুমাবেনা, রাত্রে খাবার আগে এক আধ পেগ ব্র্যাণ্ডি নেবে। দেখবে ভাল ঘুম হবে। রাত হয়েছে চুপচাপ থাকো, চোখ বন্ধ করে রাখো, ঘুম আসবে, চেষ্টা করো—

—করছি তো। তুমি আমার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দাও—

—কোথায়, তুমি এই বুড়োটার গায়ে হাত বুলাবে, যত্ন করে ঘুম পাড়িয়ে দেবে, নাতো উল্টে ছোটো মেয়েকে গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়াতে হবে!

কিউ তার সমস্ত শরীর দিয়ে আমার শরীর জড়িয়ে ধরে। আদর করে। আমার বুকের ওপর কিউ তার শরীর, উষ্ণ স্তনভার আমার বুকের ওপর, আমার শরীর দুপাশে দুই কনুই এর ওপর ভার করে আমার মুখের ওপর কিউ নিজের মুখ চেপে ধরে, দুটি ঠোঁট উষ্ণ নরম সুস্বাদু সিক্ত ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে। আমায় উষ্ণ চুম্বন দেয়—দীর্ঘ চুম্বন। চন্‌মনে কিউএর উষ্ণ শরীরের নিষ্পেষণে শীতলতা হারায় এ দেহ। কম্বলের নিচে কিউ এর নগ্ন পিঠে আমার কম্পিত দশটা আঙুল অস্থির ভাবে বিচরণ করে। জানিনা কতক্ষণ—দুটি শরীর দুটি শরীরের পাহাড়ের শীতলতা বিতারণ করে উভয়ে উভয়কে উষ্ণতা সঞ্চার করে। ঘুমিয়ে পড়ি। জানালার পর্দা খোলা। নক্ষত্রখচিত রাতের আকাশ নির্বাক প্রহরী—সাক্ষি তারা অনন্ত কালের।

কিউ কখন যৌথ শয্যা ত্যাগ করে নিজের জায়গায় ফিরে গেছে জানিনা। এখন ঘুমাচ্ছে। সূর্যের আলো জানালার কাঁচ উপেক্ষা করে ভরেছে কিউএর উন্মুক্ত মুখ আর আর গায়ের ঢাকা কম্বল। নিষ্পাপ, ঘুমন্ত, প্রশান্ত প্রচ্ছন্ন হাসিমাখা চেহারা। সারল্য স্পষ্ট। ভোরবেলায় আমার ঘুম ভেঙে যায়-পুরানো অভ্যাস। এই লজেও তার অন্যথা হয়নি। বিছানা ছাড়িনি। লজের খাটের মাথার দিকটা উঁচু যাতে হেলান দিয়ে বসা যায়, বসে আছি আরাম করে। কম্বলে ঢাকা শরীরের নিম্নাংশ। সাত্‌টা বাজে—এবার কিউ এর ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে। আড়মোড়া ভেঙে উঠবে। পায়ে চপ্পল গলিয়ে দরজা খুলবে। দিগ্‌ ধীরে লজে ঢুকে চা বানাবে। কিউ টায়োলেটে থেকে ব্রাশ করে বেরোবে। গরম কিছু গায়ে জড়িয়ে বিছানায় বসে বাসি কাপড়ে চা খাবে। আমি বেড টি নেব।

দিনের প্রাত্যহিক কাজ কর্ম শুরু হয়েছে পাহাড়ে। দু-এক জন করে গ্রামবাসিরা ধীরে অথচ লম্বা পা ফেলে চলেছে ওপরের দিকে। লজের সামনে থেকে একটা পাকদন্ডি ওপরে গেছে, সংক্ষিপ্ত করেছে হাঁটা পথ। যেকারণে গাড়ি ছাড়া পথচারীরা কেউ পাকা রাস্তা ব্যবহার করেনা। দূরত্ব ও সময় বেঁচে যায়। পাকদণ্ডির পর আবার পাকদণ্ডি পেরিয়ে তবেই স্টেশনে পৌঁছানো যায়। স্টেশন অর্থে বাসস্ট্যাণ্ড। এই অঞ্চলে ট্রেন লাইন নেই। হবেও না—কারণ লাইন বসানো ব্যয়সাপেক্ষ এবং বাণিজ্যিক সুবিধা বঞ্চিত। যানবাহন বলতে সরকারি-বেসরকারি ছোট ছোট বাস, জিপ ও প্রাইভেট কার। ঐ যারা ধীরে পায়ে চলেছে—স্টেশন থেকে কেউ গাড়ি চেপে শহরে যাবে, কেউ স্টেশন থেকে দিনের কাজ সেরে—অর্থাৎ দুধটা, সবজি, চাল, আটা কিনে ফিরবে—নিত্যদিনের। কেউ ঘুরবে কাজের ধান্দায়, মুটে মুজুর বাগানে কোন কাজ জোটে যদিবা—কাজে চলে যাবে। সকালে পুরুষেরা স্টেশনে যায়—বিকালে বিপরিত, ফিরে আসে হেঁটে চলে যায় দূর দূরান্তে বিভিন্ন বসতিতে। বেরিয়েছে বৃদ্ধারা-দুজন-চারজন-একপাল ছাগল নিয়ে হাতে লাঠি, গায়ে বিবর্ণ পরিধান। ছাগল গুলো রাতভর বন্ধ থাকে

বন্ধ ঘরে-পাশের ঘরটা বৃদ্ধার, গলা দিয়ে শব্দ করছে, ছাগলপাল ঘাসের ডগা, গাছের ডগা খাচ্ছে, ঝুলন্ত লাফাচ্ছে পাথরে দাড়িয়ে দূরের পাহাড় দেখছে নোংরা করছে পিচ রাস্তা। হাতের লাঠি ঠুকে, গলায় শব্দ করে ছাগলপালিকা শাষন করে তার ছাগল গুলো-- যাদের আমি নাম রেখেছি ছাগলবুড়ি। ওদের পরিচয় তার ছাগল পাল ছাড়া অন্য কারো সাথে, কিছুর সাথে আছে বলে মনে হয়না। ছাগল চেনে ছাগলবুড়িকে, ছাগলবুড়ি চেনে তাদের ছাগলকে। হাঁটি যখন রাস্তায় ওদের সাথে দেখা হলে। রুগ্ন দুটি হাত জোড়া করে নমস্তে জানায় ঘোমটার আড়াল থেকে, বসে থেকে। বসে থেকে রোদ্রে ঘাসের ওপর দুপা লম্বা করে ছড়িয়ে। কাউকে পেলে কাছে ডাকে। সাড়া পেলে গল্প বলে—নিঃসঙ্গ বৃদ্ধাবৃন্দ। দীর্ঘ জীবন। পিচ ঢাকা এরাস্তা যোগ করেছে গ্রামকে শহরের সাথে কিন্তু এদের জীবনের যোগ ঘটেনি আজো। নগর সভ্যতার আলোর স্পর্শ কিছুটা অন্ততঃ পেয়েছে নবীনেরা। আমি মেয়েদের কথা বলতে পারবনা, তবে নবীন যুবারা কমবেশি সকলেই লেখাপড়া শিখেছে। আলোচনার সময় সিনেমা-থিয়েটার নায়ক-নায়িকা, ক্রিকেটের খবর, ক্রিকেটারদের রেকর্ড, রাজনীতির খবর-গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে। মার্জিত চেহারা, পোষাকে বাবুয়ানা। শুদ্ধ হিন্দিতে কথা বলে—কুমায়ুনি ভাষা ব্যবহার করেনা। দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কেউ কেউ কাজ করে। ভোঁটের সময় ভোট দেয়—কেউ কেউ ভোটের প্রচারে অংশগ্রহণ করে, একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে আবার ভোট ফুরালেই সকলেই বন্ধু, কোনো রাজনৈতিক দলাদলি বা হানাহানি নেই এই পাহাড়ে। কিন্তু প্রবীনেরা এখনো সেই পাহাড়ি কুমায়ুনি জীবনধারা বহন করে নিয়ে চলেছে প্রাত্যহিক এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে। আমাদের গ্রাম বাংলায় এখনো যেমন পুরাতন রীতি—রেওয়াজ চালু আছে।

এই কুমায়ুনেই—অনেক দূরে দূরে, যেখানে পাকা রাস্তা নেই, বসতি ঘন নয়, একটা দুটো অতি আধুনিক মানের হোটেল বা লজ আছে। শহর থেকে পয়সা ওয়ালা লোকেরা, বা প্রভাবশালী নেতা, মন্ত্রীরা মাঝে মাঝে দামি দামি গাড়ি নিয়ে আমাদের লজের সামনে দিয়ে যায়, ছেলেমেয়ে বন্ধু বান্ধবি দেশি বিদেশি-হোটেল গুলোতে। রাস্তার ধুলো ওড়ে। হাসির শব্দ—কথার শব্দ কানে আসে হঠাৎ হঠাৎ। রাস্তায় রাস্তায় স্ফূর্তিতে, হাসতে হাসতে হেটে বেড়ায়, ফুল তোলে—ফল ছেড়ে— প্যাকেটের চিপ্স খায়, ঠাণ্ডা জলের বোতল হাতে হাতে ঝোলে। কেউ কেউ পাহাড়ে এসে সভ্য জগতের কথা বিস্মৃত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতায় ডুবে যায়। মুক্তির আনন্দে না মুক্তির উল্লাসে, জানিনা। আদিম প্রবৃত্তি জেগে উঠে সভ্য মানুষের মধ্যে—উল্লসিত হয়, উৎফুল্ল হয়। জানিনা কখন কে কিসে আনন্দ পায়! অনেক তরুণী আসে, বেলবটস বা টাইট জীন্স, টাইট টপে, হাইহিলে আওয়াজ তোলে খটা খট্-খট্-খট্। একে অপরের গায় হেসে হেসে ঢলে পড়ে। এর নাম চেঞ্জ। চেঞ্জ ফর এন্জয়মেন্ট, ফর মোর ইন্জয়। হয়তো আধুনিক শহরের ব্যস্ত জীবনে ওরা ক্লান্ত। শহরের জীবন-শহরের আনন্দ—বার-ক্লাব-পার্টি— ব্যস্ততা, চাঞ্চল্য চাপল্যে সন্তরণেও ওরা কেউ কেউ তৃপ্ত হয়না। পাহাড়ে এসে আনন্দের সন্ধানে আদিম উন্মত্ততায় সাময়িক হলেও নিমগ্ন হয়। আবার এমন অনেকে আসে যারা প্রকৃত নির্জনতা, নিস্তব্ধতা, পাহাড়ের বনানি শোভিত সৌন্দর্য্য উপভোগ করে, স্ত্রী কখনো কখনো একটি বা দুটি ছেলে মেয়ে সঙ্গী থাকে। মনের সুখে পাহাড়ের পথে হাটে, গাছ

দেখে, ফুল দেখে, পাখীর গান শোনে, নিজেরা গান গায়, দুবেলা খায় দায় আরামে ঘুমায়। প্রকৃত বিশ্রাম। এদের সংখ্যা নগন্য। যাদের দেখা আমি এসে অবধি পাইনি আমি কিউও যেমন আমাদের আনন্দ কুমায়ুনের প্রকৃতিতে—কৃত্রিমতার প্রয়োজন নেই। সকালের আলোর জীবন বৈচিত্রের নানা রহস্য আমার চিন্তায়। ঠিক ঐ পাহাড়ের মত, ভেসে বেড়ানো মেঘের মত—ভাসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। ঐ ভাসমান মেঘেদের আড়ালে প্রভাত সূর্য্যের আলো জীবন সত্যের মতই প্রতিভাত। লজের কাঁচে ঢাকা ঘরের মধ্যে শয্যায় শায়িতা কিউ। শূন্য আকাশের ন্যায় এ মনে বিক্ষিপ্ত চিন্তার ইতঃস্ততঃ এবং উদ্দেশ্যহীন বিচরণ।

কিউ এর ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে। হাত পা টান টান করে আড়মোড়া ভাঙছে। চোখের পাতা খুলে জানালা দিয়ে বাইরের আলো পরখ করে সময় আন্দাজ করল। ঘুরে দেখে, আমি বসে আছি। উঠে বসে গায়ের জামা কাপড় টেনে নিজেকে ঢেকে নিল, মাথার চুল সরালো মুখেব ওপর থেকে।

—সুপ্রভাত।

—সুপ্রভাত।

—নিশ্চয় চা জোটেনি, বসে আছো চায়ের জন্য।

—কে আর চা দেবে? তুমি ঘুমিয়ে আছো। চায়ের তেষ্টা সে কারণে বিশেষ অনুভব করছিনা। এই যে তুমি ঘুম থেকে উঠলে, আলুথালু চেহারা, চোখেমুখে ঘুম লেগে আছে। তোমার ঘুম ভাঙা এই চেহারা আমায় চা খাওয়ার ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দিলে।

—রিয়েলি?

—সত্য। এই সাতসকালে তোমার মিথ্যা বলতে পারি!

মৃদু হেসে কিউ এর প্রতি কটাক্ষ করি। কিউ বুদ্ধিমতি। ওর বুঝতে অসুবিধা হয়না। যোগ্য প্রত্যুত্তরের প্রয়াসে নিজের কিঞ্চিৎ ইচ্ছায় খাট থেকে নামে। পায়ে স্লিপার গলায়। মুখে দুষ্টুমি হাঁসি ফুটিয়ে আমার খাটে উঠে বসে। গলা জড়িয়ে, নিজের শরীর আমার শরীরের ওপর বিছিয়ে দিয়ে হাতের তালুতে আমার মুখ চেপে ধরে চট্ করে চুমু খায় ছোট কোরে। বিছানা থেকে নামে। টয়োলেটে ঢোকে। সকালের মিঠে চুমু। শরীরের উষ্ণ স্পর্শ। চিন্তার কুয়াশা মন থেকে এক লহমায় উধাও। কোথায় হারিয়ে যায় কেউ জানেনা। এই ঠাণ্ডায় গরম তালুর স্পর্শে কম্বলের নিচে থেকে নিজের হাত দুটি বের করে স্বীয় উষ্ণতালু দিয়ে নিজের গাল রগরাই। আরাম লাগে। শীতের সকালে এ শরীর উষ্ণতা প্রত্যাশি। কিউ তখন টয়লেটে।

বুঝলেন শ্রোতৃবৃন্দ, আমি কিন্তু মোটেই অত্যুক্তি করছিনা। কিউএ আমি আচ্ছন্ন। নীতি-দূর্নীতি, ন্যায়-অন্যায় বিচারের দায় আমার নয়। আমি যা বলছি—অকপটে বলছি। বলতে পারেন আমার মানসিক দৌর্বল্য এর জন্য দায়ী। এর প্রতিরোধ করা আমার সাধ্যের অতিত। জীবনসায়াহ্নে নিছক সম্পূর্ণ অবসর বিনোদনের জন্য এই পাহাড়ে এসেছি। এবং এই অবসরে মুক্ত চিন্তা শূন্য মনে এসে ভিড় করছে। পুরানো কাজ, পুরানো কথা, পুরানো স্মৃতি—উজ্জ্বলতা-অনুজ্জ্বলতা মিশিয়ে। দীর্ঘ কর্মব্যস্ত জীবন-- মাঝে মাঝে কাজের চাপে বিদ্ধস্ত হয়ে গেছি। নিজের অস্তিত্ব কাজের চাপে মাঝে মাঝে বিস্মৃত হয়েছি। একদা হতাশায় বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলাম। কাজের ক্ষমতা হারিয়ে গিয়েছিল। রুচীর সাথে শীতল সম্পর্ক এমন একটা পর্য্যায়ে পৌঁছেছিল যে জীবন

সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। সৃজনশীল মনের মৃত্যু হয়েছিল। এমন এক মানসিক দৈন্য অবস্থায় কিউ এর আগমন। কিউ এল। আবাল্য লালিত পালিত, স্নেহ ভালবাসা স্মৃতি মিশ্রিত মানসদার সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়ে, নিরাশ্রিতা লাবনী। কে তার বাবা, কে তার মা, কি তাদের পরিচয়—কোথায় তাদের দেশ—কি নৃসংশ মানুষ তারা—এমন এক নিদারুণ আঘাত, বজ্রপাতের ন্যায় সদ্য যুবতি লাবনীর হৃদয়ে প্রচণ্ড হতাশার সৃষ্টি করেছিল এবং তৎপরবর্তী সময়ে মানবের উষ্ণ প্রশ্রয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হৃদয় যখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসছিল, সেই সময় এল চরম আঘাত। মানসদার সংসার হতে বিতাড়িত হল কিউ। দুঃস্থ মন নিয়ে আমাদের সংসারে লাবনীকে সাহচর্য্য দিয়ে, বন্ধুত্বের উষ্ণতা দিয়ে, সেবা দিয়ে আমার খরাক্রান্ত মন নিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তুললাম। ধীরে ধীরে কিউ রূপান্তরিত হল। কিউ এর মনের গ্রীষ্মে থরেথরে বর্ষার মেঘের উদয় হল। বর্ষার ন্যয় পশলা পশলা প্রণয় বরষনে সিক্ত হল বসন্ত হৃদয়। মৃত মনো জমিতে সরসতায় ফসল ফলল, সৃষ্টির ফুলে ফলে ঝলমল করে উঠল নতুন জীবন—পূণর্জীবন। সৃষ্ট ফুলে ফলে সুরোভিত হল পৃথিবী। বিশ্ব নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ হল। আজ আমায় পৃথিবী চেনে।

যখন দিনের আলো ফোটেনি, খাটে হেলান দিয়ে বসে, কিউ ঘুমাচ্ছে অকাতরে, পূর্ণ অবসরে শূন্য মন। সে রাজ্যে ভিড় করছে অতিত। শরীর অবসরে থাকলেও মনের অবসর মেলেনা। ইচ্ছা হলেও মনকে তালাবদ্ধ বা বন্দি রাখা যায়না। আকাশের মেঘের মত অবাধ এবং বিচরণশীল, স্বাধীন। পাশে কিউ ঘুমাচ্ছে। রাতের বেশির ভাগ সময় আমার পাশে কিউ ছিল। এই সুন্দর একাকি সকালে আমার মন বিচরণ করছিল রুচীর সাথে। রুচী আমার স্ত্রী। আমার আর রুচীর মধে সম্পর্ক যেন একদা ব্যবহৃত হাঁটাপথ—দীর্ঘদিন অব্যবহারে আগাছায় ঢাকা, অনেক চেষ্টায় চেনা যায়, একদা এখানে পথ নামক বস্তুটি ছিল। আমার ও রুচীর সম্পর্ক অনেকটা অব্যবহৃত পথের মত। এই মুহূর্তে সে হায়দ্রাবাদে ছেলের ফ্ল্যাটে হয়তো ঘুমিয়ে আছে। পাহাড় আমাদের প্রিয় ছিল। সাগরতটে গেছি অনেকবার কিন্তু আনন্দ বেশি পেতাম পাড়াড়ে ভ্রমণে। রুচী ও আমি। দুজনে কলেজে পড়াই। ছুটী পেলেই পাহাড়ে—গরমে হোক, শীতে হোক বা কোন উৎসবে। এই যে সেই ভোর থেকে বিছানায় জেগে বসে আছি, প্রতিক্ষা করছি কখন চা আসবে, রুচীর সাথে বেড়াতে বেরিয়ে বিছানা ছাড়তামনা—শুয়ে থাকতাম বিছানা আঁকড়ে, আলস্যে নয় নেশায়, মাদকের চেয়ে সে নেশার প্রকৃতি তীব্র ছিল। রুচীও থাকতো যেন এ সময়ের প্রতিক্ষায়। সকালের সতেজ উষ্ণ শরীর দিয়ে, রুচী, বসন্তকে যৌবন উদ্দাম কামনায় তৃপ্ত করতো। রাতের অন্ধকারে তার শরীর যেন অতৃপ্ত থাকতো। দিনের আলোর জন্য সে অপেক্ষা করতো। সুস্পষ্ট দিনের আলোয় নগ্ন রুচী নগ্ন বসন্তে আসীন হত। অন্তহীন ছিল যেন সে কামনা। নিলাজ আমরা উভয়েই অনুভব করতাম স্বর্গীয় সুধার স্বাদ। শিক্ষা, রুচী, লজ্জা সে সময়ে ছিল অলীক। আর এ-বয়সে হয়তো কখনো সখনো ইচ্ছা জাগে. শরীব বাধা। ইচ্ছার মৃত্যু হয় কষ্টে। কিউ আছে, কিউ জীবন্ত, সতেজ সকাম অস্তিত্ব নিয়ে সে কামনাতুর। আমার দৈহিক অক্ষমতা আমার মনের আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে—সে বড় কষ্টের। এই যে কিউ টয়লেটে যাবার আগে আমায় আদর করলো, স্নিগ্ধ সূর্যের আলোয় লোভনীয় স্তনযুগল স্পষ্ট. মাঝে মাঝে আমায় স্পর্শ করছিল করতলগত হচ্ছিল তবুও অসহায়, আহাম্মকের মত আমি নিবৃত ছিলাম। এ শরীর-

জলাশয়ে তুফান যে আলোড়ন তোলে, সেজাতীয় কামোদ্দীপক তুফান ব্যতিত প্রভাব যদিও পড়ে, তা আংশিক। যেন মৃদু হাওয়া, ব্যর্থ কোনো স্পন্দন সৃষ্টিতে।

টায়োলেট থেকে বেরিয়ে প্রথমে মেন্ দরজ খুলে দেয় কিউ। দিগ্ ঢুকে যায় কিচেনে। চায়ের জল চাপায়। কিউ কম্বল গুছিয়ে নিজের বিছানা পরিষ্কার করে। ঢিলেঢালা, পাতলা পোশাক ওর পরনে, দুষ্টু সূর্যের আলো ওর শরীর থেকে পোষাকের আড়াল অপসারিত করছে। কি জাগ্রত ওর দেহমন্দির! যেন সদ্য ফোটা ফুল সৌরভে মদির—অভিপ্রায় বর্ণালি প্রজাপতি সে-ফুলের মধু আহরণ করুক! অথচ এই কিউ সেদিনের কথা, যেদিন মনের মৃত্যু ঘটিয়ে বা বজ্রপাতে মৃত মন নিয়ে আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হল, সেদিন এ শরীর ছিল নিষ্প্রাণ, মৃত মানুষের মত শীতল ও বর্ণহীন। বরফে জমা ওর মনও শরীর। উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরুর বরফের ন্যায় হীম শীতল। সেই শীতলতা মুক্ত করতে চায় সেই তীব্র উষ্ণতা—এ-বৃদ্ধের কোথায়! তবুও মানবিক আবেদনে একজন অসহায় মেয়ের করুণ অবস্থার কথা চিন্তা করে আমরা, রুচী ও আমি সংবেদনশীল ব্যবহার করে ওর কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করেছিলাম। যদিও রুচীর অপেক্ষা আমার সাহচর্য্য অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য ছিল। ধীরে ধীরে আমার ওপর কিউ এর আস্থা জন্মাল। আস্থা হতে নৈকট্য এবং বন্ধুত্ব। দুটি অসমবয়সি মানব-মানবি।

এর পর আমি চেষ্টা করলাম—একটা স্থায়ী সুখী বন্দোবস্ত। প্রত্যেক মেয়েদের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে স্বামী সন্তান নিয়ে ঘর। কিউ নারাজ। না মোটেই না। জীবনসঙ্গি করে কারোর স্ত্রী হয়ে তাকে ভালবেসে ঘর করা সম্ভব নয়। নতুন করে কাউকে ভালবাসা সম্ভব নয়। ভালবাসা বলে বস্তুটি তার হৃদয় থেকে নিঃশেষিত হয়েছে চিরতরে। পৃথিবীতে অন্য কাউকে বিশ্বাস সে করতে পারবেনা। একমাত্র আমাকে ছাড়া। আমি তার বন্ধু। এই বন্ধুকে কোন কারনেই সে হারাবেনা। এই বিশাল পৃথিবীতে সব কিছু হারিয়ে পরম সৌভাগ্য, আস্থাশীল একমাত্র অবলম্বন সে কোনক্রমে হারাতে রাজি নয়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা রাখতে সে নারাজ।

আর আমি? বসন্ত?—আমার কথা?—নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা করছে। আমি আগেই বলেছি—মিথ্যা বা বানিয়ে বা লুকিয়ে কিছু রাখবনা বা বলবনা।

স্নেহ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে ধীরে ধীরে কিউএর বিষণ্ণ মনের পরিবর্তন সাধনের প্রথম পর্বে বিশ্বস্ততা বা আস্থা অর্জন। কিউএর আস্থাভাজন হওয়া। একজন যুবতির সহেলি হওয়া বা প্রণয়ী হওয়া, এ প্রয়াস কম মানসিক শ্রমসাধ্য নয়। ওকে সুস্থ্য করে, তুলতে প্রাথমিক ভাবে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়লাম। কারণ কিউকে ছোট থেকে দেখেছি। ওর প্রতি স্নেহ ছিল প্রাথমিক ভাবে। পরে পরিচর্য্যার মধ্যে দিয়ে কিউএর সাথে মায়ায় জড়িয়ে পড়লাম। মায়া থেকে আমার প্রতি কিউ এর নির্ভরশীলতা। পুরোপুরি নির্ভরশীলতা। নিমজ্জমান কোন প্রাণী যেমন কোন কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করে মৃত্যুকে জয় করে এবং কাষ্ঠখণ্ডে নির্ভরশীল হয়, সেমত কিউ বসন্ত নির্ভর হয়ে উঠল। আমাকে ছাড়া সে কিছুতেই একা থাকবেনা। আমায় ছাড়া সে খাবেনা। বিস্ময়ের ব্যাপার হল। অভ্যাস জন্মালো দুজনেরই। আমিও কিউ এ অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। যা করব দুজনে দুজনকে সাথে করে। একসাথে চলা-খাওয়া-বসা-কথা বলা-একাত্ম হওয়া সুখ-দুঃখ বন্টন করা। কেন হল? আগেই বলেছি আমার অন্তরে খরা—রুচীর আমার সম্পর্কে রচিত হয়েছে দীর্ঘ ব্যবধান। দুর্বল মনে রোপিত হল নির্ভরশীলতার বীজ। গ্রীষ্মের দাবদাহে পৃথিবী

যখন ক্লান্ত, ঝির ঝির হাওয়া বা একপশলা বৃষ্টি যেমন দাহজ্বালা দূর করে, বসন্ত হৃদয়ে কিউ এর আগমন এক পশলা গ্রীষ্মের বৃষ্টি। রুচীর আমার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানে যে ক্লেশ ছিল, কিউ এর আত্মনিবেদনে কিউ এর নারীত্বের স্পর্শে কিউ এর নাতিশিতোষ্ণ স্পর্শে-এ হৃদয় জ্বালার উপশম হল। রুচীর এ জাতিয় আচরণের মধ্যে আমি কিন্তু কোনদিনই দোষ দেখিনা। আসলে দুজনের প্রকৃতি ভিন্ন। দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করছে রুচী—প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্না। প্রভুত্ব ওর মজ্জাগত। আমার কাজের জগৎ স্বতন্ত্র। আমার কাজের প্রতি রুচীর শ্রদ্ধা আছে। আমার ওপর যে কারণে কোনদিনই প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেনি। রুচী জানতো আমার স্বপ্নের কথা, আমার আপোষহীন চেষ্টার কথা—রুচী জানে এবং যে কারণে সে এ বিষয়ে বিরোধ করতে চায়নি। স্ব স্ব জীবনবোধ নিয়ে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে আমরা স্বাতন্ত্রতা নিয়ে জীবন নির্বাহে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আপন আপন সীমারেখায় আমরা উভয়েই আবদ্ধ। সংসার যাত্রা নির্বাহ হচ্ছে দৃশ্যত অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে। দাম্পত্য জীবনে রুচী রুচীর মত, আমি আমার মত আছি—একত্রে এবং সুসম্পর্ক নিয়ে। অথচ মানসিক ভাবে বিশাল শূন্যতা। রুচীর অবলম্বন সন্তান রোহিত, আমার কাজ দুঃস্থ শিশু নিয়ে। দুজনে দুজনেই একা। এ যেন জীবনের সোনালি লগ্নে ধূসর রঙের লেপন—হৃদয়ে খরার দাপট। জীবনের সেই ধূসর লগ্নে কিউ বা লাবনীর আবির্ভাব মৃত মন ও পূর্ণ যৌবনদীপ্ত শরীর নিয়ে। এ আকর্ষণ রুখবে কে!

দিগ্‌বাহাদুর ধূমায়িত চা নিয়ে আসে মগে করে। ঠাণ্ডায় ছোট কাপে চা পোষায় না। কিউ দিগের হাত থেকে চা নিয়ে আমায় এগিয়ে দেয়। গরম চা লম্বা চুমুকে পান করি। কিউ নিজের বিছানায় চা নিয়ে বসে। চা পান শেষ করে ধীরে বিছানা ছাড়ি। সিগ্রেট জ্বালি। ব্রাশ নিয়ে টয়োলেটে। ইত্যবসরের দিগ্ নিজে এক কাপ চা খেয়ে কাপ সিঙ্কে রেখে বিছানা ঘরদোর পরিষ্কার শুরু করে দেয়।

সকালের স্নিগ্ধ রোদ্দুর উষ্ণ, মনোরম-কিন্তু উত্তাপহীন। বিশেষ করে কুমায়ুন পর্বতমালার এই গ্রামে। উত্তর হাওয়া কনকন বয় অবিরাম-কখনো শন্ শন্ শব্দ ওঠে ওক দেওদার গাছে। খোলা জায়গায় ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকলে শীত করে, সেজন্য রোদ্দুর খুঁজতে হয়।

আমার লেখায় বার বার কুমায়ুন প্রকৃতি এসে যাচ্ছে। আমি নিরুপায়। কারণ কুমায়ুনের এই গ্রাম আমার স্মৃতির পাতা একে একে না হলেও পাতাগুলো খুলছে ফর্ফর্ শব্দে। নজরে আসছে মোটা মোটা লেখাগুলো। কলকাতায় সময় ছিলনা, সুযোগ ছিলনা বা পরিবেশ ছিলনা পিছন ফেরা দেখার। এখানকার প্রকৃতি আমার পুরানো দিন গুলোকে উলটে পালটে দেখার বা স্মৃতি রোমন্থন করতে উৎসাহিত করেছে। এই অবসর আমায় আমাকে নিয়ে ভাবিয়েছে। অতিত নির্লিপ্ত, বর্তমানে সুন্দর হয়েছে। মাঝে মাঝে আমার নিত্য অভ্যাস, নিত্য কাজের জগতে মন ফিরে গেছে। মনে হয়েছে, যে কাজ এতকাল করে চলেছি—তাও অপূর্ণ। এই যেমন দুজন পাহাড় রমণী তাদের দুটি শিশুর হাত ধরে চলছিল—আমার কষ্ট হচ্ছিল। কি অস্বাভাবিক রুগ্ন চেহারা, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে। শিশু দুটিও মায়ের অনুরূপ, আমি জানি, অনেকে জানেও, যদিও সকলে জানেনা—এ দেশে শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ সন্তান সম্ভবা মায়েদের অপুষ্টি। জমি অনুর্বর হলে যেমন ভাল ফসল হয়না। অপুষ্ট মাও স্বাভাবিক শিশুর জন্মদানে অক্ষম। মা অপুষ্টিতে ভুগবেন কেন? প্রথমতঃ গরীব, পরিবারের প্রয়োজন মত খাদ্যের অভাব,

দ্বিতীয়তঃ যেটুকু খাদ্য পরিবারের পুরুষ সদস্য গ্রহণ করার পর অবশিষ্ট থাকে মায়েরা খায়, যদি মা গর্ভবতী হয় তার জন্যও খাবারের বরাদ্দের হেরফের হয়না। সে গর্ভবতী মহিলা যে সন্তান জন্ম দেবে, সে পূর্ণতা পাবে, স্বাভাবিক হবে, দুরাশামাত্র। যে কারণে শিশু জন্মলগ্ন হতেই পঙ্গু। তার ওপর গ্রামাঞ্চলে, পাহাড় অঞ্চলে, না আছে ডাক্তার না আছে ওষুধ না আছে চিকিৎসা না পরামর্শ।

রোদ বেড়েছে। বেরোবার সময়, প্রাতঃভ্রমণ বললে ভুল হবে, সকালের প্রাত্যহিক ভ্রমণ-জামাকাপড়, টুপি সোয়েটার মাফলার ইত্যাদি দিয়ে বাইরের ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করি। কিউ গরম জলে স্নান সেরে, ত্বকের পরিচর্য্যা করে, পোষাক পরে। দিগাকে নির্দেশ দেয় যেন ফিরে না আসা পর্যন্ত ব্রেকফাষ্ট না করে। দিগের এখন অনেক কাজ। বিছানা, ঘর দোর পরিষ্কার করা, বর্তন সাফাই করা, পিলোকভার বেডসিট চেঞ্জ, ম্যাট পরিষ্কার এর পর বাগানে গাছের যত্ন করা, জল দেওয়া, শুকনো পাতা— ঘাস সাফাই করা, জল সিঞ্চন করা ইত্যাদি।

—বসন্ত রেডি?

—ইয়েস ম্যাডাম—ইয়াং লেডি।

—থ্যাঙ্ক ইউ—ওল্ড ম্যান।

বেরোলাম প্রাত্যহিক প্রাতঃভ্রমণে। দুজনে। পাহাড়ের পথে পথে হাঁটবো। সোজা রোদ এসে গায়ে লাগছে। সকালের সতেজ হাওয়ায় স্নায়ুসমূহ সক্রিয় হবে। দূষণমুক্ত অক্সিজেন সবেগে ফুসফুসে প্রবেশ করে রক্ত শোধিত হয়ে শীরা উপশীরায় ধাবিত হবে।

—কোন দিকে যাবে?

—যাবার জন্য মাত্র দুটো দিক—এক চড়াই অন্যটি উৎরাই। চড়াই ভাঙলে স্টেসন-বাজার, মানুষের ভিড়। উৎরাইয়ে বাগান ফুলের গাছ, ফলের গাছ, খোলা জায়গা। যেদিকে চাও যেতে পারো, আমার কোনদিকেই আপত্তি নেই। তবে তোমার মত খটাখট্ হাঁটতে পারবোনা-হাঁটবো ধীরে ধীরে, নইলে হাঁপ ধরে যায়, কষ্ট হয়—

—যেমন পারো হাঁটো, দরকার হলে বিশ্রাম নেবে। আমি তোমার পিছে পিছে চলবো কেমন!

কথায় কথায় এগোচ্ছি। একটাই রাস্তা, পাহাড়ের গা অর্থাৎ পাথর কেটে তৈরি। কুমায়ুন পর্বতমালার পাহাড় জুড়ে এ গ্রাম। এ কোন পর্যটন কেন্দ্র নয়। সে কারণে পর্যটকের ভিড় নেই। পর্যটকদের দ্রষ্টব্য বা আকর্ষনীয়-নদী, লেক, মন্দির, সানরাইজ বা সানসেট পয়েন্ট কোনটাই এখানে নেই যারা আসে তারা হয় বিশ্রাম নিতে নয় আদিম স্ফুর্তি লুটতে অথবা কাজে আসে। আমরা এসেছি পূর্ণ বিশ্রাম নিতে। বিশ্রামের মানসিকতা নিয়ে। যে কারণে পাহাড়ে ছড়ানো শ্যামল প্রকৃতি, মনোরম জলবায়ু আমাদের বিশ্রামে অত্যন্ত উপযোগি এবং যথার্থ উপভোগ্য। আমরা যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি—সেই রাস্তার সাথে এসে মিশেছে অনেকগুলো পাকদণ্ডি, ঐ পাকদণ্ডি দিয়ে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যাওয়া যায় সংক্ষেপে বিভিন্ন বসতিতে যাওয়া যায়, বাস স্টেশনে যাওয়া যায়, ডাকঘর, হাসপাতালে যাওয়া যায়। স্থানীয় পাহাড়িরা পাকদণ্ডি ব্যবহার করে—সময় ও রাস্তার দৈর্ঘ্য কমে যায়। নিকটবর্তী শহর থেকে, রাজধানী দিল্লী থেকে দু চারজন শহুরে ধনী ব্যক্তি—তাদের নিজেদের জন্য কট্ বা লজ বানিয়েছে, ফলের বাগান কিনে গ্রীন হাউস বা ফার্ম হাউস বানিয়েছে। মাঝে মাঝে সপ্তাহান্তে

নামিদামি গাড়িতে করে এসে আনন্দ করে যায়। একটা হোটেল আছে প্রচণ্ড ব্যয় সাপেক্ষ। দেশি বিদেশি সাহেব শুবোরা আসে, ভি আই পি আসে সরকারী বা কোম্পানি খরচে। হয়তো এ সড়ক এর এ গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃতি ঐ ভি আই পি দের সুখের জন্য। সে কারণে এ পথের সমাপ্তি ঐ হোটেলের দ্বারপ্রান্তে। কখনো হোটেলের আগন্তুকদের দামি গাড়ির আলোয় রাতের আঁধারের বিঘ্ন ঘটায়। ওদের অনেকে আসে, দু-তিন দিন থাকে, ঘোরে ফেরে, ফুল দেখে, ফল তোড়ে, রাস্তায় হাসি হুল্লোর করে—রাতভর আলো জ্বেলে নাচে গায়-পান করে মাতাল হয়। ব্যাট ধরেনি কোনদিন—ব্যাট্‌মিন্টন খেলে, পাহাড়িদের দিয়ে ম্যাসাজ করায়।

রাতের বেলায় দিনে সংগৃহিত পাকাফলের পেটি চালান হয় শহর থেকে শহরে। এ রাস্তার জন্মের পিছনে এমন কারণ থাকতে পারে। যুদ্ধের জন্য বা বাণিজ্য বিস্তারের সার্থেই যোগাযোগ ব্যবস্থা বা সড়ক নির্মাণের সম্পর্ক লুকিয়ে আছে। এবং এ কথার সত্যতা যাচাই এর জন্য ইতিহাসের যে কোন পাতা খুললেই পাওয়া যাবে। সে সভ্যতার প্রথম দিন হতে অদ্যাবধি—যে স্থলপথ—জলপথ বা আকাশ পথই হোক না কেন! গরীব গ্রামবাসির—সেই সমতলের হোক বা পাহাড়ের হোক, রাস্তা হবে পাকা—বানাবে শাষকশ্রেণী—সে রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রই হোক না কেন, তৈরি হলে মানুষের পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম হত!

যাক্ গে! আমরা এসেছি বিশ্রাম নিতে। এই পাকা রাস্তা থাকতে আমাদের খুব সুবিধা হয়েছে। আমরা আসতে পেরেছি, আমরা হাঁটতে পারছি। ঐ পাকদণ্ডি দিয়ে হাটা-সরু কাঁচা রাস্তা, একজন কোনরকমে যেতে পাবে, পাশাপাশি দুজন অসম্ভব—পাথর ছড়ানো, জল নেমেনেমে অসমতল, প্রচণ্ড চড়াই কিম্বা উৎরাই, আসা বা হাঁটা কোনটাই সম্ভব ছিল না। অথচ এখানকার অধিবাসিরা কত স্বাভাবিক—কত দ্রুত হাঁটে-একবারের জন্য ভাবেনা, গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। ওরা হাঁটুক, আমরা নই। পিচ ঢাকা রাস্তায় আমি আর কিউ। চড়াই ভাঙছি, কিউ সালোয়ার কামিজের ওপর হালকা পুল ওভার ঝুলিয়েছে। বুক খোলা, অল্পহিলের ফিতে বাঁধা জুতো। স্নানের পর ফ্রেশ।

—নমস্তে আঙ্কেল।—নমস্তে আন্টি।

—নমস্তে।

স্কুলের পথে ক্ষুদে পড়ুয়ারা। পিঠে ব্যাগ-বই, টিফিন, জলের-বোতল। নীল হাফ্‌প্যান্ট, সাদা সার্ট ও নীল সোয়েটার, মেয়েদের প্যান্টের বদলে স্কার্ট পাঁচ ছ-সাত বছর বয়স হবে—সকলেই শীর্ণকায়। গায়ের রঙ লালচে সাদা। মুখের গড়ন চ্যাপ্টা ও আছে আবার কারো কারো লম্বা। আলাদা কোন বিশেষত্ব নেই। ওরা হাঁসতে হাঁসতে, খেলতে-খেলতে, অনর্গল কথা বলতে বলতে স্কুলের দিকে এগোয়।

—কিয়া নাম হ্যায়?

—মেরা?

—হ্যাঁ।

—জী-হরিষ।

—তুম্‌হারা?

—জী কাব্বু। জী সোমু। জী সোনু!

—টাটা আঙ্কেল।

—টাটা।

ওরা এগিয়ে যায়। আমরা দাড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করি। পাকদণ্ডি ধরেছে। ঐ দূরে থেকে আওয়াজ আসছে শোরগোলের। শিশুদের কলরব। এখান থেকে কম করেও এক মাইল দূর হবে। ওদের ক্লান্তি নেই। কেউ খেলছে, কেউ ঢিল ছুড়ছে, কেউ জল খাচ্ছে। মহা আনন্দে। মুক্তির আনন্দে। বন্ধুদের সাথে খেলা করার আনন্দে। ওদের মধ্যে একজনের হাত চেপে ধরে কিউ।

—কি, অপূর্ব দেখতে। বলো বসন্ত?

—হ্যাঁ।

—কিয়া নাম তুম্‌হারি।

—কব্‌বু। জী ছোড়দো না! সভি যা রাহি হ্যায়—মুঝেভি—

কিউ ওর গালে হাত দিয়ে, ছোট চুমু খেয়ে ছেড়ে দেয়—কি মিষ্টি!

—আমাদের স্কুলের স্কার্টের রঙ ছিল সবুজ। সাদা ব্লাউজ। টাই ছিল—মোনোগ্রাম—

—তোমার মনে আছে?

—নিশ্চয়ই। নাহলে বলছি কি করে।

—আর কি কি মনে আছে?

—বেশি কিছু নয়। যেমন ওদের দেখে আমার ছোট বেলার ড্রেসের কথা মনে পড়ল। চেষ্টা করলে দু-একজন বন্ধুর নাম ও বলতে পারবো। যেমন কেকা—মনে আছে, মনে আছে ভীষণ আদুরে ছিল। আমরা ওর পিছনে লাগতাম। তখন বড়—থ্রি-ফোরেএ পড়ি। ওকে নিয়ে মজা হত। মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলতো। জানিনা এখন কেমন আছে—কোথায় আছে। ছোট বেলার ছিঁচকাদুনে অভ্যাস নিশ্চয় এখন নেই—বলো?

—কি করে বলবো?

—কেন? গেজ করো। কেকা ছিল, বাসবি ছিল। বাসবি-ফার্স্ট হত। খুব সিরিয়াস, গম্ভীর, আমাদের সাথে মিশতো না। দেমাক ছিল।

—তোমার পেছনে কারা লাগতো?

—সে রকম কেউ না। তবে দিদিরা, গাল টিপে দিতে, বলতো গালে লাল রঙ মেখেছিস্? হাত বুলিয়ে বলতো তোর গাল খুব লালরে—

—তোমার গাল এখনো লাল—ঐ বাচ্চা গুলোর গাল তোমার গালের মত লাল নয়।

—তার ওপর তোমার সার্প নাক পাতলা ঠোঁট—চোখ—

—বসন্ত ভাল হচ্ছে না বলছি। এই সকালে তুমি কি আমার পিছনে—

কিউ এর গলায় এবারে যেন আদুরে মিশিয়ে, স্বরের পরিবর্তন হল। কারণ কিউ জানে সে রূপসী। রূপ থাকলে অন্তরে সে রূপসির অহঙ্কার কম হোক বা বেশি হোক থাকবেই। এবং সে চাইবেই অন্য কেউ যেন তার প্রসংশা করুক। কথাগুলো যখন কিউ বলছিল, কিউএর পাতলা ঠোঁট মিষ্টি হাসির পরশ মেখে মৃদু কাঁপছিল—ঝিলিক দিচ্ছিল তার ফাঁকে সাদা দাঁতের সারি। মানস বলতো কিউ এর চেহারার অনেক কিছুই ওর বাবার কাছ থেকে পাওয়া। কাশ্মিরী মুসলমান তীক্ষ্ণ নাসা, সুরমাটানা বড় চোখ সুঠাম লম্বা শরীর। আকর্ষণীয় পুরুষালী চেহারা। মানস দেখেছে। মানস জানে। মানসদার ক্যাম্প অফিসের দারোয়ান। সে সময় একটা পাওয়ার প্রোজেকেটর দায়িত্বে ছিল মানস।

তারই মেয়ে লাবনী ওরফে কিউ। মানসদা অবসর নিয়ে সল্ট লেকের নিজস্ব বাড়িতে বাস করে। বৌদি আছে আর আছে মেয়ে। মানসদা—দুজনেরই শরীর ভাল নেই।

----বসন্ত ঐ পাখীটা দেখো।--দেখছো?—ঐ যে সামনে ইলেক্‌ট্রিক তারে বসে আছে----

--হাড়িচাচা?—না। না-না। হাড়িচাচা নয়। অনেকটা হাড়িচাচার মত দেখতে। তবে লেজটা লম্বা বেশি, হাড়িচাচার লেজ এত লম্বা হয়না।

--সুন্দর দেখতে।

যাক, তবুও একটা পাখী দেখা গেল। এখানে পাখীর সংখ্যা কম।

---আছে। আছে। তুমি দিনভর ঘরে বসে থাকলে দেখবে কি করে --অনেক পাখী আছে। ছোট-ছোট। নানান্ রঙের । কালো ধূসর, সবুজ লাল কালো রঙ মেশানো। কিচির মিচির ডাকে। পাখায় চড়ে এ গাছে ওগাছে উড়ে বেড়ায়। ঝগড়া করে, ভাব করে। দেখে বেশ মজা লাগে।

-- আপাততঃ ঐ ছোট পাখীরা আমাদের কিউ রাণীর মনোরঞ্জন করতে পেরেছে। বুঝেছো কিউ, এ পাহাড় কাউকে অখুশি করেনা। তোমার খারাপ লাগছে ভেবে আমি চিন্তায় ছিলাম—

----আমাকে নিয়েই তো তোমার চিন্তা, তাই না?

কথায় কথায় বেশ ছিলাম। হাসি গল্পে, হঠাৎই তাল কেটে গেল। বেসুরো গলার স্বর। বিষণ্ণ বাতাসে আদ্রতার ইঙ্গিত। কেন হবে? প্রকৃতি আনন্দের উপকরণ সাজিয়ে রেখেছে অকৃপণ হৃদয়ে সেখানে প্রকৃতির সন্তান—এ মানুষ কেন বিষণ্ণ হবে! কিউ তো জানে কিউ এর একদা বসন্ত কাকা আর আজকের এ বসন্ত কিউ এর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত-- তার সুখের কথা, তার নিরাপত্তার কথা গভীরভাবে চিন্তা করেও কূল পায়না, এখনো মাঝে মাঝে অতিত কিউকে বিব্রত করে। অজানা আশঙ্কা কিম্বা অতিতের স্মৃতি কিউ এর মনে ভেসে ওঠে, কিউ এর স্বাভাবিক আচরণ হারিয়ে যায়, অশান্ত হয়ে ওঠে, বিষণ্ণতা গ্রাস করে। তার কথাবার্তা, আচার-আচরণে প্রকাশ পায় অস্বাভাবিকতা। এই কিউটির পূণর্বাসন হয় আমাদের বাড়িতে-আমাদের কাছে। কিউ তখন নির্বাসিতা মানসদার বাড়িতে ঠাঁয় নেই। লাবণী নবীনা, যৌবনসমৃদ্ধা, আশাহতা অনন্ত দুঃখসাগরে অনুতপ্ত মানসদা আমাদের কাছে ওর ভার তুলে দিয়ে নিষ্কৃতি পায়। স্নেহান্ধ মানসদা, সংস্কারাচ্ছন্ন মানসদা, লাবণীকে কোন ভাবেই নিজের পুত্রবধু হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। একমাত্র ছেলে মানবকে নিশ্চয়ই লাবণীর স্বামী হিসাবে মেনে নিতে কোন মতেই রাজি নয়। অথচ লাবনীকে সন্তানবৎ স্নেহ করে। তার অকল্যাণ চায়না। তার সুরক্ষা, তার ভবিষ্যৎ, তার শুভকামনার কথা চিন্তা করে আমাদের দ্বারস্থ হয়। সকাতর অনুনয়ে করে বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ দিয়ে লাবণীর আশ্রয়ের জন্য। মানবিকতার আহ্বানে, অসহায়, আত্মীয় স্বজনহীনা মেয়েটির প্রতি দয়াপরবশ চিত্তে রুচী ও আমি এ আমাদের কাছে গ্রহণ করি। আংশিক নিশ্চিন্ত হয় মানসদা। সেই লাবণী রূপান্তরিতা আজকের কিউ। তবুও অতিতের লাবনী বর্তমানে, অতিতের স্বপ্ন দেখে আশঙ্কায় চমকে ওঠে। সেই বসন্ত, যার জীবনে ধূসরতা আচ্ছন্ন করেছিল, তার জীবনে ধীরে ধীরে সজীবতা ফিরে এল। তা'র কৃতিত্ব দাবি করতে পারি কিউ এর সান্নিধ্য। কিউ এর নারীশক্তির অপূর্ব সৃজনশীলতা। বসন্তের পৌঢ় জীবনে, রুচীর বসন্তের প্রতি উদাসীনতা এবং

উৎসাহের অভাব, রুক্ষ শীতের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল, কিউ এর আবির্ভাব আশীর্বাদের মত, বসন্তের আগমনী নিয়ে এল। নিভে যাওয়া উৎসাহ, কর্মক্ষমতা ফিরে গেল। কিউ যেন সেই জিয়নকাঠি যার স্পর্শে বসন্ত ফিরে পেল তার হারিয়ে যাওয়া সৃজনশীলতা। নতুন উদ্যমে আত্মনিয়োগ করল তার কাজের জগতে। কিউ এল নতুন সাথী হিসাবে। বাস্তব, এই অবস্থা যতটা আকস্মিক ঠিক ততটাই স্বাভাবিক।

অশান্ত উচ্ছ্বাস, ক্ষণিকের অতিত কিউ এর হৃদয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, ধীরে ধীরে তা অর্ন্তহিত হল। কিউ এর চেষ্টায় পুণরায় স্বাভাবিক হয়ে এল। আমিও কিউ এর আহ্বানে ফিরে এলাম বর্তমানে।

—আকাশের রঙ দেখেছো বসন্ত কেমন স্বচ্ছ নীল। কলকাতার আকাশ এমন নীল, আমি দেখিনি।

আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখলাম। পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করা আকাশ, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা আকাশে, সকালের আলোয় উজ্বল আকাশ—সত্যই এ আকাশ বড় মায়াময়, বড়ই স্বচ্ছ, বড় নীল, নির্মল—

—এখানকার বায়ুস্তরে কারখানার চিমনির ধূয়ো নেই, না আছে গাড়ির একঝস্ট্ এর ধোঁয়া, রাস্তার ধূলোর ঝড় যে কারণে এই আকাশ নির্মল নীল। বিকালে মেঘের দল আকাশের চূড়ায় যা ভাসমান রাতের শীতলতায় গুড়ি গুড়ি বরফ হয়ে পাহাড়ে জমা হয়। যে কারণে এই প্রান্তের আকাশ এত সুন্দর।

—আকাশ, বাতাস, সবুজ বনানি মলিনতামুক্ত—যে কারণে এখানকার মানুষের প্রকৃতি নিষ্কলুষ।

—কিউ অবশেষে এ পাহাড়ের মাদকতায় তুমি ও আচ্ছন্ন হলে। ভালবেসে ফেললে।

বদ্ধ জলাশয়েও কখনো কখনো জলে আলোড়ন হয় মৃতবৎ হৃদয়ও স্পন্দিত হয়। ভাল ও মন্দের অনুভূতি স্পর্শ করে। কলকাতায় জীবন বদ্ধ, বড় যান্ত্রিক, রুটিনে বাঁধা, আশা আকাঙ্খাও সীমার মধ্যে বন্দি। কলকাতায় মনের মুক্তির পথ নেই।

—সব সত্য। তবু, সভ্যতা, বলো সংস্কৃতি বলো, কৃষ্টি বলো আধুনিকতা বলো, জ্ঞানের উন্মেষ বলো—সবই কলকাতা থেকে। স্বাধীনতার আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ-কলকাতা কেন্দ্র বিন্দু। কলকাতাতে জন্ম নেয়, নিয়েছে তাবৎ শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য। কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই প্রভৃতি শহর আজকের সব কিছুর কেন্দ্রভূমি। শুরু এই শহরগুলো হতে। পরে বিস্তারলাভ করেছে ভারত তথা পৃথিবী ব্যাপি।

মনযোগ দিয়ে পায়ে চলার তালে কিউ প্রত্যেকটা শব্দ অনুধাবন করছে কিউ। যেমন অনুভব করছে এই সুন্দর সকাল। মাঝে মাঝে কিউ উষ্ণ তালু দিয়ে আমার হাতের আঙুলগুলো নিস্পেষণ করছে। আরাম পাচ্ছি। কি নরম আর উষ্ণ ওর হাতের তালু আর তুলির মত আঙুলগুলি। উষ্ণতায় মিশে রয়েছে স্নেহ ও উত্তেজনা। স্নেহ বঞ্চিত আমি দীর্ঘদিন। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হয়েছে। পিতৃবিয়োগ তাও বছর ত্রিশ হতে চলল। স্নেহের উৎসরণের উৎস এ বসন্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে চিরতরে। রুচী প্রেয়সি, আমার স্ত্রী, ওর ব্যবহারে কোনদিনই স্নেহপ্রদায়ী অনুভূতি হয়নি, আমি কিন্তু কিউ এর আচরণে কেন জানিনা আমার মায়ের হাতের কোমল স্পর্শ অনুভব করি। মা যেমন মাথায় হাত বুলিয়ে, গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতেন, কিউ এর আচরণে মাঝে মাঝে সে জাতিয় স্নেহানুভূতি আমায় স্পর্শ করে। হয়তো মানুষ মাত্রেই মায়ের স্নেহ কোন কালেই সম্পূর্ণ

বিস্মৃত হয়না। কিউ মাতৃপিতৃহীনা অনাথিনী। জন্ম সামাজিক পরিভাষায় অবৈধ। বাবা মায়ের পরিচয় অজ্ঞাত। সুন্দর শিক্ষিত পরিশীলিত পরিবেশে কৈশোর অতিবাহিত করেছে। যে কারণে জন্মের কলুষতা প্রভাবিত করেনি ওর মনের গড়ন। ওর চরিত্রে বিদ্যমান সুস্থ নারীত্বের কোমলতা সিক্ত ব্যঞ্জনা। যে কারণেই এই স্নিগ্ধ সকালে ওর কোমল তালুর স্পর্শে মিশে আছে নারীত্বের অপূর্ব সুষমা, স্নেহজর্জরিত অথচ প্রণয়ে সিক্ত। এই উষ্ণতার স্পর্শে এ বৃদ্ধ আজো সজীব। সজীবতা জীবনের লক্ষণ, সৃষ্টির রহস্য ও শক্তি। মৃতবৎ হৃদয় হতে উৎসরিত হয় গ্লানী। কিন্তু সুস্থ সজীব জন্ম দেয় সুন্দরের। একদা জীবন্মৃত বসন্ত কিউ নাম্নী প্রকৃত নারীর স্পর্শে নতুন জীবন, যা সৃষ্টি মুখরতায় তন্ময়। সেই নবীনা, তারুণ্যে চঞ্চলা, যৌবন রসে মদির, কিউ আমার সাথী। আমি সার্থক। সকালের মিঠে রোদ্দুরে, ওর চলার মাদক ছন্দে, মায়াবী মনের অনন্ত ঐশ্বর্যে আমি মুগ্ধ। বৃদ্ধ শরীরের যৌবন মনে তাই আনন্দ শিহরণ শরতের জ্যোৎস্নার প্লাবনের ন্যায় মায়াবিনী।

—দেখো বসন্ত—ঐ যে দূরে—ঐ পাহাড়টায় চূড়ায় সাদা সাদা কয়েকটা ঘর—

—আমি দেখতে পাচ্ছিনা—

—ঐ যে—ঐ ঐ দূরে—

—হ্যাঁ। এবার দেখেছি।

কিউ এর লম্বা হাত অনুসরণ করে দেখলাম, উত্তর পূর্ব কোণে একটা পাহাড়ের ওপর কয়েকটা ঘর সাদা রঙের।

—তা, কি হল? দেখা যাচ্ছে আবছা-আবছা।

—তোমার চোখের নজরও গেছে—চশমার পাওয়ার বদলাও।

—চোখের আর দোষ কি? বয়সটা কম হল?

—সে জন্যেই কি মাঝে মাঝে আমাকেও দেখতে পাওনা! আমি আছি তোমার পাশে, ঘরে থাকি তোমার পাশে বলতে গেলে দিন রাত্রি সব সময়—দেখে মনে হয় তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছোনা কিম্বা দেখেও না দেখার ভান্ করছো—

সত্যই আমি দেখতে পাইনা। দেখতে পাইনা রক্তে মাংসে গড়া একজন নারী। কামনা বাসনা সুখ-দুঃখ সমস্ত অনুভূতি নিয়ে একজন সম্পূর্ণ মানুষ। নইলে এই সকালেও কিউ এর তালুর উত্তপ্ততা অনুভব করতে আমি ব্যর্থ কেন?

কেনই বা কিউ এর তালুর উত্তাপ শুধুমাত্র আমার হাতের তালু ব্যতিত শরীরে সম্প্রসারিত হয়না! অথচ কিউ এর হাতুর তালুর উত্তাপ তার সমস্ত অবয়বের উত্তপ্ততা সঞ্জাত। বয়স-এ শরীর যেন মাঝে মাঝে কাষ্ঠ খণ্ডবৎ। কিউ এর কথায় আমি আমার অনুভূতির ব্যর্থতা কাটিয়ে কিউ এ ফিরে এলাম—

—কিউ, আমি তো চলে যাবো তোমার অনেক আগেই, সেদিনে—

—আমাকে নিয়ে সেদিনে তোমার ভাবনার ও মুক্তি হবে।

—তুমি বড় একা কিউ। সেজন্যেই আমার ভাবনা। রুচীর রোহিত আছে। তোমার যে কেউ নেই—মানস বড় স্বার্থপর, তোমাকে নির্বাসিত করে বেশ নিশ্চিন্তে এবং আরামে আছে।

—আবার ওদের কথা? বার বার বলেছি ওদের কথা আমায় বলবেনা। ওদের আমি

ভুলে গেছি। ওরা মৃত আমার কাছে। ওদের আমি ভুলে থাকতে চাই।

আমার কথায় উত্তেজিত হয়ে আমার হাত ছেরে কিউ ছিট্‌কে দূরে সড়ে যায়। বদলে গেছে ওর মুখের রঙ। লাল রঙের ওপর কালির আস্তরণ। না-আমার বলা ঠিক হয়নি। অনেক চেষ্টায় সেদিনের স্মৃতি চাপা পড়ে গেছে। ভুলে গেছে সেই বিষাদাচ্ছন্ন অধ্যায়। যে অধ্যায়ে কিউ আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। হঠাৎ কেন যে মানসদার কথা মনে আসে? বলে ফেলি?—সব জেনেও—দিলাম মাটি করে কিউ এর সুন্দর সকাল। সুন্দর মুড। ওর মুড খারাপ হলে—আমারও—

কিউ এর দৃষ্টি ওর নিজের পায়ের দিকে, যেন ওর পায়ের সামনে কিছু পড়ে আছে কোন কাঁটা গাছের ঝাড় বা পাথর টুকরো, নিচের দিকে চেয়ে সর্ন্তপণে পা রাখছে, যেন পায়ে আঘাত না লাগে, যদিও কিছুই নেই, পরিষ্কার পথ। আসলে কিউ মানসদার কথায় যে কষ্ট পেয়েছে, সে কষ্ট থেকে মন সংযত করে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে। চেষ্টা করছে অতিতের অন্ধকার থেকে বর্তমানের আনন্দ আলোয় নিজের উত্তরণ। মানসকা, মানবদার সাথে ঘটে যাওয়া বিষাদভরা কাহিনী সে ভুলে গেছে! নতুন করে বাঁচতে চায় কিউ।

—তুমি বলেছিলে নতুন করে পড়াশুনা শুরু করবে—এম এ পড়বে, তার কি হল?

—না না। আর কোন পড়াশুনা নয়। কি হবে পড়াশুনা করে! যার কোন ভবিষ্যৎ নেই, তার পড়াশুনা কোন কাজে লাগবে!

—কিউ লেখাপড়া সব সময় কাজে লাগে। মন ভাল রাখতে লেখাপড়ার মত বন্ধু আর কেউ নেই।

—হতে পারে। কিন্তু বেড়াতে এসে আমার মন যথেষ্ট ভাল আছে, নতুন করে অন্য কিছু ভাবছিনা।

—বেশ।

হাসিতে ঝলমল কিউ এর সাময়িক বিবর্ণ মন মুক্ত হৌক। আমার ইচ্ছা।

কিউ স্বাভাবিক হোক। আত্মনির্ভরশীল হোক, সাবলম্বি হোক। আমার খুশির জন্য কিউ বিসর্জিতা হোক আমি চাইনা। জীবন চিরস্থায়ী নয়। না আমার না কিউ এর। জীবন পথের শেষ প্রান্তে প্রায় পৌছে গেছি আমি। কিউ এর সামনে পড়ে আছে দীর্ঘপথ। একা এ পথে পাড়ি দেওয়া কঠিন। চায় স্থায়ী সাথী। স্থায়ী অবলম্বন—যা নিয়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। পড়াশুনা—একটা চাকরী সমাজের শ্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে চলা। স্বার্থপরের মত ওকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইনা।

না চায়লেও কিউ এর ভবিষ্যৎ আমার মনের আনন্দে বিঘ্ন ঘটায়। কিউ এর জীবনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে এ এক সংশয়, এ এক অভিজ্ঞতা। এই পাহাড়ে এই এ মনোরম পরিবেশে এই বাস্তবতা উপেক্ষণীয় নয়। বুদ্ধিমতি কিউ এর সচেতন হৃদয় আমার মনের ব্যকুলতা অনুভব করে। কিউ এগিয়ে এসে সজোরে আমার একটি হাত চেপে ধরে, সহাস্য মুখে আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকে। ব্যকুলতা মিশ্রিত আশ্রিতার প্রণয় মিশ্রিত আবেদন।

—আর কতক্ষণ হাঁটবে?

—কেন, ভাল লাগছে না? পা ব্যথা করছে? কোমড়ে?—বলবে তো। —চলো ফিরে যাই। যাবে? —না, ঐ পাথরটায় বসে জিড়িয়ে নেবে?—চলো, বসি। —নোংরা

নেই। - ধূলো নেই—

- বসতে হবে না।

- -বোসোই না। পরে ফিরবো।

কিউ আমায় পাথরের ওপরে বসায়। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা একটা পাথরখণ্ড। পা ঝুলিয়ে বসলাম। পাশে কিউ। চারপাশে কেউ নেই। জাগ্রত প্রকৃতির মাঝে কুমায়ুন পর্বতমালার একটি পাহাড়ের একখণ্ড প্রস্তর খণ্ডের ওপর একজন মানব একজন মানবি; কিউ এর গায়ে গা লাগিয়ে পাশাপাশি বসে। সামনে পাহাড় নিচের দিকে নেমে গেছে। নেমেছে ঘুড়ে ঘুড়ে পাকদণ্ডি। আবার পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উঠে গেছে অন্যপাহাড় শ্রেণী। কিছু সময় পর কিউ পথের কিনারার দিকে এগিয়ে যায়। আমি লক্ষ্য রাখি।

—বেশি ধারে যেওনা, ধসে যেতে পারে।

—ভয় নেই পড়বো না।

—পা দুটো দেখে ফেলো। নিচে চেয়ে দেখো কি মাড়াচ্ছো?

—কি?

—দেখোইনা? তোমার জুতোয় চাপা পড়ছে ছোট ছোট ফুলগুলো। মাদুরের মত লেপটে থাকা গাছে দেখো কত হাজারো ফুল ফুটে রয়েছে, দুলছে হাওয়ায়। তুমি ওদের মাড়িয়ে দিচ্ছো।

—ওঃ তাইতো! ভেরি সরি।

পিচ ঢাকা রাস্তার দুপাশে এক ফালি জমি রাস্তার পাশ ধরে আছে, সেখানে জন্মেছে নানান আগাছা, ঘাস, কাঁটা গাছ। গ্রীষ্মে ফুল ফুটেছে আগাছার ডালে ঘাসের ডগায় সাদা, বেগুনি, নীল-নানা রঙের। ঝির ঝির করে দুলছে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে হাওয়ায় ঢেউ তুলেছে ওদের বুকে। সামনে একটা গাছ ঢেকে গেছে সাদা ফুলে। লতানে গোলাপ গাছটার ডাল পাতা ঢেকে দিয়েছে, ভরে আছে সাদা গোলাপ, ভন্‌ভন্‌ করছে মৌমাছি, মিষ্টি গন্ধ নাকে আসছে হওয়ায় ভেসে। কখনো কখনো পাহাড়ের গায়ে এরকম অসংখ্য গোলাপ দেখা যায়। ব্রাশ ফুলে লালে লাল ব্রাশগাছ। এ অঞ্চলে ফুলের সৌন্দর্য সৌরভ অপার, কেউ যদি এই পাহাড়কে এ সময়ে ফুলের পাহাড় হিসাবে আখ্যা দেয়-মিথ্যা বলা হবে না। ফুল বাঁচিয়ে কিউ ফিরে আসে, বসে পড়ে আমার পাশে। নির্বাক চোখে আমরা দুজনে সৌন্দর্য্যের অপরূপ রূপ দেখি বিস্ময়ে। আমি কথা বলি না। কিউ বলে না। কথা বলে নিজের মনে অপরূপা প্রকৃতি নির্বাক, সে কথা আমি শুনি, কিউ শোনে। দুজনে দুজনের নিজ মনে সুন্দরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভুলে যায় সময়। এ সুযোগ জীবনে কমই আসে।

বদ অভ্যাস মাথা চাড়া দেয়। পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরে, কিউ ফস্‌ করে কাঠি জ্বালায়, হাওয়ায় নিভে যায়, আবার ধরায়, আমি দুহাতে বাতাস আড়াল করে সিগ্রেট জ্বালিয়ে টান দিই। কিউ তৃপ্ত। ছোট বড় আমার যে কোন কাজ করার মধ্যে দিয়ে কিউ সুখ পায়, তৃপ্ত হয়। সিগ্রেট জ্বালানোর পর তৃপ্ত হাসি ওর মুখে। আমিও সমান তৃপ্ত হই কিউ যখন আমার যেকোন কাজে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়া অভ্যাসে পরিণত এবং একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতায় যেন নিয়ম এবং পূর্ণতা। সংসার নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ছারা পূর্ণতা পায়না—একথা তো সত্য এবং

শতঃসিদ্ধ।

এই সেই কিউ। নারীত্বের পূর্ণ ডালা সাজিয়ে বসে আছে। একে একে আশা আকাঙ্খার অসংখ্য ফুল দিয়ে গাঁথা মালা ওর ডালিতে, বসে আছে আমার পাশে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রথম শুনি, সেদিনের কথা। আগেই বলেছি নির্জনে মন বড় সক্রিয় হয়। মনের মধ্যে চলতে থাকে অসংখ্য প্রক্রিয়া। তারই একটি কিউ নিয়ে। আমাদের বাড়িতে লাবণীকে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব আসে। আশ্চর্য্যজনক সে প্রস্তাবে রুচী এবং আমি উভয়েই হতচকিত হই। তবুও প্রত্যাখ্যান না করে সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয় মানবিকতার খাতিরে। মানসদা কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। আমাদের বাড়িতে মানসদার, বৌদির যাতায়াত আছে। আছে তাদের ছেলেমেয়েদের—মানব-লাবণীর। সেদিন সন্ধ্যার পর, বৌদি ও মানসদা এসে বসে আছে আমাদের বসার ঘরে সোফায়। রুচী আছে, আমি আছি। নানান টুকিটাকি কথাবার্তা—দেশের হালহকিকৎ, খেলাধূলা, গায়ক গায়িকা, কলকাতার পরিবেশ ইত্যাদি। অন্যদিনের মত সহজ না হলেও কথাবার্তা চলছে। যদিও মানসদার কথা বার্তার মধ্যে স্বাভাবিকতা ছিলনা। চিন্তাক্লিষ্ট অনেকটা আড়ষ্ট ভাব। জানিনা বা অনুমান করতে পারছিনা বা করার চেষ্টাও করিনি। মানব, মানসদার ছেলে যাদবপুর ক্যাম্পাসে সিলেক্ট হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হয়েছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের জন্য অপেক্ষা করছে। লাবণীর অনার্সের পরীক্ষা হয়ে গেছে। ছোট মেয়ে স্কুলে। মানদা মাসি, যিনি প্রকৃত অর্থে আমাদের ফ্ল্যাটের কর্ত্রী, চা দিয়েছে, সাথে স্ন্যাক্‌স।

—বৌদি তোমার কষ্টের দিন শেষ হল বলো—এবার ছেলে চাকরী করতে চলে যাবে, মেয়ের বিয়ে দেবে—একদম নিশ্চিন্ত। তোমার ছেলে মেয়েরা হিরের টুকরো—

—রোহিত?

—রোহিত ও ভাল ছেলে। ওতো রুচীর ছেলে—

—বাইরে থেকে দেখে বা ওপর ওপর দেখে, সকলকে সুখী মনে হয়।

মানসদা ধীরে সুস্থে উত্তর দেয়।

—সেটা ঠিক। তবে তোমাদের ভেতরে বাইরে, সব জায়গায় সুখ। তোমার যাযাবরের জীবন শেষ হয়েছে। শেষ জীবনটা অন্ততঃ কোথাও ছোটাছুটি না করে কলকাতায়, এক জায়গায় বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পাববে।

—সেটা ঠিক, তবুও—বড় বিপদে পড়েছি বসন্ত। সেই কারণেই বিশেষ করে আজ তোমাদের কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি।

গম্ভীর গলায় মানসদা বলে। মুখের দিকে দেখলাম, অনুমানে বুঝলাম—মানসদা কিছু বলার জন্য নিজের মধ্যে লড়াই করছে, বলবে কি বলবে না, বলে ফল হবে কি হবেনা—এ জাতিয়, বৌদিও রুচী তখন অন্য কথায় মগ্ন।

—হঠাৎ কি হল? সিরিয়াস্?

—একটা বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে। সেজন্যেই চিন্তা হচ্ছে। যেটা তোমাদের সাথে আলোচনা করার জন্যই বিশেষ করে আজ এসেছি। নইলে দেরি হয়ে যাবে—

রুচী ও বৌদি নিজেদের কথা থামিয়ে গম্ভির হয়ে আমাদের কথায় মনযোগী হয়। মানবদার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

—মানবকে নিয়ে মহা চিন্তায় পড়েছি। বয়স কম—

—কেন? মানবের কলেজে কোনো গণ্ডগোল? রাজনীতি? আজকাল কলেজে

কলেজে গণ্ডগোল লেগেই আছে। ছাত্ররা রাজনীতির দাবার গুটি হয়ে গেছে—মারামারি-খুনোখুনি বাজে ব্যাপার।

—না-না। সে চিন্তা নেই। মানব রাজনীতি করেনা। রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা নেই। চাকরী হয়ে যাবে। যদিও বাইরে। কলকাতার কাছে পিঠে হলে ভাল হতো। তবে এখন মনে হচ্ছে বাইরে হয়ে একদিক থেকে ভাল হয়েছে, মঙ্গল হয়েছে।

—তবে?

—বিপদটা হচ্ছে ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে। আমরা যে সমাজে বাস করি, যে রকম পারিবারিক পরিবেশে আমাদের জীবন, সেখানে মানব ও লাবণীর—

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, আমাদের অনুমান মানব ও লাবণী—ওরা একে অপরকে ভীষণ চায়। এমন কি মানব ওকে বিয়ে করার জন্য—

—যাঃ এটা অসম্ভব।

বৌদিকে দেখে মনে হল, মানস যা বলছে সঠিক।

—যাঃ অসম্ভব। এটা হতে পারেনা। তোমরা ওদের ভুল বুঝছো।

রুচী জোর দিয়ে বলে।

—এতদিন আমিও তাই ভেবে এসেছি। শ্রাবণী বললেও বিশ্বাস করতাম না। দিনের পর দিন ওরা গল্প করেছে, হেসেছে খেলেছে, ভাই বোন অনেক সময় বন্ধুর মত ঠাট্টা ইয়ার্কি করে, ওরা করেছে। কিন্তু ইদানীং ওদের ঘনিষ্ঠতা, ওদের আচরণ ভাই বোনের মত নয়—বিশ্বাস না হয়, বৌদিকে জিজ্ঞাসা করো। আসলে বয়সটা ভাল নয়-না?

—তাই হয় নাকি? ওরা ভাইবোনের মত পিঠে পিঠে মানুষ হয়েছে।

—মানসদা, তুমি চিন্তা করোনা। ওর বড় হয়েছে, ওদের বুদ্ধি হয়েছে। ওরা চিন্তা ভাবনা না করে কিছু করবে না।

মানসদা ঘাড় নাড়ে। বৌদি আশ্বস্ত নয়। রুচী চিন্তা করছে। আমি মানব ও লাবণী কে মনে মনে দেখতে পাচ্ছি। দুদিন পরে মানব চলে যাবে। তারপর লাবণী। দুজনে দুজনের কাছে থেকে দূরে সরে যাবে। ঘনিষ্ঠতার সুযোগ না থাকলে, যদিও কোন নিকট সম্পর্ক ওদের মধ্যে গড়ে উঠে থাকে, ধীরে ধীরে সে সম্পর্ক হালকা হয়ে যাবে। অল্প বয়সের আবেগ দুদিনের। কিন্তু আমি সেদিন ভুল ভেবেছিলাম। সেদিনের লাবণী আর আজকের কিউ, যৌবনের প্রথম লগ্নে মানবের সাথে প্রণয়াবদ্ধ হয়েছিল, তার শৃঙ্খল ভঙ্গুর ছিল না। যা আজো বিদ্যামান। হয়তো সময়ের ধূলি ধূসরতায় চাপা আছে। কিন্তু সে সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্যতা বিদ্যমান আজো। লাবণী সুন্দরী, অপরূপা, সেদিনের লাবণী তাবড় তাবড় ঋষিদের ও ধ্যান ভাঙাতে পারতো অনায়াসে। আমি তো লাবণীকে দেখেছি যেন অপ্সরা। আজো তাই। বয়স আকর্ষণ হরণ করেছে, ঠিকই তবুও শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যে লাবণী আজো উজ্বল—তীব্র নয়, স্নিগ্ধ।

মুখ থেকে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে দিচ্ছি, চক্রাকারে ঘুরে, মিলিয়ে যাচ্ছে। লাবণী আমার একটা হাত দুহাতে ধারে বসে আছে। আমার মনে চিন্তার চক্র মিলিয়ে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু মানসদার চিন্তাক্লিষ্ট সমস্যাসঙ্কুল চেহারা আজো মনে আছে। মানবের কথা ভাবি। শুনেছি প্রচণ্ড অসুখী সে। মানসদা তীব্র মনোকষ্টে আছে। বৌদি অসুস্থ। কিউ আপাততঃ শান্ত। সুখী নিশ্চয় নয়। আমি তৃপ্ত।

—কটা বাজে? ঘড়ি দেখো। খিদে পায়নি।

কিউ আমার ঘড়ি সমেত হাত চোখের সামনে তুলে ধরে। সময় দেখে। দুটি ঠোঁট হাতে স্পর্শ করে। আমি দেখি কিউ এর চোখের হাসি। স্পর্শ পাই ওর উষ্ণ নিঃশ্বাসের কিউ তৃপ্ত। কিউ সুন্দর। আমার মনে বাজে আনন্দ লহর।

—চলো উঠি। তোমার খিদে পেয়েছে।

পাথর চেয়ার ত্যাগ করি দুজনে। কিউ আমার হাত ধরে। মনের তালে চলার তাল মিলিয়ে লজে ফিরি।

তৃতীয় অধ্যায়

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
ধন্য হল অঙ্গ মম পূণ্য হল অন্তর—
সুন্দর হে সুন্দর—

গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে লজে ফেরে কিউটি। সাথে আমি মাঝে মাঝে জোরে তবে গলা ছেড়ে নয়। মিষ্টি সুর—রবীন্দ্রনাথের গান কিউটির গলায় সুন্দর হয়ে ধ্বনিত হয়। তাল আছে সুর আছে, কথা অনবদ্য। ওর গানের সুর আমার মনের তন্ত্রিতে অনুরণিত হয়। মনে ছন্দ জাগে। বাঁচার আনন্দ বর্দ্ধন হয়। পুলকিত হয় এ সকাল। জীবন বড় বিচিত্র। বাবা কাশ্মিরী মুসলমান, যৌবনে দেহজ কামনায় নেপালি মায়ের গর্ভে জন্ম। মানসদার কাছ থেকে শুনেছি, পিতামাতার অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত সন্তান। পালিত হয়েছে পুরাতন সংস্কারে আচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে। তার গলায় মিঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনে হৃদয় তৃপ্ত হয়। মানস আমার দাদা কাম বন্ধু। মানসদার কাছ থেকে শোনা। কিউ এর তখন তিন মাস বয়স। তিন মাস বয়স থেকে বড় হয়েছে মানস দত্ত পরিবারে। মানস বাবা, শ্রাবণী বৌদি মা আর মানব ওর দাদা দা-দা-দা-থেকে দাদা, পরবর্তীকালে মানবদা। মানবকে লাবণী কোনদিনই মানব বা মানু বলে ডাকেনি। হয়তো নাম ধরে কোন কালে ডাকতোও না।

মন ভাল হয়ে গেছে কিউয়ের সাময়িক ছন্দপতন থেকে মুক্ত হয়ে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এসেছে। মুক্তির আনন্দে উত্তাল, সুন্দরের সঙ্গ কামনায় ব্যাকুলিতপ্রাণ। গলা নয় হৃদয় থেকে নিঃসৃত হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে দিয়ে সেই সুর সেই বাণী। সুন্দর প্রকৃতি ওর হৃদয়ে সৃষ্টি করেছে সুন্দরের কামনা, সুন্দরের আবাহনে প্রকৃতই প্রস্তুত কিউ। মনে মনে কামনা করি ওর আবাহন পূর্ণ হোক!

আমরা ফিরেছি। লজে। ইতিমধ্যে দিগ্‌বাহাদুর ঘর দোর, বাসন পত্তর বাগান পরিষ্কার করে আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। নিশ্চয় ওর খিদে পেয়েছে, আমার না হয় খিদে হয়না। দিগের তো হয়। পরিশ্রম করে দিগ্। অবশ্য ওদের খিদে, খাবারের সঞ্চয় বা সামর্থ্য অনুসারে হয় বা হয়না। এখন আমরা আছি। আমরা খেলে দিগ্ খেতে পায়। খিদে হয়। আমরা না খেলে দিগের খিদে পাবে কেন! কিউটি ঘরে ঢুকেই, দিগ্‌কে ডেকে পরোটা বানানোর নির্দেশ দেয়। আলুর বা কবি পরোটা নয় স্রেফ প্লেন পরোটা, আলুভাজা পরে দার্জিলিং চায়। দিগ্ বাহাদুর কিচেনে ঢোকে। ইতিমধ্যে দিগ্ বাহাদুরের ছেলে স্কুলে গেছে। ওর বৌ গেছে ঠিকেদারের কাজে। ওর কুঠুরির সামনে যে গাই গরুটি বাঁধা আছে, তাকে ঘাস দেওয়া হয়েছে খেতে। এই গরুটি নিজের হাতে মানুষ

করে বড় করেছে, দুবার বাছুর হয়েছে। দেশি গরু, বেশি দুধ দেয়না। তবুও দিগ্ নিজে হাতে গরুটির যত্ন করে। গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা থেকে আরামের জন্য গায়ে বস্তা জড়িয়ে দেয়।

কিউ টয়লেট থেকে বের হয়ে, গায়েব গরম জামা কিছুটা লাঘব ঘটিয়ে কিচেনে দিগের পাশে। গুনগুন করে গলা দিয়ে এখনো বাজছে ঠাকুরের গানের সুর। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি কিউটির সংগ্রহে যোগ হচ্ছে ঠাকুরের বই গানের, কবিতার প্রবন্ধের। মাঝে মাঝে ক্যাসেটে রবীন্দ্রসংগীত শুনি। গলা মিশিয়ে কিউ ও শেখার চেষ্টা করে। কবিতা পড়ে। পড়ুক। গান শুনুক। নিরস কম্পিউটার নিয়ে আমার কাজ নিয়ে কতক্ষণ ব্যস্ত থাকা যায়? সাময়িক বিরতি বা বিষয়বস্তু পরিবর্তন দরকার। একে তো বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। ময়দানে পার্কে বা যাদুঘরে কোথাও যায়না। হলে সিনেমা দেখা পছন্দ করেনা। হয়তো একাকিত্ব এর একটা কারণ হতে পারে। কোন মানুষই একা একা সিনেমা হলে, ক্লাবে, ময়দানে ঘুরতে পারেনা। তার ওপর কিউ এর মত মেয়ের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। আমি সঙ্গ দিতে পারিনা।

—কিউ, তুমি গান শিখতে পারো।

নিরুত্তর। আমার কথা শুনেছে। আমি গান শেখার প্রস্তাব দেবার সাথে সাথে কিউ ঘুরে আমাকে দেখে। উত্তর দেয়না। গলায় গুন গুন শব্দের যতি নেই। যেন তুমি যা বলো তাই বলো, আমার কি! আমি আছি আমার মত-আমার মনের সুখে; তোমার বলায় আমার কিছু যায় আসে না। আমি দ্বিরুক্তি করিনা। বাধা দিইনা। আমার নিজেরও শুনতে ভাল লাগছে। টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারে বসি। টেবিলের ওপর রাখা রয়েছে একটা ফাইল। নিষেধ করেছিলাম তবুও নিয়ে এসেছে কিউ। আমার কাজের ফাইল। ভ্রমণকালে যদি নতুন কোন তথ্যের সন্ধান পাই, যাতে নোট করে রাখতে পারি। অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ কোন ঘটনা। যেমন কুমায়ুন পাহাড়ে বসবাসকারী কুমায়ুনীদের জীবন যাত্রা আর তাদের সন্তান সন্ততিদের ওপর তার প্রভাব। নিজের চোখে দেখছি এখানকার শিশু ও তার মায়েদের রুগ্ন চেহারা। নিশ্চয় বলে দিতে হবেনা যে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এর জন্য প্রধানতঃ দায়ি। বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জীবনধারা, অসম আর্থিক অবস্থা, অসম শিক্ষা, অসম সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থান। মানসিক গঠনের মধ্যেও আছে বিস্তর ব্যবধান, খুব স্বাভাবিক। জীবন ও জীবিকার ওপর মানসিক গঠন নির্ভর করে। এর ওপর আছে বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কার যা জীবনধারনে প্রভাব বিস্তার করে। শিশু মৃত্যু, সুস্থ শিশুর জন্ম এবং সুস্থ নাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার প্রভাব বিস্তর। নারীকে সম্মান করা, মাতৃসম্ভবা নারীব প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, চিকিৎসকের পরামর্শ ইত্যাদি শিশুজন্মের পূর্বে এবং পরে শিশুজননীকে বিশেষ মর্যাদা দান একজন সুস্থ শিশুর জন্ম এবং সুস্থ নাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরী। এসব তথ্য সংগ্রহ করা, বিশ্লেষণ সহকারে পরিবেশন করা আমার কাজের অঙ্গ। এজন্য আমাকে সাহায্য নিতে হয় পরিচিত বন্ধুবর্গ যারা কেন্দ্রীয় সরকারে কিম্বা রাজ্যসরকারের মন্ত্রালয় সমূহে প্রত্যক্ষভাবে কাজে নিযুক্ত, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা যারা মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে কাজ করে, চিকিৎসা গবেষণা সংস্থা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা সমূহ ইত্যাদি এখানে আসার আগে পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আমার নির্দেশে চিঠি পাঠিয়ে

এসেছে। ফিরে গিয়ে লেখাটা তৈরি করে পাঠাতে হবে ইংল্যাণ্ডের এক প্রখ্যাত সংস্থার জার্নালের জন্য। টেবিলে ফাইলটা রাখা আছে, একবার খুলেই বন্ধ করেদিলাম। ইচ্ছা করছে না।

বর্তমান পরিবেশে আমার মন অন্য সুরে বাধা। অবসর যাপন, সম্পূর্ণ নিজেকে নিয়ে আর আমার একান্ত আপনার কিউকে নিয়ে। কিউ মনের আনন্দে সুর ঝরাচ্ছে আর সে সুরের মুর্চ্ছনায় আমার পূর্ণ হৃদয়ে অন্য কিছুর আপাতত স্থান নেই। চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম। আলু-পেঁয়াজ ভাজা হয়েছে, গন্ধ পেয়েছি, নাকে পরোটার গন্ধও আসতে লেগেছে—অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট রেডি। একটা তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে কিউ এসে বসলো আমার সামনে, চোখ খুলে দেখলাম তৃপ্ত কিউ এর চেহারা। কিছু সময়ের মধ্যে দিগ্ বাহাদুর টেবিলে রাখে ঝক্‌ঝকে চিনেমাটির প্লেট। প্লেটে গরম পরোটা আর আলু পেঁয়াজ ভাজা। দক্ষিণের সূর্য জানালা দিয়ে এক ঝলক আলো পাঠিয়েছে পরোটার প্লেটে এবং বিউটির গায়ে মাথায়। আলু ভাজার সবুজ রঙের কাঁচা লঙ্কা ভাজা কিউ দাঁত দিয়ে কাটছে। পরোটা ছিড়ে ক্ষুধার্ত কিউ দুটি ঠোঁট ফাঁক করে দুপাটি দাঁত মুক্ত করে মুখে দিচ্ছে, খাচ্ছে, পরোটায় তেল, আলু ভাজার তেলে ভেজা কিউ এর সরু লম্বা লাল আঙুল, এক জোড়া নরম ঠোঁট। খাওয়া দেখে যে কেউ বলবে একজন ক্ষুধায় কাতর কিশোরি খাচ্ছে অত্যন্ত স্বভাবচঞ্চলা দ্রুততায়। কিউ কিশোরী নয়। কিউ যুবতি-সদ্য যুবতি নয়। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়স হবে কিউ এর। মনে মনে হিসাব করে দেখলাম, মানসদা রিটায়ার করেছে পাঁচ-ছয়বছর হবে। মানসদার চাকরীর কয়েক বছর পরে এক্‌জিকিউটিভ হিসাবে কাশ্মীরে। মানসদার ছেলে মানব হাঁটতে শিখেছে অর্থাৎ দুবছর বা তিন বছর বয়স। তার কিছুদিন পর কিউ এর জন্ম। মানবের কলকাতায় জন্ম হয়। তখন সল্টলেকের বাড়ি হয়নি। বিয়ের পরের বছর মানসদা বৌদিকে দিল্লী নিয়ে যায়। দিল্লীতে থাকা অবস্থায় মানসদার প্রমোশন হয়। মানসদা সন্তানসম্ভবা বৌদিকে ওর বাবার বাড়ি উত্তর পাড়ায় রেখে যায়। মানব জন্মানোর পর মানসদা ছেলেকে দেখতে এলে, আমিও বৌদি আর তার ছেলেকে দেখতে যাই উত্তরপাড়ায়। রুচীর সাথে আমার বিয়ে হয়েছে, তখনো রোহিত জন্মায়নি। বৌদির পাশে কয়েকদিনের শিশু মানব, বৌদির মুখে স্বস্তির হাসি আর মানসদার চোখে মুখে খুশির। বৌদিকে কন্‌গ্রাচ্যুলেট জানাই, ভীষণ ভালবাসতো বৌদি। একাধিকবার যেতে হয়েছে উত্তরপাড়ায় মানসদার বিয়ের আগে ও পরে। মানসদার শশুরমশায় অধ্যাপক ছিলেন। বনেদি বংশ। পুরানো বাড়ি। উত্তরপাড়া শহরের পূর্ব দিকে জিটি রোড, জিটি রোডের ধারে প্রশস্ত গঙ্গা। সকালের সূর্য গঙ্গার জলে ছোট ছোট ঢেউ এর মাথায় পড়ে ঝিক্‌মিক্ করতো। জেলেরা নৌকায় করে জাল ফেলে মাছ ধরতো। গঙ্গা এপার ওপার করার জন্য ছিল ভট্‌ভটি চালিত নৌকা। ডানদিকে দেখা যেতো দক্ষিণেশ্বরের ব্রিজ। মানসদার শ্বশুর বাড়ির বারান্দায় বসে সবকিছু দেখা যেতো। দোতালা বাড়ি। নিচে রাস্তার ধারে ঘরের বাইরে ছিল লম্বা রক-সন্ধ্যার সময় স্থানীয় বৃদ্ধরা এসে রকে বসতেন, গল্প করতেন—তাদের কারোর হাতে লাঠি থাকতো। উত্তর পাড়ায় বৌদির কাছে আমি যেতাম মানসদার বিয়ের পরে পরেই। তখনো মানসদার দিল্লীতে ফ্ল্যাট ঠিক হয়নি, স্বাভাবিক ভাবে বিয়ের পর বেশ কিছুদিন বৌদি কলকাতায় বৌবাজারের বাসায় থাকতো, মাঝে মাঝে মায়ের কাছে উত্তর পাড়ায়। বৌদির আহ্বানে আমি না বলতে পারতাম না। যেতাম, দুচার ঘণ্টা থেকে

ফিরতাম, দু একবার রাত্রি যাপন ও করতে হয়েছে। সেই মানসদা, সেই বৌদি যাদের সাথে আমার এত মধুর সম্পর্ক ছিল—সে সম্পর্কের কণামাত্রও আজ অবশিষ্ট নেই। সল্টলেকে নিজের ফ্ল্যাটে আছে প্রচণ্ড মনোকষ্ট, বৌদির শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ। ছেলে মানব, বাঙ্গালোরে, সেই গেছে বহু বছর পার হয়ে গেল বাড়ি ফেরেনা। মানসদার জোর করে বিয়ে দেওয়া বৌ নিয়ে বাঙ্গালোরে থাকে, ওদের মধ্যে শুনেছি সম্পর্ক ভাল নয়। ওদের ও ছেলে হয়েছে, নাম রেখেছে মনসিজ্। খবর পাই এই মাত্র।

দরজার খুট খাট আওয়াজ শুনে দরজা খোলে দিগ্ বাহাদুর। রোজ সকালে বাসষ্টেশন থেকে স্থানীয় একজন লোক—নিজের বাড়ির জন্য প্যাকেটের দুধ নিয়ে আসার সময় খবরের কাগজটা এনে দেয়। ব্যবস্থা করেছে দিগ্ বাহাদুর। দরকার হলে আমার সিগ্রেট এনে দেয়। এখানে কাগজ দশটার আগে আসেনা—শহর থেকে কাগজ আসে। বাসের কণ্ডাক্টার এনে দেয় ব্যবস্থা করা আছে। কাগজ টেবিলে রেখে দিগ্ যায় নিজের কাজে।

আমি চায়ে চুমুক দিই। কাগজে চোখ রাখি। কিউ চা শেষ করেছে। একটা পাতা নিয়ে টেবিল ত্যাগ করে ঘরে যায় ওর বেড়ে।

—কি হল, অবেলায় বিছানায় কেন?

—খাওয়ার পর শুতে হয়-তাই।

—ব্রেকফাস্টের পর?

—খাওয়া তো!

—বেশ। ঘুমোবেনা। লাঞ্চে কি খাবে, দিগ্ বাহাদুরকে বলে দিও।

—এই তো সবে একপ্রস্থ খাওয়া হল। লাঞ্চের অনেক দেরি। লাঞ্চে কি হবে না হবে আমি বুঝবো দিগ্‌কে বলে দাও। তোমার ফার্স্ট পেজ পড়া হয়ে গেলে, আমায় দেবে।

চা খেতে খেতে কাগজ পড়ি। লেবার পার্টি জিতেছে। নতুন প্রধানমন্ত্রি হিসাবে শপথ নেবে ব্লেয়ার। বিভিন্ন দেশ থেকে রাষ্ট্র নেতারা অভিনন্দন বার্তা পাঠাচ্ছে। ব্লেয়ারের পাশে তার স্ত্রী, হাত তুলে ব্রিটেনবাসীর অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। ভারতবর্ষে লোকসভায় বিরোধীপক্ষের বয়কট এখনো চলছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় লোকসভার কাজের জন্য। জনগণের প্রতিনিধি, অধিকার আছে জনগণের টাকার অপচয় করার! বিগত সরকারে আমলে অস্ত্র কেনাবেচা নিয়ে দূর্নীতি হয়েছে, তা নিয়ে সরকার পক্ষ ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে—তদন্ত হবে কিনা। মহিলাদের জন্য দিল্লী নিরাপদ নয়—এই জাতিয় সব খবর। সময় রয়েছে হাতে, সে কারণে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলাম। দূর্নীতি ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। জাতীয় জীবন নষ্ট হচ্ছে। সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে দূর্ণীতি বড় বাধা। এক সময় ঘুষ-দূর্নীতি ইত্যাদি বিসয়গুলো আলোচনা হতো কখনো সখনো, দুএকজনের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন কাগজে টিভিতে বাজারে, বাস ট্রামে এমন কি খেলার মাঠেও দূর্নীতি, বহুল আলোচিত। খেলাধূলার মাধ্যমে চরিত্র গঠন হয়। শোনা যাচ্ছে খেলোয়াররাও দূর্নীতিমুক্ত নয়। ঘুষের বিনিময়ে তার বিপক্ষ দলকে জিতিয়ে দেয়, হার-জিত নিয়ে জুয়া খেলা হয়। খেলা আজ পণ্য হিসাবে গন্য হচ্ছে। টাকার বিনিময়ে খেলোয়াররা বছর ভর খেলছে। বড় বড় সংস্থাগুলো খেলোয়ারদের বিজ্ঞাপনের মডেল হিসাবে ব্যবহার করছে, খেলার জন্য টাকা যোগাচ্ছে। ভোগবাদ মানুষের পুরানো ধ্যান ধারণা একদম বদলে দিচ্ছে।

ঘরের জানালা বন্ধ। কাচের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। সামনের ওক গাছের পাতাগুলো মৃদু দুলছে। উঠলাম। ফাঁকা ব্যালকুনিতে দাঁড়ালাম উত্তরে হাওয়ায় মৃদু আন্দোলিত গাছের ডাল পাতা। দূর থেকে শন্ শন্ আওয়াজ ভেসে আসছে-পাইন কিম্বা দেওদার হবে। বাঁশিতে ফুঁ দিলে শব্দ বেড়োয়, উত্তরে হাওয়া ঐ গাছগুলোতে শব্দ তোলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শন্ শন্। কিউ বিছানা ছেড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। গায়ে চাদর জড়ানো। ভাবলেশহীন চেহারা।

—একটা টিভি থাকলে ভাল হতো, ছবি দেখে, গান শুনে কিছুটা সময় কেটে যেতো।

—কেন? সময় কাটছেনা? এখন বাজে প্রায় সাড়ে এগারোটা। সকাল থেকে এতটা বেলা কখন কিভাবে হলো, আমি টের পেলাম না।

—তোমার কথা আলাদা। তুমি টিভি দেখো? না গান শোনো? যতদিন এসেছি, দেখছি—দেশের চিন্তা. মানুষের দুরবস্থা, শিশু মৃত্যু, মায়ের রুগ্নশরীর ইত্যাদি করতে করতে তোমার সময় শেষ হয়ে যায়, বলতে গেলে জীবনের শেষ পর্য্যায়ে পৌঁছে গেলে, টিভি, গান, সিনেমা এসবের স্বাদ বুঝবে কি করে! কোলকাতায় তোমার লেখা, তোমার কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে টিভি দেখতাম, গান শুনতাম, নিজের, মাঝে মাঝে তোমার ও আমার খাবার তৈরি করতাম। সময় কেটে যেতো এখানে, বেকার হয়ে গেছি, কোন কাজ নেই। সময় কাটতে চায়না।

—কাজের মানুষ তুমি। যাও পাহাড়ে ঘুরে এসো। ছাগল চরিয়ে এসো। ফলের বাগান পরিষ্কার করে এসো। কোন কাজ না থাকলে, ছাগল বুড়ির সাথে গল্প করে এসো, এদের জীবন যাত্রার পরিচয় পাবে, নাহলে ঐ যে ঐ ভদ্রমহিলা, দেখো ছাতে বসে ফসল ঝাড়ছে বা নিচের কল থেকে মাথায় করে খাবার জল সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে— ওদের সাথে কথা বলে এসো।

—লোকে পাগল বলবে।

—মোটেই না। ওরা কেউ পাগল না যে তোমাকে পাগল বলবে। বরং তোমার সাথে কথা বলে ওরা খুশি হবে।

—প্রস্তাবটা খারাপ না। দেখি, এবার সেই চেষ্টা করব, ওদের সাথে ভাব জমাতে হবে। তবে এখন না, আজ বিকাল থেকে ট্রায়াল হবে।

—আপাততঃ ঐ কাগজের পাতা দেখো। মনোরঞ্জনের কোন উপকরণ পাও কিনা।

—বাজে। একদম বাজে। সিনেমার নায়ক-নায়িকা, পাত্র-পাত্রীর চুটকি বা মুখরোচক খবর। সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক, অসহ্য। ওগুলোর দিকে আমার কোন কালে আগ্রহ নেই।

—তবে?

—বরং তুমি এই খবরটা পড়ো, তোমার কাজে লাগবে। মধ্যপ্রদেশে হাসপাতালে একজন সন্তান প্রসবা মহিলার মৃতুকে নিয়ে বিধানসভা সরগরম। হাসপাতালের গাফিলতি না দারীদ্র জনিত কারণে মৃত্যু—বিরোধী পক্ষ সোচ্চার। একজন অচ্ছুৎ আদিবাসি মহিলা। গ্রামের শেষপ্রান্তে থাকে। এটি তার সপ্তম সন্তান। স্বামী অর্দ্ধবেকার। বছরের বেশি সময় অর্দ্ধাহারে থাকে। অতএব এ মৃত্যুতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই।

—এ তো জানা খবর। বরং তোমাকে যেভাবে বললাম এখানকার জীবন যাত্রা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নাও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবে।

—-চেষ্টা করবো।

দুজনে যে যার মত কাগজে মন দিই। সব খবর পড়ি। এমন কি বিজ্ঞাপন গুলো। সকালটা কাগজ পড়ে কেটে যায়। বিকালেও তাই। রাস্তায় পদচারণা করি। ব্যালকুনিতে কিউ কে পাশে নিয়ে বসে থাকি, গল্প করি, গাছ দেখি, পাখী দেখি। সূর্য ডুবলে কাগজ পড়া যায়না লো ভোল্টেজ এই এরিয়াটায়। বাল্ব জ্বলে টিম্‌টিম্‌ করে. অনেক সময় পাওয়ার থাকে না। প্রায় অন্ধকারে বসে থাকি কিউটির পাশে, কখনো খাটে, কখনো টেবিলে গায়ে গা লাগিয়ে, হাতে হাত রেখে সময় কেটে যায় নানান্ কথায়।

দিগ্ বাহাদুর এসে সামনে দাঁড়ায়, একবার কিউটিক একবার আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি। অর্থাৎ জানতে চায়—এবার কি রান্না হবে?—কখন রান্না শুরু করবে?

—আগে গরম চা খাওয়াও তো দিগ্‌—-

—-জী।

কিচেনে গ্যাস জ্বেলে চায়ের জল চাপায়। কিউ উঠে যায় কিচেনে। কিচেনের সবজির স্টক দেখে বাহাদুরকে নির্দেশ দেবে। একদম গিন্নি! কিউটির চরিত্রে এই একটা বৈশিষ্ট। অন্ততঃ আমি ওকে যতদিন দেখছি। সেবা যত্ন করা। কলকাতায় যেমন দেখেছি-নিজে যত্ন করে রান্না করা, যত্ন করে খাওয়ানো, কোন খাবার পছন্দ, কি ধরণের রান্না পছন্দ, আমায় বলতে হয়না, কোনদিন বলিওনি। কিন্তু কিউ বোঝে, কিউ জানে। বাঙালী বধু বা মায়েদের চরিত্রে স্বভাবতঃ যে গুনগুলো থাকে, কিউ এর চরিত্রেও তাই বর্তেছে। একজন ভারতীয় নারী বিশেষ করে বাঙালী নারীর চরিত্রে যে বৈশিষ্টগুলো বিদ্যমান গুছিয়ে সংসার করা, পরিবারের প্রতিটি সদস্যপ্রতি যত্নবান হওয়া, তার প্রয়োজন পূরণ করা সেবা যত্ন করা—-এককথায় সেবা পরায়ণতা এবং নারীসুলভ কমনীয়তা কিউ যেন আপনা থেকেই অর্জন করেছে কিম্বা কিউকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। মানুষের চরিত্র গঠিত হয় দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এক জন্মসূত্র, দুই পরিবেশ। জন্মসূত্রে কিউ যাই হৌক, তার চরিত্রগঠনে শ্রাবণী বৌদির প্রভাব বড্ড বেশি। বৌদি এমনি স্নেহশীলা ছিলেন, নিজ হাতে সেবা যত্ন না করে যেন তৃপ্ত হতেন না। কিউ ও তাই। সব কিছু নিজের হাতে করবে। এখানে দিগ্ আছে, ওকে বলে দিলেই হয়; সে তৈরি করতে পারবে. কিন্তু কিউ নিজহাতে না করলে ওর সন্তুষ্টি হবেনা। রুচীর ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। রান্না বান্নার ব্যাপারে রুচীর কোনদিনই কোন উৎসাহ ছিলনা। প্রকৃতি ও পরিবেশ গঠন করে চবিত্র। যেমন এই পাহাড়ে ফোটা গোলাপ। গোলাপ সমতলে দেখেছি। কিন্তু এখানকার গোলাপ ফুল দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ি গোলাপ সত্য ফুটতে জানে! বিকশিত হতে জানে! সৌরভ বিস্তার করতে জানে! লাল-লাল গোলাপ ফোটে, নুয়ে পড়ে গাছের শাখা জায়গা হয়না যেন গাছের শাখায়—সংখ্যায় এরা এত বেশি। কিন্তু এই গোলাপ যদি বাংলা দেশের মাটিতে বসানো হয় টবেই হৌক কিম্বা বাগানে, ফুটবে কিন্তু কুমায়নের এই গ্রামে ফোটা গোলাপের মত বর্ণগন্ধ পাবেনা। পরিবেশ। তিন মাসের শিশু লাবণী বড় হয়েছে মানসদার সংসার। মানসদার, বৌদির কোলে পিঠে। বৌদির কাছ থেকে পেয়েছে বাঙালী নারীর নারীত্বের গুনাবলী। মানসদা তার ছেলে মানব, মেয়ে লাবণীকে নিয়ে বৌদির কল্পনা ও স্বপ্নের বিন্যাস। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ-আনন্দ-তৃপ্তি যেন বৌদির একমাত্র লক্ষ্য বা স্বপ্ন। রুচীর মত নয়—রুচীর চিন্তার মধ্যে বিস্তার আছে ব্যাপকতা আছে, নিজস্বতা আছে—বৌদির চিন্তার পরিধি সংক্ষিপ্ত

সংসার নামক বৃত্তকে কেন্দ্র করে তার সুখ বা সাধ, আর রুচীর সংসার নামক বৃত্তের বাইরেও তার বিচরণ ও সুখের তালাস। কিউ এর চিন্তা বা স্বপ্ন আঘাতে আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে স্বপ্ন থেকে নির্বাসিত হয়ে নির্ভরশীলতার মধ্যে অস্তিত্বের সন্ধান করে। কিম্বা আঁকড়ে থাকা অস্তিত্বের মধ্যে ভালবাসার চারা রোপণ করে স্নেহধারা সিঞ্চন করে। নাও হতে পারে। হয়তো এ আমার একান্ত বার্দ্ধক্যজনিত কল্পনা বিলাস।

—কি খাবে? ভাত, ডাল, আলুপটলের দম্ আর ডিমের কারী, হবে?

—বাহাদুর যা পারবে, করুক না।

—তোমার কাছে যা জানতে চাইছি, তার উত্তর দাওনা। বাহাদুর কে নিয়ে তোমার কি? তারজন্য আমি আছি।

—আমি বলে কি হবে, তোমার মন যা চায় করো। হল?

—আচ্ছা। দেখছি।

কিউ কিচেনে যায়। দিগ্ বাহাদুরের সাথে পরামর্শ করে নির্দেশ দিয়ে ফিরে এসে কাগজ নিয়ে বসে। আমি কাগজের অন্য পাতায় কালো কালো অক্ষরগুলোর মধ্যে চোখ রাখলাম। মন বসছেনা। মাঝে মাঝে মাথা তুলে কিউকে দেখছি। কিউ এর কাগজ পড়া অনেকটা আমারই মত। মন বসেনি! অন্য কোন বিষয়ে ওর মন ব্যস্ত বা চঞ্চল বলে মনে হয়।

মানব, মানসদার ছেলে। কিউটির অপেক্ষা বছর তিনেকেব বড়। একমাত্র ছেলে, ভাল ছেলে। যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ করে বাঙ্গালোরে ভাল চাকরী করছে। পাশ করার আগেই ক্যাম্পাসে সিলেক্ট হয়েছে। বাঙ্গালোর ছাড়াও কলকাতার সন্নিকটে হাইড রোডে একটা ইঞ্জিনিয়ারীং ফার্মে চাকরী হয়েছিল। কিন্তু বেদনাহত মন নিয়ে পরিচিত জগতের বাইরে পালিয়ে গেছে। অনেকটা বাবার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে ভাঙা মন নিয়ে কলকাতা থেকে দূরে বাঙ্গালোরে কাজের মধ্যে হারিয়ে যেতে চেয়েছে। সিরিয়াস প্রকৃতির ছেলে মানয। বাবা মার একান্ত অনুগত। স্থির চিত্ত। বাবার ইচ্ছায় নিজের অনিচ্ছায় বিয়ে করতে বাধ্য হয়ে সংসার পেতেছে। পাঁচ বছর হল তার ছেলে হয়েছে, দাদুর দেওয়া নাম মনসিজ। সুখে নেই মানব। বিয়ে করে সংসার করছে-নিষ্প্রাণ সংসার। স্ত্রীর সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন গড়ে ওঠেনি। বুদ্ধিমতি মানবের স্ত্রী, হিন্দু বাঙালী নারী, বাধ্য হয়ে দাম্পত্য জীবন যাপন করছে। লাবণীর সাথে মানবের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এতদিনেও মানবের মনে তা অম্লান রয়ে গেছে। যার ফলে তার সাংসারিক জীবন প্রচণ্ড দুঃখের।

পিঠে পিঠে মানুষ হয়েছে মানব ও লাবণী। তিন মাসের বাবা মায়ের পরিত্যাগ করা সন্তান বৌদি কোলে তুলে নিয়েছে সম্পূর্ণ মাতৃ স্নেহে। কোলে পিঠে করে বড় করেছে মানব লাবণীকে বোনের মত স্নেহে, দাদার মত ভালবাসায়। ভাই-বোন খেলেছে। আদর করেছে, ঝগড়া মারামারি করেছে। ভাই বোনে স্কুলে গেছে। বাবা মায়ের আদর পেয়েছে সমান ভাবে। মানসদা এবং বৌদি লাবণীকে পরের মেয়ের মত মানুষ করেনি। সুখের সংসারে সুখী ছেলে মেয়ে। দুজনেই ভাল পড়াশুনা করে। ইতিমধ্যে মানসদার ছোট মেয়ে জন্মেছে।

কিশোরী লাবণী, কৈশোরিক সোনালি স্বপ্ন নিয়ে বড় হচ্ছে। মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হচ্ছে। মানসিক পরিণতি হতে শুরু করেছে, নারীত্বে উপনিত হতে লেগেছে।

সেই সময়ই অকস্মাৎ ছন্দ পতন। হঠাৎ বজ্রপাতে হারিয়ে গেল তার আশৈশব লালিত পালিত স্বপ্ন। অদ্ভুত আকর্ষণীয়া ছিল লাবণী। শিশুকাল হতে সদা চঞ্চলা, হাস্যমুখরা লাবণীকে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করতো, কোলে তোলে নিয়ে চুমু খেতে ইচ্ছা করতো। ছোট বেলায় মানসদার সাথে যখন আমাদের বাড়িতে আসতো, এমন একদিনও নেই যে আমি লাবণীকে আদর করিনি বা চুমু খাইনি। আজো তাই, যেকোনো পুরুষ মানুষের সেই কামনার নারী। যেকোন পুরুষের ইচ্ছা করবে ওকে কাছে পেতে, ভালবাসতে, কাশ্মিরী মুসলমান, পিতার কাছ থেকে পেয়েছে গাত্র বর্ণ, শারীরিক গঠন, চোখ মুখের ধারালো চেহারা আর নেপালী মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে গাত্রচর্ম এবং কমণীয়তা এবং বাঙালী পালিতা মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে বাঙালী নারীর চারিত্রিক মাধুর্য, পেলবতা। স্নেহপ্রবণতা এবং সেবা পরায়ণা। ওর চেহারা, ওর শারীরিক গঠন ওর সুরেলা কণ্ঠস্বর যে কোনপুরুষেরই একান্ত কাম্য। কিউ এর চোখ, কিউ এর ঠোঁট, কিউ এর মরালের মত গলা, কিউ এর চলার ছন্দ যেকোন পুরুষের কামনার উদ্রেক করে।

আমি, বসন্ত কিউ এর অনুরাগে রঞ্জিত আমি সমর্পিত। রুচী কি সেটা অনুমান করে! অনুভব করে! সে কারণেই কি রুচী আমার জীবন থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করে নিচ্ছে নিজেকে। নাকি রুচী কিউ এর ওপর আমার ভার অর্পণ করতে চাইছে? যেহেতু রোহিত আসার পর থেকে ধীরে ধীরে রুচী রোহিতকে অবলম্বন করে জীবনে চলার পথ নির্ণয় করেছে অথচ স্ত্রী হিসাবে আমার প্রতি তার দায়বদ্ধতা আছে এবং কিউকে সে দায় সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছে, সেই হেতুই কি আমার প্রতি কিউ এর আকর্ষণ এবং নির্ভরশীলতা এবং কিউ আমার মানসিক অবসাদ দূর করতে সক্ষম সে কারণেই কি রুচী নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে, আমি জানিনা। আমি এ বিষয়ে সংশয় মুক্ত নই বরং এক ধরণের অপরাধবোধ অথচ কিউ এর আচরণে আমি তৃপ্ত, এমত অবস্থায় আমি অসহায়। চিত্ত বিনোদন চিত্তের পক্ষে প্রয়োজন, চিত্ত বিনোদিনী কিউ। রুচীর প্রকৃতি বৌদির বিপরিত এমন কি কিউ এর নারীসত্তার সাথে রুচীর নারীসত্তার মিল নেই বললে চলে। রুচীর চরিত্রে মার্জিত বোধ, সম্ভ্রান্তসুলভ উদাসীনতা ক্ষুরধার বুদ্ধিসত্তার লক্ষণ বিদ্যমান নিজের সুখের কারণে বা অপরের সুখের পথে, আনন্দের পথে বাধা হতে চায়না। বরং তোমার কাজে, তোমার ভোগে তুমি সুখে থাকো, আমি তোমার স্ত্রী হতে পারি তাই বলে তোমার অধিকারে তোমার স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাইনা, তোমার সুখ, তোমার জীবন তোমরই রচনা যেমনটি আমার। এমনি কোন চিন্তার ফলসরূপ কিউকে আমায় সঁপে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত, রোহিত কে নিয়ে সুখে আছে, সম্পর্ক বিছিন্ন করে, পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রেখে। না কি কিউটির রূপ কিউটির যৌবনমত্ত শরীর, কিউটির স্নিগ্ধ ভালবাসার কাছে পরাজিত হয়ে স্বমর্যাদায় নিজের পৃথক অবস্থান গ্রহণ করেছে-জানিনা। জানতে চাইনা। রুচীর আচরণে শীতলতা আমি ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রথম প্রথম রুচীর আচরণে আমি শারীরিক ক্লেশ অনুভব করতাম ঠিকই আবার কাজের মধ্যে দিয়ে সে ক্লেশ দূর হয়ে যেত। তখন কিউটি আসেনি কিন্তু দাম্পত্য জীবনের অস্বাভাবিকতা একদা আমার দৈনিক কর্মক্ষমতা হরণ করেছিল, আমি হারিয়েছিলাম আমার সেই সৃষ্টিমুখর কর্মকৃশলতা। মনের দিক থেকে

অথর্ব হয়ে পড়েছিলাম। তবুও আমি রুচীর সাথে কোন বিরোধে যাইনি, রুচী যায়নি। রুচীকে আজো আমি যে আসনে সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, সেই আসন থেকে বিচ্যুত করিনি, আমি চাইনি আজো চাইনা। সেখানে রুচীর অবস্থান সমুজ্বল। তবু কিউ এর স্থান আমার এ জীবনে অভিনব, সুমহান এবং অপরিহার্যা। কিউ যেন সেই ওষধি যা আমার মৃত জীবনীশক্তিকে পূনর্জীবন দান করেছে। একদা সুপ্ত আমার হৃদয় কোরক প্রস্ফুটিত করেছে, আমার মৃত মননশীলতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে, যেন কিউ হচ্ছে সেই জীবন রস, যার প্রভাবে সিক্ত, উজ্জীবিত আমার জীবনমৃত আত্মা। কিউ যেন সেই পরশপাথর যার স্পর্শে আমার জীবনে সোনার ফলন। বড় বিচিত্র এ জীবন বড় বিচিত্র মানব প্রকৃতি, বড় বিচিত্র জীবনে সুখ-দুঃখের রূপরেখা। এই পাহাড়ি অবসরে মনের আকাশে রঙ বেরঙের চিন্তার আনাগোনা। একটু মৌতাত হলে ভাল হতো। চোখ বন্ধ করে চোখের সামনে বর্ণমালা দেখতে পেতাম, স্বপ্নের বৈচিত্রতায় বিস্ময়ে পুলকিত হতে পারতাম। পূলক চায় মানুষ। পূলক চায় জীবন। স্পন্দিত, ছন্দিত পুলকিত অনন্ত সময়!

—তুমি কাগজ পড়ছোনা বসন্ত?

কিউ এর মিষ্টি এবং মৃদু প্রশ্নে স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে আসি। মুখ তুলে কিউ এর দিকে তাকায় গভীর দৃষ্টি মেলে।

—পড়ছি তো।

ছোট্ট জবাব। উষ্ণ প্রতিবাদ করে কিউ।

—নাঃ। পড়ছোনা। একেবারে সত্যি কথা নয়। কাগজ পড়তে পড়তে কেউ বার বার চোখ বন্ধ করে। কেউ অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে!

—আমি কারোর দিকে তাকাচ্ছিনা।

—তুমি কি মনে করেছো, আমি দেখছিনা। দেখেছি। দেখেছি তুমি অন্যমনস্ক— সামনে কাগজ রেখে তুমি বার বার আমায় দেখছো। আর আমি চোখে না দেখলেও বুঝতে পারি। আমার সত্ত্বা আমায় জানিয়ে দেয়, তোমায় কেউ লক্ষ্য করছে—

—আর কি বলে তোমার সত্বা—তোমার নারী সত্ত্বা—

—বলবো কেন? তুমি তো আমায় দেখছোই না। তোমার সামনে থাকলেও তুমি আমায় দেখোনা।

অভিমানী গলা। কিউ এর অভিমান। নারীত্বের অভিমান। সব পেয়েও যেন অনেক কিছু না পাওয়ার বেদনার অভিব্যক্তি। কিউ এর গলায় তারই রেশ তাই প্রকাশ—

—আমার মনের মধ্যে যে যে প্রশ্নগুলো ঘোরা ফেরা করছিল এবং তার যে উত্তর মন থেকে দিচ্ছিল—আমি মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরের সাথে তোমার ভেতরের উত্তর কতটা সঠিক—দেখছিলাম। কিউ মাঝে মাঝে আমি আমার বুকে হাত রাখি, হাতের নাড়ি চেপে ধরে দেখি, আমি বেঁচে আছি কিনা বা জীবিত কি-না, জীবনের লক্ষণ পাইনা, আবার তুমি পাশে এলেই বা কাছে থাকলেই জীবনের স্পন্দন অনুভব করি।

—চা করবো, খাবে?

—গুড্ আইডিয়া—ভেরি গুড। কিউ, তুমি রিয়েলি জিনিয়াস্।

এই হচ্ছে কিউ। প্রখর অনুভূতি সম্পন্না। ও বুঝতে পারে অমুক সময় অমুক জিনিষটা আমার প্রয়োজন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতায় সে-প্রয়োজন মেটাতে প্রয়াসী হয়।

এই আচরণ কে কি বলে! কিসের লক্ষণ! ভাষায় কি বলে অভিব্যক্ত করা যায়! আমি কি কিউ ছাড়া থাকতে পারি! সম্ভব! দিগ্ বাহাদুর নয়, নিজে হাতে চা করবে, নিজে হাতে করে চা নিয়ে এসে নিজে নিজের হাতে পরিবেশন করবে, চোখে মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি।

আমি কাগজ গুটিয়ে রাখি। সামনের জানালা দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করি, সামনে রৌদ্রস্নাত সবুজ গাছে ঢাকা পাহাড়। কোন কোন পাহাড়ে আধখানা রৌদ্রোজ্জ্বল বাকী অংশ ছায়ায় আবৃত। ভুল করে এক টুকরো মেঘ সূর্যের আলোকে কিছুক্ষণের জন্য আড়াল করে মজার খেলায় মেতেছে। কোথাও আলো, কোথাও আঁধার বা কোথাও ছায়া—আলো আর আধার, আলো আর ছায়া নিয়েই তো জীবন। এই প্রকৃতি, এখানেই তো সুন্দরের নব নব বেশ। সুন্দরের আকর্ষণ তার বৈচিত্রে।

দুকাপ চা ধূমায়িত দুটি প্লেটে বসিয়ে কিউ সামনে এসে দাড়ায়। আমি হাত বাড়িয়ে একটা প্লেট ধরি। কিউ বসে। আমি প্লেট রেখে নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালাই। হেসে জিজ্ঞাসা করি—

—কি করে বুঝলে আমার চা খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল?

—বলতে পারবোনা। মনে হল, এই সময় তোমার এক কাপ চা ভাল লাগবে—তাই জিজ্ঞাসা করলাম। দেখলাম, আমার অনুমান সঠিক।

—সেটাই তো প্রশ্ন—কি করে?

—অভ্যাস। পাশাপাশি দুজনে দীর্ঘদিন থাকলে একে অপরের অভ্যাসের সাথে পরিচিত হয়ে যায়। মনে হয় সেখান থেকেই একে অপরের প্রয়োজন বুঝতে পারে। দীগ্ ধীরে ধীরে করো, দরকার হলে ডাকবো—

—জী।

দীগ্ বাহাদুর জবাব দেয়। ওর হাতেও এক গ্লাস গরম চা।

—মিরিচ কম দেনা, সাহাব্ জাদা মিরিচ খা নেহি সকতা—

—জী।

চায়ে চুমুক দিই। কিউকে আদর করতে ইচ্ছা করছে। এই ইচ্ছার কথাও কি বুঝতে পারছে? বুঝতে পারলে ভাল হতো—মনে মনে ভাবছি। পাশেই বসে আছে। ইচ্ছা করছে ওকে স্পর্শ করি। কিউ এর একটা হাতের ওপর আস্তে করে আমার একটা হাত রাখি—আবার সরিয়ে নিই। কিউ চোখতুলে দেখে—ওর চোখে-মুখে রহস্যময় হাসি। মনে মনে ভাবলাম—ভীষণ দুষ্টু তুমি! এবার কিউ তার একটা হাত আমার হাতের তালুতে গুঁজে দেয়। আমার একটা হাত কিউ এর একটা হাত নিয়ে খেলা করে কখনো আঙুলের ডগায়, কখনো হাতে তালুতে কখনো মৃদু কখনো জোরে চাপ দিই, কখনো চিমটি কাটি, কিউ আরাম পায়। চোখ বন্ধ করে, চোখ খোলে, চা পান করে, আরাম উপভোগ করে। আমার চা শেষ হয়, কাপ নামিয়ে রেখে তৃপ্তিতে বুঁদ হয়ে থাকি। কাপ প্লেট উঠিয়ে নেয় দিগ্ বাহাদুর।

—বসন্ত, পাহাড়ে থেকে গেল কেমন হয়?

—কেন? প্রথম প্রথম পাহাড়ে এসে পাহাড়ের নিন্দা করছিলে, সময় কাটছিলনা, ভাল লাগছিলনা—

—লাগছিলই না। এখন আবার ভাল লাগছে। আবার কিছুদিন পরে ভাল যে

লাগবেই বলা যায়না। এটা আমার হয়—মাঝে মাঝে কেন কিছুই ভাল লাগেনা—বর্ষার মেঘলা আকাশের মত মন গোমড়া হয়ে থাকে।

—এটা তোমার কেন, সকলের ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য। একই কাজে আনন্দ পাওয়া যায়না, একঘেঁয়েমি বড় বিশ্রী ব্যাপার। এর জন্য পরিবর্তন চায়—কাজের হোক, সাথীর হোক, জায়গায় হোক—পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে।

কিউ মন দিয়ে শোনে। বসে বসে চিন্তা করে। একসময় উঠে যায় কিচেনে।

বৈচিত্র-জীবনে বৈচিত্র চায়। বৈচিত্রহীন জীবন ক্লান্তিকর। একই কাজ একই দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় মানুষ ক্লান্ত। বৈচিত্রের সন্ধানে সদা সচেষ্ট। হয়ে উঠছেনা। ভোগবাদের বিষম ফল অর্থহীন প্রতিযোগিতা, শৈশব থেকে যার শুরু, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষ মুক্ত হতে পারছেনা। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবার জন্য ছুটছে, বলছে— ছোটো-ছোটো আরো জোরে ছোটো। দেখো সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, সদায় ভয়, সে কি তবে পিছিয়ে পড়ছে? অতএব অবিশ্রান্ত ছোটো, দ্রুততর ছোটো—দ্রুততম ছোটো নতুবা প্রতিযোগীতার বাজারে পরাজিত, সমাজে তুমি অপাংক্তেয় তোমার স্থান একাসনে নয়। যে কারণে মানুষ এ যুগের ব্যাধির শিকার, সুগার, ব্লাডপ্রেসার-স্ট্রোক, ডাইবিটিশ ইত্যাদি, ইত্যাদি। অসময়ে নানান ব্যাধির শিকার হয়ে অর্দ্ধপঙ্গুর জীবন নির্বাহ করে। মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি, মানুষ বিস্মৃত হচ্ছে সে কথা। এবং মানুষ যতই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, প্রকৃতি বিরোধি হচ্ছে, ততই তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। মানুষ বুঝতে অসমর্থ সে এই প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির গর্ভে তার জন্ম, প্রকৃতি তাকে লালন পালন করে, প্রকৃতির জল হাওয়া মাটি তার সৃষ্টির প্রকৃত উৎস এবং বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন, সে অসহায়। শিক্ষার গলদ সেখানেই। এই প্রকৃতির সন্তান কিউ ও আমি। প্রাকৃতিক ধর্মে শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে সে উপনিতা। যৌবনে সমাগমে গাছে যেমন ফুল আসে ফলের কথা চিন্তা করে। কিউটির যৌবনসমাগমে কিউ পুষ্পিত— ফল হওয়া প্রাকৃতিক ধর্ম। চায় সে ভ্রমর-যে ভ্রমর পরাগ মিলন ঘটিয়ে ফল সৃষ্টি অর্থাৎ সন্তানের জন্ম দেবে। সময় বয়ে যায়, যৌবন প্রবাহমানা—ভাঁটার টান প্রাকৃতিক নিয়মে আসবেই। কিউ আমার সামনে বসে। কিউ এর মন, যৌবন বার্দ্ধক্য এবং তার পরিণতি আমার মনের মধ্যে ভাসছে। কিউ এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়—আমায় উদ্বিগ্ন করে। কিউকে দেখি ওর প্রসন্ন চেহারার অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

কিউ এর হাত আমার হাতে। কিউ এর উষ্ণতা প্রবাহিত আমার শীরায়। তার প্রস্ফুটিত যৌবন ভ্রমর-পিয়াসি। ইচ্ছা হচ্ছে ওকে আদর করি। ওর হাতে অর্থযুক্ত চাপ প্রয়োগ করি।

—কি হচ্ছে বসন্ত!

—জানি না তো!

রাঙা গালে রঙ লাগে, রক্তিম। চোখে মদিরতা, সিক্ত দুটি কোমল ওষ্ঠ। ওর চোখে চোখ রাখি—নিবিড় সে দৃষ্টি। গভীর চোখের দৃষ্টি দিয়ে উভয়ে উভয়ের শিরায় শিহরণের স্বাদ পাই। এ বড় মনোরম, মহামূল্যবান।

কিউ ওঠে। কিচেনে যায়। দুপুরের খাবার তৈরি হবে। দিগ্ এর সাথে হাত লাগায়। আমি সিগ্রেট বের করে জ্বালাই ও পরম তৃপ্তিতে টানতে থাকি।

রুচী ও ঘর সংসার করেছে। গৃহিণী সেও ছিল। কিউটি গৃহিণী না হয়েও গৃহিণী বা

ঘরণী। দুজনের ঘর সংসার করার ব্যাপারে মৌলিক পার্থক্য আছে। দুজনের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। রুচীর সাথে আমার বিয়ে হওয়ার পর রুচী ও আমি ভ্রমণ করেছি বহু স্থানে। তখন রোহিতের জন্ম হয়নি। এই রকমই লজে বা গেস্ট হাউসে থেকেছি, এই রকম নেপালি দারোয়ান বা বিহারি কিম্বা অন্য ভাষি কেয়ার টেকার কাম্ কুকও ছিল কোথাও কোথাও। কিন্তু রুচী কোন দিনই কিচেনে গিয়ে তাদের সাথে বা নিজে একা নিজের হাতে খাবার তৈরি করা কিম্বা নির্দেশ দেওয়া এমনকি চা কিম্বা কফি করেনি কোনদিনই। হয় তার ইচ্ছা হতোনা বা ডিগ্‌নিটিতে বাধতো। খাওয়া হোক বা না হোক যেখানে চাকর-বাকর বা কেয়ার টেকার যে কিচেনে খাবার তৈরী করে, সেখানে রুচী খাবার তৈরি করবে, অসম্ভব। সে থাকতো রাণীর মত। রুচী ঘুড়েছে, বেড়িয়েছে, আনন্দ করেছে, বই পড়েছে কিন্তু কিচেনে—কখনোই নয়। ঐ বাহাদুরের দল যা করে দিয়েছে তাতেই তৃপ্ত। সার্ভ করা তাও তারাই করতো। কিউটির ভূমিকা এক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। দিগ্ বাহাদুর আছে, দিগ্‌বাহাদুরকে বলে বুঝিয়ে করিয়ে নেবে, তা নয়, নিজের হাতে করে নেবে। নিজে হাতে করে নিজে হাতে খাইয়ে সে খুশী। এবং আমি তৃপ্ত। বাইরে বাইরে ঘুরেও বাঙালির হাতে বাঙালি রান্না আমার আজো প্রিয়। বিদেশে বিদেশে ঘুরেও বিদেশী খাদ্যে রপ্ত হয়ে ওঠা হলোনা। বিদেশের জীবন যাত্রায় কিচেনে নারী পুরুষের দায়িত্ব সমান—যে যেমন যখন যা পারে নিজেরটা বানিয়ে নিজেরা খায়; একে অপরের ওপর নির্ভরশীল নয়। যেখানে পারিবারিক জীবন যতটা প্রয়োজনে বা দায়বদ্ধতায়, আন্তরিকতায় ততটা নয়। ওদের জীবন যাত্রা স্ব স্ব বা স্বতন্ত্র অন্যের ওপর, স্বামী স্ত্রীর ওপর কিম্বা স্ত্রী স্বামীর ওপর নির্ভরশীল নয় বরং জীবনকে আমার মনে হয় কিছুটা হালকা ভাবে গ্রহণ করে। যে কারণে ওরা গ্রহণে যতটা উৎসুক দানে ততটা নয়—আমি ওদের পারিবারিক সম্পর্কের কথা ভাবছি বলে ওদের ছোট করে ভাবছিনা—যাদের যেমন অভ্যাস। ভারতীয় নারী, পুরুষের কাছে উৎসর্গীত হয়ে স্বার্থকতা খোঁজে বা তৃপ্ত হয়—বিদেশে তার অভাব আছে। কিউ ও রুচী দুজনই ভারতীয় নারী হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতি বা বৈশিষ্টে সুমহান কিন্তু আচরণে দুজনে ভিন্ন। কিউটি প্রকৃতই ভারতীয় তথা বাঙালী নারী এবং মাতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিউ দানে আনন্দে পায়, অপরের সুখে সুখী হয়। সে মোটেই আত্মসুখপরায়ণা নয়।

রুচীকে আমি কোন সময়ই ভুলতে পারিনা। এটা আমার দোষ না গুণ; জানি না। রুচী আমার পাশে নেই, অনেক দূরে, অনেকদিন হলো। প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় রুচীর অভাব অনুভূত হয়না। মানসিক ভাবে আকর্ষণ খুব একটা নেই। বিয়ের পর প্রথম দুএক বছর প্রচণ্ড অসুবিধা হতো। এমনকি বিদেশে গিয়ে মন টিকতো না। পরবর্তীকালে একে অপরের কাছে থাকা বা পাশে না থাকা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, আকর্ষণের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল। ধীরে ধীরে কাজের চাপ এবং কাজের প্রতি যথেষ্ট মনযোগ দেওয়ার ফলে একত্রে না থাকার অভাববোধটাও কমে গিয়েছিল। রোহিত আসার পর শারীরিক সংযোগ স্থাপনে রুচীর অনীহা এবং তৎপরবর্তীকালে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রায় সমাপ্তি এবং রুচীর কাছ থেকে যথাযোগ্য প্রয়োজন না মেটার কারণেই হোক কিম্বা কাজে অত্যন্ত মনযোগি হওয়ার কারণেই হোক রুচীর ও আমার মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য অসুবিধা হতোনা বরং অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তথাপি আমাদের দাম্পত্য জীবনে আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনদিনই কোন বিরোধ হয়নি। বরং মানিয়ে

নিয়েছিলাম। তবুও স্মৃতি দীর্ঘজীবি। যে কোন অবস্থায়, যে কোন ঘটনায় রুচী এসে ঠিক হাজির হয়ে যায়। রুচীর কথা বার্তা, আচার আচরণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া আদি চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে, অতিত আজো স্পন্দন সৃষ্টি করে, তার প্রভাব যতই কম হৌক অনস্বিকার্য নয়। কারণ, রুচী আমার বিবাহিতা স্ত্রী বলেই, স্বামী স্ত্রী হিসাবে সামাজিক ভাবে আমরা একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ। যে কারণে মনে আজো তার অস্তিত্ব সমাসিন। একই ফ্ল্যাটে রুচী, কিউ এবং আমি সহাবস্থান করেছি দীর্ঘদিন। কিউ কলেজের পরীক্ষা দেবার পর থেকে আমাদের পরিবারের সদস্যা। সেই থেকে আমরা এক সাথে আছি। রুচি আমার স্ত্রী, কিউ আশ্রিতা, মানসিক দিক থেকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ, হৃদয় অসুস্থ, পৃথিবীর প্রতি তার ঘৃণা, পরবর্তী সময়ে, স্বাভাবিকতা ফিরে এলে সে প্রথমে আমার সহযোগী পরে সেক্রেটারী কাম বান্ধবী কিম্বা প্রেয়সী, প্রকৃত সংজ্ঞায় কিউকে চিহ্নিত করা শক্ত। দুজনকে নিয়ে জীবন। একসাথে আছি। পরবর্তীকালে আমি আলাদা ফ্ল্যাট কিনে নিজের কাজের জগতের সাথে সাথে কিউকেও, নতুন ফ্ল্যাটই প্রকৃতপক্ষে দিনের ও রাত্রের ঠিকানা হয়। এই যে রুচী হায়দ্রাবাদে গেছে বহুদিন, কিউ আর আমি কলকাতায়, কিউ আর আমি এক সাথে বিভিন্ন স্থানে গেছি। কিন্তু কুমায়ুনের এ গ্রামের লজের একান্ত অবসরে রুচী আমার চিন্তার জগতে প্রায়শঃই তার শরীর মন নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে তখনই ভাল মন্দের বিচার, দুটি নারীর মধ্যে তুলনা মূলক বিচার বা হিসাব করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে আমার মন। ভাল না। তবুও আমি নিরুপায়। নির্জন নিস্তব্ধ পাহাড়ে, কিম্বা তরঙ্গায়িত সমুদ্র সৈকতের কোন সুসজ্জিত ভ্রমণাবাসে রুচী অপেক্ষা কিউ যেন অনেক বেশি কাছের, অনেক বেশি আপনার, অনেক বেশি প্রীতি সঞ্চারকারিণী এবং সুখদায়িনী। জানিনা এর জন্য দায়ী কি কিউটির আচরণ নাকি কিউটির যৌবন নাকি কিউটির আকর্ষণীয় চেহারা না আমার নির্ভরশীল বয়স্ক মন। সতত ক্রীয়াশীল এ-মানব-মনে চিন্তার সীমাহীন বিচরণে আমি স্তব্ধ; আমি শিহরিত, আমি পুলকিত।

—স্নান করবেনা?—কারেণ্ট নেই। জলগরম করে দেবো। অ্যাট্ লিস্ট পরিষ্কার হয়ে নাও। ঠাণ্ডায় স্নান না করলে অসুবিধা হবেনা।

—রান্না হয়ে গেছে?

—হচ্ছে। আর বেশি সময় লাগবে না। মাত্র সাড়ে বারোটা বাজে।

কিউটি সকালে চা পানের পর স্নান করে নিয়েছে। প্রাতঃ বা পাহাড় ভ্রমণ পর্ব শেষ করে ব্রেক ফাস্ট, কাগজ পড়া। এখানে দিগে্র রান্নার তদারকি করছে এবং নিজেও করছে, রান্না শেষ হওয়ার মুখে, আমায় স্নান করতে হবে।

—বোসো। ব্যস্ত হয়ো না।

—রান্না শেষ হলে জল বসাবো। ফ্রেস্ হয়ে নেবে। এই ঠাণ্ডায় খাবার—ঠাণ্ডা করে লাভ নেই।

হাত মোছা হয়ে গেলে, তোয়ালে ঝুলিয়ে রেখে আমার সামনে বসে। মাথা ভর্তি কালো চুল। কিছুটা বাদামি রঙ মেশানো যেন—রোদ্দুর পড়লে চিক্ চিক্ করে। বেশি লম্বা নয়। গলা ছড়িয়ে কাঁধের ওপর নেমেছে মাত্র, আর বাড়তে দেওয়া হয়নি। একসময় একটা দুটো করে চুল পড়ে যেতো, লম্বা চুল, আমার পরামর্শে ছোট করেছে। সুডৌল হাত অলঙ্কার শূন্য। কানে রিং, গলায় সোনার চেন্। পুলওভার খুলে গায়ে

চাপিয়েছে হাউসকোট। কোমড়ে ফিতে বাঁধা-বোতাম নেই। হাউসকোটের নিচে সাদা টপ্। তৃপ্ত হাসি মুখ---সে রান্না করছে। আমি হেসে ওর হাসির জবাব দিই। কিউ এর গালে গলায় দুধে আলতায় গোলা ত্বকে জমে আছে স্বেদবিন্দু। ওর তৃপ্ত তপ্ত বরণ ভাল লাগছে। নাতিদীর্ঘ সময়---দ্রুত ফুরিয়ে যায়। দিগ্ গরম জল ডেক্‌চি করে নিয়ে বাথরুমের বালতিতে ঢেলে ঠাণ্ডা জলের সাথে মিশিয়ে দেয়। আমি উঠি। দিগ্ টেবিল সাজায়। প্লেট, গ্লাস, খাবার সমেত হটপট্, প্লেটের ওপর কাটা শসা, পেঁয়াজ, লঙ্কা, লেবু। আমি সাবান ছাড়া ঠাণ্ডা গরম জলে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খাবার টেবিলে দুজনে বসি, দিগ্ কিচেনেব দরজায় অপেক্ষায় থাকে, কিছু লাগলে এগিয়ে দেবে।

খাবার পর ঝোলা বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসি। পশ্চিমের সূর্যের আলোয় ঝলমলে উত্তপ্ত বারান্দা। খাবার পর শীত শীত করে। তাই এই রোদ্দুর আরাম দেয়। গায়ে শাল জড়িয়ে পিঠে গায়ে রোদ্দুরে সূর্যের উল্টোদিকে মুখ করে বসি। ভর পেট খেয়েছি। কম করে খেলে হয়। বেশি খেলে কষ্ট হয়। তবুও বেশি হয়ে যায়। কিউ এটা সেটা চামচে করে পাতে তুলে দেবে, মৃদু প্রতিবাদে শুনতে চায়না---যার ফলে বেশি হয়ে যায়। খাবার পর সে কারণে কিছু সময় বসে না থাকলে অসুবিধা হয়। গা এলিয়ে বসে জিরিয়ে নিই। সিগ্রেট জ্বালায়। বাহাদুর টেবিল পরিষ্কার করে। অবশিষ্ট খাবার পাত্র সমেত হাতে নিয়ে নিচে যায়। দরজা ভেজিয়ে দেয়। ওর ছেলে স্কুল থেকে আসবে। বাপ বেটায় অবশিষ্ট খাদ্য ভাগ করে খাবে।

কিউটি নিজের খাটে। দিনের ঘুম তাড়ানোর জন্য হাতে জার্নাল। কোলকাতা থেকে আসার সময় অনেকগুলো জার্নাল নিয়ে এসেছে। শুয়ে বসে বারবার পড়া জার্নালগুলোর পাতা উল্টাবে। সাহিত্য, সিনেমা, স্বাস্থ্য ইংরাজি, বাংলাও ভাষার মাস্থলি কিম্বা উইক্‌লি। পড়তে পড়তে দুপুর গড়িয়ে বিকাল। দুপুরে কাজ নেই, রাস্তায় বেড়ানো যায়না। কি করবে?—জার্নালের পাতায় চোখ বুলাও। আগে জানলে একটা রেকর্ড প্লেয়ার সঙ্গে আনতে পারতো। গান শোনা যেতো। অগত্যা নিজেই গুনগুন্ করে শুরু করে দেয়। কিছু পর ঘর থেকে প্রশ্ন আসে।

—বসন্ত, আগামি লেখাগুলো তৈরি করেছো?

চোখ বন্ধ করে ঝিমোচ্ছিলাম আরাম চেয়ারে বসে। কিউ এর ডাকে চোখ খুললাম।

—মনে যদি কিছু আসে নোট করে রাখতে পারো। আর নিজে না লিখতে চাইলে আমায় বললে আমি টুকে রাখি।

মনে পড়েছে। ফিরে গিয়েই বার্কলে ইউনিভারসিটি থেকে যে জার্নালটি প্রকাশিত হবে সেই জার্নালের জন্য লেখাটা পাঠাতেই হবে। কোলকাতায় থাকলে যোগাযোগ করে তথ্যগুলো যোগাড় হয়ে যেতো, এখানে আসার জন্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ফেরার সময় বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী হয়ে ফেরার কথা। মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তথ্যগুলো যোগাড় হলে কিউটি সাজিয়ে, তৈরি করে দেবে। যদি ভাল লাগে, নইলে সোজা কোলকাতা।

—বসন্ত শুনছো?

—হ্যাঁ।

—এখানে এসো না। তুমি পায়ের ওপর কম্বল চাপিয়ে বসে বলে যাও, আমি নোট করে নিচ্ছি।

এই পাহাড়ের অভিজ্ঞতা তুমি ব্যবহার করতে পারো।

--এই পাহাড়ের মানুষের কথা জানার দায়িত্ব তো তোমার ওপর দেওয়া আছে।

--সে তো আজই বললে। যতটা পারি সংগ্রহ করবো। তুমি এসো না।

উঠতেই হবে। কিউ চাইছে। আমি ওর কাছে যাই। একা একা খারাপ লাগছে নিশ্চয়। আমার খাটে বসি হেলান দিয়ে, কিউ নিজের খাট ছেড়ে আমার খাটে, আমার পাশে, কম্বল দিয়ে দুজনের পা ঢেকে দেয়, আমার হাত টেনে নেয় ওর কোলে। দুটি হাত দিয়ে ধীরে ধীরে আমার হাতের আঙ্গুল নাড়াচাড়া করে, টানে, তালুতে চিমটি কাটে। আরাম লাগছে। কিউয়ের হাতের স্পর্শে শিথিল হয়ে যায় আমার হাত। অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিই।

—লেখা, নোট্স, এসব কথা বার বার বলে তোমায় কি বিরক্ত করছি বসন্ত? আমি দেখছি, তুমি ভুলে গেছো কিনা। আসলে মাঝে মাঝে আমার নিজেকেও বেকার মনে হচ্ছে।

আমি কোন উত্তর দিইনা। নিস্পন্দ, বসে থাকি। কম্বলের নিচে পা ছড়িয়ে বসায় আরাম হচ্ছে। বয়স, আবহাওয়া, পরিবেশের সাথে সাথে শারীরিক ভাল লাগা বা মন্দ লাগা বা এক কথায় অনুভূতির পরিবর্তন হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীর বেশি বেশি বিশ্রাম চায়, আদর যত্ন চায়। সে কারণে মন এখন, বিশেষ করে এ অবসর, কাজের ব্যাপারে নিস্ক্রিয় প্রায়। কিউ কিন্তু তার চেষ্টা থেকে হাত গুটিয়ে বসে নেই। অল্প সময়ের জন্য চোখের পাতা উন্মুক্ত করে দেখলাম কিউ এর সেই নোটবুক ও কলম পাশে রাখা আছে, দুচোখে আমার দিকে চেয়ে আছে, অর্দ্ধ উন্মিলিত চোখে—আমি বলবো সে নোট করবে। ইদানিং আমার মাথা হতে যে সামান্য লেখার তথ্যগুলো বেড়োয়, তার বেশির ভাগই কিউ এর লাগাতার তাগিদে। লেখার তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে কিউ এর ভূমিকা আমার থেকে বেশি। দীর্ঘদিন কিউ আমার সহযোগী যে কারণে মোটামুটি আমার কাজের জগৎ ওর পরিচিত। আমি আমার অভিজ্ঞতা নিসৃত বিশ্লেষণ এবং মন্তব্যগুলো রাখি। এমন কি অনেকক্ষেত্রে কিউ এর সাথে আলোচনাও করি।

---তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না?

---না। বসন্ত বুঝেছি, তুমি এখন কিছু বলবে না, তোমার মন নেই। তাহলে বরং উঠি নোট বুক তুলে রাখি।

---সত্যি ঠাণ্ডা লাগছে না? আমার শীত শীত করছে—

একটা পাতলা জামা ও পাজামা পরনে। সোয়েটার নেই। চাদর নেয়নি। এমনকি ভেতরের জামাও পরেনি। অত্যন্ত ক্যাজুয়াল পোষাক গরম দেশে পরে--

---বলছি তো আমার শীত করছেনা। তুমি বুঝতে পারছো না? শীত করলে সোয়েটার নেবো।

আর ঠাণ্ডা লাগলে তোমার কি? তোমায় দেখতে হবে না।

ওর ঠাণ্ডা লাগছে। বেশ বুঝতে পারছি। কম্বলের নিচে কিউ যখন দুটি হাতের তালু দিয়ে আমার হাত ধরেছিলো, ঠাণ্ডা ছিল। যদিও সে কম্বল কোমর পর্যন্ত টেনে নিয়েছে, কিউ এর শরীরের উর্দ্ধাঙ্গ এখন পাতলা জামায় ঢাকা। ঠাণ্ডায় শরীর যেমন আচরণ করে, লোমকূপ সোজা হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সামান্য দৃঢ় হয়—কিউ এর শরীরের পাতলা

জামার আড়ালে উর্দ্ধাংশ তেমনি বিদ্রোহী। আবার এমনও হতে পারে, সত্যই কিউ এর ঠাণ্ডা লাগছে না, আমার স্পর্শে, কম্বলের নিচে আমার হাত নিয়ে খেলায়, কিউ এর নিজের আরাম, কিউ এর হাত বাহু হয়ে ছড়িয়ে পরেছে পাতলা অবরণের নিচের রত্ন ভাণ্ডারে, কিউ এর সুললতি শরীরের স্নায়ুতে স্নায়ুতে হয়তো এ বিদ্রোহ। সে কারণে লক্ষ করলাম, কিউ এর ঠোঁটের অগোচর কম্পন আর হঠাৎ ছুটে আসা রক্তে রক্তিম গাল, গলা। আবার ভাঙা ভাঙা গলায় কিউ বলে—

—বলছি না আমার ঠাণ্ডা লাগছে না—ঠাণ্ডা লাগছেনা। বসন্ত তুমি কি বোকা! তুমি বোকা বুদ্ধু অনুভূতিহীন—

আমার হাত ছেড়ে কম্বলের নিচে আমার পায়ের ওপর মৃদু আঘাত করে। আঃ কি আরাম! আমার বুঝতে বড় দেরি হয়। আমি কিউকে পাশ থেকে বুকের ওপর তুলে নিই জড়িয়ে ধরি। এত সময় ধৈর্য্য ধরে কিউ অপেক্ষা করছিল—সুযোগ পেতেই, তর সয়না। দুটি ঠোঁট দিয়ে আমার ঠোঁট জড়িয়ে ধরে, চুঁষতে থাকে। কি ভুল ভাবছিলাম এত সময়! কি উষ্ণ কিউ এর ঠোঁট! কিউ এর শরীর, কিউ! কি অপূর্ব! সেই দুপুরে, কম্বল সরে গেছে গা থেকে, শীতলতা উধাও কিউ এর সমস্ত উষ্ণতার প্রস্রবনে আমার শরীর ও মনের প্লাবনে; স্নাত হলাম দুজনে। এ আনন্দ, এ আরাম-এ আমেজ-এর তুলনা নেই। ফিরে আসে প্রশান্তি, পূর্ণতৃপ্ত দুজনে। টেবিলে বসি। এবার সত্যই নোটবুক নিয়ে। কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে দেয় কিউ। বাঁ হাতের ওপর মাথার ভার রেখে নোটবুক খুলে কলম হাতে আমার দিকে তাকায়। আমি বলি—

কুমায়ুন পর্বত মালার বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন পাহাড়ি জনজাতি। কখনো কখনো একটা বা দুটো পরস্পর সংলগ্ন পাহাড়ের কোলে বা বুকের জনবসতি নিয়ে এক একটা মৌজা কোথাও পঞ্চায়েত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মত এখানেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু আছে। পাটোয়ারী আছে। জন বসতি হালকা—কোথাও দশ-বারো ঘর কোথাও বিশ ত্রিশ আবার কোথাও দু-চার ঘর মিলিয়ে বসতি। ঝর্ণার জল থেকে থেকে সঞ্চিত জল পরিশুদ্ধ করে বসতি গুলোতে খাবার জলের ব্যবস্থা আছে। সময় ধরে টাইম কলে জল এলে সারিবদ্ধভাবে এরা জল সংগ্রহ করে মাথায় করে ঘরে নিয়ে যায়। সেই জলেই স্নান, জামাকাপড় পরিষ্কার এবং তৃষ্ণা নিবারণ হয়। বর্দ্ধিষ্ণু এলাকায় ঘরে ঘরে কলের জল পৌঁছে গেছে, যেমন আমরা যেখানে আছি, এখানে ধনী লোকেদের ঘরে ঘরে জলেব কল আছে।

--এগুলো তো আমি জানি, আমি লিখে নিতে পারবো।

—এখানে আসার আগে জানতে?

—না জানলেও। এখানে জলের কোন অসুবিধা নেই।

—খোঁজ নাও, যখন রিজার্ভারের জল কমে যায় যখন? বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা কোরো।

—ঠিক আছে, জেনে নেবো।

—পাহাড়ে জলকষ্ট সমতলের অপেক্ষা অধিক। মনে হয়না এখানে তার ব্যতিক্রম হবে।

—তবে তাই। তারপর?

—আরো বলতে হবে? তুমি তো জানো নোট করে নাও। যদি মনে থাকে—লিখতে

হবেনা।

—তবুও।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষা ভাষি লোকের মত এখানে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। অবশ্য অর্থনৈতিক অবস্থার কারণেই পরিবার গুলোর ভাঙন। জীবিকার সন্ধানে পরিবারের সদস্যবৃন্দ পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন শহরে বা বিভিন্ন বসতিতে বাস করে। তবুও বেশ কিছু যৌথ পরিবার এখনো এই পাহাড়ে টিকে আছে। জীবিকা ফল চাষ ও পশুপালন। বৎসরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এখানে ফলের চাষ হয়। আপেল নেসপাতি, পিচ, খোমানি ইত্যাদি। পশুপালন বলতে বাড়ির বৃদ্ধা সদস্যরা ছাগল পালন করে, কেউ কেউ গরু, মুরগি। যান বাহন ও কাঁচা মালের অভাবের জন্য কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি। বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ কাঠের কাজ হয় তাও সমতলে। পুরুষ ও নারী উভয়েই পরিশ্রম করে, তবে পুরুষেরা অলস প্রকৃতির এবং নেশা করে অনেকেই। নারীরাই পরিবারের কত্রী, ঘরের কাজ, বাগানের কাজ, পশুপালন, সন্তান মানুষ করা তাদের শিক্ষাদান সব কিছুর দায়িত্বে নারী এবং অত্যন্ত যোগ্যতা সহকারে সুষ্ঠভাবে পালন করে। নারী ও পুরুষ, অধিকাংশের শরীরের গঠন হালকা, ছিমছিমে, পুষ্টির অভাব আছে। বিশেষ করে নারীরা দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে অথচ খাদ্যভাব আছে, যে কারণে অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার। প্রোটিন জোটেনা বললেই চলে। শিশুরা জন্মসূত্রে রুগ্ন। খাদ্যাভাবের কারণে শিশুদের বয়স অনুপাতে শরীর বৃদ্ধি হয়না।

—এতো তুমি এদের সামাজিক অবস্থার কথা বর্ণনা করছো, এর সাথে শিশু মৃত্যুর সম্পর্ক কি?

—তোমাকে নিশ্চয় শিশুমৃত্যুর কারণ হিসাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে বিষদভাবে বোঝাতে হবেনা।

কিউ ঘাড় নাড়ে। অর্থাৎ বুঝতে পেরেছে। কিউ দীর্ঘদিন ধরে আমার কাজের সাথে জড়িত। মূলতঃ আমার পেপার তৈরি করা, পরিবেশন আদি করার দায়িত্ব তার। এমনকি প্রাথমিক আলোচনা ওর সাথেই করি। অশিক্ষা বা স্বাস্থ্য বিধি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব, চিকিৎসার অভাব শিশুমৃত্যু, অপুষ্টিজনিত শিশুর জন্ম এবং বিকাশে প্রতিবন্ধকতার কারণ। অধিক মায়েরাই জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক বিধি মেনে চলেনা। অপুষ্ট শরীরে অধিক শিশুর জন্ম পূর্ণ বিকশিত মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার পথে প্রধান অন্তরায়। অথচ অধিকাংশ মায়েদের স্বাক্ষরতা বা প্রাথমিক শিক্ষা আছে।

—অথচ সরকার জন্ম নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট?

—নীতি গ্রহণ এবং নীতির সঠিক প্রয়োগে ব্যবধান অনেক। সুস্থ সবল সচেতন পূর্ণ বিকশিত নাগরিক সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গঠনে অত্যন্ত জরুরী। অতএব?

—নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং সুষ্ঠ প্রয়োগের জন্য প্রকৃত দায়বদ্ধ, দরদী এবং প্রকৃত মানবপ্রেমিক দরকার।

—যার অভাব রয়েছে।

এবার থামি। গল্প বলার সাথে সাথে কিউ এর বার বার আবদারের কারণ আমার কাজের বিষয় নিয়ে কয়েকটা মোটা মোটা কথা আলোচনা করে ফেললাম। নেহাৎই দায়বদ্ধতা থেকে উৎসরিত নয়। এমন ভাবেই ভালবাসা দিয়ে অত্যন্ত মানবিক সংবেদনশীলতা দিয়ে কিউ আমার মৃতপ্রায় মননশীলতার পুণর্জীবন ঘটিয়েছে। আমাকে

কাজের জগতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। দেশে বিদেশে, বিশ্বের বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক সংগঠনে আমার সংগৃহিত তথ্য সমৃদ্ধ বিবরণ এবং প্রতিকারের পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে, এমনকি ভারতবর্ষেও। এবং আমার কৃতকর্মের পিছনে এই-মহিয়সি কিউ এর অবদানের কথা না বললে সঠিক হবেনা।

এইভাবে ধীরে ধীরে বলি, কিউ শোনে, কিউ লেখে। দিগ্ আসে চা করে দেয়। সূর্য্য পাড়ি জমিয়েছে পশ্চিমে। গাছের ছায়ায় আয়তন বাড়ছে ক্রমশঃ। দিগ্ চা খাইয়ে বাগানে যায়। গাছে জল দেবে, বাগানের কলে লম্বা পাইপ লাগিয়ে। দিগের ছেলে রাস্তায় উঠবে, খেলবে একা, সাথী পেলে দোকা। শিশুরা স্কুল থেকে ফিরছে, চড়াই ভেঙে, ক্লান্ত পদক্ষেপে। ছোট থেকে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। পাকদণ্ডির পর পাকদণ্ডি বেয়ে জীবনের পাকদণ্ডি অতিক্রম করবে ওদেরই পূর্ব পুরুষের মত। পরিবর্তন আসবে-হয়তো কোন এক কালে---হয়তো সময় নেবে দীর্ঘ-তবুও আসবে—যেমন করে এসেছে বিদ্যুৎ-যেমন করে এসেছে কালের জল—যেমন করে এসেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। সভ্যতার আলোর প্রভাব প্রত্যক্ষ সূর্যের উজ্জলতা বহন না করলেও চাঁদের আলোও অন্ধকার অপেক্ষা নিশ্চয় ভাল—অন্ততঃ মন্দের ভালো।

চতুর্থ অধ্যায়

গরু যেমন পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ে বা কখনো স্রেফ দাঁড়িয়ে, চোখ পিট্ পিট্ করে অলস সময়ে বিশ্রাম করার সাথে সাথে জাবর কাটে, মুখের দুটি চোয়াল সঞ্চালিত হয় ক্রমাগত এবং চোয়ালের দুপাশ দিয়ে ফেনার মত গাজলা বেড়োয় আমিও তাদৃশ জাবর কাটছি অর্থাৎ আমিও আমার হজম হয়ে যাওয়ার সময় নিয়ে এবং সময়ে সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে মুখে নয় মনে মনে। পূর্ণঃ পরিপাক করছি আর পরিবেশন করছি আপনাদের দরবারে, হে আমার বন্ধুবর্গ বা আমার শেষ বয়সের অনুরাগী শ্রোতৃবৃন্দ। এবং এই পরিবেশনায় অসংলগ্নতা বিদ্যমান। কারণ যখন যে রকম যে যে ঘটনা মনে ভেসে উঠছে বা ঘটনার আংশিক টুকরোগুলো দৃশ্যমান হচ্ছে একমাত্র সে গুলোই হাজির করছি আপনাদের সামনে। স্মৃতির পাতায় আঁকা বা লেখাগুলোর সবগুলোই সমান উজ্জ্বল বা দৃশ্যমান নয়। কালের বাতাসে মুছে গেছে বা হারিয়ে গেছে অনেকেই। তাই এ-প্রায়-বৃদ্ধের আপনাদের কাছে অনুরোধ এ অসংলগ্নতার দায় ধূসর স্মৃতির এবং অপুট পরিবেশকের—হে শ্রোতৃবৃন্দ বা বন্ধুবর্গ মার্জনা করবেন অনুভূতি মিশিয়ে। যেমন এ গল্পের নায়িকা কিউটি বা লাবণীর গল্প কুমায়ুনের অবসর, কুটিরে বসে, শুয়ে বা কালো পিচ ঢাকা রাস্তায় পদচারণা করতে করতে ফুলের সৌরভে বা চোখ ভোলানো সবুজ সৌন্দর্যের সাথে মিশিয়ে গল্প বলছি। বুঝতে পারছি গল্পের বিন্যাস বড় দুর্বল তবুও প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে কিউ এর চরিত্রের বা অস্তিত্বের এতটাই মিল যে প্রকৃতি এবং কিউ একে অপরের সাথে অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমার বর্ণনায় প্রকাশ পাচ্ছে। হয়তো বা অতিতের স্বভাবই এ রকম।

মানব শিশু পৃথিবীতে যখন প্রথম আগমন বার্তা প্রেরণ করে সুখের পসরা সাজিয়ে। ধ্বনিত হয় আগমণি সুরের আনন্দ মুর্ছনা। জন্মের পূর্বে এবং জন্মের পরে জল্পনা-কল্পনা, স্বপ্নচারনা, শিশুকে নিয়ে ভবিষ্যতের সুখের রচনা শিশুর বাবা মা বা জন্মদাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা, তার পরিধি সে গৃহের সদস্যবৃন্দ এমননি প্রতিবেশির মধ্যেও বিস্তৃত

হয়। শুভ বিবাহের অনুষ্ঠান বা আনন্দ যেমন বিবাহ বাসরের বর কনেব মধ্যেই আটকে না থেকে পরিবার, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজনেরা সে বিবাহের আনন্দ উপভোগ করে সপ্তাহ বা মাসাধিক কাল ব্যাপি। বাজনা বাজে, আলোর রোশনায়, আনন্দ লহরী একে অপরের সাথে মিলে মিশে উপভোগ করে। শিশুর জন্মের উৎসবও কোন অংশে কম নয়। এটাই তো কাম্য বা বাঞ্ছনিয়। কারণ শিশু তো ভালবাসার ফসল। পৃথিবীর পবিত্রতম সম্পর্ক হল ভালবাসা। ব্যতিক্রম শুধু লাবণীর জন্ম লগ্নে। লাবণীর মত জন্ম গ্রহণ পৃথিবীতে বহু শিশুর মত বিষাদে মথিত, কলঙ্কলেপিত। আমার শোনা কথা। আমার দাদা কাম বন্ধু যার সাথে আমার পরিচয় শৈশবের স্কুলের দিন থেকে—তার কাছ হতে হাসির সাথে গল্পের মাঝে, সমাজ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে করতে চায়ের আসরে বা নেহাৎই ব্যালকুনির বারান্দায় আকাশের নক্ষত্র দেখতে দেখতে কিউ এর জন্ম বৃত্তান্ত আমার জানা হয়। মানসদা এবং বৌদির কাছ থেকে জেনেছি এবং পরিবেশন করছি, কারণ আগেই বলেছি কিউ এই আখ্যানের নায়িকা। এবং যেহেতু লাবণী ও আমি দেহে ও মনে একাত্ম হয়ে গেছি এবং লাবণীর জীবন আমার জীবনে জড়িয়ে গেছে সে কারণে আমার এমনের আত্মগত বিশ্লেষণে লাবণীর আবির্ভাব এবং লাবণীর প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সুস্পষ্টই শুধু নয় এ জীবনের অধিকাংশ সফলতা বা বিফলতা, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, আনন্দ-নিরানন্দে লাবণীর ভূমিকা, লাবণীর প্রভাব, লাবণীর অবদান প্রায় সবটাই।

মানসদা চাকরীর শর্তে পোস্টিং পেয়েছে কাশ্মীরে। ভারত সরকারের অধীনস্ত একটি সংস্থার এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমানস দত্ত। ক্যাম্প অফিস। প্রোজেক্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী ভাবে থাকতে হবে। ক্যাম্প অফিস হলেও তাঁবু খাটানো কোন ক্যাম্প নয়। অস্থায়ী হলেও অফিসের বাড়ি দোতালা, কাঠের পাটাতন দেওয়া মেঝে, দেওয়াল, মাথার ওপর টিনের চাল নিচে পালিশ করা কাঠের সিলিং। দোতলায় সাহেবের কোয়ার্টার। নিচে দপ্তর, সার্ভেন্টস রুম, গোডাউন। কাঁটাতার দিয়ে তৈরি সীমানা। পাহাড়াদারের গুমটি গেটের পাশে। যখন বদলি হয়ে মানসদা কাশ্মীরে যায়, মানব-মানসদার ছেলে ও বৌদিকে সাময়িকভাবে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। কাশ্মিরে পৌঁছে, সেখানকার অবস্থা বুঝে, থাকার জায়গা ভাল করে গুছিয়ে নিয়ে তবেই ছেলে বৌকে নিয়ে যাবে। বৌ ছেলেকে দূরে রেখে অসুবিধা হলেও উপায় নেই। প্রোজেক্টের কাজের প্রস্তুতি পর্বে নতুন জায়গায় প্রচণ্ড ব্যস্ততা থাকে, অসুবিধা থাকে। সাইটের কাছে—পিঠে বাজার ঘাট নেই, খাবার মত হোটেল নেই সারা দিন কাজের ব্যস্ততা, সে অসুবিধার কিছুটা হাল হয়েছে লছমির জন্য। লছমি থাকার ফলে কাজের শেষে বিশ্রাম পায়। ঘরদোর পরিস্কার করা, জামা কাপড় কাচার জন্য, কোন কামীন বা ঐ জাতিয় কোন লোকের ব্যবস্থা করতে হয়নি। এরজন্য সে মনে মনে সুন্দর লাল থাপাকে ধন্যবাদ জানায়। সে যখন দিল্লীর ফ্ল্যাটে থাকতো, দিল্লীর অফিসে চাকরি, লছমি, পনেরো-ষোলো বছর বয়সের, দিল্লী অফিসের দারোয়ান সুন্দর থাপার মেয়ে দিল্লীর ফ্ল্যাটে থাকতো, শ্রাবণীর কাজ কর্ম করতো। লছমির বাবা সুন্দরলালা থাপা, দারোয়ান দত্ত সাহাবকে বিসওয়াস করতো, ভক্তি করতো। সাহাব বদলি হোয়ে গেলে, লছমি কি ধার যাবে? সাদি হোয়নি। দিল্লী জগহ ঠিক নেহি। সো লছমিকো সাহাব কা সাথ ভেজ দিয়া। সাহাব কে লিয়ে খানা পাকায়েগি, যতন করেগি, সেবা করেগি, ঘর কি কাম করেগি। লছমি

আচ্ছি রহেগি।

—সাব আপ লছমি কো আপকে সাথ লে যাও।

—কাঁহা লে যাঁয়ু। উঁহা রহেনা কা জগহ নেহি। ও ছোটি হ্যায়। লেড়কি হ্যাঁয়। ও রোয়েগি। ও উঁহা নেহি যায়েগি।

—নেহি সাব্, নেহি, ও নেহি রোয়েগি। ও খুশ্ রহেগি। সাব্ আপ না মত্ করনা। ও আপকা ঘরমে কাম করেগি। আপকা ঘরমে আচ্ছি হ্যায়। ওভি আপকা লেড়কি হ্যায়। লে যাও, ও খুশ রহেগি।

কথার মাঝে তাকিয়ে দেখি, লছমি ফ্ল্যাটের দরজার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমাদের কথপোকথন শুনছে। বাবার প্রস্তাবে খুশিতে উজ্বল চোখ মুখ। আবার আমার অনিচ্ছার কথা শুনে ম্লান। অর্থাৎ আমাদের কথপোকথন লছমির চেহারায় আকাশে আলো ছায়ার খেলা। আমি ওর দিকে তাকিয়ে ওর মনের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলিত রূপ দেখে উপভোগ করছিলাম। উপলব্ধি করছিলাম। অনেকদিন হল লছমি আমাদের পরিবারে আছে। বলতে গেলে সে এখন এ পরিবারের সদস্যা। মায়া জন্মে গেছে ঐ কচি মেয়েটির প্রতি।

—লেকিন—

—আপ বহুত মেহের বাণ্ হ্যায়। পরণাম সাহাব।

দুটি হাত একত্র করে অনুণয় করে। হাত বাড়িয়ে পা ছুতে চায়। জোর করে বাধা দিতে পারেনা। অতএব মানসদার লাগেজের সাথে একটা লাগেজ বাড়ে, লছমি মানসদার সাথে ট্রেনে, গাড়িতে চেপে, জানালা দিয়ে লোকজন বাড়ি ঘর, গাছপালা পিছনে ফেলে কাশ্মীর হাজির হয়। স্থান পায় নিচের একটা ছোট কাঠের ঘরে। পনেরো ষোল বছরের কুমারী লছমি, মিষ্টি স্বভাব, লাজুক প্রকৃতির, সদ্য যৌবন শরীরে। দিল্লীর ফ্ল্যাটের মানসদা ও বৌদির ঘরের কাজের সহায়িকা লছমি থাপা। সাত পাঁচ ভেবে দেখেনি মানসদা। যেতে চাইছে, যাক্, কাজ কর্ম করবে, যেদিন ফিরে আসতে চাইবে, বাবা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবে। বৌদি কলকাতায় থেকে কাশ্মীরে এলে দিল্লীতে যেমন ছিল—তেমনি থাকবে। সুবিধাই হয়েছিল মানসদার। ঘর দোর, কাচা ধোয়া ছাড়া দুটো ভাত, রোটি, সবজি যেমনি হোক বানাতে পারে। নইলে মানসদার খাবারের কষ্ট হতো। কিছুদিন পরে শ্রাবণী বৌদি, মানসদার শিশুপুত্র মানব কাশ্মীরে পৌছায়, এবং নিজের সংসার নিজের কাঁধে তুলে নেয়। প্রোজেক্ট সাইট ছিল শহরের বাইরে। কাশ্মীর ভূস্বর্গ। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে মানসদার ছোট সুন্দর সংসার। সেই সংসারের মাঝে অতিথি বাস্তবে একজন ছোট সদ্যসা, প্রজাপতির মত মেয়ে লছমি। যে বোকাবোকা কথা বলে, যেকোনো কথায় হাসে, কাজ কর্ম করে, মানবকে কোলে নিয়ে খেলা করে, রাত্রে ঘুমোবার সময় নিজের ঘরের খিল বন্ধ করে ঘুমায়। সুখে ছিল, আনন্দে ছিল। ভালো ছিল। বেশ ছিল। আমার গল্পের নায়িকা কিউটির জন্মের তিথি নক্ষত্র তখন অনেক দূরে।

কিন্তু লছমি তো প্রজাপতি নয়। লছমি সদ্যযৌবনা, কুমারী নেপালি কন্যা। কাশ্মীরের জলহাওয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশে আর মানসদার ঘরে খাবারে দাবারে আদরে যত্নে আরো আকর্ষণীয়া হয়ে উঠেছে। রঙ লেগেছে শুধু দেহে নয় মনেও। সেই রঙকে উজ্জীবিত করেছে এক কাশ্মিরী সুঠাম, সুদর্শন ক্যাম্প অফিসের দারোয়ান এক যুবক। সদ্য যুবতি, প্রস্ফুটিতা পুষ্প সম লছমির আকর্ষণ উদ্দাম, উত্তাল। ফুল ফোটে, প্রজাপতি উড়ে উড়ে মধুপান করে, ফুলের কোন জাত দেখেনা, বর্ণ দেখেনা—প্রজাপতির কাছে ফুল ফুলই,

ফুলেই তার আকর্ষণ, সব ফুলেই তার অধিকার। সেটাই ফুলের এবং প্রজাপতির ধর্ম। কিন্তু সমাজে, মানুষের ক্ষেত্রে যদিও প্রাকৃতিক নিয়মে ধর্ম এক তবুও মানুষকে সামাজিক কিছু নীতি, নিয়ম বা সমাজের সৃষ্ট শৃঙ্খল মেনে চলতে হয়, নইলে সমাজ সেই আদিম যৌথ ব্যবস্থায় ফিরে যাবে, যেদিন পরিবার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সেদিনের সেই লছমি ভুলে গেল যে তাকেও পারিবারিক রীতি নীতি মেনে চলতে হবে। হয়তো এমনও হতে পারে যে, যৌবনের উদ্দীপ্ত কামনায়, বাঁধভাঙা উচ্ছলতায়, শারীরিক তাড়নায় পরিবেশ, সমাজ, ভূত-ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হলো অবগাহন করলো আকণ্ঠ আনন্দ সলীলে, নিমজ্জিত হল শারীরিক সুখের সাগরে। সেদিনের সেই লছমি আর সুঠাম তনু কাশ্মিরী পাঠান মুসলমান যুবকের অবাঞ্ছিত, অবৈধ, যৌবনের দেহজ সাময়িক সুখের ফল বা বীজ আজ করে এ লাবণী। তথা আজকের কিউটি। যে পড়ন্ত বেলায় আমার পাশে পাশে কুমায়ুনের স্লিম পথে পদচারণা করছে। হাওয়ায় উড়ছে সোনালি-কালো চুল, যার শরীরের গন্ধে পারফিউমের গন্ধ মিশে শীতের বাতাসে বসন্তের সুবাস নিয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে এবং পাহাড় পেরিয়ে অনন্ত-অজানার উদ্দেশ্যে। হালকা সবুজ সিল্কের শাড়ি ওর পরনে। লাল পাড়, পাড়ের রঙের সাথে মিলিয়ে কার্ডিগান। কার্ডিগানের বুক খোলা, লাল ব্লাউজের নিচে মধুভাণ্ড, পায়ে হাই হিল। চলার সাথে নৃত্যরত নিতম্বদ্বয়, সুগঠিত মধুভাণ্ড এবং মসৃণ কোমল নাভি সংলগ্ন আকর্ষণীয় মেদশূন্য তলদেশ। শাড়ি পরেছে কিউ। মা নেপালী হলে কি হবে কিউ এর শরীরের গঠন নেপালি মেয়েদের মত নয়। নাক, মুখ শরীর সুঠাম তনু কাশ্মিরী মুসলমান পাঠান বাবার মত। সুললিতা, সুগঠিতা, যৌবন মদীরা সিক্ত তনু। কিউ শাড়ি পরলেও বাঙালী রমণীর মত মনে হয়না। নেপালি মায়ের মতই গা ও মুখের স্কিন্। বড় কোমল এবং উজ্বল। শাড়ি পরেছে আজ। উত্তর থেকে হাওয়া এসে লাগছে চোখে মুখে শাড়িতে। যেন বিরক্ত করে মজা পাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া। যেন প্রতিদিনের চেনা কিউকে শাড়ি মুক্ত করে পরখ করে নিচ্ছে। শাড়ি নিয়ে সে ব্যস্ত, নাজেহাল। একবার আঁচল, এক বার কপালের ওপর উড়ে পরা চুল—সে বেসামাল। আমার মুখে হাসি। আমি হাসছি। উপভোগ করছি। আনন্দ পাচ্ছি। মিষ্টি বিকাল। পড়ন্ত রোদ। কিউ এর ভ্রূকুটি। আমার অগ্রাহ্যে কিউ খুশি। ফুল ফোটে খুশিতে অপরের খুশির তরে। চির সত্য।

সুন্দর মেয়ে ছিল লছমি—মানসদা বলতো। কাছে কাছে থাকতো। হাতে হাতে কাজ করতো। আস্তে কথা বলতো। আদর যত্নে ছিল। কাজকর্ম শিখেছিল। অল্প স্বল্প রাধতে শিখেছিল। কিন্তু কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল! আগে থেকে কোন কিছু বুঝতে পারিনি।

—আঁচল ভালো করে গুঁজে নাও। নইলে সামলাতে পারবেনা। দেখছোনা তোমার শাড়ি পরার আনাড়িপনা দেখে হাওয়াও মজা পেয়েছে। কিম্বা শাড়িটা প্রকৃতির পছন্দ হয়েছে। যে কারণে হাওয়াকে পাঠিয়েছে খুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দেখছোনা আজকে যেন হাওয়ার গতি অন্য দিনের চেয়ে বেশি? জোর করে তোমার গা থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত কৌতুকে মেতেছে-হাসছে, নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে। কান পাতো শুনতে পাবে, ওরা বলছে বেশ জব্দো তো!

—বেশ! গাছের পাতা হাসুক, বা কথা বলুক তাতে তোমার কি! তোমার তো হাসি পাচ্ছে! মজা পাচ্ছো, না! আমি বাবা, নিজে নাকাল, আর উনি রসিকতা করছেন!

আমিও বলে দিচ্ছি আজই লাষ্ট শাড়ি পরা।

বেচারা কিউ! সে নিজেও হাসে। কপট হাসি। এক চোখ বন্ধ করে মুখ কুঁচকে কথার সাথে প্রশ্রয় মেশানো ভ্রূকুটি। আমি হাত বাড়িয়ে ওকে সাহায্য করি। কিউ তৎক্ষণাৎ সে সাহায্য সাদরে গ্রহণ করে। হাসতে হাসতে টান টান করে শাড়ি বুক কোমর পেঁচিয়ে, গুঁজে নেয়।

—এবার হয়েছে?

উত্তর না দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসি। আমার হাসিতে কিউ সংশয়ে পুণরায় যাচাই করে নেয় হয়তো শাড়ি ঠিক মত জড়ানো হয়নি। লক্ষ্য করে, শাড়ি কোমর জড়ানো হয়েছে ঠিকই। কিন্তু অপসৃত বুকের বিস্তৃত অংশ হতে তার পরনের শাড়ি লাল ব্লাউজের ওপর থেকে গেছে নেমে। নগ্ন দক্ষিণ স্তন, উদ্ধত, পরিমিত ঈষৎ অবনত। এই পাহাড়, পাহাড়ের গা জুড়ে সবুজ বনানী সুন্দরী কিউকে এমত অবস্থায় দেখে নিশ্চয় উল্লসিত। কপালে তার লাল টিপ। ঠোঁটের রঙ ন্যাচারাল। লাজুক গর্বের হাসি ঠোঁটে। কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় রপ্ত করেছে কিভাবে রঙে রঙ মিশিয়ে সাজতে হয়। মৃদু সঞ্চালনে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। আমি ওর কাঁধে এক হাত রেখে সামান্য চাপে কাছে টেনে নিই। কিউ কামনায় রক্তিম চোখে আমার চোখে চোখ রাখে। আমি নিচু হয়ে নাকের ডগায় ওর নরম লাল ব্লাউজ স্পর্শ করি। লাল গালে রক্ত এসে ভিড় করে।

—কিউ এর গালের রঙ বড় লাল। ক্ষণিকের জন্য দুটি চোখের পাতা জুড়ে যায়। চোখ খোলে।

—দুটি হাত মুঠো করে আমার বুকে মৃদু আঘাত করে। আমার মধ্যেও তখন হৃদয়ের গতি অস্বাভাবিক। দ্রুত ঠিক নয় মুখরিত -- সেখানে সুরের ব্যঞ্জনা। কিউ এর গলার শব্দ যেন বাড়ির পুসি বেড়ালের মিউ মিউ।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। নিজের মনে প্রশ্ন করি,—সুন্দরলাল থাপা যেমন লছমিকে থেকে মানসদার সাথে প্যাক্ড় করে দিয়েছিল-রুচীও কি নিজেকে আমার জীবন থেকে মুক্ত করার প্রয়াসে অথচ দায়বদ্ধতায় লাবণী বা কিউকে আমার জীবনের সাথে অত্যন্ত সচেতনতায় জুড়ে দিয়েছে। না কি রুচী নিজেকে রোহিতের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবেনা বলে নিজেকেই প্যাক্ড় করে রোহিতের কাছে চলে গেছে। কলকাতার নিজের সংসার থাকতেও ছেলের বাসায়, হায়দ্রাবাদে। বিচিত্র মানব চরিত্র। ভালবাসার রঙ কোনো কোনো সময় বড় দ্রুত বদলায়। ভালবাসা প্রতিটি মানুষের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে সুন্দর হয়ে আসে। ভালবাসার উপলব্ধি রুচী, কিউ ও আমার ভিন্ন ভিন্ন-স্বতন্ত্র। অথচ রুচী, কিউ ও আমি একই জগতে, পাশাপাশি, অত্যন্ত কাছাকাছি থেকেও মননের জগতে সকলেই পৃথক। রুচী হায়দ্রাবাদে, আমি কুমায়ুনে। কিউ হাঁটছে আমার পাশে পাশে। সুখের আলাপন আমাদের দুজনের অন্তরে। রুচী আসে, মনের জগতে তার হাজিরা নিয়মিত না হলেও প্রায়শঃ। রুচী আমার স্ত্রী। রুচী ও আমার বন্ধন বৈদিক সূত্রে আর কিউ আর আমার বন্ধন সম্পূর্ণ মনন সূত্রে। তবুও বন্ধন স্বীকার্য্য।

কিউ নিশ্চয় সুন্দরী, রুচী ও যৌবনে কম আকর্ষণীয়া ছিলনা। বয়সে কিউ ছোট, এমন কি আমার ছেলে রোহিত কিউ এর চেয়ে বয়সে বড়। কিউ তাজা, প্রচণ্ড তাজা। ফল আসা, ফুল আসার আগে শীতের লাউডগা যেমন লক্‌লক্ করে, কিউ লাউ ডগার

মতই সবুজ এবং সতেজ। শরীরে ও মনে পূর্ণ বসন্ত। আমি বৃদ্ধ প্রায়। বিগত যৌবন। কিউ এর সতেজ, যৌবন এ বৃদ্ধের মনে এবং শরীরে যৌবন না হলেও বার্দ্ধক্যকে বাধা দিয়ে পৌড়ত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমি ফিরে পেয়েছি আমার হৃতশক্তি আমি ফিরে পেয়েছি কাজ করার শক্তি। পূর্ণ শক্তি দিয়ে আমি আমার কাজে ফিরে এসেছি। আমার শরীরে এখন মাঝে মাঝে যৌবনের পদধ্বনি অনুভব করি। আমি মুগ্ধ, আমি আবিষ্ট, আমি সবাক চোখে কিউ এর প্রতি চেয়ে অনুভব করি আমার আনন্দ স্পন্দন।

কিউ এর প্রতি আমার অনুভূতি হয়তো এরকম নাও হতে পারতো যদি না রুচী স্বেচ্ছায় আমার সাথে তার স্বাভাবিক আচরণ বজায় রাখতো। এ সমাজ এ পরিবার গঠন হয়েছে মানুষের প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি গত অবস্থান হতে। স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতা, সব কিছুই নির্ভর করে বাস্তব অবস্থার নিরিখে। যৌবনে রুচীর আমার জীবনে আগমন অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকতার মধ্যে দিয়ে আমার গ্রহণ এবং রুচীর এবং আমার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ছিল সুস্থ্য স্বাভাবিক এবং হার্দিক। রুচী ও আমার কামনা বাসনায় পূর্ণতা পেয়েছে অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর ভাবে। যুবতী রুচী ও যুবক বসন্ত তাদের শরীর ও মনের কামনার পূর্ণতা পেয়েছে স্বাভাবিক ভারতীয় দাম্পত্য জীবনের পূর্ণ অনুভূতি মিশিয়ে, পুলকে, বিস্ময়ে। অপূর্ণতাজনিত বিষণ্ণতার স্থান ছিলনা কোথাও আত্মিক দিক হতে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন। সেই রুচীর পরবর্তী সময়ে এ হেন শীতল আচরণ আমার বোধগম্য ছিলনা, আজো নেই। সেজীবনে তৃতীয় ব্যক্তি বলতে রোহিত এসেছে রুচীর কোলে। লাবণী বা কিউ এর অস্তিত্ব অবান্তর। রুচীর জীবনে অন্য কোন ব্যক্তির থাকবে প্রভাব কোন কালে ছিলনা, আজো নেই। রুচীর এ হেন আচরণে, রুচীর সাথে বছর কয়েক ধরে যে জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম—শরীর ও মনে, তার অভাবে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতা আমায় গ্রাস করল। বিশেষ করে শারীরিক বৃত্তিগুলো আমায় অস্থীর করে তুলতো, অসহায় আমি ছটফট করতাম তবুও আমার সংযমি মন আমায় কখনো ধৈর্য্যের সীমার বাইরে নিয়ে যায়নি। রুচী অন্যান্য পারিবারিক আচরণেই তদ্রুপ শীতল কিন্তু দায়িত্ব সচেতন। আমার খাওয়া দাওয়া—খুটিনাটি প্রয়োজন গুলো মানদা মাসিকে নিয়ে যথার্থ পালন করতো। রুচীর এ জাতিয় আচরণের অর্থ আমি আজো বুঝতে পারিনা। কিন্তু ফল হল মানসিক অবসাদ থেকে জীবন বিতৃষ্ণা, স্বাভাবিক ভাবে আমার লেখার ইচ্ছা থেকে, লেখার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। অর্থহীন, অসহায়, সন্ত শরীরে মনের সাথে লড়াই করে হলাম নিঃস্ব, রিক্ত, জীবন্মৃত আমি বসন্ত বাসু। একসময় মনে হতো, আমি আমার কাজে ব্যস্ত থাকি, রুচী ও রোহিতের জন্য সময় দিতে পারিনা।

সেজন্যই কি? কিন্তু না। আমি সে চেষ্টা করেও দেখেছি, ফল হয়নি। বরং লেখায় অমনোযোগি হলেই রুচী ভৎর্সনা করতো। আমার বিষয় এবং বিষয়ের প্রতি অনুরাগে রুচীর বিস্ময় ছিল এবং সেই বিস্ময় থেকে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা থেকে ভালবাসা এবং পরিণতিতে বিয়ে সংসার। রুচী আমার কাজের প্রধান সমর্থক ছিল, আজো আমার কাজকে সে শ্রদ্ধা করে। কাজের জন্যে দেশে বিদেশের বিভিন্ন স্থানে দিনের পর দিন গেছি কিন্তু রুচীর অনুযোগ শুনিনি কোনদিন। অস্বাভাবিক শান্ত, সমাহিত, সম্ভ্রান্ত মনের নারী রুচী। স্বামী হোক, সন্তান হোক নিজের সুখের জন্য ইচ্ছা পূরণের কারণে কখনো কারো জীবনে অনুপ্রবেশ বিরোধী ছিল সে। আমার আদর্শ, আমার ভ্রমণ, বাড়িতে আমার অনুপস্থিতি

কোনকালেই তাকে ব্যাকুল করেনি। সে ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বয়ংসিদ্ধা, আত্মতুষ্টা। তবুও জীবন জীবনের ধর্ম মেনেই চলে। লেখার ক্ষমতা হারিয়েছি, সুখের কামনা করিনা, বাসনা লুপ্ত, স্থবীর শরীর ও মন নিয়ে শুধু বেঁচে আছি। দীর্ঘদিন। সময় বয়ে চলেছে নির্দিষ্ট নিয়মে। একমাত্র বেনিয়ম আমি। লাবণী এল। লাবণী, কিউ হল। হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন নিয়ে, হারিয়ে যাওয়া মন নিয়ে অসহায়, পৃথিবীতে যার কেউ নেই, রোরুদ্যমানা।— আমার পাশে পাশে হাঁটছে। আমার জীবনে দ্বিতীয় নারী। দুই নারী স্বতন্ত্র এবং প্রভাবশালী। নারী বৈচিত্রময়ী চিরনতুন এবং চির অচেনা।

কিউ হাঁটছে আমার পাশে পাশে। ওর হাতের গরম তালুতে আমার হাতের আঙুলগুলো গরম। পাহাড়ের বিকাল বিষণ্ণতা মুক্ত। দিনের উত্তাপে উত্তপ্ত বিকালে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় মোহ আছে, আরামের আবেশ আছে। একটা পুরানো গাছ। বোটানিকাল নাম জানিনা। স্থানীয় লোকেরা বলে বাজ গাছ। বাজ গাছ ধরে রাখে পাহাড়ের শীতলতা, পাহাড়ের অস্তিত্ব। পাহাড়ের মাটি ধরে রাখে বাজ গাছ। কর্কশ এর পাতা, মোটা, দেখতে অনেকটা তেজপাতার মত। পাতার দুপিঠে দুই রং, ওপরের দিব ঘন সবুজ নিচের দিক ফিকে। হাওয়া আর বিকালের রোদে পাতাগুলো উল্টে যায়, সূর্যের আলোয় ঝকমক করে দূর থেকে দেখলে মনে হয় সিলভার রঙের ফুল ফুটেছে ডালে। অনেক উঁচু ও মোটা, কর্কশ ফাটা কালো গা। অতিতে এই পাহাড়ে বাজ গাছ ছিল সংখ্যায় অনেক মানুষ, কেটে ধ্বংস করেছে। গাছ বন্ধু জেনেও গাছের শত্রুতা করে নিজেরা প্রকৃতির শত্রু হয়ে উঠেছে মানুষ আজো বোঝেনা। লোকেদের ধারণা এই গাছের পাতা শীতল হাওয়া আকর্ষণ করে, শীতলতা রক্ষা করে। বাজ গাছ কাটার ফলে শীতলতা হ্রাস পেয়েছে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফল সুস্বাদু আপেল এ পাহাড়ে আর জন্মায়না। অথচ এককালে এখানকার আপেল প্রসিদ্ধ ছিল। এই ভাবেই প্রতিদিন কত প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা ধ্বংস করছি, প্রকৃতি ভারসাম্য হারাচ্ছে, আমরা দিনে দিনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছি। চলতে চলতে দাড়িয়ে পড়ে মৃদু হিল্লোলিত ঐ সবুজ আর রূপালী পাতায় আলোর ঝিকিমিকি দেখতে লাগলাম। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিউ আমার হাতে ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। নিরিক্ষণ করুক। পাহাড়ের সৌন্দর্যে ওর সুন্দর মন স্নাত হোক পুষ্পিত হবে। বিষণ্ণতা ফিরে পাবে তারুণ্যে বরণ করবে সুন্দর জীবন।

—বসন্ত, এই গাছগুলো এই পাহাড়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—না?

—প্রহরী। পাহাড়ের প্রহরী ওরা। ওরা একমাত্র তাদের শিকড় ছড়িয়ে মাটি ও পাহাড় এবং পাতার সাহায্যে শীতলতা বজায় রেখেছে। এই গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হয়। মানুষের শত্রুতাও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনেক গাছ নিঃশেষ হয়ে গেছে। নতুন জন্মের খবর সে তুলনায় নেই বললেই চলে। অথচ ঐ গাছগুলোই এই পাহাড়ের রক্ষাকর্তা বা প্রকৃত প্রহরী। অথচ লক্ষ্য করো, এত অত্যাচার হতে নিজেদের রক্ষা করে যারা বেঁচে আছে তারা কেমন খুশিতে হাসে। লক্ষ্য করো দেখো সামনে বাজ গাছটি সূর্য্যের আলোয় অপূর্ব হাস্যমুখর।

—তোমার কি মনে হয়, ওদের বংশধর থাকবে?—প্রাচীন গাছ।

—মানুষ বাঁচিয়ে রাখলে থাকবে।

কিউ বুকের ওপর দুটি হাত রেখে গাছ দেখে, পাতা দেখে, পাতার রঙ দেখে, সূর্য্যের আলো দেখে, আমি সিগ্রেট বের করে জ্বালায়। লক্ষ্য করি কিউকে। দূর থেকে দেখলে

প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে কিউকে মনে হবে একটা অপূর্ব সুন্দর ছবি পড়ন্ত বেলায় প্রকৃতি মুগ্ধ এক প্রকৃতি প্রেমিকা, প্রকৃতির প্রেমে মগ্ন হয়ে বিস্মৃত নিজের অস্তিত্ব। মগ্ন কিউ। থাক্ মগ্নতা নিয়ে, প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে। মানসদা কিউ এর সাথে অন্যায় করেছে। কিন্তু মানব সঠিক ভাবে নির্বাচন করেছিল তার বন্ধুকে যে যথার্থ জীবনসঙ্গিণী হতে পারতো। হয়নি।

মানসদা'র সম্পর্ক ছিন্ন বহুদিন। ফোনে কথাবার্তা বিশেষ হয়না। মানসদার মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে ব্যাপক। পারিবারিক ভারসাম্য হারিয়েছে ভীষণভাবে। একমাত্র ছেলে মানবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন। সে বছরের বর বছর বাড়ি ফেরেনা। বিচ্ছেদের বেদনা মানসদা ও বৌদির মনের ওপর যে বেদনা সৃষ্টি করেছে, যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছে, তার প্রভাব বেসামাল করেছে উভয়কে। মানসদা ভগ্নস্বাস্থ্য, দৈনা মানসিক অবস্থা, একদম বুড়ো হয়ে গেছে। কোথাও বেড়োয়না। সকলের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করেছে। অসহায় সম্পূর্ণ একা। বৌদির শরীরের অবস্থা মানসদা অপেক্ষা খারাপ-হাই-প্রেসার, হাত পায়ের চামড়া গেছে কুঁকড়ে। খাওয়া দাওয়া অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। মানসদার মেয়ে মালবিকা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। বেশি বয়সের সন্তান স্বভাবতঃই বাবা মা দুজনের অত্যন্ত আদরের সন্তান। আদুরে মালবিকা। মানসদা কলকাতায় বদলি হয়ে আসার পর মালবিকার জন্ম। একে বেশি বয়সের সন্তান, তার ওপর লাবণী, যাকে কন্যাসম স্নেহে পালন করেছে। তাকে মানসদা তার নিজের কাছ হতে আমাদের কাছে চিরকালের জন্য স্থানান্তরিত করেছে বা নির্বাসিত করেছে, তার দুঃখ ভোলার কারণেই হোক, মালবিকার প্রতি উভয়েরই স্নেহের প্রাবল্য বেড়ে গেছে অত্যন্ত। বাবা মা দুজনে মেয়ে বলতে পাগল। অতি স্বাভাবিক। তার ওপর মানবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন এবং বিষাদমণ্ডিত মানসিক অবস্থা। লাবণীকে বিসর্জন দিয়ে মানসদার যে অর্ন্তদাহ সৃষ্টি হয়েছে তা অন্তহীন একমাত্র ছেলে মানব বাবা মার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, যার ফলে যে শূন্যতার জন্ম নিয়েছে তা থেকে পরিত্রান পাওয়া বা স্বান্তনার আশ্রয় মেয়ে মালবিকা। মালবিকাকে যে কারণে দুজনে কখনো চোখের আড়াল করেনা। স্কুল থেকে না ফেরা পর্যন্ত দুজনে রাস্তার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে। ছোট মেয়ে মালবিকা দাদা মানব এবং লাবণী দির প্রতি বাবার ব্যবহারে অখুশি। যদিও শ্রাবণী বৌদি ও এ রকমটি চায়নি। যদিও মানব এবং লাবণীর অবৈধ সম্পর্ক তিনি পছন্দ করতেন না তবুও বৌদি চায়নি তার একমাত্র ছেলে পর হয়ে যাক, তার বাবা মাকে ত্যাগ করুক। তিনি চাননি লাবণী তার পুত্রবধূ হোক আবার এটাও চাননি লাবণী এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাক্। তিনি মনে করতেন ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। লাবণী ও মানব নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিজেরাই একে অপরের কাছ হতে দূরে সরে যাবে। লাবণী ও মালবিকার মধ্যে বোনের মত আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

মনের ভিতর বিক্ষিপ্ত ভাবনার আনাগোনা। ধীরে ধীরে পদচারণা করি। পদচারণা, মুক্ত হাওয়ায় বুকভরে সতেজ অক্সিজেন গ্রহণ করা আর পাহাড়ের সৌন্দর্য্য বিস্মিত চোখে দেখা। এই তো আমাদের প্রতিদিনের অবসর যাপন। দেখি, দূর হতে একজন নেপালি মুটে এক বস্তা আটা পিঠে চাপিয়ে হোটেলের গোডাউন থেকে হোটেলে নিয়ে যাচ্ছে। দুটি স্থানের দূরত্ব এক কিলোমিটার তো হবেই। কোমড় থাকা মাথা পর্যন্ত সামনে ঝুঁকে গেছে। আর মাথায় বেল্টের মত কিছু দিয়ে মাথার সাথে ঝোলানো বস্তা। কঠোর

পরিশ্রম করে। দূর থেকে ওর শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাশ দিয়ে দুহাত জোর করে নমস্তে জানায়। আমি ঘাড় নেড়ে প্রত্যুত্তর দিই। দিনের মধ্যে বহুবার এরকম বস্তা বহন করা কাজ ওদের। ওর মত অনেক নেপালি কে আমি দেখেছি। সব দিনমজুর, এই মজুরটি আমার লজের উল্টো দিকে থাকে। ছোট বেলায় নেপাল থেকে কাজের খোঁজে এসে কাজ পেয়েছে। একজন পাহাড়ি মেয়েকে বিয়ে করেছে—পাহাড়ি; দেহাতি বৌ। ছোট ছোট ছেলে ও মেয়ে আছে।

এই সময় দেখি, কিউ একটা রঙিন প্রজাপতি ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে। চালাক প্রজাপতি কিউ এর তাড়ায় এ গাছ থেকে অন্য গাছে, এক ডাল থেকে অন্য ডালে উড়ে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ধরা দেবে কেন? ধরার সময় গতি বেড়ে যাওয়ায় জড়িয়ে যাচ্ছে শাড়ি পায়ে।

—কিউ পড়ে যাবে। ওটা ধরছো কেন? কি করবে?

—হাতে করে দেখতাম। কি সুন্দর দেখতে বলো?

—সুন্দর বলেই ধরতে হবে। দূর থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে।

—কলকাতায় প্রজাপতি দেখা যায়না।

—গাছ আছে না ফুল ফোটে যে প্রজাপতি—

ব্যর্থ হয়। আশা ত্যাগ করে। বিরত হয় প্রজাপতি ধরা থেকে। আবার কিছু পথ এগোনো। জন বিরল এপথ। একটা দুটো লোক, কয়েকটা হোটেলমুখি গাড়ি,—লোকেরা পাকা সড়ক কম ব্যবহার করে। নিচের পাকদণ্ডি দিয়ে এখন যেমন ঘাসের বড় বোঝা মাথায় চলেছে এক রমণী—নিশ্চয় ছাগল বা গরু আছে। আবার অনেক সময় এ ঘাসগুলো শীতের আগুন করার জন্য শুকিয়ে পাঁজা করে রাখে। একহাতে কাটারি, অন্য হাত ঘাসের বোঝা ধরে আছে। পরনের শাড়ি রঙিন কিছুটা গুটিয়ে কোমড়ে গোঁজা, তার নিচে পা পর্যন্ত পেটিকোটে ঢাকা, সস্তার চপ্পল তো আছেই। পরনের শাড়ির আচলে ঢাকা মুখের সামনের দিক—অনেকটা ঘোমটার মত। দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে জন্মানো ঘাস-মেয়েরা কাটে-সংসার তো মেয়েদের!

সূর্য নামছে পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে। আকাশে শীতল রোদ্দুর, ছায়ার বিস্তার পাহাড়ে। ছায়াতে ঠাণ্ডার আমেজ কিউ গরম জামা নেয়নি।

—চলো ফিরি।

—এত তাড়াতাড়ি?

—তোমার ঠাণ্ডা লাগবে। গরম জামা নিয়ে বেড়োওনি। পায়ে মোজা নেই—

—আমার শীত করেনা।

অতএব চলি। হাঁটতে ভালই লাগে। পায়ে পায়ে সামনে চলা—পিছনে ফেলা জীবন। উলের টুপি টেনে কান ঢেকে নিই। কিউ হাঁটে। লাল ব্লাউজের ওপর দীর্ঘ গ্রীবা, কানে ঝুমকো দুল। সবুজ শাড়িতে টান টান করে জড়ানো শরীর। উন্মুক্ত নাভিদেশ মসৃণ, কোমল হিলের গুনে না চলার গুনে জানি না-ধীরে চলার গতি অথচ হিল্লোলিত নিতম্ব স্পষ্ট। সূর্য অস্ত গেছে। ছায়ার আচ্ছাদনে সবুজ পাহাড়। পাখীদের কাকলি স্তিমিতপ্রায়। ফুলদলের উজ্জ্বলতা ম্লান—বিশ্রামের অপেক্ষা অন্ততঃ এই আঁধারটুকু দুষ্টপ্রজাপতির হাত থেকে রেহাই। দূরের একটা পাহাড়ে একটা—দুটো বিজলি বাতি জ্বলেছে। দিনে দু একটা ঘর দেখা যায়। অর্থাৎ লোক বাস করে—অনেক উঁচু। পাকা

সড়ক নেই। —কি করে থাকে লোকেরা? বিপদ আপদ, অসুখ বিসুখ তো মানুষের হয়। হলে? নিশ্চয় শীতকালে বরফে ঢাকা থাকে। মানুষের অশেষ ক্ষমতা—অগম্য কোন স্থান নেই।

—ক'টা বাজে বসন্ত?

—সাতটা।

—এখনো দিনের আলো। দেখেছো ঐ পাহাড়ের চূড়াগুলো কেমন রঙিন।

—পশ্চিম দিকে। সূর্য অস্ত-যায়নি—পাহাড়ের আড়ালে সরে গেছে। অস্তগামি সূর্যের রঙ।—দিনান্তের রাঙা আলোয় রাঙানো আকাশ।

—আস্তে আস্তে মুছে যাবে রাতের আঁধারে চলো ফিরি। তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

কিউ পাশে আসে। আমার হাত ধরে। আমরা ফিরি। কয়েক মূহুর্ত কিউ দুটি হাত দিয়ে আমার দুহাত ধরে, অপেক্ষা করে, চোখ তুলে আমার চোখের দিকে তাকায় অনুরাগ মেশানো সে দৃষ্টি আমার চোখের আবেশে একাকার হয়ে যায়। উভয়ের হৃদয়ের উষ্ণতায় অর্ন্তহিত হয় প্রকৃতির শীতলতা। লজের পথে সেদিনের মত পা বাড়ায়। কিউ এর ডান হাতে বন্দি আমার বাঁ হাত। উষ্ণ হাত, আমার শীতল হাত কিউ এর উষ্ণ হাতের স্পর্শ পায়। উষ্ণতা বিস্তারিত হয় ধমনী হয়ে মস্তিষ্কে। ফেরায় ও আনন্দ আছে। অনুভব করি শিরা, উপশিরা ও পেশীতে।

রেস্ট হাউসের আলোয় দীগ্ অপেক্ষায় ছিল। দেখলাম তার নীরব চোখের প্রতীক্ষা। যে প্রতীক্ষায় উৎসাহ নেই, উদ্বেগ নেই, ক্লান্তি নেই---শুধুই প্রতীক্ষা। ওর বৌ নিচের কলে কাপড় ধুচ্ছে---থপ্থপ্ শব্দ। প্রতি সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে বাসন মাজা, কাপড় কাচা মাথা না ভিজিয়ে স্নান করা নিত্যদিনের কাজ। এর পর ডাল বানাবে, রোটি বানাবে, খাবে, আলো নিভিয়ে এক বিছানায় ছেলেমেয়ে স্বামীর সাথে ঘুমোবে।

আমি পা গুটিয়ে লম্বা সোফায় বসলাম। কিউ ঘরে পোষাক বদলায়। দিগ্ এসে হাত জোর করে সামনে দাড়ায়। মায়া হয় ওদের দেখে। "পশ্চাতে রেখেছো যারে / সে তোমারে....

—তোমার বিবি এই ঠাণ্ডাতে—

—কিয়া করেগা সাব্, ঠিকেদারকা কাম—গন্দা—

—ঠাণ্ডায় শরীর খারাপ হবে না—যদি—জুখম—

—নেহি সাব্, আভি গরমি হ্যায়—

এখন গরম। বাহাদুরের বিবি অন্ধকারে স্নান করছে, ওর শরীর খারাপ হবেনা। ওর বিবি বাসন মাজবে, জামা কাপড় কাঁচবে—তার ঠাণ্ডা লাগবেনা। আমরা জুতো জামা সোয়েটার পরে শুয়ে বসে আছি। দরজা জানালা বন্ধ। ওদের ঠাণ্ডা লাগেনা, অসুখ করেনা। ভারতবর্ষের গরীব মানুষের ঠাণ্ডা লাগেনা!

কিউ পোষাক বদলে বেড়িয়ে আসে।

—বাব্বা! বাঁচলাম! এতক্ষণে আরাম লাগছে। শাড়ি পরা ঝামেলার—

—মেম্ সাহেব কিয়া করেগা—চায় ইয়া কফি?

—সেফ্‌মে নমকিন প্যাকেট আছে, লে আও।

—জী।

—শুনো, প্লেটমে ঢালকে লানা—যাস্তি নেহি-কম করকে

—জী।

সোফায় বসে। আমার পাশে। ত্যাগ করেছে শাড়ি, ব্লাউজ, কপালের টিপ, কানের দুল। ঠাণ্ডা জলে পরিষ্কার কোরে হাত মুখ ধুয়েছে। চুলে চিরুনি বুলিয়েছে। হাতে ক্রিমের টিউব। গায়ে রাত্রির পোষাকের ওপরে শাল চাপিয়েছে।

—তুমি হাত মুখ ধোবেনা?

—হাতে মুখে কি হল? নোংরা নেই।

—বাইরে থেকে ফিরলে।

—এখানে ঘর-বার-দুটোই এক।

—তবুও—

—পরে ধোবো।

—ঠিক আছে। বাহাদুর, তুম গীজার অন্ কোরো। দীগ্ প্লেটে করে নমকিন নিয়ে আসে। নমকিন্ মানে নিম্‌কি। এখানকার খাবার দোকানের নিমকি খুব চলে। কিউ হাত বাড়িয়ে ধরে নেয়।

—পানি?

—নেহি, বসন্ত জল খাবে?

ইতস্তত করি ঠাণ্ডা জল। কিউ বোঝে। বাহাদুরকে গরম জল ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে আনতে বলে। জী, জবাব দিয়ে দিগ্ কিচেনে।

কাচের জানালা ঘেরা চারিদিক বন্ধ ঘর। লো ভোল্টেজ। দূর্বল আলো। দিগ্ জল খাওয়ায়। গরম চা খাওয়ায়। কিউ এর নির্দেশে কিচেনে ঢুকে রাত্রের খাবারের প্রস্তুতি শুরু করে। কিউ ক্রিম নিয়ে গালে হাতে মুখে ঘসে। বন্ধ ঘর। সিগ্রেট খাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও বিরত হই। ঠাণ্ডায় ব্যালকুনিতে যেতে ইচ্ছা করছে না। চুপচাপ বসে থাকি। নির্বাক। আমি আমার মত চিন্তায় ভেসে যায়। কিউ বসে থাকে। হালকা আলোয় কিউ এর মুখের চেহারা অস্পষ্ট। তবুও বোঝা যায় কিউ এর মন চুপ করে নেই। রাত্রি বাড়ে। বাড়ে ঠাণ্ডা। কিউ দুপা সোফায় তুলে নেয়। চাদর দিয়ে গা হাত পা ঢেকে নেয়। আমার দুটি নগ্ন হাত কিউ এর চাদরের নিচে আশ্রয় পায়। এ পাহাড়ে কোলাহল নেই। এমনকি কোন মানুষের কথাবার্তা, রাস্তায় কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক, নিস্তব্ধ পাহাড় যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। একমাত্র কিচেন হতে দিগ্ বাহাদুরের খুট্‌খাট আওয়াজ আসছে কানে। নিস্তব্ধ, এ পাহাড়ে কোলাহল মুখর পৃথিবীর দুটি অসম বয়সি বড় কাছের মানুষ আপন আপন জীবন নিয়ে অতিত, বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরে চিন্তামগ্ন। কখন বিব্রত, কখনো পুলকিত। অথচ অপ্রকাশ্যে। দুজনে দুজনের কাছ হতে সম্পূর্ণ গোপন করে। অথচ দুজনে দুজনের কাছে নগ্ন সম্পূর্ণরূপে তবুও মনে মনে উভয়েই আমরা নিজেদের কথা নিজেরাই বলে, শুনে, উপলব্ধি কখনো পুলকিত কখনো বিষাদে মথিত হচ্ছি। আমার মনে হয় আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সম্পূর্ণ নগ্ন হতে পারেনা। প্রত্যেকেরই মনের ঝুলিতে কিছু ধ্যান ধারণা কামনা-বাসনা অবশিষ্ট থাকে। সময় পেলেই মানুষ সকলের অলক্ষ্যে সেগুলো ঝুলি থেকে বের করে, দেখে, অনুভব করে আবার ঝুলিতে ভরে রাখে, মুক্ত হতে পারেনি কিউ। পারেনি রুচী। আমি কি পেরেছি?—উত্তর 'না', অবশ্যই না। কিউ আমার বন্ধু। বন্ধুর চেয়ে বড়। সম্পর্ক-বিচারে কিউ এবং আমার সম্পর্ক সঙ্গায়িত করা যায়না এক কথায় কিউ আমার বড়

আপনার। এ পৃথিবীতে বর্তমানে আমিই কিউ এর আশ্রয়স্থল, আশ্বাসস্থল, বিশ্বাসনীয়: একান্ত একক এবং আপনার। এই কিউকি উন্মুক্ত করেছে তার মনের আনাচে কানাচে জমে থাকা সমস্ত অনুভূতি। অথচ আমি কিউ এর মনের গোপন আস্তানায় বার বার হানা দিয়েছি, সন্ধান করেছি সেই কোমল স্থান যেখানে আঘাতের পর আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছে, সন্ধান করেছি সেই স্থল সেখানে লুকিয়ে আছে কিউ এর সেই স্বর্গীয় আনন্দ ঘন মূহুর্তের অনুভূতিগুলি। পারিনি সেই মূহুর্তগুলি, যখন কিউ এর প্রথম যৌবনের অন্তরে ভালবাসার উন্মেষকালে মনের আকাশ প্রত্যুষের রঙে রাঙিয়েছিল যখন কিউ এর প্রণয় পাত্র মানবকে দেখে বা না দেখে আকরণে শিহরিত হতো, কিম্বা কোমল স্পর্শকাতর স্থানগুলো স্পর্শ ব্যতিরেকেও স্পর্শের অনুরণণ অনুভব করতো, কল্পনায় মানবের ওষ্ঠস্পর্শে সিক্ত হতো কিউয়ের দৃষ্টি ওষ্ঠ কিম্বা দুজনে পড়ার টেবিলে মুখোমুখি বসে কল্পনায় লিপ্ত হতো তৃপ্ত সঙ্গমে—তারপর একসময় মাথা নিচু করে লুকিয়ে পরতো চোখের আড়ালে। যৌবনের প্রথম প্রণয়ের বিলাস—পার্থিব কিম্বা অপার্থিব কিউকি আমায় বলতে পেরেছে। তবু আমি সংগ্রহ করেছি যখন কিউ আপন দুঃখে প্রলাপের মত আপন মনে বলে যেতো সে প্রণয় কথা। কিউ আমার হাত ওর চাদরের নিচে ঢুকিয়ে নিয়েছে। ধরে আছে নিজের দুহাতে, কথা নেই, কোন সঞ্চালন নেই, অথচ এই মুহূর্তে আমি নিশ্চিত যে কিউ ফিরে গেছে তার পেরোনো কৈশরে এক যুবকের কাছে, যার নাম মানব, মানবদা, মানসদার ছেলে। আমি ওর হাতের স্পর্শে আধো আলোয় মুখের পাশ হতে শুনতে পাচ্ছি ওর হৃৎপিণ্ডের দ্রুত গতিময়তা। স্বল্পস্থায়ী। অনুভব করছি কখনো কখনো তার হৃৎপিণ্ডের গতির অস্বাভাবিকতা অর্থাৎ বিষাদ স্পর্শ, প্রণয়পাত্র হারানোর অন্তহীন ব্যথা। কিউ এখনো ভাবে, মনে মনে বলে, মনে মনে হাসে-কাঁদে। ভুলতে পারেনি সে। সে ভুলতে পারেনি সেদিনের কথা যেদিন সেই সল্টলেকের বাড়ি হতে অপসারিত হয়ে অজানা আশ্রয়ে দুকুল ছাপিয়ে কান্নায় বিহ্বল। বজ্রের আঘাতে প্রাণপাত হয় কিন্তু সেদিনের সে আঘাত বজ্রের আঘাত অপেক্ষা কঠোর, প্রাণে বেঁচে প্রাণ ব্যতিত সব কিছু হারানো—সেদিন যদি কিউ এর প্রাণ যেতো তবুও শান্তি থাকতো। কিউ এসে আশ্রয় পায় রুচী ও আমার ফ্ল্যাটে। আমি হতবাক্। কোন ভাষায় সেই মুহূর্তে প্রকাশ করবো মানসদা এ অন্যায়। অন্যায় কিউ এর ওপর, মানবের ওপর, আমাদের ওপর, শুধু রুচী কিউকে হাত ধরে টেনে নিয়ে ওর পাশে বসায়। মাথায় গায়ে হাত বুলায়, শান্ত হবার পরামর্শ দেয়। আমি অন্য সোফায় সম্পূর্ণ বিকৃত মুখে ঘাড় নিচু করে বসে থাকি। নিচে ট্যাক্সির শব্দে বুঝতে পারি মানসদা চলে গেল।

কিউটির আঙুলে চাপ দিই। যাতে ওর চিন্তায় বাধা সৃষ্টি হয়। যাতে কিউ বর্তমানে ফিরে আসে। কিউ যাতে অনুভব করে যে ওর গায়ের গরমে আর একজন কেউ বসে আছে। ইত্যবসরে পার হয়ে গেছ সময়। কিউ আমার হাত দুটো কোলের মধ্যে টেনে নেয়, ওর শরীরের সাথে চেপে ধরে, ছেড়ে দেয়।

—আজকের কাগজে ভারতবর্ষে জন্মের হারের যে রিপোর্ট বেড়িয়েছে দেখেছো?—ভয়াবহ অবস্থা।

—না, দেখিনি।

—কাল পড়ে নিও।

—বোসো, আমি আসছি, দেখে আসি বাহাদুর কি করছে? ওকে ভেন্ডি ধুয়ে কাটতে

বলেছি।

—ওর আন্দাজ নেই—হয় কম না হয় বেশি করে কেটে ফেলবে।

চাদর ছেড়ে উঠে যায়। আমি খবরের রিপোর্টটা মনে মনে ঝালিয়ে নিই। যদিও এ সমস্যা সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল তবুও তথ্য থেকে প্রকৃত ভয়াবহ চিত্রের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতহারে বাড়ছে। যথার্থ জন্মনিয়ন্ত্রণ আজো বহু দূরে। ভারতবর্ষে চল্লিশ বছরের নিচে সাতসন্তানের জননীর সংখ্যা দুলক্ষ সত্তর হাজার পনেরো বছরের চেয়ে কম বিবাহিতা মেয়ের সংখ্যা পনেরো লক্ষেরও বেশি। তার মধ্যে এক বা একাধিক সন্তানের জননী ও আছে অর্থাৎ পনের বছরের বয়েসের মায়েদের এক বা একাধিক সন্তান হচ্ছে। এ ছাড়াও আছে চার পাঁচ, ছয়, সাত আট সংখ্যা সন্তানের জননী সাথে সাথে। এতে জনসংখ্যা যেমন বাড়ছে। সুস্থ সন্তানের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় দেশে সুস্থ নাগরিক হওয়া। অসুস্থ পঙ্গু, নিরক্ষর নাগরিক দ্বারা সুন্দর সভ্য উন্নত দেশ কল্পনায় রয়ে যায়, স্বপ্নে রয়ে যায়, বাস্তবে হয়না। ভারতবর্ষের উন্নতিতে জনসংখ্যার সমস্যা প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক। দেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

অল্প সময় পরেই ফিরে আসে। একই শালে আমাকে জড়িয়ে নেয়, জড়িয়ে ধরে ঠাণ্ডা তাড়াতে না নিজের চিন্তা এড়াতে জানিনা। অন্ধকারে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, ওর আচরণ সমর্থন করি।

—তোমার ক্লান্তি লাগছে বসন্ত? হাঁটা কি বেশি হয়েছে?

—না তো। এরকম ঠাণ্ডা জায়গায় থাকা অভ্যাস আছে। বরং ভালো আছি। কোলকাতায় গরমে কষ্ট হয়।

—তবে চুপ করে আছো কেন? কোন কথা বলছোনা। কত সময় হয়ে গেল আমি তোমার পাশে বসে আছি।

—সে তো আমিও আছি। তুমি কিছু বলেছো?—বলোনি। আমি বলিনি এই কারণে যে, যেন মনে হ'ল তুমি আমার পাশে থাকলেও তোমার মন ছিল এখান থেকে দূরে, অন্য কোথাও—আমি অহেতুক তোমায় বিরক্ত করতে চাইনি।

—বেশ করেছো। আর তুমি কি করছিলে?

—কিছুনা। স্রেফ্ চুপ্‌চাপ্। মাঝে মাঝে সংবাদ পত্রের রিপোর্ট নিয়ে চিন্তা করছিলাম। এখানকার লোকেদের কথাও মনে আসছিল। এইরকম বিচ্ছিন্ন কিছু চিন্তা ধারাবাহিকতা বহির্ভূত।

টেলিফোন বেজে ওঠে। বলা ভালো। পাহাড়ের এই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও টেলিফোন পরিসেবা সুন্দর ভাবে চালু আছে। কলের জল, বিজলি বাতি, টেলিফোনে যোগাযোগ ব্যবস্থার মত আধুনিক সুবিধা গুলি বর্তমান। দিগ্ কথা বলছে।

—জী? —জী? মেম্‌সাব? —জী। আপ্ রাখিয়ে—জী-জী।

—কিউ দেখো তোমার কল আছে, মনে হচ্ছে। কিউ চাদর খুলে উঠে, টেলিফোন ধরে, কথা বলে।

কথা বলে শেষ করে কিচেন ঘুড়ে আবার বসে চাদর জড়িয়ে।

—এই বিজনে, নির্জনে তোমায় কে ফোন করলো? কেউ তো তোমায় ফোন করে বলে মনে হয়না।

—কেন বলবো? নিশ্চয়ই এমন কেউ হবেনা যে যার নাম জেনে তুমি জেলাস্ ফিল করবে?

—জেলাস তো হবই না, বরং সেরকম কেউ হলে, আমি খুশি হবো।

—সেদিন বা সে সুযোগ আর আসবেনা, বসন্ত! আমার এক বান্ধবি। একসাথে কলেজে পড়তাম। কলেজ শেষ হয়ে গেলেও ওর সাথে যোগাযোগ এখনো রয়ে গেছে। বিয়ের পর স্টেট্সে চলে গেছে। মাঝে মধ্যে ফোন করে, নিজের খবর দেয়, আমার খবর নেয়। কোলকাতায় ফিরে আমায় রিং করলো। কলকাতায় থাকতে ওর সাথে কথা বলার সময় জানিয়েছিলাম আমি বাইরে যাচ্ছি, সেই সময় এই লজের ফোন নম্বর ওকে বলেছিলাম। ছুটিতে ছেলের সাথে দেখা করতে এসেছে। ছেলে কোলকাতায় মামার বাড়ি থেকে স্কুলে পড়ে। ডনবস্কো স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ে। একমাত্র ছেলে।

—কোলকাতার খবর কিছু বলল?

—বেশি কথা তো হলনা। বলছিল—ভেরি হট্, আনবিয়ারেবল—অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে কিনা। কোলকাতার মেয়ে, কোলকাতায় মানুষ। বাইরে থেকে ফিরে কোলকাতা অসহ্য মনে হচ্ছে। বাংলায় অনার্স ছিল—আমার মত। বিয়ের পর স্টেট্সে যাবে বলে স্পোকেন ইংলিশ পড়েছে, প্র্যাকটিস্ করেছে। কেমন বলো? বাংলার ছাত্রী। শেষ পর্যন্ত বাংলা ত্যাগ করে ইংরাজি বলা শিখে বিদেশে পাড়ি। কেমন কনট্রাডিক্শান—তাই না?

—এ রকম হাজারো আছে।

—তাই।

কিউ এর জীবনও এরকমটি হতে পারতো। ছেলে কিম্বা মেয়ে—একটি সন্তান, বিদেশে না যাক্ সন্তান স্বামী নিয়ে সংসার। হয়নি। সব কিছুই কি নিয়ম মেনে চলে? জীবনের ছকে—সাধারণ নিয়মে সকলের জীবন অতিবাহিত হয়?—হয়না। কিছু অনিয়ম, কিছু নিয়মছাড়া, কিছু ব্যতিক্রম বা অস্বাভাবিকতাও জীবনেরই অংশ। কিউ ব্যতিক্রমের দলে।

—কাগজের র‍্যাকে আছে। তুমি পড়লেই বুঝতে পারবে। কি লাগবে না লাগবে—তোমার জানা তবুও লাগতে পারে।

—বেশ যা করার করবো। বেড়াতে এসে রিপোর্ট ছাড়ো। রিলাক্স্ বসন্ত-রিলাক্স্

—আমি তো তাই চাই। তুমিই তো ব্যস্ত করো, কোলকাতায় ফিরে তাড়া লাগবে।

সাড়ে নটা। বাইরে থেকে তাওয়ার শব্দ পাচ্ছি। নিশ্চয় রুটী সেঁকছে। রান্না রেডি। পাহাড়ে সাড়ে নটা মধ্য রাত। দিগ্ একমাত্র আমাদের সাথে জেগে। আমাদের খাওয়ানোর পর ছুটী পাবে। উঠে পড়লাম। গীজারের গরম জল হাত মুখ পরিষ্কার করে খাবার টেবিলে।

রাতের খাবার পর এবার শোবার পালা। নিস্তব্ধ পাহাড়ে, তারা ঢাকা আকাশের নিচে লজে আমি ঘুমাবো, কিউ ঘুমাবে। প্রতিরাতের মত কিউ রাতের পোশাকের নিচে নগ্ন শরীর কম্বল দিয়ে ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করে আরামে ঘুমাবে। তার আগে সামান্য ত্বকের পরিচর্যা। শাল খুলেছে, গরমের জামা খুলেছে টায়োলেট ঘুড়ে খাটে বসে ক্রীম লাগাচ্ছে, গালে গলায় হাতে পায়ে। আলো জ্বলছে, হালকা আলো হলেও কিউ এর নগ্নত্বকে ক্রীম পরিবেশন দৃষ্টি নন্দন। ক্রীমের গন্ধে কিউ এর শরীরের গন্ধ উত্তেজক। অনুত্তেজিত আমি এই নরম আলোয় কিউ এর ত্বক পরিচর্যা প্রতিদিনের মত উপভোগ করছি মহাসুখে।

কিউ এরপর নিজের খাটে নিজের কম্বলের নিচে না ঢুকে অবশ্যই আমার কম্বলের নিচে ঢোকে। যদিও আমি তখনো শুইনি, বালিসে হেলান দিয়ে আধা শোয়া অবস্থায় বসে আছি। আঃ কি ঠাণ্ডা, বিছানা বরফ্ হয়ে আছে। তোমার বিছানা কি সুন্দর, গরম। কিউ এর নরম হাত আমার বুকে, আমার পেটে, আমার হাতে ধীরে ধীরে মৃদু স্পর্শে সঞ্চালিত হাতে থাকে। এক সময় কম্বলের নিচে নিজেকে সম্পূর্ণ গলিয়ে নিই। কিউ এর শরীরে ধীরে ধীরে স্পর্শ করে আমার শরীর, স্পর্শ পাই। হালকা আবরণ নিরর্থক। কিউ এর উষ্ণ শরীরের স্পর্শে আমেজ আসে, হাত পা দিয়ে সম্পূর্ণ রূপে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পরে। কোনো কোন রাত্রে কিউ এর ঘুম না এলে আমাকে কিউ এর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, চুম্বনে চুম্বনে ক্লান্ত হয়ে আরামে চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি জেগে থাকি এর পরও। এতেই কিউ তৃপ্ত। শরীরের অতৃপ্তি মনের তৃপ্তি দিয়ে পূরণ করে নেয়। আমার কাছে কিউ এর এইটুকুই প্রত্যাশা। প্রত্যাশা না বলে বলা যেতে পারে দীর্ঘদিনের অভ্যাস। কিউ এর অশান্ত মনকে শুধু কথা দিয়ে নয়, স্পর্শ দিয়েও সান্ত্বনা দিতে দিতে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। একে অপরের স্পর্শ ব্যতিরেকে কারোরই ঘুম আসেনা—দৈনন্দিন স্নান করা, ভাত খাওয়ার মত। স্পর্শের আকর্ষণ বড় মারাত্মক। স্পর্শক্ষুধা যথার্থ পূরণ না হলে অঘটন ঘটে। সাদার্ণ এভিনিউ এর ফ্ল্যাটে থাকতে থাকতেই অভ্যাসের গোড়াপত্তন তারপর আমার অফিস কাম ফ্ল্যাটে স্থানান্তরিত হয়ে তা যথার্থ পূর্ণতা পায়। যুবতি কিউ এর শারীরিক পুলক, শিহরণ এবং শারীরিক প্রক্রীয়ার স্বাদ, তার আকর্ষণ, নতুন ফ্ল্যাটে এসে উদ্দাম হয়ে ওঠে। যুবতি কিউ এ বৃদ্ধ বসন্তের জীবনে অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি। পৃথিবীর সকল সুখের বড় যে সুখ, বা চরমতৃপ্তি হচ্ছে রতিতৃপ্তি।

যাইহোক এরপর রাতের কোনো এক সময়ে আমার খাটের লাগোয়া কিউ এর খাটে কিউ সড়ে যায়। বুঝতে পারিনা। সকাল বেলায় ঘুম ভাঙলে দেখি নিজের খাটে অকাতরে ঘুমাচ্ছে।

কিউ চিরকালই আদুরে। তিন মাসের মেয়ে পরিত্যক্ত কাশ্মীরের লছমির কুটিরে বৌদির কোলে আশ্রয় পেয়েও নিশ্চিন্ত হয়নি। শিশুর স্বাভাবিক অনুভূতি দিয়ে অনুভব করেছিল। পরিচিত মায়ের কোল এ কোল নয়। পরিচিত মায়ের স্নেহ এ স্নেহ নয়। মায়া, মমতা, ভালবাসা সবকিছু পর্যাপ্ত পরিমানে পেলেও অপটু নিজের মায়ের থেকে পার্থক্য আছে। সে কারণে শিশু লাবণীর কান্না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, জেগে ঘুমিয়ে স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি। সেদিন সেই প্রভাতে দীর্ঘসময় শিশুর কান্নায় ঘুম ভেঙে মানসদা বৌদিকে ডেকে তোলে, বৌদির পাশে ঘুমে অচেতন শিশু মানব, বছর চারেকের মানব। মানসের বার বার ডাকায় বাধ্য হয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে হয়, ভেজানো দরজা খুলে অন্ধকার কুঠরিতে প্রবেশ করতে হয়। অন্ধকারে হাতড়ে, কান্নার শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে এসে ছোট তক্তাপোষে ক্রন্দনরতা শিশু কন্যাকে আবিষ্কার করে শ্রাবণী বৌদি। মনে মনে ভাবে—কি হল? বাচ্চা কাঁদে কেন? শরীর খারাপ? লছমি করছে কি? লছমির ঘুম এত গাঢ় যে পাশে শুয়ে থাকা নিজের মেয়ের কান্না শুনতে পায়না অথচ ওপরে শুয়ে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল! সেখানে পৌছানোর আগে লছমি সম্বন্ধে এ জাতিয় মন্তব্য করেছে শ্রাবণী বৌদি, অবশেষে সহ্য করতে না পেরে নামতে বাধ্য হয়েছে। মানসদা জোর করে বৌদিকে নিচে পাঠিয়েছে।

বৌদি দরজা খুলতেই আকস্মিক শিশুর কান্না থেমে যায়. শিশু অনুভব করে তার আকাঙ্খিত মা এসেছে। কিন্তু আকস্মিকতা কাটতে সেদিনের শিশু লাবণীব বেশি সময় লাগে নি। আবার কান্না, তীব্র কান্না, ছোট শিশুর পূর্ণ শক্তি নিঃসরিত কান্না, করুণ কান্না। রাত্রির অন্ধকার সবে দূর হচ্ছে। স্বল্প আলোয় বৌদি দেখে শিশুকন্যা হাত পা ছুড়ে কাঁদছে, গায়ের গরম ঢাকা খোলা, হাত দিয়ে দেখে বিছানা ভিজে, শিশুর হাত পা শীতে ঠাণ্ডা। শিশু কাঁদছে, পাশে লছমির বিছানা শূন্য, লছমি নেই! তবে কি সেদিনের শিশু লাবণী চিরতরে মা হারানো বেদনায় এমনি তীব্র চিৎকারে তার বড় দুঃখ বা ক্ষোভ প্রকাশ করছিল! তবে কি মা হারা সব শিশুদের কান্নাই এমনি তর হয়—মা-মা আর্তনাদ এমন করুণ হয়! সেই তিন মাসের শিশু এই লাবণী। বৌদি কোলে তুলে নেয়। বাচ্চার ভিজে জামা পরিবর্তণ করে। নিজের গায়ের চাদরে শিশুকে ঢেকে নেয়, আদর করে। কিন্তু কান্না থামেনা। মানসদাকে ডাকে। মানসদা নিচে নেমে আসে। মানসদা, বৌদিকে ওপরে পাঠিয়ে দেয়, বলে এখনি এসে পড়বে। আশে পাশে কোথাও আছে। প্রথমে লছমির ঘর, ঘরের বাহির চার পাশ খুঁজে দেখে। নেই। নিশ্চয় আশে পাশে আছে, এসে পড়বে। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সূর্যের আলো প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত ঠাণ্ডার দাপট কমে না, সূর্যের আলোয় ধীরে ধীরে উষ্ণতা অনুভূত হয়। সেই ঠাণ্ডায় কিছু সময় ঘোরাঘুরি করে, গেটের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে—যদি বাইরে গিয়ে থাকে। গেটের পাশে অস্থায়ী কাঠের গুমটি। ঐ গুমটিতে বসে সিকিউরিটি ম্যান ইরফান খান পাহারা দেয়। যুবক সুন্দর সুগঠিত পাঠান। যেমন লম্বা, তেমনি গড়ন। উন্নত নাসা, টানা চোখ—মনলোভা পুরুষালি চেহারা। যতক্ষণ দফ্‌তর খোলা থাকে, ইরফান বসেনা, দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। অফিস ছুটীর পর কাঠের গেটে তালা ঝোলে, ছুটী হয়, ইরফানের। থাকার জায়গাও গুমটির লাগোয়া এক চিলতে ঘরে। ঠাণ্ডা জায়গা, যে কারণে ছোট কুঠরিতে থাকার অসুবিধা হয়না। লছমির শিশু কন্যার কান্না তখনো থামেনি, মানসদা শুনতে পাচ্ছে শ্রাবণীর গলায় ছেলে ভুলানো বিচিত্র সুরে কান্না থামানোর চেষ্টা, ছটফট করতে করতে এগিয়ে যায়, গুমটির কুঠরির দরজা খোলা সে বিছানাও শূন্য। অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয় মানসদা—দুজনে গেল কোথায়? ইরফান ও লছমি দুজনের ঘর খালি। গেট খালি বাইরে বেড়িয়ে সামনে রাস্তা। রাস্তার আশে পাশের গন্তব্য স্থান সমূহ? না কোন হদিস্ নেই। আর একবার লছমির ঘরে উঁকি দিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে, নিজের ফ্ল্যাটে ফেরে, বাচ্চাটির কান্না থেমেছে। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে। মানব, মানসদার ছেলের ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে দেখে তার বিছানায়, পাশে শুয়ে লছমির মেয়ে। আশ্চর্য্য হয়ে মার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—

—এখানে কেন মা? ওকি আমাদের কাছে থাকবে?

—আস্তে কথা বলো, ওর ঘুম ভেঙে যাবে।

মানব কথা বলেনা, বিছানা ছাড়ার আগে, বাচ্চা লাবণীর গাল ছুঁয়ে দেখে, নরম ছোট লাল গাল, মাথায় অনেকটা সোনালি রঙের চুল। ইতিমধ্যে মানসদা ফিরে আসে চোখে মুখে হতাশা আর অবিশ্বাস। বেলা বাড়ে, চা জল খাবার খেয়ে লাগোয়া দফ্‌তর। টেবিলে গিয়ে বসে। মন লাগেনা। দুচারজন কর্মচারী, ঠিকেদারের লোক যারা আসে, তারাও খবর শুনে হতচাকিত হয়, কিন্তু অবিশ্বাস করেনা। দুজনের অল্প বয়স, বাচ্চা হয়েছে,—সকলেই জানে, ওদের বিয়ে হয়নি, কিন্তু হারিয়ে যাবে বা পালিয়ে যাবে; এমন অনুমান

কেউ করেনি, সকলে বলাবলি করে, খুঁজে দেখবার চেষ্টা করবার কথা বলে, চেষ্টাও হয়তো করে, শেষ পর্যন্ত ইরফান ও লছমি ফেরেনি। বেলা বাড়ে, দফ্‌তরে কাজ হয়নি, যে যতটা পারে খোঁজ করে, ব্যর্থ হয়। ফেরেনি পাঠান যুবক ইরফান খান্। সে নিরুদ্দেশ, তার বাড়ির ঠিকানা কেউ জানেনা যে খোঁজ খবর করবে, অস্থায়ী ক্যাম্প অফিসের অস্থায়ী কর্মী, সেই সঙ্গে দিল্লী অফিসের দারোয়ান, থাপার যুবতী কন্যা লছমি। ঐ সেদিনের ছোট শিশু কন্যা, আজকের কিউ আমার কম্বলের নিচে, কম্বলের এবং আমার শরীরের উত্তাপে নিজেকে উত্তপ্ত করছে। মনে মনে ভাবি, হায়রে নিষ্ঠুর জনক-জননী, শিশু, সুন্দর, নির্মল, ফুলের মত পবিত্র। যে তোমাদের কোন এক সোনালি মুহূর্তের বা স্বর্গীর আনন্দঘন মুহূর্তের সৃষ্টি, তোমাদের রক্ত মাংস দিয়ে গড়া, এবং যাকে অনেক কষ্টে গত তিনমাস ধরে পালন করেছো, লছমির মাতৃস্তনে যার বৃদ্ধি হচ্ছে, যার প্রতি তোমাদের দুজনের স্বর্গীয় স্নেহের প্রকাশ ঘটছে, তাকে ত্যাগ করলে কি করে! যে সাময়িক আত্মসুখে মগ্ন হয়ে এই সুন্দর সৃষ্টি, ফুলের মত— কি এমন ক্ষতি করলো তোমাদের? তোমাদের মনিব তোমাদের তো বিতারণ করেনি, অন্যায় জেনেও শাস্তি দেয়নি, বরং তোমাদের সুস্থ্য এবং সামাজিক মর্যাদায় পূর্ণ-দম্পত্তি হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকতে পারো তার জন্য তোমাদের মনিব অর্থাৎ মানসদা চেষ্টা করছিলেন, তবুও তোমরা এমন কঠোর অন্যায় করতে পারলে! মানসদা সামাজিক উৎপীড়নের অনুশাষনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। একমাত্র তিনিই তোমাদের ভালবাসার মর্যাদা দিয়েছেন। না হয়, এখানে না থেকে বিয়ে করে দূরে কোথাও তোমাদের শিশু কন্যাকে নিয়ে চলে যেতে পারতে। পরিবর্তে আত্মসুখের লালসায়, প্রচণ্ড স্বার্থপরতার সাক্ষী রেখে তোমার তোমাদের সন্তান ত্যাগ করলে-এ অন্যায় এ পাপ! লাবণী বা কিউ জানতো না, এসব ইতিহাস। পরবর্তী সময়ে নিজের পরিচয় সে যখন বুঝতে পারলো, তখনো জানতোনা। এখন জানে, কিছুটা আমি, কিছুটা শ্রাবণী বৌদি বলতে ব্যধ্য হয়েছি।

রাত বেশি হয়নি। তবুও কুমায়নের অনেক রাত। আমি জেগে, কিউ জেগে, কম্বলের নিচে উষ্ণতা আদান প্রদান করছি। টেলিফোন বাজে। উঠতেই হবে—লঙ্ রিঙ—এই সময়ে ফোন রুচী কিম্বা মাঝে মাঝে রোহিত করে—

—তোমার ফোন।

—তাই হবে।

উঠি। ফোন ধরি। কথা শুরু হয়। শীত করছে। কিউ উঠে পিঠে গায়ে ওর শাল জড়িয়ে দিয়ে বিছানার ফিরে যায়।

রুচী নয়। রোহিতের গলা! রোহিত আমাদের একমাত্র সন্তান। হায়দ্রাবাদে চাকরি করছে। অনেক পড়াশুনা করেছে। বড় পোস্টে চাকরি করে। বিদেশি কোম্পানি। রুচী ওর ফ্লাটে থাকে। সাদার্ণ এভিনিউর ফ্ল্যাট খালি। একমাত্র মানদা যার কর্ত্রী। মাঝে মাঝে আমি যাই যেন আমার সাময়িক অতিথি নিবাস। রোহিত শুধু পড়াশুনায় ভাল নয়, আচার আচরণে নম্র ও দায়িত্ব সচেতন। রুচী ফোন করে সাধারণতঃ, কিন্তু শরীর ঠিক নেই, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছে এবং রোহিতকে তার বাবার খোঁজ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রোহিত মায়ের আদেশ যথার্থ পালন করে। এক এক করে কেমন আছি, খাওয়া দাওয়া ঠিক হচ্ছে কি-না, ঠাণ্ডা কেমন, গরম জামা কাপড় ঠিক মত পরি কিনা এবং পাহাড়ে যেন সাবধানে চলাচল করি ইত্যাদি রোহিত বলে যায়, আমি উত্তর দিই এবং

ওদের খবর নিই। বলতে গেলে প্রতিদিনের রুটীন।

কথা শেষ করে, শাল খুলে সোজা কম্বলের তলায়, যে কম্বলের তলায় আরো একটি শরীর। উষ্ণ, কোমল, কমনীয়, লোভনিয়, যে কোন পুরুষের পরম কাম্য-রমণী শরীর, মিলন প্রতিক্ষিতা রমণীর শরীর। কোন কথা নয়, অল্প সময়েই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীর। হাত পা গলা পর্যন্ত কম্বলের তলায়। ধীরে ধীরে উষ্ণতা ফিরে এলো। উত্তপ্ত হল। ধীরে ধীরে। কিউ এর উত্তাপ সঞ্চালিত হচ্ছে নিরবে আমার মধ্যে। কিউ এর গাল আমার গালে, মাঝে মাঝে কিউ এর ঠোঁট চেপে ধরছে আমার ঠোঁট, কিউ এর স্তনভার মথিত করছে আমার বুক কিউ এর হাত ও পা পেঁচিয়ে রেখেছে আমার শরীর। না, কোন কথা না, কোন আন্দোলন, না কোন অন্য চিন্তা, নিস্তেজ নিঃস্তব্ধ এই শরীর একমাত্র কিউ এর উত্তাপে উষ্ণ হয়ে পরম আনন্দে, পরম সুখে ঘুমিয়ে পড়ল। রাতের কোন্ প্রহরে কে জানে!

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিদিনের ন্যায় শুরু হয়েছে দিন। অন্ধকার দূর হয়েছে। সকালের আবির্ভাব নতুন সাজে নতুন অর্ঘ্য সাজিয়ে। আকাশ বর্ণালী। ছড়ানো ভাসমান মেঘদল দ্রুত রঙ বদলাচ্ছে ক্রমাগত, পাখিরা বাসা ছেড়ে শুরু করেছে আগমনি উচ্ছ্বসিত কাকলি। ফুল পাপড়ি খুলে সৌরভ ছড়াচ্ছে স্নিগ্ধ হাওয়ায়, মানুষ ক্লান্তি-মুক্ত উদ্দীপ্ত শক্তি নিয়ে দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত। ঘুম ভেঙেছে আমার। বেলায় কিউএর। যথারীতি দিগ্ এসেছে, চা বানিয়েছে, চা খেয়েছি। বেড়োবার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

—আজ, তোমাকে নতুন জায়গায় নিয়ে যাবো। কিছুটা রাস্তা কাঁচা, পাকা নয়, পারবে তো?

—কাঁচা রাস্তায় অসুবিধা কি। অগম্য না হলেই হল। আর যদি সামর্থে কুলায়। চেষ্টা করব যত দূর পারবো যাবো, না পারলেও ক্ষতি নেই, আমি পাথরের ওপর বসব, তুমি ঘুরে আসবে।

—আমার ঘোরা হয়ে গেছে। আমার দেখা জায়গা। তোমাকে দেখাবো বলেই তো যাওয়া। গেলেই বুঝতে পারবে—কি অপূর্ব জায়গা।

—তুমি কি করে দেখলে? না কেউ বলেছে?

—কে বলবে? আমি নিজে আবিষ্কার করেছি।

—কলম্বাসের মত!

—না হলেও বিভূতিভূষণের মত তো হতে পারে।

—হতে পারে, নিশ্চয় পারে। কে বললে নয়। ঐ দেখো—দেখো। দরজার দিকে কান পাতো। শুনতে পাচ্ছো?—দরজায় কেউ আঁচর কাটছে, মনে হচ্ছেনা?

—হ্যাঁ, তাই তো। দিগ্ দরজা খোলো। ঢুকতে দাও। আজ কদিন পর এসেছে। দিগ্—দরওয়াজা খোল্ দো।

—ওর ব্রেকফাস্ট ডিউ হয়ে গেছে। দিগ্—

—জী।

দিগ্ বাহাদুর দরজা খুলে দেয়। সেই কুকুর ছানাটি, মাঝে মাঝে আসে, বিস্কুট খায়,

রুটী খায়। কিউ এর কোলে ওঠে। কিউ আদর করে, খাওয়ায়, আবার খোলা দরজা পথে চলে যায়। এসেছে এই সকালে। কিউ এর পায়ের গোঁড়ায়, কিউ দাঁড়িয়ে; মাথা দোলায়, লেজ নাড়ে ঘন ঘন জুলজুল করে খুদে চোখে কিউকে দেখে, কুঁই কুঁই শব্দ করে অর্থাৎ, আমি এসেছি আমায় আমার বিস্কুট দাও! কিউ বাইরে যাবার জন্য পোষাক পরে প্রস্তুত। কোলে নেয়না, দিগ্ ঘর থেকে বিস্কুট আনে, মেঝেতে দেয়, ছোট ছোট দাঁতে কুট্ কুট্ করে খায়, কিউ ওর মাথায় হালকা চাঁটি মারে—'খা ছড়াবিনা'। চেয়ারে বসে বিস্কুট খাওয়া দেখে দিগ্‌বাহাদুর। আমিও দেখি।

চা পান, কুকুরছানার বিস্কুট খাওয়া শেষ হলে তিনজনে রাস্তায় নামি। কিউ আর তার কুকুর ছানা, দুজনের পিছনে আমি। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাই দুজনে। কারণ তৃতীয় জন ইতিমধ্যে কেটে পড়েছে নিজের গন্তব্যে।

নির্মেঘ আকাশ। সূর্যের উজ্বল আলোয় প্রাণবন্ত সবুজ বনানি। হিমালয়ের শীতল উত্তুরে হাওয়া বইছে মোটামুটি গতিতে, হাওয়ায় গাছের পাতায় সৃষ্টি হচ্ছে শব্দ। শীত করছে কিছুটা। গলার মাফ্‌লার দিয়ে জড়িয়ে নিই গলা। কিউ এর কথাই শু না পরে, পরেছি পাওয়ার। কিউ এর পায়েও ফিতে বাঁধা পাওয়ারের জুতো। পরেছে জীন্‌সের প্যান্ট, বাইরে—বেরোলে কিউ প্যান্ট পরে, যাতায়াত করতে সুবিধা হয় বলে। টপের ওপর গলা দিয়ে গলানো ভি-কাট সোয়েটার। স্লিম লম্বা, কোমর সরু, ভারি নিতম্ব এবং বক্ষ। স্নিগ্ধ সকালে তাজা কিউ সকালের আলোয় সবুজ বানানির ন্যায় উজ্বল, প্রানবন্ত এবং আকর্ষণীয়। আমি নিজেও কোটের নিচে গোল গলা সোয়েটার পরেছি, যৌবনে পরতাম, ব্যবহার হয়না ইদানীং, এখানে কাজে লাগছে। শীতল হাওয়া আমায় খুব একটা কাবু করতে পারেনি। কিউ আমার একটা হাত ধরেছে শক্ত করে। এক পা এক পা করে নেমে চলেছি ঢালু রাস্তা দিয়ে, নামতে কষ্ট হয়না। দুদিকে ফলের বাগান—ফল ধরেছে গাছে, ঝুলেছে ডালে ডালে। ফলের ভারে অবনত অনেক গাছের শাখা সমূহ। চলার পথে মাঝে মাঝে নমস্তে বলে নমস্কারের জবাব দিতে হচ্ছে পথ চলা দু চার জন স্থানীয় অধিবাসীকে।

—একটু পরেই ঠাণ্ডা চলে যাবে। রোদের তেজ বেড়ে গেলেও হাওয়া, কষ্ট হবেনা।

—ঠাণ্ডায় কষ্ট হচ্ছে না।

যেহেতু আজ গন্তব্যস্থল দূরে, আগে বেড়িয়েছি আমরা, আমাদের চলার পিচ ঢাকা পথে রোদ লেগেছে কোথাও কোথাও, সব জায়গায়। কিউ ভয় করছে, পাছে আমার না ঠাণ্ডা লেগে যায়। বিদেশ—ডাক্তার নেই। ওকে আশ্বস্ত করি। উল্টে ওকে বলি—

—মাথায় স্কার্ফ বেঁধে নিতে পারতে।

—কি কারণে? তুমি ভাবছো আমার ঠাণ্ডা লাগছে। ভুল। তুমি দেখো—এখানে দেখো? কি ঠাণ্ডা? না গরম?

আমার একটা হাত টেনে কিউ গলার কাছে। গালে ঠেসে ধরে, পরখ করতে সত্যিই কি কিউ ঠাণ্ডায় কাতর হয়েছে? দেখলাম না। স্বাভাবিক উষ্ণ ওর গলা, বরং গাল সেই অনুপাতে ঠাণ্ডা। ওর গালে হাত ঘসে দিই।

—আঃ কি হচ্ছে! ক্রিম্ মুছে যাচ্ছে!

হাত সরিয়ে নিই। চলি। চলার আনন্দে। চলার ছন্দে। ঢালু পথ। সবুজ স্নিগ্ধ পরিবেশ। দুপাশে ফলভারে নত সবুজ ফলের গাছ। কোথায় ক্লান্তি? কোথায় অবসন্নতা।

বরং রাত্রির শ্লথমুক্ত শরীর তখন। হাত পায়ের পেশিগুলো হাঁটার ফলে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। হাঁটায় বেশ আরাম অনুভূত হচ্ছে। ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই। হঠাৎ কিউ আনন্দে লাফিয়ে ওঠে—

—এই তো—এই তো এসে গেছি। ওখানে যাওয়ার আগে বোসো কিছু সময়, রেস্ট নাও, তারপর যাবো।

একটা বড় পাথর! প্রথমে কিউ পরে আমি বসি।

—না বসলে চলতো। কোন কঠিন রাস্তা নয়।

—তবু বসে নাও। এবার রাস্তা খারাপ। এ দেখো-বাঁদিকে, মাঝে মাঝে কেউ যাতায়াত করে, সম্ভবত গ্রামের মহিলারা, বনের ঘাস লতাপাতা কাঠ যারা সংগ্রহ করে, তারা মাঝে মাঝে ঐখান দিয়ে যাতায়াত করে। সাধারণের যাতায়াতের জন্য পাকদণ্ডি নয়। বর্ষার জল ওপর থেকে এ পথ দিয়ে নিচে নামে।

—যে কারণে ছোট বড় পাথর ছড়ানো, জল নামার ফলে এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো—অসমতল, অবিন্যস্ত পাহাড়ের গাত্রদেশ।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় শ্বাসপ্রশ্বাস। অন্য দিনের তুলনায় বেশি পথ হেঁটেছি। ক্লান্ত না হলেও স্বাস প্রশ্বাসের গতি দ্রুততর হয়েছিল। স্বাভাবিক হয়। কিউ আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে দোলাচ্ছে। মুখে স্মিত হাসি।

—বসন্ত তুমি এত গম্ভির হয়ে আছো কেন? তোমার কষ্ট হচ্ছে? মন ঠিক আছে? রুচী আন্টির শরীর ঠিক আছে? কাল জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

—না-না মন, শরীর সব ঠিক আছে। রুচী ও রোহিত দুজনেই ভাল আছে। হয়েছে? হঠাৎ তোমার মাথায় এতগুলো প্রশ্ন আসলো কেন? আমাকে দেখে কি সেরকম মনে হচ্ছে?

—না। তবুও যেন মনে হচ্ছে, অন্যদিনের তুলনায় আজ তোমায় নিস্তেজ মনে হচ্ছে।

—নিস্তেজ? হতে পারে। বেলা বাড়লে তেজ বেড়ে যাবে, সতেজ হয়ে উঠব।

—যাঃ মিথ্যা কথা।

—মোটেই না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ্য এবং সতেজ।

কিউ কথা বন্ধ করে। বিশ্বাস করে যে আমি সুস্থ্য আছি। আমার শরীর ও মন সুস্থ্য। রুচীকে কিউ আন্টি বলে। ছোট বেলায় কিশোরী লাবনী মাঝে মাঝে মায়ের সাথে বাবার সাথে অর্থাৎ শ্রাবণী বৌদি ও মানসদার সাথে আমাদের ফ্ল্যাটে বেড়াতে আসতো এবং তাদেরই শেখানো সম্পর্ক রুচী আন্টি—এখনো একই অর্থাৎ অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। পরিবর্তন হয়েছে আঙ্কেল-বসন্ত আঙ্কেল থেকে 'বসন্তে' 'বসন্ত'। কিউ এর বসন্ত, বসন্ত নামের পরের শব্দ অর্থাৎ পরিচিত "আঙ্কেল" অপসারিত। এখন কিউ এর কাছে আমার পরিচয় শুধু একটা নাম, একজন পুরুষের নাম 'বসন্ত' অন্য কোন সম্পর্ক সংযোযিত হয়নি বা নির্দ্ধারিত হয়নি। স্থায়ীভাবে এ বাড়িতে আসার সময় এবং তৎপরবর্তি দীর্ঘ সময় বসন্ত-আঙ্কেল আচার-আচরণে-ব্যবহারে-প্রয়োগের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এবং সত্য বলতে অজান্তে এবং সম্পূর্ণ ইচ্ছার অগোচরে বসন্ত আঙ্কেল রূপান্তরিত হয়েছে 'বসন্ত'-ব-স-ন্তো। আর লাবনী হল সুইট-সুইটি-বিউটি-বিউটিফুল-কিউট থেকে কিউটিতে। বসন্তের কাছে কিউটির কি পরিচয়? পরিচিতা—অসহায়,

অনাথ একজন যুবতি? না সুন্দরী যুবতী? প্রেয়সি?' প্রেমিকা? রক্ষিতা?—কি? কি হওয়া উচিৎ যথার্থ সম্পর্ক উভয়ের কাছে উভয়েই সঠিক জানিনা। কিউ নিজেকে উদ্ধার করে, সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে, কিউ এর হৃদয় নিসৃত ভালবাসা দিয়ে বসন্তের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সৃষ্টি করে, বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পায়। সুখের সন্ধানে বসন্ত এক মাধ্যম না সুখের উৎস বসন্ত, না সুখের চাবিকাঠি বসন্ত, জানিনা। তবে নিশ্চিত কিউ আর বসন্তের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন বর্তমানে হয়তো ভবিষ্যতেও। বসন্ত পেল-জীবনের নতুন অর্থ, সৃষ্টির উৎসমূল বাঁচবার প্রেরণা। বসন্তের ইদানীং যা কিছু সৃষ্টি তা যে কিউ এর অনুরাগ সিঞ্চিত, যে বিষয়ে বসন্তের অর্থাৎ আমার কেন সন্দেহ নেই। আমি মনে মনে বারে বারে একথা অনুভব করি এবং অকপটে স্বীকার করি আপনাদের সকাশে। এই হচ্ছে সেই শক্তি যে শক্তির বৈশিষ্টে বিকশিত হল দুটি মৃতবৎ হৃদয়-অসহায়া, আশ্রয়হীনা, প্রথম যৌবনের ভালবাসার মানুষকে হারানোর বেদনায় নিঃশেষিতা, প্রায় অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় অন্ধকার জীবনের অধিকারী এক নারী আর একজনের যার সব থেকেও না পাওয়ার কষ্টে বা বেদনায় বিদ্ধ। নিলকণ্ঠের মত একজন সৃজন শীল মানুষের বিবর্ণ উষর মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক একজন পুরুষ। অনুরাগে সিঞ্চিত হলে দুজনে, সংরাগ বা সেই স্বর্গীয় শক্তি যার প্রভাবে সিক্ত হল দুটি হৃদয়, পুষ্পিত হল, সৌরভে আমোদিত হল বিশ্ব।

সেই কিউ এই পাথরে, নির্জনে, সবুজ বনানী বেষ্টিত পাহাড়ে বসে আছে গা ঘেঁষে, একে অপরের হাত ধরে দুজনে দুজনের হৃৎপিণ্ডের শব্দ বিনিময় করছে—যা আজো কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র করতে সমর্থ্য হয়নি। কিউ এর অতিত আমরা জেনেছি, কিউ এর সেদিনের ব্যর্থ ইতিহাসের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে? আমি, বসন্ত, আমার সুশিক্ষিতা, সুন্দরী স্ত্রী আছে, একমাত্র বুদ্ধিমান সন্তান আছে, ঘর আছে. নিরুপদ্রব স্বচ্ছল, সুস্থ্য জীবন আছে—তার কেন এমন বন্ধ্যাদশা? সংবেদনশীল দরদী মনের অধ্যাপিকা, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে রুচী—সে তো একমাত্র বসন্তের অনুরাগিনী, বসন্ত ব্যতিত অন্য কোন পুরুষ বন্ধু তার জীবনে নেই। বিয়ের পরও যে কয়েক বছর বসন্তকে ভালবেসেছে। যৌবনের রঙিন দিনগুলি বসন্তের সাথে উপভোগ করেছে শরীর ও মন দিয়ে। অথচ রোহিত পৃথিবীতে আসার পর ধীরে ধীরে সেই রুচীর জীবনে পরিবর্তন এল অতি দ্রুত। রুচী তার সন্তান রোহিতে এমনি মগ্ন হল যে ভুলে গেল বসন্ত বা তার স্বামীর প্রতি দাম্পত্যজনিত দায়িত্ব। শীতল রুচীর চোখের সামনে মৃত্যু ঘটল একটি হৃদয়ের। একটি সক্রিয় সৃজনশীল হৃদয়ের, রয়ে গেল মৃতবৎ শুধুমাত্র বসন্তের অবয়ব। ঠিক সেই ক্ষণে এই নারী, জীবনদায়িনী শক্তি নিয়ে উপস্থিত হল বসন্তের জীবনে বা বসন্ত এক মৃতপ্রায়া হৃদয়কে পূর্ণজীবনদানের কাজে ব্রতী হয়ে সৃষ্টি করল কিউ নাম্নী এক মহিয়সী নারীকে— সেই নারীর স্পর্শে বসন্তের হৃদয় প্রাণ ফিরে পেল, শুষ্ক হৃদয়ে জোয়ার এল সৃষ্টির—নতুন করে বাঁচার, সৃষ্টি সুখের আনন্দে মুখর হয়ে ফিরে এল জীবন-স্বর্গে। এটাই বাস্তব-জীবনের সত্য। প্রকৃতি, পরিবেশ, এবং সঠিক সহযোগির পরশে জীবন মাধুর্যে পূর্ণ হল।

কিউ আর আমি পাথরের ওপর বসে অছি। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে উজ্বল মনের আকাশ। নিজেকে নিয়ে ভাববার অখণ্ড অবসর। নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসে মনের সামনে অকপটে খুলে যাচ্ছে ছোট ছোট ঘটনা আর তার পর্যালোচনা, তখনই কিউ এর

প্রতি এ মনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হচ্ছে।

—সেই গম্ভীর, মুখ গোমড়া? ডোন্ট গেট কোলড বসন্ত। ওয়ার্ম আপ। চলো, এবার এগোই।

কিউ দাড়িয়ে একটি হাত সামনে বাড়িয়ে দেয়। আমি ধীরে ধীরে একটি হাত ওর হাতে গুঁজে দিই, কিউ এর সামান্য আকর্ষণে আমি উঠে পড়ি। পাশাপাশি হাত দুলিয়ে চলতে থাকি। সহজ, ঢালু, পথ—সেরকম কষ্টসাধ্য নয়। কিউ এর হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে, এক পা এগিয়ে অপেক্ষা করে অন্য পা এগিয়ে, একটা পাথর থেকে অন্য পাথরে পা রেখে অত্যন্ত সাবধানে নামি। সঙ্কির্ণ রাস্তা পাহাড়ের জল নামা ঢালু বা প্রাকৃতিক নালা বলা চলে। দুপাশে গাছের আচ্ছাদন-রোদ্র প্রবেশের সুযোগ পায়না। স্যাঁৎসেঁতে শীতল মাটি ও আবহাওয়া। কয়েক কদম, কিউ যেরকম বর্ণনা দিয়েছিল সে রকম দূর্গম-কিছু নয়। কয়েকগজ সমতল জায়গা দেখে থামি। সোজা হয়ে দাড়ায়। কিউ দাড়িয়েছে। চেনা মিষ্টি গন্ধে ভরপুর—বাঃ কি মিষ্টি! কিসের এ সৌরভ? নিশ্চয় কিউ এর পারফিউমের গন্ধ নয়, তাহলে আগেই সে গন্ধ পেতাম। বড্ড চেনা গন্ধ-মিষ্টি গন্ধ-অথচ উৎপত্তি স্থল নজরে পড়ছেনা—কিছুদূর এগোলাম—দেখি কোথায় থেকে আসছে এ-সৌরভ? কিউ আমার সন্ধানি চোখ অনুসরণ করে বলে—

—বসন্ত, কিছু দেখতে পাচ্ছো? চিনতে পারছো কোন কিছু? চেষ্টা করো, আমরা সেই সুন্দর জায়গার খুব নিকটে পৌঁছে গেছি, যে উদ্দেশ্যে আজকের যাত্রা।—কোনো গন্ধ পাচ্ছো?

—পাচ্ছি? মনে করবার চেষ্টা করছি, চেনা গন্ধ অথচ এ জঙ্গলে—মেলাতে পারছি না।

—পারবে। ঠিক সেই জায়গাটায় আমরা পৌঁছাই। মনে হবে—সত্যিই সুন্দর এ পৃথিবী।

কয়েক পা এগিয়েই কিউ থেমে গেল, আমিও অনুসরণ করে চলা বন্ধ করলাম। সুগন্ধের তীব্রতা চোখ মুখ কান দিয়ে প্রবেশ করতে থাকলো আমার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। মনে হল পাগল হয়ে যাবো। ওপরের দিকে তাকালাম। আমার মাথার ওপর আচ্ছাদনের রঙ সবুজ নয়-সাদা। সেখানে অসংখ্য রঙিন প্রজাপতি পাগল প্রায়। উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায় কেউ মাতোয়ারা হলে যেমন তার চলার ছন্দের বিঘ্ন ঘটে—প্রজাপতি সমুহের ডানায় ভর দিয়ে ভেসে বেড়ানোয় সেই আনন্দে মাতোয়ারা ভাব। গুন্ গুন্ গুন্ গুনিয়ে পাখায় সৃষ্টি হয়েছে সুর-মৌমাছির। সাদা গোলাপে ছেয়ে গেছে দুপাশে গাছের সারির মাথাগুলো লতানে গোলাপের লতা আর পাতা হারিয়ে গেছে ফুলের অজস্র সংখ্যায়। সমতলে গোলাপ দেখেছি, কিন্তু লতানে গাছের অজস্র সাদা গোলাপ এবং সৌরভের তীব্রতা আমি কোনোদিন দেখিনি। পাহাড়ের জংলী গাছের গা বেয়ে লতানো-গোলাপ নির্জনে তার সৌন্দোর্য্যের পসরা সাজিয়ে বসিয়েছে। সত্যই মনোরম পরিবেশ।

কিউ আনন্দে আত্মহারা হয়ে জড়িয়ে ধরল আমাকে। স্বর্গীয় মুহূর্ত। মনোমুগ্ধকর, সৌরভে মদির স্বর্গীয় নির্জন পরিবেশে কিউ এর বাহু তথা শরীরের বন্ধনে আবীষ্ট হয়ে চোখ বন্ধ করলাম। উচ্চারণ করলাম, মুখ দিয়ে নয়, প্রচেষ্টায় নয় পরন্তু স্বাভাবিক উৎসরণে।

—অপূর্ব! অপূর্ব! অবর্ণনীয়। প্রকৃতি রূপসী। সে সাজতে জানে।

—চোখ থাকলে তবেই সে রূপের দর্শন মেলে।

—সেও তোমার অবদান।

আমি ধীরে ধীরে আমার দুটি ঠোঁট দিয়ে কিউ এর শরীরের বেষ্টনির মধ্যে কিউ এর দুটি ঠোঁটে জড়িয়ে থাকা শুভ্র গোলাপের মিষ্টি সৌরভ পান করলাম দীর্ঘ সময় ধরে। চোখ খুললাম। কিউ এর চোখে পরিতৃপ্তির হাসি।

এখানে আলোর প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছে ঘন সবুজ লতাপাতা, বুনো গাছপালা। মৌমাছির গুন গুনানি, বন্য পোকাদের একটানা শব্দ, বিহ্বলতায় সময় বয়ে যায়, মিনিটের পর মিনিট। শরীরের নিয়মে হাঁটুতে ব্যথা অনুভূত হয়, কিউ বুঝতে পেরেছে।

—চলো ফিরি।

আমি ওপরের দিকে তাকাই— প্রচণ্ড চড়াই। কোমরে ব্যথা হবে।

—ওপরে উঠবে কি করে—ভাবছোতো? আমি জানি। তোমায় কষ্ট দেবনা। আমি ভাল করে দেখে গেছি। সামনে কিছুটা এগোলেই ওপরের ঐ রাস্তা পেয়ে যাবো। দূরত্ব রোজকার অপেক্ষা বেশি—ধীরে ধীরে ওপরে যাবো। সময় লাগবে ঠিকই। বেশি কষ্ট হবেনা। রাস্তায় বিশ্রাম নেবো।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ডালি অসীম। কজন তার কতটুকু পরিচয় পায়! সুন্দরের পিয়াসি মনই বা কোথায়! মানসিক প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে সময়ের সাথে। ইউরোপ মহাদেশে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়ে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত উপমহাদেশে, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার দেশে দেশে। প্রাক বিপ্লব মানসিকতার পরিবর্তন ঘটল বিপ্লব পরবর্তী সময়ে। জীবনের ধারা বদলে গেল। চিন্তায় ভাবনায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন এমনকি চিন্তার জগতে এলো আমূল পরিবর্তন। নিত্য নতুন ভোগ্য সামগ্রির উৎপাদনে বাজার ছেয়ে গেল। মানুষ প্রলুব্ধ হল নিত্য নতুন সামগ্রির চমকে। প্রলুব্ধ মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে গেল অস্বাভাবিক ভাবে। শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল ভোগবাদের বিস্তার, উপনিবেশবাদের বিস্তার। এশিয়া আফ্রিকার অনেক দেশ উন্নত দেশগুলির উপনিবেশে পরিণত হল। ইউরোপিয় বণিকেরা ভোগ্যসামগ্রির সাথে নিয়ে এল যাজক সম্প্রদায়কে। ধর্মীয় উপনিবেশ। ধর্মে ধর্মে যুদ্ধ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যুদ্ধ, দেশে দেশে যুদ্ধ মানুষের অন্তরের কোমল প্রকৃতির স্থান ধীরে ধীরে দখল করল রুক্ষ বাস্তবতা। মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে সরে গেল, হয়ে উঠল শিল্পের দেশ, ধর্মের দাশ, সুস্থ্য সুন্দর জীবনবোধের জায়গা দখল করল ভোগবাদ আনন্দের উপকরণ। সুখের সরঞ্জাম বদলে গেল। গড়ে উঠল পার্ক, লজ্, ক্লাব, বোটিং, স্কেটিং ইত্যাদি। যে মন দিয়ে প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসীম সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারতো— সেই মন হারিয়ে গেল। নিত্যনূতন ভোগের গোলক ধাঁধায় মানুষ চোখ বাঁধা বলদের মত ঘুরপাক খেতে থাকল—যা থেকে মুক্তি মেলেনি আজো। পাহাড়ের এই গ্রামের সবুজ বনানীর মধ্যে পরিভ্রমণ করতে করতে মনে হচ্ছে, আমরা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হচ্ছিনা, আমরা প্রকৃতিকে ভালবাসার ইচ্ছাটাও হারিয়ে ফেলেছি।

পায়ে পায়ে পা ফেলে, সড়ক পথে চড়াই ভাঙছি। পাশে সুন্দরী কিউটি এবং কয়েক মুহূর্ত আগে গোলাপের সৌরভে আবিষ্ট হৃদয়, কোনো কষ্ট এখনো অনুভূত হচ্ছে না।

চড়াই ভাঙায় সকালের শীতলতা হ্রাস পেয়েছে। বরং এই হাঁটায় কষ্টের বদলে আরাম পাচ্ছি। খুশির মেজাজ মনে এবং শরীরে। রুচীর সাথে বিয়ের পর বেড়িয়েছি বহুদিন—বছরে তিনবার চারবার। রুচীও ভ্রমণবিলাসী ছিল। বেড়াতে ভালবাসতো। পাহাড় হোক কিম্বা সাগরবেলা যেখানেই হোক; কিন্তু নির্জন পাহাড় বা প্রকৃতি কিম্বা নির্জন সাগরবেলা রুচীর পছন্দ ছিলনা। রুচীর পছন্দ ছিল পাহাড়ী ছোট ছোট শহর যেমন সিমলা, নৈনিতাল, কাশ্মীর যেখানে পাহাড়ের সৌন্দর্য্যের সাথে বিলাসবহুল হোটেল বা লজ আছে, সুন্দর সাজানো ঘর-শয্যা, দারোয়ান, খানসামা ইত্যাদি আছে, সাগরবেলার ক্ষেত্রেও এক। জাঁকজমক পূর্ণ হোটেল বা আধুনিক সুযোগ সুবিধার অভাব যেখানে, সেখানে রুচী নেই। বেড়ানোর ব্যাপারে সে বনেদিয়ানা ত্যাগ করতে নারাজ।

—কি হল বসন্ত, চুপ কেন? কথা বল।

—বলবো, বলবো। সবুর করো। তোমার ঐ ফুলের গন্ধ, প্রজাপতির সৌন্দর্য্য এখনো মনের সমস্ত অংশ জুড়ে আছে, কথা বলা বা অন্য কিছু ভাবতে দিচ্ছে না।

কিউকে সত্য কথা বললাম না। বার বার রুচীর কথা এসে যায়। রুচীর জন্য করুনা হয়, সে কথা কিউকে বার বার বলি কি করে।

—সরে এসো, গাড়ি আসছে।

একটা সৌখিন গাড়ি নিচের দিকে আসছে, রাস্তার এক পাশে থামলাম। ফোর্ড আয়কণ, ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে, পেছনে দুজন সওয়ারি। হোটেলে যাচ্ছে। গাড়ি পার হয়ে গেলে চলতে শুরু করলাম পাশাপাশি, কিউ আমার হাত ধরেছে। তার মুখে জয়ের তৃপ্ত হাসি।

—আজ বেশি খিদে পাবে—বলো বসন্ত?

—কেন?

—কত হাঁটলাম। কত চড়াই ভাঙলাম। খিদে পাবেনা?

—সে তুমি জানো।

—তোমার?

—সেটাও তুমি জানো।

গলা ছেড়ে হাসি। কিউ হাসে। আমার প্রয়োজনের অপ্রয়োজনের খবর আমার অপেক্ষা কিউ এর বেশি জানা। সে বেশি খবর রাখে।

পুরুষের নিজের খাওয়া দাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদ, নিয়ম মেনে বিশ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে একজাতিয় উদাসীনতা বা সচেতনতার অভাব আছে। বিশেষ করে তার সাথে যদি কোন নারী থাকে। বা নারী পুরুষ একসাথে থাকলে—তাদের খাওয়া পরা বিশ্রামের দায়িত্ব সঙ্গিনী নারীর ওপর বর্তায় পুরুষের ওপর নয়। বিশেষ করে বাঙালি নারী হলে ঘরে বাইরে নারীই প্রকৃত কর্ত্রী। যেটা যে গুণ আমরা দুজন হলে কি হবে, কিউটির মধ্যে আছে। বা কিউটির দায়িত্ব—আমি পরিমাণ মত আহার করি, সময় মত খাই, স্নান করি, বেড়াই বিশ্রাম নিই, অথচ একবার ভুলেও কিউটির প্রতি এ সব ব্যাপারে আমার দায়িত্ব আছে বলে মনে হয়না। পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান। এবং এ বিষয়ে রুচী আর কিউটির আচরণে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। কোন পোষাক পরবো তার সাথে কোন জুতো জোড়া, কি রঙের টাই—রুচী লক্ষ্য রাখত এবং স্থির করে দিতো। রুচীর জীবন ছিল কঠোর ও সুন্দর নিয়মে বাঁধা, একচুল ব্যতিক্রম সেখানে

ছিলনা। রুচীর পোষাক আশাক ছিল অত্যন্ত মার্জিত এবং আভিজাত্য মণ্ডিত। রুচী সম্ভ্রান্ত বংশের। বনেদি চাল-চলন ইত্যাদি দেখে রুচীর পরিচয় বুঝতে কারোর পক্ষে বেশি সময় লাগতো না। এছাড়াও রুচী ছিল স্বাধীনচেতা এবং অপরের স্বাধীনতা খর্ব করার ঘোর বিরোধী। একমাত্র পোষাক আশাক ছাড়া, আমার কোন কিছু করার বিরুদ্ধে সামান্যতম ক্ষোভ ছিলনা রুচীর অন্তরে।

—আবার ভাবতে শুরু করলে? বড় বেশি ভাবছো বসন্ত। তোমার ভাবনা গুলোর একটা দুটো বলোনা, আমি শেয়ার করি।

—সব ভাবনা সকলের সাথে শেয়ার করা যায়না। এমন কিছু ভাবনা প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে, যা কারোর সাথেই শেয়ার করা যায়না।

—যেমন?

—যেমন তুমি পারোনি, যেমন রুচী পারেনি, যেমন আমি পারছিনা।

হঠাৎ রুঢ় বাস্তব, এবং সত্য কথা, যা এই সুন্দর পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়, আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যেতেই আমি চুপ করে যাই, অনিচ্ছাকৃত প্রকাশ হয়ে পড়ায় কষ্ট হয়, কিউ দুঃখ পায়, মুখের হাসি নিমেষে উধাও, বিষণ্ণতা স্পর্শ করে কিউএর অন্তর—বরফ অপেক্ষা শীতল। সেই গোপন স্থান, যার খবর একমাত্র কিউএর জানা, আমি কিছুটা অনুমান করতে পারি, বা জানি, যদিও সম্পূর্ণ উন্মোচিত নয়, সেখানে স্পর্শ লেগেছে, যদিও আঘাত লাগেনি, শির্‌শিরে ব্যথায় বিবর্ণ কিউ এর কিয়ৎকালে পূর্বের উচ্ছল চেহারা। বড় স্পর্শকাতর এই কিউ। আমি কিউকে নিজের কাছে আকর্ষণ করি। সামান্য আকর্ষণেই কিউ আমার বুকে মাথা রেখে আত্মসমর্পন করে। শিশুর অভিব্যক্তি ওর চোখে।

সকালের সূর্য পাহাড়ের কোল থেকে আকাশে, উঁচুতে উঠে গেছে। রাত্রের জড়তা ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে অপসারিত হচ্ছে। অনেক চড়াই ভাঙা এবং সূর্যের আলোয় গরম লাগছে। হাওয়া রুদ্ধ। অকৃপণ সূর্য্য আলোর সাথে উত্তাপ সঞ্চারিত করছে পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদ জগতের জন্য। দু-চারটে দাঁড়কাক এ গাছ থেকে অন্য গাছে কর্কশ আওয়াজ তুলে উড়ছে ডাকছে। শালিক থেমে নেই, ওরা কিচির মিচির, ঝগড়া করছে। রেস্ট হাউসে পৌঁছালাম। দিগ্‌বাহাদুর বিছানা, বাসন, ঘরদোর এবং বাগান পরিষ্কার করে অপেক্ষা করছে—ব্রেকফাস্ট বানাবে।

ফেরার পথ সুখের হলনা। হেঁটেছি, হাত ধরাধরি করে। কিউ এর অভিমানি চেহারায় স্বাভাবিকতা ফেরেনি তখনো। মানসদা বলতেন—কিছু বলা যায়না ওকে, পছন্দ না হলেই কোন উত্তর দেবেনা নিরবে সকলের আড়ালে লুকিয়ে রইবে। জলে ভেসে যাবে দুচোখ। নিচের ঠোঁট থর্‌থর্ করে কাঁপবে। কিউ এর বয়স বেড়েছে শরীর ও মনের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তার সে চারিত্রিক বৈশিষ্টের পরিবর্তন আজো ঘটেনি। রেষ্ট হাউসে ফিরে ব্রেকফাস্ট ব্যবস্থা করতে দিগ্‌কে নিয়ে কিচেনে ঢুকেছে ঠিকই কিন্তু চেহারায় সকালের ঔজ্বল্য তখনো ফেরেনি।

তিন মাসের পরিত্যক্ত শিশু বড় হয়েছে শ্রাবনী বৌদির কোলে. মানবের পরের বোন যেমন মানুষ হয় ঠিক সেই মত। মানব দাদা, লাবনী বোন। লছমি ফেরেনি। ফেরেনি ইরফানও। ফেরার জন্য ওরা যায়নি। ক্রন্দনরতা লাবনীকে নিয়ে বৌদি, খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়েছে। শিশু ঘুমোতে ঘুমোতে বার বার কেঁদে উঠেছে, শ্রাবণী বৌদি কাজ ফেলে

ছুটে গেছে, বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। দিনের পর দিন, মাস পার হলে সে মায়ের স্পর্শ ভুলতে সমর্থ হয়। বৌদি তখন থেকে লাবণীর মা। মায়ের স্নেহ, মায়ের আদর, মায়ের ভালবাসা বৌদির কাছ থেকে পেয়েছে, মানব-দাদা এবং মানবের সাথে সাথে মানবের বাবা—লাবনীর বাবা।

ইরফান, লছমি চলে যাবার পর মানসদা থানা পুলিশ করেনি। খোঁজ খবরের কোন ত্রুটি রাখেননি। অফিসের সকলকে দিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের গ্রামে গ্রামে গোপনে সন্ধান করেছেন। যদিও মানসদা জানতো, কোন ফল হবেনা। বয়সের দোষ, যৌবনের যে উদ্দামতা, শান্ত নেপালি মেয়ে লছমির বুকে পাঠান যুবক ইরফান সৃষ্টি করেছে, সেখানে ঐ ছোট শিশু কন্যার প্রতি আকর্ষণ তুচ্ছ। তুচ্ছ সংসার, জগৎ—সবকিছু। একই কথা, পাঠান যুবকের অদম্য তৃষ্ণায় লছমি বেসামাল হয়ে দুজনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেও ছোট শিশু কন্যার বন্ধন ছিন্ন করে ওরা নিরুদ্দেশ। কোন অজানা দেশে। অজানা সমাজে দুজন দুজনকে নিয়ে আত্মসুখে মগ্ন হতে চেয়েছে। হয়তো চেনা জগতের চেয়ে অচেনা জগতের হাতছানি তাদের কাছে অনেক-অনেক বেশি মূল্যবান। যদিও মানসদা, ওদের দুজনের অবৈধ সম্পর্ককে কোনদিনই অমর্যাদা করেনিনি, অবজ্ঞা করেননি ঐ শিশু কন্যাকে, বরং তিনি চেয়েছিলেন, ওরা সামাজিক প্রথায় বিয়ে করে, স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করুক। লাবনী হওয়ার পর ইরফান খানকে ভৎর্সনা না করে সুন্দর জীবনের জন্য সৎ পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা সকল পরামর্শ ও সহযোগিতাকে তুচ্ছ করে যৌবনের আবেগে হারিয়ে গেছে চিরতরে। সন্ধান পায়নি মানসদা, সন্ধান পায়নি বড় হয়ে নিজের প্রকৃত পরিচয় জানার পর লাবনীও। লছমির অন্তর্ধান শিশু লাবনীর মনের অজান্তে যে দুঃখ সাগর সৃষ্টি করেছিল হয়তো তারই পরিণতি কথায় কথায়, সামান্য কথায় একবুক অভিমান, যা আজো অপরিবর্তিত। কিছু কিছু ক্ষত থাকে যা কিছুতেই শুকায়না, শুকোলেও দাগ থেকে যায়, আর দাগ নজরে এলেই ব্যথা আবার জেগে ওঠে। সেদিনের বঞ্চনার ব্যথার জন্য কেউ নিজের জন্মকে দায়ি ভাবে, মনে হয় অভিশপ্ত এ জীবন—তখনই মনের দুর্বল জায়গা থেকে ক্ষরিত হয় করুন রস, আশ্রয় নেয় মুখের চেহারায়, চোখের পাতার নিচে।

চেয়ারে বসি। অনুভব করি কিউ এর দুঃখ জর্জর মনের চেহারা। আমি ওকে চিনি। আমার কাছে আসার পর আমি প্রতিদিন ওর চোখের জল নিজের হাতে মুছিয়েছি। ওর দুঃখ জর্জর বুকে আমার হৃদয়ের কোমল স্পর্শে, স্বান্তনা ছড়িয়েছে। ওর দুঃখ সজোরে হরণ করে নিজে হজম করেছি। যে কারণে ওর দুঃখে আমার অন্তর কাঁদে। আমি অন্তরে অন্তরে কাঁদছি!

কিউ কিচেনে। অন্যদিন দিগ্ আর কিউ এর ছোট ছোট কথা শোনা যায়। আজ দুজনের কেউ কোন কথা বলছেনা, আমি ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিনা। কাজ করতে করতে কিউ নিজেকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। মনের জোরে ফিরে আসবে বর্তমানে। এ কবছরে আমি অন্ততঃ কিউ এর মনে সে শক্তিটুকু দিতে পেরেছি। কাগজ খুলি।

প্রথম খবর এন্ ডি-এর লোকসভা বয়কট। বিরোধীপক্ষ বিহীন লোক সভা। তাদের দাবী অভিযুক্ত মন্ত্রীদের বহিষ্কার করতে হবে। মন্ত্রি নিজেই যদি কোন অভিযুক্ত আসামি হয়, তাকে নিশ্চয় মন্ত্রী হিসাবে মেনে নেওয়া যায়না। এই দাবীকে সামনে রেখে সরকার

পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে বিবাদ চলছে নতুন ইউপিএ মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার পর থেকে। লোকসভা চলাকানীল ভারতবর্ষের নাগরিক কর্তৃক দেয় করের অনেক টাকা ব্যয় হয়। লোকসভায় এই ডামাডোলের কারণে বিনা কাজে অনেক টাকা খরচ হচ্ছে। সরকার পক্ষ হোক অথবা বিরোধি পক্ষ হোক—প্রত্যেক সাংসদের দেশের জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে। জানিনা তাদের এ পদক্ষেপ সংসদীয় রাজনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক কি-না। তাদের বিচার বিবেচনার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। সাংসদ এবং মন্ত্রীসভার বিভিন্ন নেতা সম্বন্ধে খবরের কাগজ এবং দূরদর্শনের মাধ্যমে যে সকল খবর পরিবেশিত হয় তা প্রচণ্ড উদ্বেগজনক। তাদের নৈতিকতা, তাদের আদর্শ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বিশেষ করে বর্তমান শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের অনেকেই রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ। এমত অবস্থায় দেশের যারা কর্ণধার অর্থাৎ লোকসভা, বিধান সভা এবং মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দের আত্মঅনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে প্রতিটি দুর্নীতির অভিযোগের প্রকৃত তদন্ত করা, বিচারের মাধ্যমে শাস্তি বিধান করা। এর-জন্য আইন আছে, পুলিস আছে, সিবিআই, ভিজিলেন্স আছে, আছে কোর্ট কাছারি—দেশের আইন সকলের জন্য, এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের সে সাংসদ হোক বা মন্ত্রী হোক, সমান ভাবে প্রযোয্য হবে। বিচারের ক্ষেত্রেও তাই হওয়া উচিৎ। সে কারণে কোন মন্ত্রী বা সাংসদের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে তবে উপযুক্ত বিচারের পরেই তার সরকারি পদে স্থান হওয়া উচিৎ এবং প্রয়োজনে আইনসভা সেরূপ আইন প্রণয়ন করা উচিৎ। কোন স্বার্থান্বেষী দল বা ব্যক্তির জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষতি করা উচিৎ নয়। কাগজের খবর পড়ছি এবং মনে মনে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি, যদিও রাজনীতিতে আমার আগ্রহ খুব কম। এইসময় কিউ ঢোকে। এক মুখ হাসি আর দুপ্লেট ডিম টোষ্ট হাতে। ভাজা ডিমের গন্ধ বেরুচ্ছে সসের গন্ধের সাথে। কাগজ পাশে সরিয়ে রেখে কিউটির মুখের দিক চেয়ে দেখি, ফেরার পথের সেই কালো মুখ আর নেই। বদলে হাস্যোজ্বল। যেন শরতের মেঘ, মৃদু হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে হঠাৎ আকাশে দেখা দিয়ে আবার ভেসে ভেসে হারিয়ে গেছে। কিউটিও ফিরে এসেছে সকালের তরতাজা, সৌরভমণ্ডিত চেহারা নিয়ে।

দিগ্ চায়ের জল বসিয়েছে। গরম, সুস্বাদু মুচ্‌মুচে, ডিমে ডুবিয়ে তেলে ভাজা টোস্ট খেতে থাকলাম। আমার খেতে ভাল লাগছে এই আনন্দে কিউটির মুখে তৃপ্তির হাসি। অদ্ভুত ওর মানসিকতা। আমি খুশি হয়েছি বুঝতে পারলে ওর সব দুঃখ দূর হয়ে যায়, ওর ব্যথার উপশম হয়।

—তোমার জন্য বেশী করে করেছি। তুমি বেশী করে খাবে। আজ বেশী পরিশ্রম হয়েছে।

—তারজন্য আমার খিদের মাত্রা বাড়েনি। তবে ভাল লাগছে খেতে, এবং নিশ্চয় একটা হলেও বেশী খাবো।

কিউ জানে এই খাদ্যবস্তুটি আমার প্রিয়। ধীরে ধীরে অত্যন্ত যত্ন সহকারে কিউ এটি প্রস্তুত করে।

—চলো, নৈনিতাল ঘুরে আসি। এত কাছে থেকে না ঘুরে ফিরে গেলে খারাপ লাগবে। কবে যাবে? একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। বাহাদুরকে বলি।

—নিশ্চয়। নৈনিতাল ঘুরতেই হবে। সকাল সকাল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ঘুরবো। নৈনিতাল সাততাল, ভীমতাল— যতগুলো তাল আছে, দেখবো, রেষ্টুরেন্টে খাবো, ম্যালে হাঁটবো। ভালই হবে। ব্যবস্থা করো।

—দিগ্ বাহাদুরকে বলে দেখি, সারাদিনের জন্য একটা গাড়ি পাওয়া যায় কিনা। ড্রাইভার এবং গাড়ি ভাল হওয়া চাই। যত্ন করে, আরামে ঘোরাবে।

দিগ্ চা দেয়। কাপ, প্লেট এবং এক পট গরম চা। দিগ্ ঢালতে চাইলে কিউ নিষেধ করে।

—যাও হাম লে লুঙ্গা। তুম্ নাস্তা করো, চায় পিও।

—দিগ্‌বাহাদুর—তুমি চা নাস্তা করে ইধার আনা।

—জী।

ধীরে ধীরে কিচেনে যায়। নাস্তা করে ফিরে এলে ওকে গাড়ির ব্যবস্থা করে জানাতে বললাম। কিউ আস্থাসূচক সম্মতি জানালো, অর্থাৎ গাড়ি পাওয়া যায়। আরাম করে বসে কাগজ খুললাম। কিউ একটা পাতা টেনে নিল। পোষাক বদলায়নি। না আমি না কিউ। শুধু টুপি আর মাফ্‌লার খুলে রেখেছি। কিউ ওর কার্ডিগান। দেখলাম কিউ কাগজ হাতে নিয়ে বসে আছে। ওর কাগজে মন নেই।

—কোনো খবর নেই।

—এই পাতাটা নেবে?

—না, ভাল লাগছেনা।

—পড়তে ভাল না লাগলে, গান গাও, ভাল লাগবে।

—না। আমি কি গান জানি?

—গান গাইবার জন্য না শিখলেও গান গাওয়া যায়, আর শ্রোতা যদি আমার মত বেতাল হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

—না।

কিউ পায়চারি করে। রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে দেখে। দেখে কাঁচের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের দৃশ্যাবলী। এর পর দরজা খুলে বাইরে পা রাখে।

—আমি আর একবার বেড়িয়ে আসি। ফিরে রান্নার ব্যবস্থা করবো। তুমি দিগ্‌কে বোলো ও যেন ব্যস্ত না হয়। তোমায় যেতে হবে না, তুমি অনেক বেশি হেঁটেছো আজ।

—আচ্ছা।

সামনের রাস্তা দিয়ে কিউ হাঁটছে। অল্প বয়স। বেড়াবার বয়স। শক্ত সমর্থ চেহারা। কাল রাতভর আমার কম্বলের নিচে গভীর ঘুমে ঘুমিয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও জাগেনি। আমিও ওর ঘুম ভাঙাইনি। আমার পাশে শোওয়া পছন্দ করে। ছোটবেলায়, মানসদার কাছে বেশি সময় থাকতো। বৌদি খাইয়ে, পরিষ্কার করে মানসদার পাশে শুইয়ে দিত সেখানেই ঘুমাতো। আর মানব ঘুমাতো মায়ের কাছে। সেই শিশু বয়স হতেই ও পুরুষদের পাশে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। মানসের প্রচণ্ড প্রিয় ছিল লাবনী। মানস নিজেও পছন্দ করতো, হয়তো লছমি ও ইরফানের লাবনী ত্যাগ করার জন্য স্নেহ বা মায়ার সাথে মানসদার অর্ন্তনিহিত করুণাও এই জাতিয় স্নেহ বা প্রশ্রয় এর কারণ হতে পারে। সেই মানসদার করুণ হৃদয়ও অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠল। প্রচণ্ড অন্তরের সংঘাত— একদিকে নিজের সন্তানের প্রতি ভালোবাসা পুরাতন পারিবারিক মূল্যবোধ

এবং কঠোর অনুশাষণ, অন্যদিকে করুণা বশতঃ অসহায়ের প্রতি মমতা, একদিকে অনুশাষণ অন্যদিকে মানবিকতা। অবশেষে সন্তানস্নেহ এবং সামাজিক অনুশাষণ জয়লাভ করল।, পরাজিত হল মানবিকতার মূল্যবোধ। অত্যন্ত কঠোর ও হৃদয় বিদারক সিদ্ধান্ত নেয়। বিসর্জন দিতে হল লাবনীকে, যাকে মানসদা নিজের মেয়ে অপেক্ষা কম ভালবাসতেন না। যদিও জানতেন এর ফলে মানব কষ্ট পাবে, শ্রাবনীর কান্না রোধ করা যাবেনা। তা বলে মানবের ভবিষ্যৎ জীবন, সামাজিক অবস্থানকে সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেনা। মানুষ বড় বেশি স্বার্থপর, নিজের স্বার্থ, নিজের সন্তানের স্বার্থ সবকিছুর ওপর। অন্যদিকে লছমি আর তার বাবার অর্থাৎ ইরফানের সম্পর্ক অর্থাৎ বাবা তার আত্মজার মধ্যে সম্পর্ক, সেখানে নিজের স্বার্থের জন্য, সুখের কারণে সে নিজের কন্যাকে দূরে সরিয়ে দিতে এমনকি অগ্নিতে নিক্ষেপ করতেও অনেক সময় কুণ্ঠিত হয়নি। নইলে লছমি, ইরফানের সাথে চলে যাওয়ার খবর শুনেও সুন্দরলাল থাপা অর্থাৎ লছমির বাবার মানসিক উদ্বেগের কোন কারণ হয়ে দাড়ায়নি। মানসদা লছমির খবর তার দিল্লী অফিসের মাধ্যমে সুন্দরলাল থাপাকে দেওয়া হলেও সে তার মেয়ের জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি বরং অত্যন্ত সহজভাবে মেনে নিয়েছে—কিয়া করেগা বাবুজি। নাতনি অর্থাৎ লাবণী হবার পর মানসদা ওদের খবর দিয়েছিলেন—সে অত্যন্ত সহজভাবে মেনে নিয়েছিল—এরকম আক্ছার হয়, সাদি হয়নি, লেড়কি হয়েছে তো কি হোয়েছো! লছমির মেয়ে অর্থাৎ লাবনীকে মানসদা থাপা দম্পতির কাছে তুলে দিতে এবং আর্থিক সহযোগিতা করার প্রস্তাবও গ্রহণ করেনি। বরং লছমি লাপাত্তা হওয়াতে সুন্দর থাপা নিশ্চিন্ত, তার লেড়কির জন্য আর তাকে চিন্তা করতে হবেনা। সে স্বস্তি পেয়েছে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ভারমুক্ত হয়েছে। সে লছমির মেয়ে লাবনীকে দেখতে আসবে, খোজ খবর করবে!...আশা করা অবাস্তব এবং অসম্ভব। হায়রে সমাজ, সামাজিক সুরক্ষার অভাব পিতাকে তার পিতৃত্বের স্নেহ থেকে বঞ্চিত করে। যতটুকু নিশ্চিন্ত হয়েছিল লছমির বাবা, লছমিকে মানস সাহেবের সাথে কাশ্মীরে পাঠিয়ে, তার বেশি নিশ্চিন্ত হয় লছমির অন্তর্ধানে। অবশেষে, লাবনীকে সাথে রাখার, তার প্রতি দায়বদ্ধতা এবং মানবিকতার করণে সেই শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করে সেদিনে মানসদা এবং তার স্ত্রী শ্রাবনী বৌদি। এবং তাদের এই গ্রহণের কারণ যাই হোক গ্রহণ করার মধ্যে কিঞ্চিৎ শূন্যতা বা ফাঁকি ছিল না। যথার্থ বাবা ও মায়ের দায়িত্বে, পরম স্নেহে ও যত্নে লাবনীকে মানুষ করেছিলেন কন্যা স্নেহে এবং পরম মমতায়, যথার্থ মর্যাদা সহকারে লাবনীকে উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। সত্যই সুন্দরী এবং ভাল মেয়ে কিশোরী ও যুবতি লাবনী। সেই লাবনীকে মানসদা ত্যাগ করলেন। অসহায় মানসদা!

অসহায় মানসদা , শ্রাবনী বৌদির সেদিনের চেহারা এখনো স্পষ্ট, সমান উজ্জ্বলতায় আমার চোখের সম্মুখে প্রতিভাত। কি অব্যক্ত যন্ত্রণা ছিল সেদিনের মানসদার চেহারায়! একদিকে স্নেহ ভালবাসা, মানবতা অন্যদিকে সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মের কাঠগড়ায় দাড়াতে, তার একমাত্র ছেলের ভবিষ্যৎ এ দোটানায় তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে লাবনীকে আমাদের কাছে রেখে বড় দ্রুত বেরিয়ে যায়। নির্বাসিতা বাক্রুদ্ধ লাবনী। কি দোষ ছিল তার? তার জন্মানোর জন্য কি দায়ী লাবনী? সে সুন্দরী-সেটা কি তার দোষ? তাকে যদি মানবদা ভালবাসে বা ভালবেসে মানবদা তাকে স্ত্রী হিসাবে পেতে চায়, সে জন্য কে সে দায়ী? সে কি কোনোদিন মানবদার কাছে তাকে গ্রহণ করার জন্য বা তার বিবাহিতা স্ত্রী

হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে? সে তো অনুমানে জানতে পেরেছে মানবদা' তাকে বিয়ে করতে চায়---তার জন্য লাবনীর কি অন্যায়? অনেক, অনেকবার সেই তো মানবদার আদর থেকে ঘনিষ্ঠতা হবার চেষ্টা কে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে একজন পূর্ণযৌবনা মেয়ের পক্ষে সেটা যে কত কঠিন লাবনী সে কথা কাকে বলবে? তাও যদি সে মানবদাকে না ভালবাসতে তো! তার সমস্ত ভালবাসার কেন্দ্রিয় বিন্দুতে অবশেষে একমাত্র মানবদাই ছিল। অথচ সে সমস্ত ইচ্ছা আবেগকে অত্যন্ত কষ্টে দমন করেছে। তার কথাই কেন এই শাস্তি!

জানিনা, হয়তো পুনরায় সেই পুরানো ক্ষত কিউ দেখতে পেয়েছে। সে কারণে এই সকালের সমস্ত আনন্দ উচ্ছ্বাস লোপাট। সামলে নেওয়ার প্রয়াসে কিউ নিশ্চয় ঘুরতে বেড়িয়েছে। পেঁয়াজ কাটার গন্ধ আসছে। দিগ্ কিচেনে পেঁয়াজ ছাড়াচ্ছে। চিকেন হবে। কিছুক্ষণ আগে দিগ্ কিউ এর নির্দেশে স্টেশন থেকে চিকেন নিয়ে এসেছে। কিউ এর নির্দেশে দিগ্, পেঁয়াজ আদা রসুন মাংসের মশলা রেডি করছে। কিউ ফিরে রান্না চাপাবে। কাল বলেছে হালকা চিকেন কারী, দেরাদুন রাইসের নরম গরম সুগন্ধি ভাত, স্যালাড আর বোতলের কেনা আচার আজ দুপুরের মেনু। ঘণ্টাখানেক পর ফিরে আসে কিউ। আমি ব্যালকুনিতে বসে আকাশ দেখছি, পাহাড় দেখছি, মাথার খালি জায়গা জুড়ে কিউ এর অতিত। কিউ ফিরেই সোজা ব্যালকুনিতে এসে পিছন থেকে আমায় জড়িয়ে ধরে আমার গালে ওর ঠাণ্ডা কোমল গাল ঘঁসে আর আস্তে আস্তে বলে—আমি আবার লাবনী হতে চাই বসন্ত, সেই ছোটবেলার লাবনী সেই প্রথম যৌবনের লাবনী...." আমি ওকে ধরে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে, ওর চোখের দিকে তাকায়—কান্নাচ্ছন্ন চোখের ভেতরে তার ব্যাথার ভাবের কিছুটা অংশ আমায় দিতে পেরেছে এতেই সে তৃপ্ত। সত্যিই আমি কি কিউ এর ব্যথা লাঘব করতে পারলে তৃপ্তি পাইনা?—পাই। এই সুখ দুঃখ বন্টন করে নেওয়ার মধ্যেই তো জীবনের স্বার্থকতা।

রান্নায় মনোনিবেশ করবে কিউ। প্রাণ মন দিয়ে রান্না করবে। অতিত ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে বর্তমানের কাজের মধ্যে। সেই ফেলে আসা দিন, ফেলে আসা স্মৃতি, সেই আনন্দঘন মুহূর্ত, যা এখনো উজ্জ্বল, যার পাশে যা কিছু আজকের প্রাপ্তি তা যতই ক্ষুদ্র হোক, অতিত সেই প্রাপ্তির কাছে ম্লান। কিউ জানে, তা কখনো সম্ভব নয়, ফিরে আসবেনা সে দিন, সেই মানব, সেই মানস কাকা, সেই মা। তারা অতিত, কবরস্থ চিরতরে, তবুওতার আকর্ষণ তার ঘ্রাণ এতই সুমধুর, মনকে টেনে নিয়ে যায়, বাস্তবতা থেকে দূরে। স্বপ্ন মানসিক ব্যাপার তার ওপর কিছু পাওয়া যায়না। স্বপ্ন, কৈশোরোত্তর কিউ এর জীবনে সন্দর জাল বিস্তার করছিল, জাল ছিড়ে গেলেও জাল বাঁধার ক্ষতগুলো এখনো রয়ে গেছে, যা থেকে আজো রক্ত ক্ষরিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে সে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে, তবুও রয়ে গেছে কিছু ক্ষতের দাগ, আমরণ-অম্লান থাকবে মাঝে মাঝেই দেখা দিতে পারে, ব্যতিক্রমের মত। জীবন এগিয়ে যাবে। কিউ এগিয়ে যাবে কাজের মধ্যে দিয়ে বসন্তের আর্টিকেল, বসন্তের করস্পণ্ডেস, বসন্তের নতুন বই এর নতুন লেখায়, প্রকাশনায়। বসন্তকে জীবনে ফিরিয়ে আনার তৃপ্তিতে ও সুখ আছে। একদিন সেই সব থেকে ছুটি। মনকে কাজের মধ্যে আটকে না রেখে, মনের দরজা খুলে দেওয়া স্বাধীন ভাবে পাখা মেলে ওড়ার জন্য। গাড়ি ঠিক হলেই নৈনিতাল যাবে, মন চাইলে রাণীখেত, আলমোড়া—বিনোদনের জন্য তৈরি ছোট ছোট পাহাড়ি শহর।

কাগজ খুলি। এমন সময় কিউ দু কাপ গরম চা বানিয়ে আমার সামনে আসে। এক কাপ কিউ এক কাপ আমি নিই। সুগন্ধি চায়ের কাপ হতে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কিউ পাশের চেয়ারে। ওর দিকে চেয়ে দেখলাম। হাসলো। না, এখনো স্বাভাবিক নয়। মনের ভেতরে সে তুফান কিছুটা প্রশমিত কিন্তু অর্ন্তহিত নয়।

—বসন্ত তুমি রাগ করেছো? তোমার খারাপ লাগছে?

—না।

—তোমায় আঘাত করেছি? আমি সত্যি বলছি, আমি ইচ্ছা করে কিছু করিনি। আমি চেষ্টা করছি। প্রচণ্ড চেষ্টা করছি, আমি বুঝতে পারছি, তোমার প্রতি অন্যায় করছি।

—থাক্।

—না সত্যি বলছি বসন্ত, ও আমার অন্যায়, তোমার প্রতি অবিচার।

—কিসের অবিচার?

—এই যে বেড়াতে এসেছি, আনন্দ করতে এসেছি, বিশ্রাম নিতে এসেছি তবুও আজ সকালে কেন যে— কেন যে মানবদার কথা, মায়ের কথা আমার এমন করে মনে পড়ল যে তোমার আমার আনন্দ মাটি করে দিল—আমার খারাপ লাগছে। বসন্ত জানি, ওরা আমার কেউ না। কোনকালে কোনো কাজে লাগবেনা ওরা। বসন্ত, আমি জানি, আমি জানি, তুমি আমাকে ভালবাসো, তুমি আমার জন্য সব কিছু করেছো, তবুও কি যে হয়, কেন যে হয় এ রকম, বুঝিনা।

—জানি। এর জন্য তোমায় দোষী করিনি।

—না করলে কি হবে, আমি যে দোষ করেছি—আমি জানি। আমার অন্যায় হয়েছে। বসন্ত আমায় ক্ষমা করো। এ রকম আর হবেনা।

—ভুল কিউ। একদম ভুল। তোমার কোন দোষ নেই। তুমি কোন অন্যায় করোনি। কোন অন্যায় করা তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।

বাঁ হাত দিয়ে ওকে কাছে টেনে নিই। ওকে জড়িয়ে ধরে কথাগুলি বলি। কিউ ওর মাথা আমার কাঁধে নিশ্চিন্তে তুলে দেয়। কিউ তৃপ্ত, কিউ শান্ত। আমি তৃপ্ত। কিউ উঠে যায়। আমি সিগ্রেট জ্বালাই। দীর্ঘদিন পর মানব তার অতিতের উষ্ণতা নিয়ে ফিরে এসেছে কিউ এর হৃদয়ে। আমি জানি কিউ, তুমি মানবের স্মৃতি তোমার মনে এখনো উজ্বল। মনের কেদারায় তুমি সংগোপনে সাজিয়ে রেখেছো সযত্নে। কাজের চাপে, ভুলে থাকার জন্য কিউ তুমি ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে আবরণ তুলে দাও সেই চেয়ার, আড়াল করার তোমার ব্যর্থ প্রয়াস, আমি জানি। কখনো কোন অসতর্ক মুহূর্তে, খোলা বাতায়ন পথে দমকা হাওয়ায় সে আবরণ অপসারিত হলে সেই ভাস্বর মানব তোমার চোখে বিদ্যুতের মত ঝলসে ওঠে, তুমি হতবাক, দিশেহারা হয়ে বিস্মৃত হও বর্তমান, ভবিষ্যৎ; অতিত অতি উজ্বল হয়ে বর্তমান থেকে তোমায় দূরে অপসারিত করে। তোমার চোখ জলে ভরে যায়। তুমি হৃদয় দিয়ে অশ্রু বর্ষণ করো। এ অশ্রু রোধ করার ক্ষমতা আমার নেই কিউ। আমি পরাজিত। তবুও আমার প্রয়াস আমার আত্মতুষ্টি।

আমি জানি কিউ। নিজের জীবনে সে অভিজ্ঞতা নাই বা থাক্, বলি কি করে, রুচীর সাথে আমার হার্দ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় আমাদের বিয়ের পরে। যদিও সে সম্পর্ক পারিবারিক নিয়মের বাধ্য-বাধকতা, রুচীকে আমার ভালবাসা অকৃত্রিম এবং ভালবাসার সেই সূত্রপাত বা সেই লগ্ন, আমার কি মনে নেই না ভুলে গেছি? ভুলিনি আজো। সেই

একই নিয়মে তোমার প্রথম প্রণয় পরশ অতি সুমধুর এবং অসীম তার প্রভাব যা মনের মনিকোঠায় আপন স্থান করে নেয় স্থায়ীভাবে, শত প্রচেষ্টা, শত প্রলোভনে তাকে বিচ্যুত করা যায়না। কিন্তু, কিউ, তোমার এ মনোকষ্ট, তোমার মানসিক টানাপোড়েন, বা দ্বন্দ্ব এই বৃদ্ধের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তা যত সামান্যই হৌক, তার খবর তুমি কি রাখো কিউ! যার জন্যও তোমায় আমি দায়ী বা দোষী সাব্যস্ত করিনা, করবোও না। যেমন রুচীকেও আমি দোষ দিই না। কিন্তু এ মন তোমাদের মনের দৈন্য দশা দেখে অনুতপ্ত নিশ্চয়, তবুও স্বাভাবিক বলে মনে করে। কারণ কি জানো? মনে হয়, পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই, কোন না কোন কারণে ভিন্ন, একে অপরের থেকে আলাদা বা পৃথক, আকৃতিগত বা বর্ণগত, সেই রূপ হৃদয়ঘটিত বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন। অনুভূতি বা উপলব্ধি সকলেরই আলাদা। প্রতিটি হৃদয় তার যেমন যে কোন অঙ্গুলি স্পর্শে ঝঙ্কৃত হয়না বা মুচ্ছর্ণার সৃষ্টি করেনা পরিস্থিতি যতই অনুকূল হৌক না কেন, আমার ও মনে হয় হৃদয় বৃত্তির এ ভিন্নতা সৃষ্টি-বৈচিত্রের নিয়ম। তবুও আমি নিরুপায় কিউ, আমার জীবনে কিম্বা আমার এ পৃথিবীতে সক্রিয় অস্তিত্ব তোমার উপস্থিতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তুমি এ জীবনে অপরিহার্য্য। তোমার হৃদয়ানুকুল্যে এ হৃদয়ে যে নুতন সুরের সিম্ফনি সৃষ্টি করেছে, জানি তুমি আমায় সেই আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত করবেনা। এ আমার একান্ত কামনা কিউ—আমার স্বার্থপরতা, আমায় অন্ততঃ আমাদের দুজনের জন্য তুমি বঞ্চিত কোরোনা!

কিউ কিচেন থেকে রান্নার প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করে দিগ্ বাহাদুরকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে, আমার সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাড়িয়ে বলে—

—গীজার অন্ করেছি। কিছু সময়ের মধ্যে জল গরম হয়ে যাবে। তুমি বাথরুমে ঢোকো। জামা কাপড় ছাড়ো। আমি যাচ্ছি, তোমার গায়ে হাতে তেল মাখিয়ে দেব। ঠাণ্ডায় তোমার গা হাত পা ফেটেছে, খস্ খস্ করছে। ঠাণ্ডা জায়গা, এখানে তেল না মাখলে চামড়া ফাটবেনা? এতো কলকাতা নয়। গায়ে মুখে ক্রীম লাগাতে পারো, তাও লাগাবেনা। যাও রেডি হও, আমি আসছি।

—জল গরম হৌক। সিগ্রেট ফুরোক। তুমি গেলে চিকেন ঠিক হবে? এরইমধ্যে রান্না হয়ে গেল?

—ঠিক আছে। সিগারেট শেষ করো, তার মধ্যে জল গরম হয়ে যাবে।

—তোমায় তেল মাখাতে হবেনা, জমাকাপড় নোংরা হবে, আমি তেল মেখে স্নান করবো।

—তেল আমি মাখিয়ে দেবো, তোমার দ্বারা হবেনা।

—তোমার স্নান হয়ে গেছে, আবার সব নোংরা হয়ে যাবে—জামা কাপড়—

—দরকার হলে চেঞ্জ করবো।

এই হচ্ছে কিউ। আমাকে কি ভাবে? আমি কি বাচ্চা না কি?—আমি তেল মাখতে পারবোনা? আসলে আত্মতৃপ্তি। আমার প্রতিটি কাজে, চিন্তাভাবনার সাথে নিজেকে যুক্ত করা। ভারতীয় রমনীর গুণ বা বৈশিষ্ট। স্বামী সন্তান সন্ততির জন্য নিজেকে উজাড় করে দেওয়া তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এমনকি নিজেকে অভূক্ত বা অর্দ্ধভূক্ত রেখে স্বামী বা সন্তানকে খাইয়ে তৃপ্ত হওয়া। আমি কিউকে যতদিন থেকে দেখছি, তার চরিত্রের এই দিকটার সাথে আমার সম্যক পরিচয় আছে। অথচ

আমি কিউ এর স্বামী বা সন্তান নই। তবুও কিউ নিজেকে আমার সাথে সম্পূর্ণ ভাবে লিপ্ত করে খুশি। কিম্বা আমার সুখে নিজের আনন্দের উৎসমূল সন্ধান করে বা উৎস হিসাবে গ্রহণ করে। আমিও নিজেকে কিউ এর ওপর সঁপে দিয়ে পরম স্বস্তি অনুভব করি। কারণ কি? কিউ এর নারীত্বের অন্তরালে যে মাতৃত্বজনিত ইচ্ছা বা মাতৃত্বের আকাঙ্খা, যা প্রত্যেকটি নারীর অন্তর্নিহিত স্বপ্ন তার ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পায়?— হতেও পারে। কিউ একজন নারী। মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের মায়ের আচরণের সাথে পরিচিত, স্বাভাবিক ভাবে সেই গুণাবলী তার চরিত্রে বিদ্যমান।

অতএব আত্মসমর্পণ করতে হয়। প্রেসারে সিটি মারছে। চিকেন ফুটছে টগবগ্ করে। প্রেসার বন্ধ হয়। আদা পেঁয়াজ মাংসের গন্ধে লজ ভরে গেছে। বাথরুমে টুলের ওপর তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে বসেছি। কিউ হাতে করে তেল নিয়ে আমার নগ্ন বুকে পিঠে মালিশ করে। মাথার চুল মুখের সামনে আসে। কিউ হাতের উল্টো দিক দিয়ে চুল সরিয়ে নেয়। গায়ে পিঠে হাতে ভাল করে তেল মাখায়। পূর্ণ যুবতি কিউ। আমার অর্দ্ধবয়সি পূর্ণ নারী। বর্ষায় ভরা বন্যায় নদীর ন্যায় যৌবন ওর শরীরে। ধ্যানমগ্ন উচ্চমার্গের কোন সাধু বা সন্যাসির ধ্যান ভাঙানোর মত তার শরীরের আকর্ষণ। এক বুক ভালবাসা উজাড় করে দেবার প্রস্তুতি পর্বেই কিউ প্রবঞ্চিতা। প্রবঞ্চিতা না বলে, বলা যায় সমাজের কুঠারাঘাতে পর্য্যুদস্ত। হায়রে! সেই—কিউ কি বসন্তের প্রেয়সী? রতিসঙ্গিনী? না মাতৃস্বরুপা? কিউ আমায় তেল মাখায়। আমি কিউ এর স্বরূপ ব্যাখ্যায় মগ্ন হই। কষ্ট হয়। আনন্দ হয়। এক সময় সে নিজে থেকে বলে, আমি যাই, তুমি স্নান করে এসো। রান্না হয়ে এল।

কিউ বেরিয়ে যেতে আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। আমি উঠে দাড়াই। কিউ ইতিমধ্যে বাথরুম থেকে বেরিয়ে গেছে। যাঃ ওর মুখ দেখা গেলনা। গেলেও আমার প্রশ্নের উত্তর পেতামনা। নারীর মনের সন্ধান দেবতাদের অজ্ঞাত, আমি কে—স্নান সেরে পোষাক বদলে খাবার টেবিলে। স্নান করে আরাম লাগছে। জড়তা কেটে গেছে।

কিউ বাথরুমে ঢুকে নিজে পরিষ্কার হয়ে, হাতে পায়ে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে টেবিলে আসে। পোষাক বদলেছে। দিগ্ টেবিল সাজিয়ে গরম দেরাদুন রাইসের ভাত আর গরম চিকেন আনে। দুজনে বসি. কিউ তুলে দেয়, তুলে নেয়, রোজকার মত পাশাপাশি বসে কথাবার্তায় দুপুরের খাবার খাই।

খাওয়ার পরে বসেছি ব্যালকুনিতে। বিকালের রোদ এসে পড়েছে আমাদের গায়ে। পশ্চিম সূর্য্যের মিষ্টি রোদে আরাম লাগে। কিউ এসেছে তার গায়ে মাখার ক্রিম নিয়ে। আমি সিগ্রেট জ্বালালাম। দিগ্ টেবিল পরিষ্কার করে তার খাবার নিয়ে চলে যবে। কিউ আপন মনে ধীরে ধীরে আবৃত্তি শুরু করলো। আপন মনে। আপন খেয়ালে। ভাল গলা---

স্থির জেনেছিলাম, পেয়েছি তোমাকে
মনেও হয়নি
তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা।
তুমিও মূল্য করনি দাবি
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় করে

আড় চোখে চেয়ে
আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে
পর দিনে মনে রইল না।
নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্বর্গ।

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে
"তোমাকে যা দিই......

তোমাকে যা দিই....যা দিই....যা! আর মনে পড়ছেনা। 'শেষ সপ্তক' এর এই কবিতাটি ঠাকুর তার একাত্তর বছর বয়সে লিখেছিলেন।

—বেশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই তা পারেন—উনিই তে লিখবেন। লিখেছেন ও।

—আর কেউ রবী ঠাকুরের মত জন্মাবেনা। এককালে কত কবিতাই না মনে রাখতে পারতাম! কবিতা পড়তে ভাল লাগত। মনে রাখতে পারতাম। যখন তখন আবৃত্তি করতাম। ঘরে, ছাদে, কলেজের করিডরে, ক্লাসে। মানস আঙ্কেল, আমার টেনে নিয়ে বসিয়ে আমায় দিয়ে বলিয়ে, কবিতা শুনতেন। আমি শোনাতাম। মানস আঙ্কেল মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করতেন।

—আর আজ?

—তাই ভাবি কোথা থেকে কি হয়ে গেল! কিভাবে সব হারিয়ে গেল!

আমি মাঝে মাঝে ভাবি—

—এর নাম সমাজ। মানুষ কত নির্ভরশীল। স্বাধীনতা একটা গুণ, সবাই অর্জন করতে পারেনা!

—হবে হয়তো।

নিস্তব্ধতা। নির্বাক, সিগ্রেট পুড়ছে। পোড়া তামাকের ধোঁয়া টেনে চালান করে দিচ্ছি শ্বাসনালি দিয়ে, আবার নাক মুখ দিয়ে সে ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পোড়া তামাক টানায় কি আরাম। এই ভাললাগাটায় অর্থাৎ আরাম হচ্ছে মনে হওয়াটাই ধূমপানীদের ধূপপানে রত বলে—যাকে বলি নেশা। আমি নির্বাক কিউএর অন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছি, অনুধাবনে। সেখানে অতিতের স্মৃতির উচ্ছাস। বাঁধ উপচে পরা জলের ন্যায় কিউ এর ছেলেবেলা মন উপচে আবেগ মথিত হয়ে কিউ এর মুখ থেকে নিঃসৃত হতে থাকল। আমি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করতে থাকলাম।

—আমি কলেজে। মানবদা হোস্টেলে, যাদবপুর থেকে সল্টলেক কি এমন দূরত্ব—মানবদা সুযোগ পেলেই, পড়াশুনার চাপ কম থাকলেই চলে আসতো। তখন আমরা ভীষণ বন্ধু। ভাই বোনের মত একসাথে মানুষ হয়েছি। এমনিতে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল কাছের। আমরা দুজনে দুজনের কাছে ছিলাম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছোট থেকেই। সেই মানবদা যাদবপুর থেকে বাড়ি ফিরলে, আমার পড়ার টেবিলে সামনা সামনি বসলে বা ছাদের কার্নিশে বিকালের আধো ছায়া আধো আলোয় আমায় আবৃত্তি করতে হতো। লক্ষ্য করতাম, মানবদার চোখে মুখে বিস্ময়। আবৃত্তি শেষ হয়ে যাওয়ার বেশ কিছু সময়

পরে মানবদা আস্তে, বড়ই আস্তে বলত—বাঃ!! আচ্ছা বসন্ত, এর নাম কি ভালবাসা?

আমি উত্তর দিইনা। কারণ দিতে হয়না। মানব লাবনীকে ভালবাসতো, ভালবাসে আজো। ভালবাসাইতো শেখায় একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে, একে অপরের প্রতি বিস্ময়াবিষ্ট বা মুগ্ধ হতে ভালবাসার বিশেষ উপদানই তো বিস্ময় বা শ্রদ্ধা। আমার উত্তর হীনতাই কিউ এর কাছে তাদের ভালবাসার স্বীকৃতি। কিউ জানে।

—মানবদাই শুধু শুনতে চাইতোনা, আমি বলেও আনন্দ পেতাম। মানবদাকে একা পেলেই নিজে থেকে আবৃত্তি করতাম। কথা বলতাম—কত কথা—কথার শেষ ছিল না। কলেজের গল্প, বন্ধুদের গল্প, সাহিত্য, গান—কিনা!

আমার এই বয়সে কিউ এর সেদিনের সেই অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। তবে এটুকু বুঝেছি মানব ও লাবণী সেদিন তাদের কল্পনা ও স্বপ্ন নিয়ে একটা জগৎ রচনা করে তাদের একমাত্র নিজেদের আবাস ভূমি মনে করে অবস্থান করতো সুখে, স্বর্গীয় আনন্দে, সেখানে এই বাস্তব পৃথিবীর সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না। হয়তো এই রকমই হয়। আমি লাবনীর সেদিনের সেই চেহারা দেখে প্রকৃতই বিস্মিত হলাম, শ্রদ্ধায় মন অবনত হলো।

—বসন্ত, আমরা মনে করেছিলাম, জীবনটা বুঝি সে ভাবেই কেটে যাবে। এবং মানবদার কাছ থেকে আর কিছু আশা করিনি। সত্যি বলতে আমরা এত কাছাকাছি থেকেও আমাদের মনে, বিশেষ করে আমার মনে অন্য কিছুই পাওয়ার ইচ্ছা জন্মায়নি। কিন্তু মানসকাকু মানবদার মধ্যে অন্য কিছু দেখেছিলেন, তার মনে হয়েছিল মানবদা ভুল করতে চলেছে, অন্যায় করতে চলেছে। মানবের একটা পরিচয় আছে। আচ্ছা বসন্ত বলতে পারো—আমার কি পরিচয়? মানস আঙ্কেল, তোমার, আর পাঁচজনের পৃথিবীতে একটা পরিচয় আছে, সেখানে আমার কি পরিচয় এই পৃথিবীতে?

—তোমার পরিচয়? কেন?—তুমি কিউ। তুমি একজন মহিলা। একজন ভারতীয় মহিলা। একজন মানুষ। একজন—আমার—

—বলো। বলো। বলতে পারলেনা। পারবে না।

বেশ তো তুমি নিজের মনে নিজের কথা বলে যাচ্ছিলে। আবার এ প্রশ্ন কেন? কি তোমার পরিচয়?

—মানস আঙ্কেল চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেনি। বাবা মা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর, কয়েক বছর দীর্ঘ প্রতিক্ষায় থেকেছে, যদি তারা ফিরে আসে, দিল্লিতে দাদুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। নিষ্ঠুর, তারা আসেনি। এর পরও, যেদিন হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ করতে গিয়ে আমি জানতে পারলাম, আমার বাবার নাম, নিজের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা হলেও আমি ভেঙে পড়িনি। কিন্তু সেদিন থেকে মানস আঙ্কেলকে বাবা বলে ডাকতে অসুবিধা হতো। মনে হত, পালিত বাবাকে—বাবা বলা যায়না। কিছুদিন মানস আঙ্কেলকে কোন সম্বোধন করতাম না। পরে পরে ধীরে ধীরে মানস আঙ্কেল হয়ে গেল। এই যে অবস্থা, বাবা বলে যাকে জানতাম, মা বলে যাকে জানতাম, দাদা বলে যাকে জানতাম, হঠাৎই তাদের পরিচয় যদি মিথ্যা হয়, এবং সে পরিবেশে নতুন-পুরানো পরিচিতির বদলে অন্য নতুন কোনো পরিচয় গ্রহণ করা, তা যে কত কষ্টের, কত দুঃখের, কত বেদনার, সে কথা বলে বোঝানো যায়না। বিশেষ করে যাদের আমি প্রচণ্ড ভালবাসি এবং যারা আমায় আপন ছাড়া পর ভাবেনা—তাদেরকে

কষ্ট দেওয়া এবং নিজে কষ্ট পাওয়া—বিশেষ করে ঐ বয়সের একটি জীবনে—বোধ হয় সেই উপলব্ধি কাউকে বোঝানো যায়না। বুঝলে বসন্ত?

কিউ বলছে। বলছে না। কিউ এর হৃদয়ের অনুভূতির নিঃসরণ ঘটছে, কিউ এর চোখের পাতা কখনো সিক্ত, আমার মনেও যেন সে আদ্রতা স্পর্শ করেছে। আমি শুধু কিউএর মন নিজের মনে জুড়ে নিয়েছি যাতে কিউ এর অন্তর কিছুটা হালকা হতে পারে। কিছুটা জায়গা পায়।

—মানস আঙ্কেল অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ প্রকৃতির। ছেলে মেয়ে ছাড়া থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। আমার প্রতি তার স্নেহের পাল্লা সব সময় ঝুঁকে থাকতো। সেই মানস আঙ্কেলও আমায় পরিত্যাগ করতে পারলো! বসন্ত, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। এ কি করে সম্ভব!

—পরিস্থিতি।

—কি পরিস্থিতি? কিসের পরিস্থিতি? আমি এমন কি করেছিলাম যে পরিস্থিতি বদলে গেল? সত্যি বলছি বসন্ত, মানবদাকে আমার ভাল লাগত, তার জন্য মানবদা আমার স্বামী হবে—একথা আমি ভাবিনি। মানবদাও ভাবতনা। কিন্তু মানস আঙ্কেল আর মায়ের সন্দিগ্ধ চিত্ততা, আমাদের সন্দেহের চোখে দেখা, আমাদের সম্বন্ধে আড়ালে আমরা যা নই, তা নিয়ে আলোচনা করার কারণেই হয়তো সে সিদ্ধান্ত পূর্ণবিবেচনা করতে বাধ্য করেছিল। এবং মানবদা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল যে সে আমাকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবেনা, প্রয়োজন হলে বিয়ে করবে। এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই মানবদার আচরণের মধ্যে পরিবর্তন এল মানবদা বন্ধুত্বের সম্পর্কের পাশাপাশি আমাকে তার প্রেমিকা-প্রণয়িনী বা তার ভাবী স্ত্রী হিসাবে ভাবতে শুরু করল। আমি মানবদার এই পরিবর্তন লক্ষ করলাম। প্রথমে ভয় হত, বাধা দিতে চেষ্টা করতাম, নিজেকে অন্যভূমিকায় ভাবতে চাইতামনা। কিন্তু মানবদাকে হারাতে আমি চাইনি তাই মানবদার ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছা যোগ হলো—স্বপ্ন দেখার শুরু—স্বামী সংসার—সন্তান, আদর্শ স্ত্রী ও মা হিসাবে ঠিক মায়ের মত—মানবদার মায়ের মত। বসন্ত বলো এ অন্যায়? আমি কি যোগ্যা ছিলাম না?

—কে বলেছে? তোমাকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়া—

—আমি এই পৃথিবীর অবাঞ্ছিতা। আমার মা আমায় চায়নি, আমার বাবা চায়নি মানস আঙ্কেল, মাও চায়না। যে চায়তো সে মানবদা, তাকে নির্বাসন দেওয়া হল, আমায় বিতারণ! কি অদ্ভুত এই পৃথিবী!

—আমি চাই।

—আমি জানি, বসন্ত, একমাত্র তুমি আমাকে চাও। তোমার বলিষ্ঠমন আছে। রুচী আন্টির উদারতা আছে, তাই এ ঠাঁয়। নইলে এতকাল কোথায় যে হারিয়ে যেতাম, কে জানে—

—মানস আঙ্কেল, তোমার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে।

—জানি।

—প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো আমার বাবা মাকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে মানস আঙ্কেল যথেষ্ট চেষ্টা করেনি। কি হবে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে এ ভয়ে। তা নয়। যেদিন আমি প্রথম জানতে পারলাম, সেদিন থেকে মনে হল এ পৃথিবী অন্ধকার, অন্ধকার পৃথিবীতে আমার জায়গা নেই। আমার জন্মদাতার কার্য্যকলাপে এ মুখ কাউকে

দেখানো উচিৎ নয়। স্কুল, কলেজ পড়াশুনা, জামা কাপড় খাওয়া দাওয়া আমার জন্য নয়। বেঁচে থাকার কোন অধিকার আমার নেই। খাওয়া দাওয়া পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময় ঐ মানবদা আমায়, দাদা বোনকে যেমন আদর করে, স্বান্ত্বনা দেয়, উৎসাহিত করে আমার সাহায্যে এগিয়ে এল। সেই সান্নিধ্যে, সেই উষ্ণতা একদিক থেকে আমায় বাঁচিয়ে তুলল। অন্যদিক মরণ হল মানবদার, মরণ হল দুটি কাঁচা মনের—একজন উত্তীর্ণা কিশোরী অন্যজন সদ্য যুবক। জানি মা ভালবাসতেন, মানস আঙ্কেল অত্যধিক স্নেহ করতেন, তবুও মানবদার সান্নিধ্য কেন যে হৃদয়গ্রাহি হয়ে উঠল, জানিনা।

—দুজন সমবয়সি বলে, দুজনের মনের সুর একই ডালে বাঁধা হয়েছিল বলে দুটি মন দুটি মনকেই প্রকৃত অবলম্বন বলে মনে করেছিল বলে—

—মানস আঙ্কেল কিন্তু তার পরও আমার বাবা মা, দাদু সন্ধান করেছিলেন। তিনি নিজে দিল্লি গিয়েছিলেন, যদি সেখানে কোন খোঁজ পাওয়া যায়। যায়নি। যে খোঁজটুকু পেয়েছিলেন—সে তোমার শুনতে ভাল লাগবেনা।

—জানি।

—না, মা দিল্লি ফেরেনি। ফিরলেও তার বাবা মায়ের কাছে মায়ের জায়গা ছিলনা। কারণ আমার মায়ের মা অর্থাৎ আমার দিদিমা, আমার দাদু সুন্দরলাল থাপাকে পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে গেছে—সেটা পতিতালয়ও হতে পারে। আমার দাদু, অন্য এক মহিলার সাথে ঘর বেঁধেছে। দিল্লির এক বস্তিতে থাকে। চাকরী নেই। দাদুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন মানস আঙ্কেল, সেখান থেকে যদি মায়ের কোন হদিস পাওয়া যায়। ফল হয়েছে বিপরীত। দেখা করতে প্রথমত চায়নি। অনেক অনুরোধে। নতুন স্ত্রীর চাপে বাধ্য হয়ে দেখা করে মানস আঙ্কেলের সাথে দূর্ব্যবহার করেছে। আমার মায়ের খবর রাখে না, রাখতে চায়না। বরং আমার জন্মের জন্য মানস আঙ্কেলকে দায়ি করেছে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে তার মেয়ে এ জাতিয় কাজ, অর্থাৎ বেজাত লোকের সাথে আমার মায়ের বিয়ের আগে তার সন্তান হতে পারে। অসম্ভব, মানস আঙ্কেল এ কুকাজের জন্য দায়ী। এবং দায়িত্ব তার। অত্যন্ত লজ্জায়, মাথা হেঁট করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে মানস আঙ্কেল। তার আগে থাপা দাদুর চেঁচামেচিতে বস্তির লোক জমে গিয়েছিল। জমে গিয়েছিল মজা দেখতে। অবশেষে প্রাণ নিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ কটু মন্তব্য শুনতে শুনতে পালিয়ে এসেছেন। এই আমার হেরিডিটি বুঝলে বসন্ত। তাও যদি স্বীকৃতি থাকতো, কথা ছিল, তবুও ভাবতে পারতাম, আমি ঐ বস্তির মেয়ে।

—হয়েছে। অনেক হয়েছে। এবার শান্ত হও। সামনে তাকাও—দেখো পৃথিবী সুন্দর।

—সেই চেষ্টাই তো করছি বসন্ত। এই জন্যই তো এই পাহাড় ভাল লাগছে। তোমার সাথে থেকে তোমার সাথে বেরিয়ে আমি সুখ পাচ্ছি। শান্তি পাচ্ছি, তোমার সান্নিধ্যে ঘটছে আমার চিত্ত শুদ্ধি। তুমিই তো আমার এ পৃথিবীতে একান্ত এবং একমাত্র আপনার লোক।

—দুপুর পেরিয়ে গেল। চেয়ে দেখো সূর্য পাহাড়ের মাথার ওপর নেমে এসেছে। বড় দেখাচ্ছে, রঙ বদলাতে শুরু করেছে।

কিউ এর চোখে জলের ধারা। না এ ঠিক নয়। কিউ দীর্ঘদিন হল কাঁদেনা। কান্না শুকিয়ে গেছে চিরকালের জন্য। আমি জানতাম ওর মন থেকে মানব, মানস, শ্রাবনী বৌদি মুছে গেছে। সেটা আমার ভুল ধারণা। ওরা এখনো আছে, উজ্বল হয়ে। যাক্। আমার ওকে স্বান্ত্বনা দেওয়া উচিৎ। ওর মাথা টেনে আমার বুকের সাথে চেপে ধরলাম।

কিউ এর চোখের জলে ভিজে যেতে লাগল আমার বুক। ওর চোখের জল, মোটা আঙুল দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। চুলে বিনুনি কাটলাম। স্তিমিত হতে থাকল অশ্রু বর্ষণ। বললাম---"চা খাব"।

কিউ উঠে কিচেনে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শেষ বেলার সূর্য আকাশ রাঙিয়ে পাহাড়ের পশ্চাদ্দেশে ঢলে পড়ছে দ্রুত। পশ্চিমের বৃষ্টিবিহীন বিক্ষিপ্ত মেঘের টুকরো সমূহ রঙ মেখে রঙিন। ভাল করে লক্ষ্য করলে ঐ মেঘসমূহের আকৃতির সাথে বিভিন্ন জন্তুর আকৃতির অনুরূপ বলে মনে হতে পারে। মেঘের রঙ আকাশের রঙ এর ছটায় পাহাড়ের চূড়া, গাছের শাখায় এক অদ্ভুত সুন্দর উজ্বলতা। যেন আকাশ পৃথিবী মিলে অস্তগামি সূর্যের উদ্দেশ্যে আবীর ছড়িয়েছে সীমন্তে। যেমন প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে এয়োতির দল সিঁদুর দিয়ে প্রতিমা বরণ করে একে অপরের সীমন্তে সিঁদুর পরিবেশন করে।

রঙ লেগেছে কিউটির গালেও। সকাল থেকে ঐ দুটি গাল লালিমা শোভিত হয়নি আজ। বিষণ্ণ পরিবেশ অন্তরে, যার প্রকাশ ওর চেহারায়। প্রকৃতি সেই কারণে তার সন্তানের, অর্থাৎ কিউটির গালে গলায় কপালে রাঙিয়ে দিল অপরাহ্ন বেলায়। অবহেলা করেছে কিউ নিজের প্রতি। পরনে ঘরোয়া পোষাক, একটা শাল বাসন্তি রঙের। চুল পরিপাটি নয়, গাল শুষ্ক, ক্রীম মাখেনি সে। স্নানের পর কিউ গায়ে সুগন্ধি ছড়ায়, সে গন্ধ উধাও অনেক আগে। তবুও কিউ এর শরীরের নিজস্ব মিষ্টি গন্ধ আমার নাকে প্রবেশ করছে হাওয়ার সাথে। মৃদু হাওয়া, বাংলাদেশের হেমন্তের হাওয়ার মত শীতল এবং মধুর; বইছে ঝির ঝির করে। উথল হাওয়া হিসাবে এই হাওয়াকে চিহ্নিত করা যায়। দীর্ঘক্ষণ ঘরের ছাদের তলায় ছিলাম—এখানে মুক্ত আকাশের নীচে উথল হাওয়ায় পরিবেশ মনোরম। এই পরিবেশ কিউ এর মনোলোকের পরিবেশকে প্রভাবিত করবে বলেই বিশ্বাস। তাই করুক—এ কামনা আমার অন্তহীন।

পড়ন্তবেলায় পাখীদের কাকলি মুখরিত কুমায়ুনের এ পাহাড়ি গ্রাম। এমনিতে পাহাড়ে পাখীর সংখ্যা অপ্রতুল। তবুও তাদের কাকলি অন্ধকার রাত্রির বার্তা বহন করে।

—কি অপূর্ব ডাক শুনেছো? কোথায়, কোন পাড়ার আড়াল থেকে ডাকছে কে জানে।

—শুনেছি, শুনছি অনেক ক্ষণ থেকে। তুমি শুনতে পেলে?

—আমার দুটো কানই খোলা—টুপি নেই, মাফলার ও জড়াইনি।

—মানুষের মাঝে মাঝে এ জাতিয় ভ্রম হয়---কাছের বস্তু দেখতে পায়না, নিকটের শোরগোল কানে ঢোকেনা। চালক চোখ ও কানের অর্থাৎ মন নামক বস্তুটি যদি সক্রিয় না হয়।

—আমার মন সদা জাগ্রত, সদা প্রস্তুত বসন্ত। মনের মৃত্যু ঘটলে বা মনের দরজা বন্ধ করে দিলে তো বেঁচে যেতাম, সুখ দুঃখের কোন অনুভূতি থাকত না। কষ্টও হতনা।

—সব কিছুর যেমন সমাপ্তি আছে, কষ্টেরও ইতি হবে, অন্ধকারের পর যেমন আলোর আবির্ভাব, দুঃখের পর সুখের দিনের ইঙ্গিত দুঃখের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে।

—আমার কোন কষ্ট নেই, দুঃখ নেই। আমি সুখে আছি, অনন্ত সুখে, বিশেষ করে তোমার মত প্রিয়জনের সান্নিধ্যে।

ছোট্ট করে আঙুলে চাপ দেয়। দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলাম। একবারের জন্য ও হাত ছাড়েনি কিউ। অসহায়তার ভীতির শিকড় কিউ এর মনে গভীর ভাবে প্রোথিত। বড্ড দুর্বল কিউ। একটা অবলম্বন, একটু প্রাণশক্তি কিউ এর প্রয়োজন, প্রায় বৃদ্ধ বসন্তের উপস্থিতি কিউ এর পক্ষে যথেষ্ট নয় তবুও স্পর্শে বসন্তের উপস্থিতি আজ বড় দরকার। আমি বঞ্চিত করিনি, করবনা, কিউএর বিশ্বাস অনাহত থাক। চেষ্টা করিনি ওর হাতের মধ্যে থেকে আমার হাতের মুক্তি। কিউ এর হাতের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া হাতের আঙুলে মৃদু চাপ দিয়ে জানিয়ে যায় সে কষ্ট মুক্ত, মুখের হাসি অনুকূল। আমি হাসি ফিরিয়ে দিই সম্মতি মেশানো হাসি দিয়ে। কিউ তৃপ্ত, আস্বস্ত। সকলের জীবনেই এই স্বান্তনা বা স্বস্তির প্রয়োজন। মানুষ একা এবং দুর্বল চিরকালই।

ফেরার পথে রাস্তায় দেখা হল মনোজের সাথে। বছর আঠাশের যুবক। নৈনিতাল কলেজ থেকে বিএ করেছে। আজো চাকরি পায়নি। বেকার। বেকার ঠিক নয় আংশিক বেকার। ফলের সময় বাগান থেকে মাল কেনে, পেটি তৈরি করে মালিকের গাড়িতে উঠিয়ে দেয়, মালিক নয়, মালিকের ম্যানেজার মাল দেখে, পেটি গুনে টাকা দেয়। এই কেনা-বেচার সময় দিন রাত্রি ব্যস্ত থাকে মনোজ। পাহাড়ে কোন মকান তৈরি হওয়ার মিস্ত্রি মজুরদের কাজ দেখাশোনা করে, বিনিময়ে কিছু টাকা, এখনো স্থায়ী কিছু হয়নি। তবুও ভাল পাহাড়ের অন্য অনেক পুরুষের মত মনোজ দিন ভর তাশ খেলে, নেশা করে দিন কাটায়না। এ রকম পুরুষের সংখ্যা পাহাড়ে কম। চাষের জমি নেই, চাষ করার জন্য লোক লাগেনা, কারখানা নেই মজুরের প্রয়োজন নেই। সামান্য কদিন বাগানে কাজ, রাস্তার কাজ ও মকানের কাজ ব্যতিত কোন কাজ নেই। যেকারণে বেকারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। অন্য পাঁচজন পাহাড়িদের থেকে মনোজ ব্যতিক্রম। বিনীত, নম্র, সুদর্শন যুবক, হেসে নমস্কার করে, কুশল সংবাদ নেয়, আবার চলতে শুরু করে। ওর বাড়িতে ওর বিধবা মা আছে। দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। লাজুক প্রকৃতির। হাঁসতে হাঁসতে ওকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম মনোজ শাদি করবেনা। সরাসরি উত্তর-নেহি জী। সাধন কা কৈ ঠিকানা নেহি, শাদি কিয়া করেগা। একই উত্তর পশ্চিম বাংলার বেকার যুবকের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। আমরা রেষ্ট হাউসে পৌঁছে গেলাম। বাইরে তখন অন্ধকার নামছে। ফুটছে তারারাজি একে একে পাহাড়ের চূড়ায়, আকাশ যেখানে পাহাড় স্পর্শ করেছে, আমাদের মাথার ওপর। দরজার কাছে সেই কুকুরছানাটি। কিউ নেই। দিগ্ আছে। ওকে প্রবেশের অধিকার দেয়নি। যে কারণে দরজার বাইরে থেকে কুঁই কুঁই শব্দ করছে। কিউ হাত বাড়িয়ে ওকে কোলে তুলে নেয়। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে প্রথমেই ওকে খাওয়ায়। সম্পূর্ণ অন্ধকার হওয়ার আগেই বাইরে ছেড়ে দিতে হবে, যাতে কুকুরছানাটি তার মায়ের কাছে পৌঁছাতে পারে। কিউ তড়িঘড়ি ওকে খাইয়ে দিগ্‌কে নির্দেশ দেয় কুকুর-ছানাটিকে পৌঁছে দিতে। আমি সোফায় বসি। কিউ বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে পোষাক বদলে পাশে বসে। ঠাণ্ডা নামছে। দিগ্ স্ন্যাকস ও কফি পরিবেশন করে। কফি খেয়ে সিগ্রেট জ্বালায়, কিউ ওর খাটে বসে ত্বক পরিচর্য্যা করে। সেই সকাল থেকে কিউ এর আচরণ একদিক থেকে অতিতের সুখের স্মৃতি, মানবের সাথে মধুরতম সম্পর্ক, কৈশোর যৌবনের উচ্ছল দিন অন্যদিক থেকে আত্মপরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পর সলজ্জ আচরণ, অপরিচিতির গ্লানিময় মানসিক সংঘাত এবং লঘু পাপে বা অপরের পাপে শাস্তিভোগ, জীবনের ছক সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া—এই যে দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বজনিত

কারণে কিউএর রক্তাক্ত হৃদয় বিচলিত করেছে আমার অন্তর। আপাততঃ অবিচল চেহারার অভ্যন্তরে চিন্তার জটলা। মানসদা, বৌদি, মানব, রুচী, রোহিত সকলে মিলে ভিড় করে একটা জটলা বা আবর্তের সৃষ্টি করেছে। আমি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, স্বাভাবিক আছি তবুও ঘটনাগুলো একে একে আছড়ে পড়ছে এ চিত্তের শূন্য বেলায়। কিউ কি জানে? মনে হয় জানেনা—তিন মাসের বাবা মা পরিত্যক্তা শিশু কন্যা লাবনীকে কিভাবে মানুষ করেছে লাবনী বৌদি ও মানসদা। বিদেশ বিভুঁই, যেখানে লোকের অভাব। মানসদা প্রোজেকেটর কাজে ব্যস্ত। কোলে চার বছরের শিশু মানব। সল্ট থেকে শিশু লাবনীকে নিয়ে মানসদা আসতো, গল্প হত, চা, জলখাবার হতো। খেতে খেতে গল্প—কাশ্মীরের কাজের অভিজ্ঞতা, কাশ্মীরের জীবনে সুরক্ষার অভাবের কথা, আর বাড়ির কথা—বাড়ি বলতে ছেলে আর মেয়ে অর্থাৎ লাবনী, লছমির মেয়ে। মানসদার মালবিকা আর মানবের বয়সের ব্যবধানের জন্য নতুন এই আগন্তুকই দায়ি। জানেনা লাবনী। আমিও বলিনি। আমি তখন ভীষণ ব্যস্ত। বাড়িতে সময় দিতে পারিনা। দেশে বিদেশে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ মিটিং সেমিনার অ্যাটেণ্ড করা, লেখার উপাদান সংগ্রহ, সাজিয়ে বিভিন্ন দেশে বিদেশে পাঠানো যোগাযোগ করা—প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে। সংসারের জন্য সময় দিতে পারতাম না। সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন দেশে, অসম বিকাশের মধ্যে, নারীর অবস্থান, নারীজাতির ভূমিকা, নারীজাতির পারিবারিক অবনমন-শিশুর জন্ম গ্রহণ, প্রকৃত শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার অভাব, রাষ্ট্রব্যবস্থার গাফিলতি, যুদ্ধের ফল, রাসায়নিক অস্ত্রের প্রয়োগ ও নবজাতকের সুস্থ্য জন্মগ্রহণ ইত্যাদির ওপর প্রচুর পড়াশুনা, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ, এর ওপর রুচীর কলেজের অধ্যাপনার জন্য নিজেকে তৈরি করা, বাড়িতে অভ্যাস করা, ইতিমধ্যে রোহিতের বড় হওয়া। ব্যস্ত জীবন, ব্যস্ত সংসার যাত্রা অথচ কাজের বিন্যাসের কারণে সংসারে শৃঙ্খলার অভাব। এর মধ্যেও মানসদার জন্য আমরা সময় দিতাম। ওদের আগমন সাদরে উপভোগ করতাম। সেখানেই উঠে আসত লাবনীর মা লছমি ও বাবা ইরফান খানের কথা। বৌদি লাবনীর কথা বলতেন। লাবনীর জন্য অত্যন্ত কষ্ট করতে হয়েছে কিন্তু তার জন্য বৌদির কোন ক্ষোভ বা দুঃখ ছিলনা বরং কিউকে কষ্ট করে মানুষ করার মধ্যে বৌদি অন্তরে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। অনুতাপ তো ছিলইনা বরং ছিল আত্মতৃপ্তির আনন্দ। উচ্ছাস সহকারে তিনি বর্ণনা করতেন। পরের সন্তান। এমনিতেই আমাদের সমাজে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ কে ভাল চোখে দেখেনা বেশির ভাগ বাবা মা। তার ওপর যদি অবৈধ হয় এবং সেই সন্তান যদি বাবা মার দ্বারা পরিত্যক্ত হয় সে সন্তানের ভবিষ্যৎ কি! কল্পনা করা কঠিন। সেই সন্তান এই লাবনী, মানসদা, বৌদির সাথে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে আপন মনে খেলে বেড়াচ্ছে। যার কোন বোধ বুদ্ধি নেই। নেহাৎই শিশু, একমুখ চপল হাসি, লাল টুকটুকে, অপূর্ব সুন্দরী, ছোট ফ্রক পরে ঘুরছে—ওকে দেখলে দেবদূতি বলে মনে করা যেতে পারে। বৌদি বর্ণনা করেন।

—কি বিপদ জানো বসন্ত, এখন তো ওকে এরকম দেখছে, কোন জ্বালা নেই, নিজের মনে খেলে বেড়াচ্ছে, শান্ত, বিরক্ত করেনা, কাউকে দেখলেই একমুখ হেসে আপ্যায়ন করে, মাতৃপিতৃ হারা তিন মাসের মেয়েকে সামলাতে কি দারুন হিমসিম্ খেতে হয়েছিল আমাকে। তোমার দাদাও মাঝে মাঝে রেগে যেত, বলত কোনো অনাথ আশ্রমে

পাঠিয়ে দেবে। পারিনি, মায়া, কারণ মায়াই এমনি জড়িয়ে গেলাম যে, ওকে আমাকেই মানুষ করতে হল। সেই সাত সকালে, ওকে ওর মায়ের হাত থেকে ওপরে নিজের ঘরে তুলে আনলাম, মানব ঘুমাচ্ছে, ওর ভিজে জামা কাপড় বদলে দিলাম। কোলে নিয়ে আদর করলাম, মুখ দিয়ে নানা আদরসূচক শব্দ করলাম, খিদে পেয়েছে মনে করে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করলাম। হলনা। কান্না থামেনা। কখনো ইনিয়ে বিনিয়ে, তার স্বরে মাতৃহারা শিশুর অবোধ কান্না—কি হৃদয় বিদারক, বলে বোঝানো যাবে না।

--তারপর খাবার ব্যাপারটা বলো।

মানসদা যোগ করে। আমরা শুনছি। মাঝে মাঝে লাবনীকে দেখছি, শিশু লাবনী, অবোধ লাবনী ঘরের মেঝেয় বসে পুতুল নিয়ে খেলছে আর আপনমনে হাহা করে হাসছে। বৌদি আবার শুরু করে।

-- বলছি। বুঝলে রুচী। ঐ টুকু শিশু, সে মায়ের দুধ ছাড়া কিছু খেতে শেখেনি, এত তাড়াতাড়ি বোতোল ধরাবো কি করে। কিছু সময় তো লাগবে। এদিকে বাচ্চা খিদেয় কাতর। কি করি আমার কি বুকে দুধ আছে, খাওয়াবো। মানুর চার বছর বয়স। শিশুও মায়ের দুধ ছাড়া খাবেনা। শেষ পর্যন্ত ওরই অফিসের এক বিহারী কর্মীর বৌ।

—হ্যাঁ কথায় কথায় অফিসে বসে আলোচনা করছিলাম। এসময় সাইডের একজন মেকানিক এগিয়ে এল। মজাফরপুরে বাড়ি। ওর স্ত্রী দু মাসের শিশু সন্তান আছে। সে দ্রুত বাসায় ফিরে গিয়ে নিজের স্ত্রীর সাথে আলোচনা করে মুশকিল্ আসান করে।

মানসদা যোগ করে।

--কি সুন্দর বৌটি। বিহারী বৌ, দেশোয়ালি, স্বাস্থ্যবতী, দু মাসের প্রথম সন্তানের মা। একবার নিজের সন্তান একবার লছমির সন্তান, লাবনীকে নিজের বুকের দুধ খাইয়ে বড় করল। যদিও বেশি দিন নয়। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ নিজের সন্তান ও অপরের সন্তানের মধ্যে এ ভাবে বন্টন করা, মাতৃত্বের এ জাতীয় নমুনা বিরল। এর দু এক মাসের মধ্যেই লাবনী বোতল খেতে শেখে।

বৌদি বলতো, মানস দা হাসতো, আমরা আশ্চর্য্য হয়ে শুনতাম। সংসারে এমনো হয়। লাবনী নির্বিকাব। সে খেলছে আপন মনে। আমি আয় আয় করে ডাকি, টলমল করে এসে হাঁসতে হাঁসতে হাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোলে তুলে আদর করি, চুমু খাই গালে। মানসদা শুনতো আব কপট হাসি দিয়ে বৌদির দোষারোপ করত।

—এর জন্য তুমি দায়ি। তোমার আস্কারা পেয়েই তো লছমি খারাপ হয়ে গেল।

---হ্যাঁ দোষ তো আমারই। কি করে জানবো, বলো রুচী, ভেতর ভেতর যে এ মতলব আছে, বোঝা যায়? সাদাসিধা ছোট মেয়ে লছমি! তবুও যা করলি, ঘরসংসার কর, বিয়ে থা কর, মেয়ে মানুষ কর—না, কেটে পড়া? ভীষণ অন্যায়। ভগবান ওদের শাস্তি দেবেই দেবে।

যাকে নিয়ে আলোচনা, এই লাবনী, ঘরময় পুতুল খেলে, হাসে লাফায়, ঘুরে বেড়ায়, আমরা ওর কথা শুনি, চিন্তা করি, ওর দুর্ভাগ্যের কথা শুনে কষ্ট হয়, আবার বৌদির মত মা পাওয়ার সৌভাগ্যের জন্য আনন্দ হয়। সেই লাবনী, আজ বড় হয়েছে, তার অতিত সে কিছু জানে, সবটা জানেনা। জানেনা কে তার বাবা কে তার মা! এ সংসারে পরিচয়হীনা কিউ যার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—তোমার ইরফান্ই কি রকম লোক বলো? ঐ রকম সুন্দর চেহারা তার মন এমন হবে কেন? নীচু মন। জানো বসন্ত, ইরফানকে দেখতে সুপুরুষ বলা যায়। মুসলমান, কাশ্মিরী লাল রঙ, তেমনি লম্বা, সুঠাম গড়ন। গুমটিতে বসে পাহারা দিতে দিতে যেকোন অছিলায় লছমির ঘরে। আমি দেখেও পাত্তা দিতাম না। কে জানতো তলে তলে ওর মতলব আছে। দেখতাম ওরা কথা বলে হাসে, গল্প করে—এক জায়গায় থাকলে এরকমটি হয়। হয়না?

—লাঞ্চের সময় ছিল ওদের দুজনের পক্ষে চরম সুযোগ। সাইড অফিস। বেলা পর্যন্ত কাজ করে দুপুরে খাওয়ার পর ঘণ্টা দুই বিশ্রাম নিতাম, তোমার বৌদির সামান্য দিবানীদ্রা। ওদের পোয়াবারো। লছমি নিজের কুঠরিতে, ইরফান্ গেট বন্ধ করে লছমির ঘরে, ছোট ছোট কথা, আস্তে আস্তে খুশির হাসি, গল্প করা। আমার ওদের ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ ছিলনা, জিজ্ঞাসা করিনি। বড্ড বাজে ব্যাপার।

আমি হলে তাই ভাবতাম। ঐ বয়সে ছেলেমেয়েরা হাসবে, গল্প করবে—এটা তো স্বাভাবিক। রুচীও সম্মতি জানাতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো—ইত্যাদি বলে সময় পার হয়ে যেতো।

—লছমি ছিল বেশি বেপরোয়া। সেই সময় বেশ কিছুদিন লছমি খেতে পারতনা কাজে মন বসতনা। আমি ভাবতাম হয়তো ওর মার কথা বাবার কথা মনে পড়ছে। ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু লছমি ঠিক বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল সে মা হতে চলেছে। তবুও আমাকে বলেনি। একদিন সন্দেহ হওয়াতে তোমার দাদাকে বললাম, তোমার দাদা লছমির সাথে কথা বলার পরামর্শ দিলেন। পরের দিনই আমি খুব আস্তে এবং অত্যন্ত লজ্জায় লছমির কাছে জানতে চাইলাম। যেন আমি লছমিকে জিজ্ঞাসা করে বড় অন্যায় করতে চলেছি। কিন্তু আমার ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হল লছমির সাথে কথা বলে। নির্ভয় লছমি, চট্পট স্বীকার করল সে। এ রকম তো হতেই পারে। এবং তার সন্তানের বাবা 'কে' তার নাম বলতেও দ্বিধা করলেনা। কোন ভয় নেই, লজ্জা নেই, ভবিষ্যতের ভাবনা নেই। সে একজন কুমারী তার মা হওয়া পাপ--কোন কিছুতে লছমির কিছু যায় আসেনা। সে সব জানে তার জন্য সে আদৌ চিন্তিত নয়। সামান্য ঘটনা মাত্র। কোনো লজ্জা, ভয় লছমির নয় বরং লজ্জা ভয় যা কিছু, সব আমাদের।

—তবুও ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করেছিল যদি টারমিনেট করা যায়। সময় পার হয়ে গেছে। ডেলিভারি ছাড়া বিকল্প নেই। এবং সেই ডাক্তার বাবুই লছমির চেক্আপ করা থেকে শুরু করে লছমির ডেলিভারি হওয়া পর্যন্ত সব দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কাশ্মীরে সেই ডাক্তার বাবুর নার্সিং হোমে লাবণী জন্মায়।

—ডেলিভারির দিন সে কি টেনশান্। তোমার মানসদার কোন অভিজ্ঞতা নেই। লছমি নাবালিকা, পরের মেয়ে। ইরফান্ যদিও সব স্বীকার করেছে এবং লছমিকে সাদি করতে রাজি আছে। তবুও আইনতঃ ওরা এখনো স্বামি-স্ত্রী নয়।

যদি কোন বিপদ হয়—কি হবে বলা যায়না। ডাক্তার বাবু ভাল ছিলেন, তিনি ভরসা দিয়েছিলেন, তবুও—

—নার্সিং হোমে ডেলিভারি হবে। লছমিকে ভর্তি করা হয়েছে। বাইরে শ্রাবনী আর আমি। ইরফান ছিল নার্সিং হোমের বাইরে, অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায়। বাচ্চা হল নির্বিঘ্নে। নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কাজ বাড়ল শ্রাবনীর। ইরফানকে ডেকে

লছমি আর ইরফান্‌কে এক সাথে থাকার পরামর্শ দিলাম। এক কথায় রাজি। এবং দুজনে খুশি।

—অন্ততঃ নিজের মেয়ে বৌকে নিয়ে সংসার করুক। সুখে ছিল তারা।

এর মধ্যে দ্বিতীয় বার চা আসতো। ঘরের আলো জ্বলতো। এক ফাঁকে খবর শুনে নিতাম। লাবনী ক্লান্ত হয়েছে। মানসের কোলে। ওকে ডাকতাম। মানসের কোল প্রিয় ছিল লছমীর সে-কোল ছাড়তো না সে।

—কিন্তু ওরা পালিয়ে গেল কেন?

রুচীর প্রশ্ন। রুচী সাধারণতঃ এসব বিষয়ে মোটেই উৎসাহ পোষণ করেনা, বরং শুনতে ভালবাসেনা। কিন্তু এক্ষেত্রে লাবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা না করে পারেনা। আমারও একই জিজ্ঞাস্য। সন্তান ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে যে সন্তান তাদের ভালবাসার সন্তান, যে সন্তানকে মা তার স্তন্য পান করিয়েছে। সে পালায় কি করে?—নিষ্ঠুর, অত্যন্ত নিষ্ঠুর ওরা।

—আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। অবিশ্বাস্য ঘটনা। কোন অসুবিধা হয়নি ওদের। খাওয়া পরা চিকিৎসা করা সব আমরা সামলাতাম, লছমিকে কাজ থেকে ছুটী দিয়েছিলাম। নিজের মেয়েকে দেখুক। পরামর্শ দিতাম, যাতে ওরা তাড়াতাড়ি বিয়ে করে। ইরফান্‌ তাদের ধর্মীয় নিয়মের কথা বলত। লছমির কোন কিছুতে আপত্তি ছিলনা। কিন্তু কি যে হল, কোন বুদ্ধি ওদের মাথায় ভর করল—হঠাৎই পলাতক।—ওদের তখনো বিয়ে হয়নি।

—আর কোন খোঁজ পাওনি?

—না। চেষ্টা করেছি, আমার অফিসের কাশ্মিরী লোক দিয়ে, দিল্লিতে, থানা-পুলিশ করিনি-পাছে অন্য বিপদ হয়। কাগজে ওদের নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন-ওরা চলে গেছে। লাবনী ওদের সুখের কাঁটা। লাবনী থাকতে আর ফেরে?

—এমনো হয়।

—হল তো। লাবনী আমাদের মেয়ে, ভুল করে লছমির পেটে জন্মেছে।

মনে মনে বলতাম—ঠিক তাই। ইরফান, লছমি লাবনীর কেউ নয়। লছমি বাবা মা হওয়ার অযোগ্য। রুচী শুনতো। বিস্ময় রুচীর চোখে। লাবনীকে টেনে নিয়ে আদর করতো।

সেই লাবনীর মনে সকাল থেকে অতিতের তুফান। কোলে পিঠে-এক সাথে বড় হয়েছে মানব ও লাবনী। বলতে গেলে একই পিতামাতার কোলে। কিন্তু ঘটনাচক্রে, সমাজের রীতি নীতিতে ভীত হয়ে কিম্বা জন্মগত গ্লানির জন্য দুটি জীবন বিচ্ছিন্ন এবং প্রকৃত অর্থে দুজনেই রিক্ত। রিক্ত একটি পরিবার। মাঝে মাঝে ভাবি। জীবন শুধু ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়, জীবনের কারবার ঘটে যাওয়া এবং না ঘটে যাওয়ার সমন্বয়ে। মানস আঙ্কেল বা বাবা, মা, মানবদা, মালবিকা—সল্ট লেকে একই পরিবারস্থ সদস্যবৃন্দের সাথে অতিবাহিত জীবন অর্থাৎ ঘটনাসমূহ, কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত। কানে শোনা তার জন্মদাতার কাহিনীর অংশ বিশেষ, যার সাথে তার পরিচয় নেই, শোনা ঘটনা কল্পনা দিয়ে সাজিয়ে, তার রূপ উপলব্ধি করা, স্কুল কলেজ, বন্ধু বান্ধব কৈশরের চঞ্চল মুহূর্ত, যৌবনের রঙিন দিন তারপর বাস্তবের নির্মম আঘাতে টুকরো হয়ে যাওয়া স্বপ্নের প্রাসাদ—যেন ভূমিকম্পে বিধস্ত স্বপ্নপুরি বা স্বপ্নের অট্টালিকা মানসলোকে প্রত্যক্ষ করে

কিউটি। গোটা অতিত বর্তমানে ধাক্কা মেরে বিতারিত করে বর্তমানের জায়গা দখল করে, তার রূপে, আতঙ্কিত, হতচকিত, আহত করে চলেছে ক্রমাগত কিউকে। সকালে গোলাপের সৌরভে মাতোয়ারা ছিল কিউ, সৌরভে মদির ছিল হৃদয়, হৃদয় রাগে রঞ্জিত করছিল নিজেকে, আমাকে, হঠাৎই অসতর্ক আমার ছোট্ট শব্দে, অতিত তাড়া করে সেই স্বর্গীয় বর্তমান কে বহিষ্কার করে শুরু করেছে ভূতের নাচন। যদিও কিউ লড়ে যাচ্ছে প্রবল সাহস নিয়ে, অতিতের কাছে আত্মসমর্পন নয়, বর্তমান সুন্দর ও সত্য প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস অব্যাহত। এবং অনেকটা সক্ষম, সে ঘুরে দাড়িয়েছে, চুলে চিরুনী বুলিয়ে আমার সামনে কিউ বসল। আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল মানসদারা সকলে। আমার চোখের সামনে কিউ, আমার অন্তরে কিউ আমার গায়ের সাথে লেপটে বসে আমার মনের শীতলতা উষ্ণতা দিয়ে উষ্ণ করছে কিউ। আমার সমস্ত উপলব্ধি জুড়ে এখন কিউ। কিউ।

কিউ ইতিমধ্যে দিগ্ বাহাদুরকে নির্দেশ দিয়ে এসছে। কিচেন থেকে টুং টাং মৃদু শব্দ আসছে।

—আজকের কাগজ দেখেছো?

—না।

—কাগজে একটা রিপোর্ট, আমি এক ঝলক দেখেছি, তোমার লাগতে পারে।

—আমি দেখিনি। তবে মন হয়না কাজে লাগবে। কাগজের রিপোর্টে কোন সারবস্তু থাকে না।

—দেখে নিও। আই এল ওর রিপোর্ট এবং ফাইন্যান্স কমিশনের রিপোর্ট এর-উল্লেখ আছে। তোমার আর্টিকেলে যদি কোথায় লাগে।

—ঠিক আছে, দেখে নেবো।

শেষ উত্তরের শব্দ গুলো সামান্য উত্তাপ মিশিয়ে মুখ হতে নিঃসৃত হয়। কিউ বুঝতে পারে। বুঝতে পেরেছে আমি রেগেছি। কিউ ও চাইছিল আমার মুখের পরিবর্তন হৌক। সে বুঝতে পরেছে, ভার ব্যবহারের জন্য আমার মন ভাল ছিল না বা অফ্‌মুডে ছিলাম। তাই সামান্য ঝগড়া দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক। আমিও সে অপেক্ষায় আছি—কিউ আমাতে ফিরুক। কিউ তাকিয়ে আছে আমার দিকে, চোখে চোখ পড়তেই এক ঝলক হাসি—সামান্য ভেট—মহারাজের মনের অনুগ্রহ পাবার আশায়! আমিই বা এ সুযোগ হাতছাড়া করি কি করে! দিগ্ স্ন্যাক্‌স ও কফি দেয়—কখনো স্ন্যাক্‌সে কামড়, কখনো কফিতে চুমুক—যেন নতুন স্বাদে।

—ভাবছি বাড়ি ফিরে—

—কি?

—তোমার জন্য—

—আমার জন্য?—বাড়ি ফিরে—প্লিজ বসন্ত। বেড়াতে বেরিয়ে এসব ভাবনা চিন্তাগুলো থাক্‌না। ফিরে গিয়ে ভাবনা ফেরার পরই ভাবা যাবে—

—লেখার ভাবনা?

—ওঃ বসন্ত, প্লিজ—

সত্যই কিউএর কেউ নেই। আমার বয়স হয়েছে। মানুষের মারা যাবার কথা বলতে পারবনা। কিন্তু কিউ এর জন্য কিছু করা প্রয়োজন। টাকা পয়সা ছাড়াও বাঁচবার জন্য

কোন কিছু অবলম্বন, বা বেঁচে থাকার স্বার্থে কোন কাজ বা কোন মানুষ বা প্রাণীর সাথে নিজেকে যুক্ত রাখা জরুরী—সে সংসার হতে পারে—শিল্প হতে পারে—আদর্শ হতে পারে।—তবুও একজন কাউকে পাশে চায় যে বিপদে-আপদে, সময়ে-অসময়ে পাশে থাকবে। কিউ জানেনা, মানস কিউএর উদ্দেশ্যে আমার কাছে কিছু টাকা রেখেছে। আমার লেখার রয়ালিটি, কলকাতায় আমার অফিস কাম ফ্ল্যাটে, কিউ এর পক্ষে পর্যাপ্ত, অসুবিধা হওয়ার কথা না। আমার অনুপস্থিতিতে কিউ নিঃস্ব হবেনা। তবুও—কিন্তু আজ কোন কিছুই শুনতে প্রস্তুত নয়।

কফি পর্ব শেষ দিগ্ এর বিরতি। নিচে যায়। নিজের বিবি বাচ্চার সাথে দেখা করতে যায়। আরামে সোফার ওপর পা তুলে বসি। কিউ ওর ঘরে। সামান্য বিরতি' হালকা আলোয় অস্পষ্ট অন্তরলোক—অস্পষ্ট ছবি, জীবনভোর তুলে রেখেছি অযত্নে, অগোছাল অবস্থায়। পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমণ অনন্ত, অব্যাহত, জীবন অব্যাহত। আমার হৃৎপিণ্ডের গতির অন্ত আছে, অনন্ত নয়, সে গতি অব্যাহত। মন এখনো গতিময়। জীবন পরিক্রমার শেষ ধাপে পৌঁছে গেছি। পরের ধাপের ঠিকানা জানা নেই, জানা নেই দিনক্ষণ।

কিউ এর সাথে দিগ্ কিচেন ঢোকে। দিগ্ ফিরে এসেছে। পাহাড়ে রাত নেমেছে। আকাশে তারা আছে, আছে চাঁদের আলো—এক ফালি চাঁদ উঠেছে পশ্চিম দিক থেকে। ধার করা আলো পাঠাচ্ছে, পৃথিবীর সাথে চাঁদের নাড়ির সম্পর্ক। দরজা খুলে ব্যালকুনিতে। আকাশ দেখার সাধ হল। সাধ হল সিগ্রেট খাওয়ার। রেলিংএ হেলান দিয়ে সিগ্রেট জ্বালালাম। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লাম। সামনে চাঁদ। চাঁদ কথা বলেনা। আমার ইচ্ছা করছিল চাঁদের সাথে কথা বলি। বলা হলনা। কিউ এসে পাশে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় কিউ এর মুখ দেখতে পাচ্ছি না, আঙুল দিয়ে কিউ এর কপালের চুল সরিয়ে দিলাম। কিউ হাত চেপে ধরল, সামান্য চাপ দিল আঙুলে। আবার ফিরে গেল কিচেনে।

কিচেন কিউকে ছাড়বেনা, না কিউ কিচেন ছাড়বেনা; বলা মুশকিল। কিউ রাঁধতে ভালবাসে নিজে হাতে রান্না করে পাশে বসে খাইয়ে তৃপ্তি পায়। টিপিক্যাল বাঙালি ঘরনীদের স্বভাব। দেখে শিখেছে শ্রাবনী বৌদির কাছ থেকে। আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে ধূমপান করলাম মেজাজে। রাত্রের খাবার তৈরি গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে, পরিষ্কার হয়ে রাতের খাবার শেষে নরম বিছানায় গরম কম্বলের নিচে। দিগ্ প্রতিদিনের মত, বাসন পত্তর, টেবিল গুছিয়ে ফিরে গেল নিজের কুঠুরিতে। কিউ দরজা বন্ধ করে, হালকা পোষাকে নিজেকে আবরিত করে ক্রিম দিয়ে ত্বক পরিচর্য্যা করে এক লেপের নিচে। আমি কিউকে ডাকলাম। জানতাম কিউ আমার কাছে শোবে, আমার কাছে না শুলে ও ঘুমোবেনা, রাতভর জেগে ছট্‌ফট্ করবে। ডাকলাম—এ কিউ শোবার আগে একবার চায়ছিল যেন আমি মুখ ফুটে ওকে ডাকি।

যথারীতি কিউ আমার কম্বলের নিচে ঢুকে আমাকে জড়িয়ে শুয়ে রইল। অন্য দিনের তুলনায় শীতল কিউ। আমি অপেক্ষা করি বা মনে মনে আশা করি কিউ অন্য দিনের অপেক্ষা বেশি মাত্রায় সক্রিয় হবে, আমাকে আদর করবে, আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবে।—না। কিউ এর জড়তা বা মানসিক স্থবিরতা এখনো বিদ্যমান। কিউ কষ্ট পাচ্ছে। কিউ এর মানসিক কষ্ট নিবারণে আমার দায়িত্ব নেওয়া উচিৎ। আমি কিউকে স্পর্শ করলাম প্রথমে অত্যন্ত হালকা এবং ক্ষণিকের জন্য, কিছু পরে প্রতিদিনের স্বাভাবিকতায়। কিউ

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল নির্বাক অথচ তার শারীরিক অবস্থানের মধ্যে দিয়ে। আমার একটা হাত কিউ এর ঘাড়ের নিচ দিয়ে গলিয়ে কিউকে কাছে টেনে, অন্য হাতের আঙুল ওর চুলের মধ্যে চালনা করলাম। আঙুলের স্পর্শে কোমল আরাম পৌঁছে দিলাম। না কোন চুম্বন নয় কোন উত্তেজনা নয়। স্বান্তনা, শুধু স্বান্তনা, কিউ আমি আছি তোমার জন্য, আমি আছি তোমার সুখ দুঃখের একান্ত সাথী হয়ে—কিউ তুমি আমার ওপর ভরসা করতে পারো, আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো। যথার্থ বন্ধু হওয়ার প্রয়াস আমার অব্যাহত থাকবেই।

ধীরে ধীরে কিউ এর শরীর এলিয়ে পড়ে, হাত পায়ের বন্ধন আমার শরীর থেকে আলগা হয়। আমি কিউএর ঘাড়ের নিচ থেকে আমার হাত সরিয়ে নিই, ওর মাথা বালিসে। ওর নিঃশ্বাস লম্বা। বুঝলাম কিউ ঘুমোলো। ঘুমোক। ঘুমোক, ঘুমোলে ঠিক হয়ে যাবে।

আমি অন্যদিকে মুখ ফেরায়। ঘুমোতে হবে। চোখ বন্ধ করি। চোখের পাতার নিচে দৃষ্টি আবদ্ধ। অন্ধকার। নিস্তব্ধ পাহাড়। একফালি চাঁদ হয়তো ডুবে গেছে পাহাড়ের পশ্চিমে। গাড়ির শব্দ, রাস্তার কুকুরের ভয় পেয়ে ডাক, হোটেলের ফেরার শেষ সৌখিন গাড়ির আলো, হর্ন বা জেনারেটারের শব্দ নেই। পূর্ণ স্তব্ধতা। ঘরের চালে গাছের ডালের ঝাপটাও নেই। কারণ হাওয়া বন্ধ। অন্ধকার রাত্রে ঘুমোতে চাই। আশ্চর্য ব্যাপার, ঘুম নেই। এপাশ ওপাশ, চোখ বন্ধ করে চেষ্টা করছি, ঘুম আসে না। এমনটি হওয়ার কথা নয়। এই পাহাড়ে প্রতিদিন আমি আরামে ঘুমাই। আজ নেই। স্বভাবতঃই মনের মধ্যে নানান্ কথার আনাগোনা। রাত বাড়ছে। কত রাত আন্দাজ করতে পারছিনা, তবে মধ্যরাত পেরিয়েছে নিশ্চয়। কি অস্বস্তি!

কি সুন্দর শুরু হয়েছিল আজকের দিন। অপূর্ব জায়গা। দারুণ মিষ্টি গোলাপের গন্ধ, রঙিন প্রজাপতির ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো। মনের মধ্যে সুন্দরের সৃষ্টি সুরের ব্যঞ্জনা। হঠাৎ কি যে হল— কেটে গেল। বেসুরো বেতাল হয়ে গেল। কিউ এর অর্ন্তদাহ, কিউ এর স্বপ্নাহত অতিত মসীলিপ্ত করলো সমস্ত দিন। এরকম খারাপ দিন এ পাহাড়ে কোনদিন আসেনি। আমি চাইনা কিউ কষ্ট পাক। হালকা ঘুম আসছে। আবার ভেঙে যাচ্ছে। আবার সেই কিউ। কিউ আমাকে প্রশ্ন করছে—বলতো কি আমার পরিচয়? বলো।—বলো। বলবেনা তো?—বলোনা। কেঁদে ফেলে কিউ? আমি ওকে স্বান্তনা দিই। কিউ তুমি কাঁদছো?—কে বলেছে আমি কাঁদছি?—আমি হাসছি, এই দেখো আমি হাঁসছি। কিউ হাসবার চেষ্টা করছে—ওর চোখে জল ছলছল করছে। বসন্ত, আমার কোন পরিচয় নেই। আমি জারজ সন্তান। আমি এ পৃথিবীর জঞ্জাল। আমি কিউ এর মুখ চেপে ধরি। ওকে জড়িয়ে ধরে স্বান্তনা দিই। বলি তুমি আমার। আমি আছি। আমার পরিচয়ে তোমার পরিচয়।—তুমি আমার। কিউ প্রশ্ন করে—বলো তুমি আমার কে?—কে আমি তোমার?—বলতে পারবেনা। সত্যি কথা বলতে পারবেনা। আমি তোমার রক্ষিতা—রক্ষিতা। ধমক্ দিই কিউকে। জোর ধমক। কিউ হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু 'করে।

আধো জাগা আধা ঘুমে অবচেতন মনের নানান প্রশ্নে ঘুম হয়না। ঘুরে কিউকে দেখি। ও নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। কম্বল টেনে দিই-যাতে ঠাণ্ডা না লাগে। আস্তে স্পর্শ করি ওর ঠোঁট। ঘুম ভাঙেনা। এরকম নীদ্রাহীন রাত জীবনে আমার কেটেছে বহুবার। রুচী

যখন পাশে থাকতো তখনো ঢের বেশি বার। তখন যন্ত্রণা ছিল অন্য জাতিয়। মনের ওপর শরীরের আধিপত্য ছিল প্রবল অপরদিকে রুচীর সার্বিক শীতলতা—সে যে কি গ্লানী—বোঝানো যাবেনা। সেই রুচী। রুচী আর কিউটি—বাস্তবে দুই নারী এবং আমি একক পুরুষ-সকলের মত সুখ দুঃখ ভালবাসায়। পৃথিবীর জন্য কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। জীবনের শেষ অধ্যায় সমাগত। অথচ ঘুম আসছেনা—কি বিপদ বলুন তো?

কখন যে তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা। ঘুম ভাঙল যখন তখন কিউ আমার পাশে বসে। কিউএর উষ্ণ শরীরের স্পর্শ আমার বুকে, কিউএর ঠোঁট চেপে বসেছে আমার ঠোঁটে। চোখ খুলে দেখলাম সূর্যের আলোয় ঘর ভরে গেছে। কিউ এর উষ্ণ ঠোঁট আমার নীদ্রিত ঠোঁটকে মুক্তি দিয়ে উঠে দাড়াল। আঃ কি উষ্ণ কিউ—কিউ এর সর্বঅঙ্গ! মনে হল আর কিছু সময় কিউ ঐ ভাবে থাকলে আমি পুড়ে যেতাম, গলে যেতাম!

—বসন্ত, এই বসন্ত—আর ঘুমায়না ওঠো। তোমার চা আসছে।

—ওঠো। আর ঘুমায়না।

—ঘুমোতে দিলে কৈ?

উঠে হেলান দিয়ে বসলাম। চোখ খুলে। সামনে সূর্যের চেয়ে জ্যোতির্ময়ী কিউ। সূর্যের আলোয় আলোকিত ঘর বিছানা। কিউ রাতের পোষাকের ওপর চড়ালো ওভার কোট। দিগ্ এসেছে। চায়ের জল বসিয়েছে। কিউ টয়োলেট থেকে বেড়িয়ে চা দেবে। মনে পড়ল দিগ্ নৈনিতাল বেড়াতে যাওয়ার জন্য গাড়ি ঠিক করার কথা। গাড়ির ব্যবস্থা হলে—শৈলশহর নৈনিতাল। ও নিজেও চা পান করেনি। দিগ্ এসে চায়ের জল বসিয়ে ঘরের কাজে লেগে যায়। বাইরের জানালা দিয়ে সবুজ বনানী দৃশ্যমান। চা খাওয়া হয়নি। ঘুম হয়নি রাত্রে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। কিউ এর স্নান সারতে দেরী হবে, আলস্যে চোখ বন্ধ করলাম।

বাথরুমের দরজা খুলল। শব্দ হল দরজার। স্নান হয়ে গেছে। দরজার আওয়াজে চোখ খুলে গেল। পাতলা হাউস কোট পড়ে রয়েছে কিউ। মাথার চুল, গালের জল, হাত পা তোয়ালে দিয়ে মুছছে কিউ। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে লেগেছে কিউ এর স্বর্গীয় শরীরে। যে শরীরের ওপর আমার অধিকার সম্পর্ণ তবুও প্রভাত সূর্যের আলোয় সদ্যস্নাত কিউ এর হালকা হাউস কোটের নিচে শরীর সুন্দর, দৃষ্টিনন্দন—দেখছিলাম লোভির চোখ দিয়ে। কিউ ভ্রূকুটি করে আপত্তি জানাল।

—ডাকলে কেন? পরে ডাকলেই পারতে।

—ডেকেছি বলে কি, চুরি করে—

চট্পট্ পোষাক পরে নিল। চোখ বন্ধ করলাম। কিউ এর গায়ের তাজা, মিষ্টি গন্ধ নাক দিয়ে মাথায়, মাথা থেকে হৃদয়ে প্রবেশ করে আমায় উত্তেজিত করছেনা ঠিকই তবে আকৃষ্ট করছে। মন ও শরীরে আমেজ অনুভূত হচ্ছে। কিউ ওর মন সকালের রোদ্দুর এর মত তাজা, তাজা কিউ এর শরীরের মত।

দরজা খুলে কিউ কিচেনে। মগে করে এক মগ চা। কম্বলে পা চাপা দিয়ে সোজা বসে চা নিলাম হাত বাড়িয়ে। কিউ অন্য মগ নিয়ে ওর বিছানায়।

—চা খেয়ে তৈরি হয়ে নাও। তোমার গাড়ি আসবে।

—গাড়ি রেডি।

এই সময় দিগ্ এসে দরজার সামনে ঘাড় নিচু করে নমস্তে করে বলে—

—সাব্, ড্রাইভার কো কব্ আনেকা বলেগা?

—ব্রেকফাস্ট খানে কা বাদ্ নিকাল যাউঙ্গা।

—জী।

—ঘণ্টা দেড়েক নিশ্চয় লাগবে। তোমার হবে তো বসন্ত?

—জী। নও বাজে আনে কে লিয়ে বোল্ দেতা হুঁ। ও বাহার খাড়া হ্যায়।

—ঠিক আছে বলে দাও। ব্রেকফাস্ট করে বেরোনো ভাল। নৈনিতাল, ভীমতাল, সাততাল যদি আরো কোন তাল থাকে দেখে ফিরবো। দারুন মজা হবে কি বলো কিউ?

—তুমি পারবে তো?

—চেষ্টা করব।

চট্ করে বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকে যাই। কিউ কিচেনে। কিউয়ের এরকম নির্দেশে দিগ্ ও কিউএর পিছনে পিছনে কিচেনে।

ব্রাশ করলাম। দাড়ি কাটলাম। আয়নায় নিজের চেহারা দেখলাম। গালের চামড়া নরম হয়ে গেছে। ঝুলে না পড়লেও মুখের চামড়ার নিচে মাংস সমূহ আগের মত দৃঢ় নয়। কানের পাশের চুলগুলো সব সাদা। দাড়ি সাদা, গোঁফ্ সাদা। বয়স হয়েছে। প্রায় বৃদ্ধ। কোমর ভাঙ্গেনি বা হাত ও পায়ের পেশি কুঞ্চিত হয়নি। ঠিকই তবুও বৃদ্ধ নিশ্চয়। মনের জোরে মনে করছি বার্দ্ধক্যকে দূরে সরিয়ে রাখব কিন্তু সময় মানছে না। যদিও যুবতি কিউ আমার পাশে আছে।

ভালই হল। গতকাল থেকে ওর মন খারাপ, নতুন জায়গায় গেলে, নতুন পরিবেশে নতুন ভৌগলিক অবস্থানে নতুন নতুন সৌন্দর্যে মন ভরে যাবে। গত কালের গ্লানী মুছে যাবে কিউ এর মন থেকে। শক্ত মনের মেয়ে। নইলে এখনো অথৈ দুঃখের সাগরে নিক্ষেপিত হয়েও নিজেকে কি ভাবে সজীব রাখে।

গত রাত্রে কি আজে বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম আমি। বাস্তবতা বর্জিত এ জাতিয় স্বপ্ন অর্থহীন তবুও রাত্রের ঘুম ভীষণ ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। স্বপ্ন স্বপ্নই। অনর্থক—মাথামুণ্ডু নেই। আচ্ছা, যদি কোনদিন সত্য সত্যই কিউ আমাকে প্রশ্ন করে—তোমার আমি কে?

—কোন উত্তর আছে কি?—নেই। কিউ কোনদিন এসব প্রশ্ন করবেনা। কিউ বুদ্ধিমতি, কিউ আমায় ভালবাসে, আমায় শ্রদ্ধা করে—আমি নিশ্চিন্ত কিউ কোনদিনই আমায় এ প্রশ্ন করবেনা। কিউ আমায় ভালবাসে। আমিও কিউকে ভালবাসি। যাই হোক কিউকে নিয়ে আমায় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিউ আমার ওপর নির্ভরশীলা। আমার কর্তব্য স্থায়ীভাবে কিউকে প্রতিষ্ঠিত করা। নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাড়াবার জন্য কিউকে বারে বারে উৎসাহিত করেছি কিন্তু কিউ নারাজ, সে আমাকে ত্যাগ করতে চায়না—সে আমায় ছেড়ে কোনদিনই কোথাও যাবেনা।

এবার দেশে ফেরার পর নতুন উদ্যমে লাগতে হবে। যে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমি কিউ এর প্রতিষ্ঠা চাই। সিদ্ধান্ত নিলাম ব্রাশ করা, দাড়িকাটা ও স্নান করার সময়। চাকরি করুক, মাস্টারি করুক, পড়াশুনা করুক, গান করুক, মানুষের সেবা করুক—কিছু একটা করতেই হবে। যা মন চায়। আমার কাছে থেকেই করুক—ওকে দূরে কোথাও যেতে হবেনা।

স্নান সেরে বেরোলাম। জামা কাপড় পরে, রেডি হয়ে টেবিলে। বেশ আরাম

লাগছে। না, ঘুমানোর ক্লান্তি নেই। শীতের দেশে গরম জলে স্নান করে আরাম হয়। মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা কম। কিচেন থেকে এখনো কাঁটা চামচ প্লেট ইত্যাদির শব্দ আসছে। কিউও দিগ্ সেখানে। কিউ এর গলায় গুন গুন শব্দ। সূর্যের আলোয় ব্যস্ত সবাই। দিন থাকতেই যে যার কাজ সেরে নিতে চায় সকলে, বিশেষ করে এই পাহাড়ে—ঘরের কাজ, বাইরের কাজ পড়াশুনা, পশুপালন ইত্যাদি। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ী জীবনের কর্মব্যস্ততা—এমনকি উদ্ভিদজগৎও, তার সূর্যের দিকে পাতা সঞ্চার করে সূর্যের আলো থেকে সংগ্রহ্ করছে বেঁচে থাকার উত্তাপ আলো এবং রশ্মি। এ পৃথিবীর যা কিছু জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ এমনকি বায়ুজল সবই সূর্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত। সূর্য উৎস, ঈশ্বর-সূর্য একমাত্র দেবতা। দুহাত তুলে সূর্য্যকে প্রণাম করলাম। কোনদিন, কোন অলৌকিক বস্তু বা দেবতাদির ওপর আমার বিশ্বাস নেই। তবুও মাঝে মাঝে মন অবিশ্বাস্য দেবতাদের স্মরণে ভক্তিতে নত হয়। আমি সম্পূর্ণ বাস্তববাদি তবুও বংশ পরম্পরায় যে সংস্কার, তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া কঠিন।

ব্রেকফাস্ট হল, চা হল, মারুতি ভ্যানের ড্রাইভার চা খেল। কিউ তৈরি হয়ে নিয়েছে। গাড়ির দরজা দিয়ে পিছনের সিটে কিউ আর আমি। গাড়ি ছাড়ল, দিগ্ ফিরে গেল নিজের কাজে। গাড়ি চলল শৈলশহর নৈনিতাল, পাহাড়ের গা কেটে তৈরি করা রাস্তা দিয়ে, রাস্তার এক পাশে ঢালু পাহাড়ের গা অন্যপাশে উঁচুতে পাহাড়ের শিখর। বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে। কুমায়ুন বনসম্পদে সমৃদ্ধ। জানালা দিয়ে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম—ছায়াঘেরা পাহাড়ের কালো মসৃণ পথ।

—পাহাড়ে গাড়ি চড়ে ঘুরতে ভাল লাগে।

—ভাল লাগছে?

—ভীষণ ভাল লাগছে।

কিউ উৎসাহিত, উজ্জীবিত। হালকা প্রসাধন। মিষ্টি সতেজ কোমল চেহারা। লাল গাল, মাথার চুল বড় বড় ঘাড় পর্যন্ত—ব্রাশ করা। পবনে কালো জিন্‌স গায়ে কমলা রঙের লুব্ধ গেঞ্জি। কার্ডিগান গায়ে চাপায়নি, গাড়িতে রাখা আছে, দরকার হলে ব্যবহার করবে। পায়ে ফিতে বাঁধা সামান্য হিল। গাড়ি চলছে ঢালুর দিকে—এঁকে বেঁকে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ের ওপর দিয়ে। প্রতিটি টার্নিংয়ে কখনো কিউ আমার ঘাড়ে কখনো আমি কিউয়ের শরীরে পড়ে যাচ্ছি। খারাপ লাগে না, বরং উপভোগ করছি। মাঝে মাঝে একে অপরের হাঁটু চেপে ধরে সামলে নিচ্ছি। ছায়াঘেরা রাস্তা। পথচারী নেই। মাঝে মাঝে দু একজন গ্রামবাসি দেখা যাচ্ছে, মাথায় করে কাঠ কুড়িয়ে বা ঘাসের বোঝা নিয়ে চলেছে যে যার গন্তব্যস্থলে বা রাস্তার আশে পাশে ছোট ছোট গ্রামে। কোথাও কোথাও ভুট্টা ছাড়িয়ে, পুড়িয়ে নুন লেবু মাখিয়ে বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতা কম। কখনো কোন গাড়িতে যাতায়াত করি যাত্রি বা যাত্রিনী কেনে। সামান্য লাভেই চলে। চাহিদা খুব কম। একটা দুটো বাস চলেছে পাহাড়ের পর পাহাড় পার করে বিভিন্ন কুমায়ুনের গ্রামে। আধঘণ্টা চলার পর রাস্তার একপাশে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। দরজা খুলে আমাদের আহ্বান করল।

—চায় পিজিয়ে স্যার।

গাড়ি থেকে নামলাম। কিউ নামল। হাত পা ছড়িয়ে কিছুটা নিজেকে সামলে নিল কিউ। দেখলাম, আমাদের গাড়ির মত আরো কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা আছে। রাস্তার

টার্নিং-রাস্তা এখানে চওড়া, গাড়ি পার্ক করলেও অন্য গাড়ির চলাচলে কোন অসুবিধা হয়না। অন্য গাড়ির যাত্রীরাও কেউ কেক, কেউ পকোরা, কেউ ডালরুটী, কেউ চকলেট্ টফি খাচ্ছে। সকলেই আমাদের মত ভ্রমণকারীর দল। ড্রাইভার চা বিস্কুট, আমি চা, সিগ্রেট খেলাম। কিউ কিছু খায়নি। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। এর মধ্যেই সে দেখে নিল দোকানের মালিক টবে সৌখিন ফুল করেছে। চা পর্ব শেষ হতে গাড়ি। কাঁচে মোড়া গাড়ি। খোলা যায়না, হাওয়া শীতল, কষ্ট হয়। গাড়ি চালিয়ে আমাদের হাজির করল সোজা নৈনিতাল। আমার দেখা শহর। বদলায়নি যেমন ছিল তেমনি আছে, ভিড় বেড়েছে ছোট গাড়ি আর ভ্রমণ বিলাসী লোকের। নৈনিতালে যেন পশ্চিমবাংলার কোন মেলা চলেছে। কিউ এর কাছে নতুন--এই প্রথম বার এসেছে। দুজনের দুধরনের অভিব্যক্তি।

গতকাল সমস্ত দিন কিউ এর মন খারাপ ছিল। আমার ছিল অফ্‌মুড। কিউ সারারাত্রি প্রচণ্ড ঘুমিয়েছে, বলতে গেলে গভীর ঘুম। আজ সকাল থেকে ঝরঝরে শরীর, সকালের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল ও রাঙানো মনেব রঙ, অনেকদিন পর গ্রামের নির্জনতা থেকে উচ্ছল সুন্দর শহরে এসেছে। নানান বয়সের লোকের ভিড়, পাহাড়ের গা জুড়ে সাজানো শহর, ম্যালের ওপর উচ্ছল যুবক-যুবতি, কিশোর-কিশোরীর রকমারি পোষাকে সজ্জিত হয়ে হাস্যমুখর পরিভ্রমণ—স্বভাবতঃই পুলকিত কিউ। আনন্দ ও বিস্ময় ওর চোখে মুখে, আচরণে।

বাঙালিমাত্রেই ভ্রমণবিলাসি। ভ্রমণ মানেই হয় সাগর না হয় পাহাড়। পাহাড়ে যাওয়া মানেই সিমলা কুলুমানালি নয় নৈনিতাল। দিল্লী, থেকে নৈনিতালের দূরত্ব বেশি নয়। সৌখিন দামি গাড়ি করে উইকএণ্ডে এসে দুদিন খেয়েদেয়ে স্ফুর্তি করে চলে যায়। বাঙালিরা, যারা ভ্রমণ পিপাসু। নৈনিতাল ঘোরেনি এমন লোকের সংখ্যা কম। সে কারণে নৈনিতালের বিবরণ দিয়ে আপনাদের একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করবোনা, তবুও দুএককথায় কিউ এর বিস্ময় এবং ভালো লাগার, মানসিক চাঞ্চল্য, প্রকাশ করা জরুরী। কারণ নৈনিতাল কিউকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করেছে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণতা দিয়েছে। কি সিদ্ধান্ত, আপাততঃ অপ্রকাশ্যই থাক। আপাততঃ বিশাল লেক—দু পাশে পাহাড়, মাঝখানে ডিমের গড়নের বিশাল লেক—গভীর জল, সাদা রঙের রাজহাস দলবেঁধে জলে ভাসছে। বোটিং করছে অনেকে। লেকের একপাশে ম্যাল, ম্যালের ওপর থেকে যতদূর চোখ যায় স্তরে স্তরে সাজানো অনেক হোটেল ও লজ। ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলে মেয়ে কেউ মার্জিত কেউ উদ্ধত পোষাকে ঘুরছে, ফিরছে, হাসছে, হল্লা করছে। সীমাহীন আনন্দ। দুঃখ কি জানে না তারা। গাড়ির পর গাড়ি—ম্যাল দিয়ে হাঁটা যায়না! গাড়ির সংখ্যা বেড়ে গেছে। গাড়ির ধোঁয়ায় নাক জ্বালা করছে—আগে এরকমটি ছিল না। তবুও লোকের আনন্দে ঘাটতি নেই। হাঁটতে হাঁটতে নৈনী দেবীর মন্দির, যার ইচ্ছা ঘণ্টা বাজিয়ে ঢুকছে। দেখছে। শ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরে যাচ্ছে ম্যালের ভিড়ে। কিউ ও আমি মন্দিরের সামনে বাঁধানো বেঞ্চে বসলাম। সামনে তাল অর্থাৎ লেক।

তির্ তির্ করে জল কাঁপছে। হাওয়া দিচ্ছে। কার্ডিগান গায়ে গলিয়ে নিল কিউ। বোটিংএ কিউ এর সাথি হলাম ভয়ে ভয়ে। চালক আশ্বাস দিলেও ভয় কি দূর হয়! সিঁটিয়ে রইলাম।

—তোমার ভালো লাগছে না?

—হ্যাঁ, লাগছে।

না বলি কি করে! কিউ এর সখ, আনন্দ মাটি করি কি করে। বলতেই হল হ্যাঁ। কিউ হাঁসছে। ঘুরে ঘুরে দেখছে চারি পাশ। হাত দিয়ে লেকের জল স্পর্শ করছে। চালক এগোচ্ছে ধীরে ধীরে।

—একবার মানবদার সাথে বোটিং করেছিলাম।

বলেই থেমে গেল। বুঝলাম হঠাৎই বলে ফেলেছে। স্মৃতির স্বভাবই এরকম এক একটা ঘটনা অতিতের অনুরূপ ঘটনাকে বর্তমানে হাজির করে। কিন্তু কিউ দ্রুত সংশোধন করে নিল। কিউ অতিতকে বর্তমানে টেনে এনে বর্তমানকে গ্রাস করতে দিতে প্রস্তুত নয়। সে গতকাল যে ভুল করেছে আজ সেভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চায়না। কোনো নদী নালা নেই যে এই লেকে জল এসে জমা হবে। দু পাশে সু উচ্চ পাহাড় তার মাঝে এই বিশালাকার লেক—যারা এ শহরের পত্তন করেছে তাদের সৌন্দর্য্যবোধ ও দূরদর্শিতার প্রসংসা না করে পারা যায় না।

—বসন্ত, দেখে মনে হচ্ছে, তোমায় ভয় করছে, তুমি বলছোনা। চল ফিরে যাই।— ঘুমালো বোট্—উতার দো।

—না-না ভয় করছেনা।

চালক দ্বিধা করছিল। যত সময় ঘোরানো যায়, তত বেশি আয়।

—নেহি, উতার দো। বহুত ঘুমে।

—জী।

নৌকা তীরে ভেড়ায়। আমি আগে কিউ পরে নামে। নৌকা ফিরে যায়। জোরের নিঃশ্বাস নেই। মনে মনে ভাবলাম—বাব্বাঃ বাঁচলাম। ঘড়ি দেখলাম। লাঞ্চের সময়। গাড়িতে আসার সময় ম্যালে বাংলায় লেখা বাঙালি খাবারের বিজ্ঞাপন দিয়ে একটা বাঙালি হোটেলের বোর্ড দেখেছি। তখন থেকে ভেবে রেখেছি আজ বাঙালি খাবার খাবো। কিউকে বলতেই কিউ রাজি হয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে সেখানে পৌঁছালাম "মৌচাক"—দাদার হোটেল। সত্যই বাঙালি হোটেল। প্রত্যেকটা খাবার টেবিলে বাঙালি পরিবার। আলাপ হল ভদ্রলোকের সাথে। বয়স হয়েছে, দাঁত পড়ে গেছে। বাঙালি খাবার, প্রত্যেকটি ভাল, আলুভাজা, বেগুন ভাজা, পোস্তো, মাছের ঝোল ইত্যাদি। পাতে পাতি লেবু, পেঁয়াজ ও লঙ্কা। সরসের তেলে রান্না কুমায়ুনের নৈনিতালে প্রকৃত বাঙালি খাবার খেলাম তৃপ্তি করে। দুজনেই। পয়সা মিটিয়ে মৌরি মুখে দিয়ে বাঙালি দাদাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। ম্যালে খালি বেঞ্চ পেয়ে বসলাম। বেঞ্চ খালি পাওয়াই মুশকিল। যেহেতু খাওয়ার মাত্রা বেশি হয়েছে, কিছু সময় না বসে পাহাড়ি পথে গাড়িতে যেতে পারবনা। বসলাম। কিউ বসলনা। ঘুরতে শুরু করল। আমি জলের দিকে তাকিয়ে সিগ্রেট ধরালাম। জনারণ্য নৈনিতালের ম্যাল, লোকে বেড়াতে এসে আরামে নিঃশ্বাস নেবে, সে উপায় নেই। এত মানুষ, এত গাড়ি, এত বাজার, খাবারের দোকান—দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। নৈনিতাল থেকে বড়জোর কুড়ি কিলোমিটার দূরে কুমায়ুনের অন্য লজে আমরা বিশ্রামের জন্য আছি। দুটি জায়গার মধ্যে কত পার্থক্য। ওখানে পয়সার অভাবে, কাজের অভাবে মানুষের নূন্যতম খাবার জোটে না আর এখানে এ যেন প্রমোদনগর। লোকেদের পয়সা উড়িয়েই যেন আনন্দ। পয়সা ওড়ানোর জন্যই

যেন ওরা ম্যালে বেড়াতে এসেছে। ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বৈষম্য অত্যন্ত প্রবল। চোখে লাগে। কিউ ঘুরছে আমি ওর সাথী হতে পারলামনা। শরীরের বয়স হয়েছে সেটা সর্বৈব সত্য। মনের জোর দিয়েও অস্বীকার করা যাচ্ছে না। সেখানে কিউএর মনে মানব এসে হাজির হওয়া ন্যায়সঙ্গত। কিউ এর পাশে মানব থাকলে সেও তো এই ম্যালে প্রজাপতির মত ঘুরতে পারত। সেখানে কিউ একা, ভাল লাগে! মানব নেই—মানব সংসারে থেকেও একা। কিউ আছে আমার পাশে—কিউও একা। কিউ মানবের কথা ভেবে কষ্ট পায়—পাবেই তো। কিউ যেমন মানবের জন্য হারিয়েছে শান্তি। মানবও দুঃখে আছে। দুজনেরই শান্তি মুছে গেছে জীবন থেকে।

ম্যালে চক্কর দিয়ে ফিরে এল কিউ। বসলো আমার পাশে, আনন্দ ও চলার ক্লান্তি ওর চেহারায়। হাতে দুটো অইসক্রীম। আমার দিকে বাড়িয়ে দিল একটা নিজের হাতে অন্যটা। চামচ দিয়ে কেটে কিউ মুখে দিল। আমিও দিলাম।

—ওপরে বিশাল বাজার, মাঠের দক্ষিণ দিকে—কি নেই, গরমের কাপড়, জামা, সালোয়ার কামিজ, ব্যাগ, জুতো, খেলনা সৌখিন ক্রীম পাউডার মায় মেয়েদের আণ্ডার গার্মেন্ট্‌স্। তেমনি ভিড়। ম্যালে যত না ভিড়, মার্কেটে ভিড় তার থেকেও বেশি এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো আনুপাতিক হারে বাঙালি ক্রেতার সংখ্যা বেশি। বিক্রেতাদের বেশির ভাগ ভূটিয়া।

—চলো, এবার যাই, নইলে অন্য তালগুলো দেখা হবেনা।

—তাই চলো। রোপওয়ে চড়া হল না।

—গেলে যখন ঘুরে আসতে পারতে।

—ভেবেছিলাম। যাকগে, চলো—অন্য তালগুলো দেখি।

কার পার্কিং থেকে গাড়ি করে সাততাল দেখে ভীমতাল দেখলাম। সাওতাল ভীমতাল—এই সব লোক সম্বন্ধে সব পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। সে সব কাহিনীর মধ্যে যাচ্ছি না কাহিনী আমাদের বিষয় বস্তু নয়। তবে সত্যি কথা বলতে সব তালের মধ্যে আমার সাওতাল ভাল লেগেছে। প্রথমতঃ নির্জন, গম্ভীর পরিবেশ, দর্শক আছে, দর্শকের ভিড় নেই। নেই নানান সামগ্রির পসরা। পাহাড়ের মাঝে লোকটি নিস্তরঙ্গ, সবুজ বনানী অচ্ছাদিত. নৈনিতাল কে যদি বারবণিতা বলা যায় তুলনামূলক ভাবে সাততাল সলাজ অনূঢ়া কন্যা। নৈনিতাল বড় বেশি বাণিজ্যিক, ভ্রমণের সৌন্দর্য্য অনুপস্থিত আর সাততালের সৌন্দর্য্যে রোমান্স আছে, আকর্ষণ আছে। এখানকার বসার বেঞ্চ, বোটিং এর নৌকা বা বোটিং এর ক্ষেত্র ভ্রমণ পিপাসু মানুষকে মুগ্ধ করে। স্বপ্ন দেখায়, ভাল লাগার মুর্ছনায় সঙ্গীত শ্রুত হয়।

—কিউ, আগে এখানে আসলে, নৈনিতালে যেতাম না। জলের ধারে বসে থাকতাম। নৌকা নিয়ে এপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভাসতাম। বড্ড তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে আসছে।

—চারপাশে জঙ্গল তো। সেজন্য মনে হচ্ছে রাত্রি নামছে। আসলে দেরি আছে।

—না চল, লোকজন ফিরে যাচ্ছে। ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

—ভয় করছে?

—না।

তবুও ফিরলাম। ড্রাইভার রেডি। গাড়িতে বসলাম। কিউ পোড়া পাঁপড় কিনেছে,

মশলা পাপড়। গাড়িতে বসে পাপড় খেলাম। ফেরার পথে ভীমতাল। রাস্তার একপাশে গাড়ি থামিয়ে চা খেতে খেতে দেখা হল। সন্ধ্যা নামল। চলমান গাড়ির আলো জ্বলছে। জ্বলছে হোটেলের, রেষ্টুরেন্টের আলো। বিদ্ধস্ত না হলেও ক্লান্ত। কিউ ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলে কোন ভাল হোটেলের সামনে দাড় করাতে। গাড়ি ছাড়ল। কিউ নিজেকে আমার সাথে চেপে ধরল। চেপে ধরল আমার বাঁ হাতের আঙুলগুলো। মনে হল কিউ এর হাত গরম, চঞ্চল, উষ্ণতা কিউ এর হাতে, গলায় মুখে সমস্ত চেহারা জুড়ে। ভাল লাগল, মন ভরল আমারও।

হোটেল থেকে মাংস পরোটা কিনে গাড়িতে উঠল।

---আজ দিগের ছুটী। সন্ধ্যা থেকে ওকে ছুটী দেব। অনেকদিন ছুটী পায়নি।

আমার হ্যাঁ বা না বলার কিছু নেই।

সপ্তম অধ্যায়

দীর্ঘ প্রস্তুতি, দীর্ঘ দ্বন্দ্ব বা লড়াই, একান্ত নিজস্ব অর্থাৎ অন্তরে দীর্ঘ লড়াই করে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে একজন পূর্ণবয়স্কা রমনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্য্যকরী করার বা সিদ্ধান্তকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ঐকান্তিক প্রয়াস, অবশ্যই অত্যন্ত সাহসি পদক্ষেপ। তার জন্য, আমি অকুণ্ঠ প্রসংশা করছি। প্রসংশা করছি একজন নারীকে যে বেঁচে থাকার জন্য জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্য, আপনার কামনা বা বাসনাকে সমাজ তথা সংসারের নিয়ম কানুন বা রীতি নীতির উর্দ্ধে স্থান দেওয়ার জন্য। জীবনের জন্য সমাজ, সুখের জন্য সমাজ। সামাজিক নিয়মের কাছে আত্মহুতি দেওয়া পরাজিত বা অজ্ঞতার পরিচয়। সে কারণেই কিউকে আমি অকুণ্ঠ প্রসংশা করছি। প্রশংসা করছি আজ, কারণ সেদিনে কিউএর সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। প্রথম যখন জানতে পারি প্রাথমিক ভাবে আমি হতচকিত, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে ধীর স্থীর ভাবে চিন্তা করে, কিউ এর সে দিনের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সাধুবাদ জানিয়েছি। কিউ এর প্রতি শ্রদ্ধা, কিউ এর প্রতি ভালবাসা আমার বেড়ে গেছে।

হে আমার পাঠক বন্ধু, কুমায়ুণে বিশ্রাম নেওয়া, কুমায়ুনের প্রাকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য শূন্য হৃদয়ে পূর্ণতাসহ গ্রহণ করার মাঝে মাঝে গল্প বলেছি কিউটির ও আমার। কখনো কিউটি ও আমি, রুচীও আমি, কিউটি মানব, মানসদা ইত্যাদির সাথে কুমায়ুনীদের জীবন সংগ্রামের খণ্ড চিত্র আমার বলার মধ্যে এসেছে। আজ বর্ণনা করবো কতকগুলো মুহূর্তের কথা, বিশেষ মুহূর্তের, বিশেষ সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার অকৃত্রিম প্রয়াসের কথা, দ্বন্দ্ব বা লড়াইয়ের মুহূর্তের কথা, শরীর ও মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা। জীবনে এ রকম অবসর কখনো কখনো আসে, সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দিয়ে জীবনের সামান্য অসাফল্য, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নির্ভর করে। কিউ সেদিনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার প্রয়াসে আমি অংশীদার হতে পেরে, বা আমাকে মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল বলে আমি তৃপ্ত, আমি খুশি—স্বর্গীয় আনন্দে উজ্জ্বল। সেই অবস্মরণীয় মুহূর্ত বর্ণনায় আমি উৎসাহিত, উজ্জীবিত বোধ করি এবং যতদিন বাঁচবে, সেই মুহূর্তসমূহের স্মৃতিচারণ, সেই মুহূর্ত সমূহের পুলক বর্তমানে অনুভব করছি। ভবিষ্যতেও করব বলে মনে হয়।

লজের সামনে নৈনিতাল, সাততাল, ভীমতাল হয়ে গাড়ি যখন থামল, রাত্রির আঁধার নেমেছে পাহাড়ে। আকাশে তারা ফুটেছে, ফালি চাঁদ পশ্চিমে পাহাড় চূড়ায়। চাঁদও তারাসমুহের ম্লান, স্নিগ্ধ অলোয় সবুজ আচ্ছাদনে পর্বতমালায় ছম্‌ছমে আঁধার। ছড়ানো ছিটানো বিভিন্ন পর্বতে ইতস্ততঃ বসতিসমূহে ম্লান বিদ্যুতের বাতি জ্বলছে। রাত্রির আঁধারে পাহাড়ের ওপরে নিচে ইতস্ততঃ আলোয় জীবনের পরিচয় যে কোন অনভ্যস্ত মানুষের মনে জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক প্রশ্ন হাজির করে। বিশেষ করে পাহাড় যদি কুমায়ুনের সে রাত্রের মত সেরকম শান্ত ও নির্জন হয়। যদিও সে রাত্রে আমার মনে সে রকম দার্শনিক চিন্তাধারা ছিল না।। অন্য পাঁচটা রাত্রির মত সে রাত্রিও ছিল সমান ও সাধারণ। তবুও সেদিনের সেই রাত্রি দুটি মানুষের জীবনে, কিউটি ও আমার জীবনে ছিল এক বিশেষ এবং অবিস্মরণীয় রাত্রি। কুমায়ুনের অন্য রাত্রিগুলোর অপেক্ষা এ রাত্রির বৈশিষ্ট, প্রকৃতি, অনুভূতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। গাড়ি থামলে কিউ দরজা খুলে নেমে সোজা ঘর থেকে টয়েলেটে। গাড়ির শব্দে দিগ্‌ দরজা খুলে আলো জ্বেলে অপেক্ষা করছিল। আমি নেমে হাত প্রসারিত করে পা টান টান করে, কোমড় থেকে শরীরের ওপরের অংশ বেঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙতে লাগলাম। কারণ ন'ঘণ্টা, দশ ঘণ্টার জার্নি কম নয়—বিশেষ করে এই বয়সে। গাড়ি ফিরে গেল। আমি লজে প্রবেশ করলাম। কিউ দিগ্‌কে গ্যাস জ্বেলে কফি বানাতে বলল। আমি গা এলিয়ে সোফায় বসলাম। কিছুটা ক্লান্ত। কিউ চুলের ব্যাণ্ড খুলল। বসল অল্প সময়ের জন্য। চাঞ্চল্য ওর পদক্ষেপে। কফি এল চুমুক দিলাম।

—কফি খেয়ে বাথে হাত মুখ পরিষ্কার করে, জামাকাপড় চেঞ্জ করে আরাম করে বোসো। জল গরম হচ্ছে। সারাদিন ঘুরেছো, ফ্রেশ হলে আরাম লাগবে। তোমার হলে আমি ঢুকবো।

—আচ্ছা।

কফি পান শেষ করে ধীর পায়ে ব্যালকুনিতে গেলাম। খোলা জায়গায় আরামে ধূমপান করবো। অনেকদিন বসে শুয়ে আছি। আজ দীর্ঘসময় ঘোরার ফলে ক্লান্তি কিছুটা আছে। ব্যালকুনির রেলিংএ হাতের ভর দিয়ে দাড়িয়ে সিগ্রেট ধরালাম। ফুসফুসে সিগ্রেটের ধোঁয়া চালান করতে করতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদের সভা দেখে ভাল লাগছিল। অপূর্ব এ আকাশ শহরের ধূলিধূসর আকাশ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিরুপদ্রব পরিবেশে আকাশ সৌন্দর্য্যের ডালি সাজিয়ে আত্মহারা।

ধূমপান শেষ করে বাথরুমে; ফ্রেশ হয়ে রাতের পোষাক পরে সোফায় বসলাম। বেশ আরাম লাগছে। দিগ্‌ কফির পট পরিষ্কার করে কিউএর নির্দেশে ফিরে গেল নিচের কুঠরিতে। কিউ বাইরের দরজা বন্ধ করে দুল্‌কি চালে বাথরুমে, গলা থেকে বেড়োচ্ছিল মৃদু সুর; সম্ভবতঃ রবীন্দ্রসংগীত। মেজাজ ভাল আছে কিউ এর। ভাল থাক্‌।

সামান্য আলোয় সোফার ওপর পা তুলে বসলাম। লজের সাজানো ঘরে নিঃশব্দ পরিবেশে একা। মনে মনে মিলিয়ে নিচ্ছি সমস্ত দিন, গতকাল, গতরাত্রি, লোকজন, রাস্তাঘাট, ভাললাগা, খারাপ লাগা ইত্যাদি। কিউ এর মেজাজের পূর্ণবাসন আমায় তৃপ্তি দিচ্ছে। আমি প্রসন্ন। সকলের আনন্দে থাকা জীবনের ব্রত হওয়া উচিৎ। কিউ বেড়োলো বাথরুম থেকে। ঘড়ি দেখলাম: দীর্ঘ সময় কিউ ব্যয় করেছে বাথরুমে। এত সময়!—এত সময় কি করছিল কিউ? সাবান মেখে গা হাত পা পরিষ্কার করেছে, কিউ এর গা

থেকে সাবানের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। হালকা পোশাকের আড়ালে কিউ এর মায়াবি স্বর্গীয় কুসুম কোমল শরীর। কিউ যদি গায়ে সাবান লাগায়, তার জন্য এই ঠাণ্ডা দেশে এত সময় লাগতে পারেনা। কিউ কি তবে বাথরুমে ঢুকে গলা ছেড়ে গান জুড়েছিল, সে কারণে দেরী, তাও তো সামান্য হলেও শুনতে পেতাম! তবে কি একা একা কিউ ভাবছিল? হতেও পারে। প্রত্যেক মানুষেরই টয়লেটে বা বাথে হাজার চিন্তা মাথায় আসে। আর কিউ যদি দরজা বন্ধ করে ভাবনার সাগরে ডুব মারে, অন্যজনে জানবে কি করে? জানা সম্ভব নয়। কিউ তবে কি বাথরুমে বসে ভাবছিল? আমি যেমন একা একা কত কথাই ভাবি। কি ভাবছিল কিউ? কার কথা?—মানবের?—নিজের?—বেড়ানোর?—না আগামি দিনের? তবে কিউ প্রফুল্ল। প্রফুল্ল শরীর ও মনে।

আপাততঃ কিউ আমার সামনে বসে। আমার হাতের নাগালের মধ্যে। সে ত্বক পরিচর্য্যায় রতা। প্রসাধনরতা। রাত্রির ঢিলেঢালা পোষাকের আড়ালে থাকা হাঁটু পর্যন্ত মসৃণ পা প্রকাশ পাচ্ছে। আঙুলে করে ক্রিম নিয়ে ধীরে ধীরে মাখাচ্ছে সে নগ্ন পায়ে, নগ্ন বাহুতে, নগ্ন গণ্ডদেশে, কপালে। মুখে স্মিত হাসি। চিরুণী বুলাচ্ছে চুলে। নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে সে ব্যস্ত। মনে সুখ থাকলে এ জাতিয় প্রসাধনে আনন্দ পায়, আত্মতৃপ্ত হয়! মন নিজের সৌন্দর্যে খুশি হয়। বর্তমানে কিউ খুশির মেজাজে। কিউ এর মনের আকাশ হতে গতকালের অকাল মেঘ উধাও। চাঁদের আলোয় নির্মল আকাশের মত কিউ এর মানসলোক। কিউ এর মনোরাজ্যের সুখবর, উল্লাস স্পর্শ করে, সঞ্চারিত হয় আমার মনে। ধীরে ধীরে কিউ এর মনের তালে, মনের ছন্দে আমার মন ছন্দিত হয়। হাত বাড়িয়ে কিউকে আকর্ষণ করি, ওকে টেনে নিই, বুকের ওপর, আদর করি, চিবুক স্পর্শ করি, ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করি কিউএর চোখের পাতা। চোখ বন্ধ করে কিউ উপভোগ করছিল। যেন কতকাল কিউ এই পরশের আশায় অপেক্ষা করছিল। যেন কিউ এর জীবনে এ প্রথম পরশ! অথচ কিউ আর আমার মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক বিদামান বহুবছর আগে হতে। এমনকি কুমায়ুনের লজে প্রতিরাত্রী যাপন একই শয্যায় এবং নারীপুরুষের শারীরিক আনন্দ উপভোগের মধ্যে দিয়ে। কিউ ও আমি উভয়েই অভ্যস্ত। অথচ আজ, এই প্রথম রাত্রে শয্যায় নয়, পাশাপাশি বসে, আমার সামান্য আকর্ষণে কিউএর বেপথু সমর্পণ যেন সদ্য কোন যুবতি তার উন্মুখ শরীর প্রণয়ীর প্রথম পরশে শিহরিত শঙ্কিত, চঞ্চল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। কি দারুণ অনুভূতি! প্রণয় অভিলাষে উষ্ণ, শিথীল স্খলিত শরীর; কিউ তার নিঃশ্বাস, তার চোখ, নাক, মুখ ঠোঁট দিয়ে আমায় উষ্ণতা সঞ্চারিত করতে থাকলো। আমি হতবাক, হতবুদ্ধি, অকস্মাৎ কিউ এর আচরণে হারালাম স্বাভাবিক আচরণ! কিউ এর প্রচণ্ড লালসা আমায় অক্ষম করে তুলল। আমি নিস্ক্রিয় হয়ে কেবলি দুবাহু বেষ্টনে কিউকে আঁকড়ে ধরে রইলাম। ক্রমশঃ গ্লানী গ্রাস করল আমাকে। কিউ নিরুপায়, হতাশ তবুও বুদ্ধিমতি কিউ ধীরে ধীরে সংযত করল নিজেকে। আমি যাতে আমার এ হেন করুণ আচরণে আঘাত না পাই সে কারণে দ্রুত নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলল। সে স্থির চিত্ত। সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমি জানতাম না যে কিউ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যে কারণে প্রকৃত অর্থে প্রস্তুত ছিলাম না। কিউ প্রস্তুত কিউ চাইছিল এই সন্ধ্যারাত্রে আমরা রতিক্রিয়াই রত হই। আমি কিউকে দলিত করি মথিত করি, পিষ্ট করি, ছিন্নভিন্ন করি আর কিউ, শরীর মন দিয়ে গ্রহণ করে যতটা প্রাণ চায়। কিউ এর প্রস্তুতি দীর্ঘদিনের মূলতঃ গতকাল থেকে আর আমি সম্পূর্ণ

অপ্রস্তুত, শরীর অক্ষম, বড় বাধা। মন জানেনা কিউ এর পরিকল্পনা। শরীর ও মনের সংযোগ যে ইচ্ছা শক্তি ও শারীরিক শক্তি জাগ্রত হয় তার অভাব ছিল। আমি অনুতপ্ত, হতচকিত। কিন্তু সাময়িক বিচ্যুতি আমাকে কাটাতে হবে। আমাকে কিউ এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ক্ষণকালের দুর্বলতা হতে মুক্ত হবার ইচ্ছায় সঙ্কল্প কবলাম।

কিউ থরথর ঠোঁট দিয়ে আমার ঠোঁট স্পর্শ করে এক মুখ হাসলো। সে হাসিতে লুকানো ছিল একটাই কথা—চীয়ার আপ্ বসন্ত, চীয়ার আপ্ তুমিই আমার সেই প্রার্থীত পুরুষ, যার বীর্য ধারণ করার জন্য এ প্রকৃতি প্রস্তুত।

কিউ সোফা থেকে নেমে নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে টয়োলেট ঘুরে এসে বসল। তার ত্বক পরিচর্য্যা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। ক্রিম নিয়ে লাগাতে শুরু করল দুটি নগ্ন বাহুতে। আমি বসে কিউ এর পাশে। শরীর সোফায় লুটিয়ে, কিউ এর হৃদয়বার্তা, হৃৎকম্প অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগলাম। নারী রহস্যময়ী। কিউ এর মন শান্ত, স্থির, চঞ্চল শরীর, ধমনীতে উষ্ণ রক্ত ধাবমান, প্রতিটি গতি ও শব্দময়তা, আমার হৃদয়ে সৃষ্টি করছে ধীরে মৃদু আলোড়ন। মনে হচ্ছিল আমার হৃদয়ের চাঞ্চল্য মস্তিষ্কের শীরায় শীরায় বার্তা প্রেরণ করছে। উত্তেজিত করছে স্নায়ুমণ্ডলী। একই সাথে সংশয় শঙ্কা দমিত করছিল উত্তেজনা। যদিও কিউ এর সাথে আমি শারীরিক ভাবে সম্পর্ক স্থাপনে অভ্যস্ত। যদিও আমার পারিবারিক অবস্থান কখনো কখনো কিউ এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। আমি সময়ে সময়ে সম্পূর্ণভাবে শারীরিক দিক থেকে কিউকে গ্রহণ করতে পারিনি। যে কারণে আমার আচরণে মাঝে মাঝে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব থেকে গেছে। মাঝে মাঝে মানসিক দ্বন্দ্বে আমি কষ্ট পাই। কিউকে আমি ভালবাসি, কিউকে আদব করি, গ্রহণ করি তবুও মনের দিক থেকে অসম্পূর্ণতা রয়ে যায়। আমি আত্মসমালোচনা করি, গ্লানীমুক্ত হতে চাই, আমি কিউকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করাব জন্য প্রস্তুত হই। বিপরীতে কিউ—সে দানে বা গ্রহণে অপূর্ণতা রাখেনা। কিউ গ্রহণ করে প্রাণ ভরে, প্রদান করে উজার করে। কিউ আমাকে ভালবাসে পূর্ণতা দিয়ে, সেখানে কোন কার্পণ্য নেই, সঙ্কোচ নেই, সংশয় নেই। সে কারণেই কিউ এত সুন্দর এত মনোরম এবং স্বর্গীয়। কিউকে গ্রহণের মধ্যে স্বর্গীয় সুখ প্রাপ্তি হয়। মানুষের জীবনে এ প্রাপ্তি কদাচ মেলে। জানিনা কিউ এর এ দান তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি-না, না আমার প্রতি তার বিক্ষুব্ধ বিস্ময়। ভালবাসা বিস্ময় থেকে জন্মায়, শ্রদ্ধা থেকে জন্মায়। মনকে ধমক দিলাম, তুমি কিউ এর ভালবাসার রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়োনা, বরং তুমি তোমার মনকে সংশয় মুক্ত করো, তুমি কিউকে, এই স্বর্গীয় নারীকে যথার্থ সম্মান দিয়ে মর্যাদা দিয়ে, পূর্ণতা দিয়ে গ্রহণ করো। একদা প্রবঞ্চিতা কিউকে মরমে উপলব্ধি করতে দাও ভালবাসা শুধু-প্রবঞ্চনা নয় বরং ভালবাসা সত্য, ভালবাসা মহৎ, ভালবাসা জীবনে স্বর্গীয় পূর্ণতা প্রদান করে। বসন্ত কিউ প্রস্তুত, তাকে তোমার রক্ত মাংসে মস্তিষ্কে হৃদয়ে পূর্ণতা দিয়ে গ্রহণ করো। কিউ এর ত্বক পরিচর্য্যা, মানসিক পরিচর্য্যা অবলোকন ও উপলব্ধি করতে করতে, আপন মনে সেই মহান স্বর্গ রচনায় প্রবৃত্ত হলাম, নিজেকে সে স্বর্গে, কিউকে নিয়ে একত্রে স্বর্গীয় সুখে মগ্ন হলাম। সেখানে সৌন্দর্য্য, সেখানে শান্তি, সেখানে তৃপ্তি, কিউ আর আমি ভিন্ন, সে স্বর্গে অন্য কোন মানুষ, কোন বস্তুর অবস্থান অনুপস্থিত। দুটি মানব-মানবি এক এবং অবিচ্ছিন্ন। ঈশ্বর সৃষ্ট আদম ও ইভের জন্মের পূর্ববর্তী অবস্থা।

হাতের তালু দিয়ে কিউ এর বাহু স্পর্শ করলাম। কিউ শিহরিত, কিউ এর দুটি চোখে

যেন নীদ্রা স্পর্শ করেছে। কিউ সরে এল আরো নিকটে। স্পর্শ করলাম তার গণ্ডদেশ। আমার প্রুকুষ্ট ঠোঁটের স্পর্শে অনুভব করলাম কিউ-এর সমস্ত তন্ত্রী নৃত্যমুখরা। লক্ষ্য করলাম কিউ এর ওষ্ঠদ্বয় সিক্ত ও শিথীল। কিউকে বুকের ওপর আকর্ষণ করে আমার কঠিন ওষ্ঠ দিয়ে কিউ এর কোমল ওষ্ঠদ্বয় চেপে ধরলাম। ঠিক এই মুহূর্তটির জন্য কিউ অপেক্ষায় ছিল। কিউ ফিরে পেল তার পূর্ণশক্তি। শরীর ও মন নিয় কিউ প্রস্তুত ছিল পূর্ব হতেই। অপেক্ষা ছিল কখন তাকে অভ্যর্থনা করি, আহ্বান করি। যে মুহূর্তে আমার আবেদনের ইঙ্গিত পৌঁছে গেল কিউ এর কাছে। কিউ সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে আমায় গ্রহণ করতে প্রবৃত হল। উষ্ণ হতে উষ্ণতর, দ্রুত কিউ এর শ্বাস প্রশ্বাস আমায় উজ্জীবিত করল ঠিকই তথাপি আমি নিষ্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন হয়ে কিউকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম। কিউ এর শরীরের বহ্নিতে আমি জ্বলতে লাগলাম ক্রমাগত। যে জ্বালাতে যন্ত্রনার পরিবর্তে আনন্দ আছে, উত্তেজনা আছে এবং বিষাদ আছে। একদা সে অগ্নি প্রশমিত হল। কিউ শান্ত হল, আমি নিস্তেজ তবুও দুজনে দুজনের উষ্ণতায় সঞ্জীবিত হয়ে রইলাম দীর্ঘক্ষণ।

—তোমার খিদে পাইনি? সেই দুপুরে খেয়েছো, রাত কম হয়নি?

—আমার তো মনে হচ্ছে তোমার খিদে পেয়েছে। তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে বসন্ত। তোমার শরীর ঠিক আছে তো? সত্যি তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

—মোটেই না। বসো আমি ধূমপান করি। গাড়িতে ঘুরেছি। ফেরার পর মনে হচ্ছিল কিছুটা ক্লান্ত। কফি খেয়ে গরম জলে ভাল করে গা হাত পা মুছে একদম ফ্রেস। অ্যাজ মর্নিং।

·নো, কোল্ড। অ্যাজ্ মর্নিং।

ব্যালকুনিতে যাবার আগে কিউ এর কথা শুনে কিউ এর দিকে অসহায় চোখে তাকালাম। কিউ মুখ নিচু করে ক্রিমের ছিপি বন্ধ করছে। কথাটা বলেই কিউ যেন লজ্জা পেয়েছে। কিউ জানেনা আমি সত্যিই সচেতন ভাবে কিউ এর আবেদনে সাড়া দেবার চেষ্টা করছি। আমার মনে এই মুহূর্তে কোন সঙ্কোচ নেই, না কোন পারিবারিক মানসিক অন্তরায়। এই মুহূর্তে সর্বান্তকরণে কিউকে আমার পূর্ণতা দিয়ে স্বার্থক করতে চাইছি। তবুও অসফল। জানিনা আমার এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিউটির অভুতপূর্ব আচরণের জন্য কিনা! না ক্লান্তি!

কিউ ক্রিমের টিউব গুছিয়ে আমার পাশে এসে গা ঘেসে দাঁড়ায়। স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল কিউ এর মুখ দেবীর মত মনে হচ্ছে। শান্ত পাহাড় নির্মল আলোয় নিদ্রাচ্ছন্ন। একমাত্র জেগে কিউ।

—বসন্ত তুমি রাগ করেছো? তোমার খারাপ লাগছে? ক্লান্ত?

—না। কোনটাই না।

—তবুও মনে হচ্ছে, তুমি যেন অন্যদিনের মত নও।

—তুমি তো আমার কথা বলে দিলে। বরং আমার মনে হচ্ছে, এই পাহাড়ে আজ সন্ধ্যায় তোমাকে নতুন করে দেখছি। যদিও তোমাকে নতুন করে দেখে আমি মুগ্ধ, আমি বিস্মিত। আমি খুশি, আমি—

—এ তোমার পাহাড়ের গুন। এ পাহাড় তোমার চোখের দৃষ্টি বদলে দিয়েছে।

—শুধু কি আমার? তোমার নয়?

—হয়তো হবে। আমার ভাল লাগছে। কলকাতায় সে এক চিলতে ফ্ল্যাট। একই কাজ, যদিও তোমার কাজে আমার স্বপ্নের স্বার্থকতা—সেই রিপোর্ট সেই লেখা—সেই করসপনডেন্স্ থেকে মুক্তি। সবুজ পাহাড় আমার মনের অশান্তি দূর করেছে।

—আমি ছুটি পেতে চাই কিউ। সেই কোন কালে, আমার চলার গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু তোমার প্রেরণায় এতদিন করে এসেছি। আর নয়—এবার অবসর নিতেই হবে।

—হলো তো অবসর।

—না কিউ না। পূর্ণ অবসর। সাময়িক অবসর নয়। পালিয়ে পাহাড়ে চলে আসা নয়। সব কিছু থেকেই বিশ্রাম নেওয়া বা বিরত হতে হবে।

—হবে, দেরি আছে। ব্রাণ্ডি খাবে? অল্প ব্রাণ্ডি খাও, ভাল লাগবে। গাড়িতে ঘুড়েছো, সামান্য ব্র্যাণ্ডি উপকার করবে। বসন্ত গতকালের সকালের সুন্দর পরিবেশ, তোমার মুড নষ্ট করেছি, আজ ঘুরেছি, তুমি বলছো, তুমি ক্লান্ত নও।

—না।

—আমার চোখে ঘুম আসছেনা। এই চাঁদনি রাত ভাল লাগছে। ভবিষ্যতে পাহাড়ের বুকে কোনদিন এরকম রাত আর পাবো কি-না জানিনা, সে কারণে জোর করে বিছানায় না শুয়ে, বলে বসে গল্প করে, আদর করে, তোমার আদরে আজকের রাত কে স্মরণীয় করে রাখতে চাই।

—আমার কোন গল্প নেই।

—কে বলেছে? বেশ, তোমায় বলতে হবেনা, আমি বলবো, তুমি শুনবে।

—ঠিক আছে।

—মন দিয়ে।

—অবশ্যই। প্রমিজ।

—তোমার ঠাণ্ডা না লাগলে, ব্যালকুনির দরজা খুলে রাখি। চাঁদ ঢুকুক এ ঘরে। ঐ সোফায় যেখানে আমরা বসবো।

আমি শ্রোতা। আমার কাজ মাঝে মাঝে কিউ এর মনোবীনায় মৃদু আঙুল ছোয়ানো।

কিউ মন্থর পায়ে, শরীরের মৃদু নৃত্যচাঞ্চল্যে কিচেনে যায়। আমি আরামে আধোশোয়া আধোবসা অবস্থায় সোফায় আরাম করি। কিউ দুটি গ্লাস, জলের বোতলে, খোলা ব্রাণ্ডির বোতল রেখে কাজুর কৌটা নিয়ে আসে। নোনতা ভাজা কাজু সুস্বাদু। কিউ ব্রাণ্ডি দুটি গ্লাসে ঢালে পরিমাণ মত জল মেশায় টিপয় টেনে হাতের কাছে রাখে। আমি হাত বাড়িয়ে ব্রাণ্ডি নিই। আজ আমার ব্র্যাণ্ডির প্রয়োজন। চাঁদের আলো ব্যালকুনি পার করে সোফার পায়ের কাছে পৌঁছে গেছে। কিউ ব্র্যাণ্ডি নিয়ে গ্লাস এগিয়ে দিলে, আমি ওর আনন্দমুখর স্বাস্থ্য কামনা করে গ্লাস ঠোঁটে ঠেকায়। কিউ কাজু মুখে দিয়েছে।

—খাবার সময় হলে, বলবে, সব রেডি আছে গরম করে নেবো।

—না। খাবার খেলে যদি ঘুম পায়, আজ কথা দিয়েছি ঘুমাবোনা। এমনিতে রাতে কম ঘুম হয়। সকলে যখন ঘুমায়, তুমি নাক ডাকো, আমার ঘুম আসেনা, জেগে শুয়ে থাকি। বরং তোমাকে নিয়ে বসে থাকায় বেশি সুখ।

—বসন্ত, ঐ তারা, ঐ চাঁদের আলো যতক্ষন জেগে থাকবে, আমরা জেগে থাকবো, আজ তোমায় একা রাত জাগার কষ্ট করতে হবে না। আজকের রাত, সম্পূর্ণ ভাবে

সমর্পণ করলাম বসন্ত, তোমার উদ্দেশ্যে।

—প্রতি রাতই তো আমার কাছে পূর্ণতা নিয়ে আসে। কোন কার্পণ্য করেনি কোনদিন।

—না, আমি ঠিক তা মিন করতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েছি। এই রাতে আমি জাগবো, ঘুমাবোনা, শুধু তোমার জন্য, যাতে তোমায় না ঘুমানোর কষ্ট করতে না হয়, না, বরং এই রাত তোমায় ভরিয়ে তুলুক।

কিউ এর মুখের দিকে তাকায়, কিউ এর গ্লাস অনেকটা খালি। কিউ এক হাতে আমার একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের মুখের কাছে নিয়ে আমার হাতের উল্টো পিঠে দাঁতের দাগ বসিয়ে কামড় দেয়। ব্যথা পাই, তবুও রাগ হয়না বরং আরাম পাই। মনে মনে বলি জানি কিউ, তুমি প্রস্তুত, কিছু সময় দাও আমায় প্রস্তুত আমি হবোই।

সামনা-সামনি বসে দুজনে। দুজনের হাঁটতে হাঁটু স্পর্শ করে আছে। শাল জড়ানো আছে গায়ে। কিউ এর গায়ের শাল কিউএর কোলের ওপর। চুমুক দিই গ্লাস খালি হলে কিউ গ্লাস ভরে দেয়, নিজেও নিজের গ্লাস ভরে নেয়।

—জানো বসন্ত, একমাত্র তুমি ? তুমিই এই কিউকে ছাড়তে পারলেনা। একে একে সকলে ফেলে পালিয়ে গেল। আর তুমি এই বয়সেও আমাকে গলায় ঝুলিয়ে চলে বেড়াচ্ছো।

—এই কি তোমার গল্প?

—সত্য কথা, গল্প বলো আর কাহিনী বলো, সত্য কথা অকপটে বলাই উচিৎ।

—তুমি যা বলছ, সেটা আমার জানা। আরো জানি, তুমি আছো বলেই জীবন আমার কাছে সুন্দর। এটা কোন গল্প নয়।

—তবুও, তুমি যে বলো, কিউ তোমার নিজের জন্য কিছু করো বা একটা অবলম্বন খুঁজে দেখো; আমি সে কথাও ভাবি। তবু—

—তবুও, সামনের দিকে তাকানো উচিৎ। কারণ—

—তুমি যতদিন আছো, আমি কিছু ভাবতে চাইনা। আমি তোমাকে হারাতে চাইনা বসন্ত।

আরো কাছে সরে আসে কিউ। যেন, আমি যদি হারিয়ে যাই, কিউ আমাকে ধরে রাখবে। আরে বাবা, বয়স কোথায় যাবে, স্বাভাবিক নিয়মে, আমি কিউ এর অপেক্ষা ত্রিশ বছর আগে মারা যাবো, তখন কিউ কার কাছে যাবে?

—তবুও বয়সের কথা ভেবে—

—কোন লাভ নেই বসন্ত। যত ভাববে তত কষ্ট বাড়বে। ছোট বয়সে যদি না ভাবতাম, না স্বপ্ন দেখতাম, আমার আজ কোন কষ্ট হতনা, কোন স্বপ্নই মারা যেতোনা আমার সব স্বপ্ন মারা গেছে বসন্ত। স্বপ্ন ও বাস্তব সম্পূর্ণ আলাদা। সময় সবকিছু বদলে দেয়—

—জানি। তবুও

—কোনো তবু টবু নেই। কাজু খাও। আমি বেথুনে পড়ি। বেথুন ভালো কলেজ। বন্ধু বান্ধব, কম বয়সের ভাল ভাল বাড়ির মেয়েরা, পড়াশুনা করা, আনন্দ করা আর এ ওর বড় হওয়ার স্বপ্নের গল্প বলে। আমি শুনি। কেউ কেউ তাদের বন্ধুদেব কথা বলে। আমি কিছু বলি না। কিন্তু আমি ভাবি—জানো, কার কথা?

—জানি।

—মানবদা আমার বন্ধু। মানবদা আমার দাদা। মানবদার কোলে চড়ে বড় হয়েছি। আমার প্রথম পিরিয়ড শুরু হলে মানবদার কাছে ছুটে গেছি। আবার স্কুলের ফর্ম ফিল আপ করে যখন মনটা পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করছিল, সেই মানবদাই তো বুক দিয়ে আমায় রক্ষা করেছে। তার পর থেকে মানবদার তো আমার ধ্যান জ্ঞান, তবুও বলছি মানবদা আমার প্রেমিক অর্থে যা বোঝায় সেই প্রেমিক সে ছিল না। ভাবতে পারতাম না যে মানবদা আমাকে বিয়ে করবে, মানবদার আমি স্ত্রী হিসাবে তার বিছানায় শোবো, মানবদার সন্তানের জন্ম দেবো,—এ হতে পারে না। অবাস্তব। তবুও মানবদাকে না দেখতে পেলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। দিন রাত্রি মানবদাকে নিয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে থাকতাম।

—সে তো হল। কিন্তু এই বসন্তকে।

—বসন্ত, তুমি না—তোমাকে না বলেছি, কথা বলবে না। আমি বলব, তুমি শুনবে। বলে ফেললে, ফ্লো কেটে দিলে। বেশ করেছো মানবদা কেটে যাক্। সে আমার কেউ না—কেউ না।

হাতের গ্লাস টিপয়ে রেখে আমার গলা দুহাতে জড়িয়ে আমার গালে, ঠোঁটে চুম্বন দেয় একাধিক— হয়তো দশাধিক—শত কি-না জানিনা। আবার গ্লাসে ঢালে। নেশা হয়নি ঠিকই, তবুও মাথা, শরীর কেমন যেন হালকা হালকা লাগছে। অর্থাৎ ব্র্যাণ্ডি স্নায়ুসমূহে সামান্য হলেও প্রভাব ফেলেছে। কিউ এর গ্লাস পূর্ণ অর্থাৎ কিউ মাতাল হতে চায়না। নিজের ইচ্ছাকে, নিজের কাজকে সংযমের মধ্যে বেঁধে রাখতে চায়। কিউ বসে আছে। ওর আপাত শান্ত চেহারার মধ্যে অনেক কথার আনাগোনা আমি টের পাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি কিউ অন্যদিনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সামান্য অসংযম ওর আচরণে।

—আমার কলেজ জীবনের এক বান্ধবি, নাম রমলা। তার গল্প বলছি শোনো বুঝবে মানুষ কি বিচিত্র।

—কি রকম?

—সাধারণ অর্থে বা সাধারণ ভাবে খারাপ মেয়ে। আমরা অনেকেই জানতাম, তখন আমিও তাই ভাবতাম, এখন মনে হয় আমার সেদিনের ভাবনা বড় কাঁচা। সাউথ থেকে আসত, স্মার্ট দেখতে, কথাবার্তায় স্মার্ট'। পড়াশুনাতে ভাল, বাবা জাহাজে চাকরী করতেন। বেশির ভাগ সময় জাহাজে জাহাজে বাইরে ঘুরতেন। বাড়িতে মা ও মেয়ে। রমলার ও এখনো বিয়ে হয়নি।

—অনেক মেয়ের বিয়ে হয়না। ছেলেদের ও অনেকের বিয়ে হয়না।

—না সেজন্য নয়। রমলার কথা আলাদা। রমলা আমার ক্লোজড ফ্রেণ্ড। অনেক ছেলে বন্ধু ছিল তার।—বেশি বয়সের, কেউ কেউ বয়সে ওর চেয়ে ছোট।

—হতে পারে। তাতে কিসের দোষ?

—দোষের কথা হচ্ছে না তোমরা খারাপ ভাবতে পারো, এবং আমিও ভালো বলে মনে করিনা। ছোট বড় সকলের সাথে মিশেছে, ঘুরেছে, স্ফূর্তি করেছে, এমনকি সহবাস করেছে একাধিক ছেলের সাথে।

—সো।

—আজো ওর বিয়ে হল না। বলে কি জানো—ওর মতে কেউ ওর হাসব্যাণ্ড হবার উপযুক্ত নয়।

—নাও হতে পারে।

—ওর বিয়ে করার খুব ইচ্ছা, বিয়ে বিয়ে করে পাগল, তবুও বিয়ে হচ্ছে না। ওর জন্য কষ্ট হয়।

—হঠাৎ রমলা প্রসঙ্গ তোমার মনে এল কেন? ইতিপূর্বে রমলা নামের তোমার কোন বন্ধুর নাম তো শুনিনি।

—এমনিই। মনে পড়ল, বললাম। আমি তোমার কাছে কোনো কিছুই গোপন করতে চাই না। আমি ঠিক করেছি। তোমার ও আমার মধ্যে আমি অন্ততঃ কিছু লুকিয়ে রাখবোনা। ভেবে দেখেছি তাতে কষ্ট বাড়ে। সেই ছোটো কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমার সব কথা মনে আছে। হঠাৎ নানান্ ঘটনা মনের পর্দায় ছবির মত ভেসে ওঠে। যেমন মানবদা—সে যেন চলমান ছবি। আমি মানবদার কোন কথা আজো ভুলতে পারিনি। জানি, আমার কষ্ট হয়, মানবদা চলে গেছে অনেক—অনেক দূরে, তাকে কোনো কালে পাওয়া তা দূরের কথা সাক্ষাৎ হবে না। তবুও মনে আসে। অথচ বসন্ত, তুমি চিন্তা করো মানবদা সবকিছু ভুলে নিশ্চিন্তে, বেশ আরামে আছে।

—কিউ?

—বেশ ছিলাম, হঠাৎ কেন যেন গতকাল সকাল থেকে মানবদার কথা বেশি বেশি মনে হচ্ছে। নৈনিতালে ঘোরার সময় মানবদাকে ভুলে ছিলাম।

—তুমি আর ব্রাণ্ডি খেয়োনা। চলো খেয়ে নাও। খাবার গরম করো। রাত অনেক—

—কত?

—সাড়ে বারো।

—অ্যাঁ? কি বল?

—হ্যাঁ।

—ও: ও: ভুলে গেছি। খাবার গরম করছি। এত রাত্রে খেলে তোমার শরীর খারাপ করবে।

—খাবার আগে সামান্য হুইস্কি দেবে কিউ।

—না।

—প্লিজ!

কিউ ঝট্ করে উঠে কিচেনে যায়। স্টেডি কিউ। ওর চলায় কোনো অসংযম চোখে পড়ছেনা। হুইস্কির বোতল কাত করে দুটি গ্লাসই পূর্ণ করে। আমার গ্লাসটা রেখে জল খাওয়ার মত জল মেশানো হুইস্কি কিউ গলায় ঢেলে দেয়। আমি ধীরে ধীরে চুমুক দিই। কিউ গ্যাস জ্বেলে মাংস গরম করে, পরোটা গরম করে, টেবিলে প্লেট রেডি করে।

ইত্যবসরে আমি সুরা পান করতে করতে একবার কিউ এর মনের ভিতর আর একবার নিজের মনের ভিতরে ঢুকে যাই। কিউ এর মুখ থেকে বার বার মানবের কথা শোনার জন্য মন অবসন্ন বোধ করছিল, মনে হচ্ছিল আমার এতদিনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ। কিউ এখনো মনে প্রাণে মানবের রয়ে গেছে। আমি কিউ এর কেউ নই। প্রকৃত অর্থে মানব কিউ এর জন্য কি করেছে? কিছুই করেনি, কাপুরুষ! অথচ আমি। বার

তেরো বছর ধরে কিউ এর জন্য কি না করেছি। এই যে রুচী আমাকে পুরোপুরি বর্জন করেছে, হয়তো কিউ আমাদের জীবনে এভাবে না হাজির হলে রুচী অন্ততঃ আমায় কার্যত ত্যাগ করত না। রুচীর জীবনে যদিও রোহিত তখন একমাত্র আকর্ষণ তবুও হয়তো এভাবে রোহিতকে নিয়ে জীবন কাটাতোনা। হয়তো রুচীর সাথে আমার সুস্থ্য শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতো না। গড়তেও পারতো, ঠিক মত চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে। রুচীর নিরুৎসাহ শরীরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নিজেকে কখনো কখনো ধর্ষক বলে মনে হতো। এমত এক আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝখানে কিউ তথা লাবণীর আগমন। কিউ এর সেদিনের করুণ অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে আমি কিউ এর মানসিক শুশ্রুষায় প্রবৃত্ত হলাম। শরীর ও মনে সেই দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে পূর্ণযৌবনা কিউ আমার শরীর ও মনের ক্ষুধা বাড়িয়ে দিল অনেক গুণ। তবুও আমি নিজেকে সংযত রেখেছিলাম। কিউকে পরিচর্যায় কোন কামগন্ধ ছিল না তাব কারণ কিউকে আমি দেখেছি যখন থেকে তখন কিউ শিশু। কিউ দেখতো, হয়তো আমার মানসিক দোদুল্যমানতা সে অনুভব করতো, তবু কেন রুচী সেই সময় এগিয়ে এসে আমায় রক্ষা করল না। আমি জানি না। জানি না এটা কি রুচীর মনোবিকৃতি না সে নিজের দায়বদ্ধতায়, নিজের অক্ষমতার কারণে কিউকে আমার কাছে ঠেলে দিয়েছে। তা আজো বুঝিনা। তবু আমার স্থির বিশ্বাস, কিউ আমার সাথে থাকাতে রুচী নিশ্চিন্ত।

আর কিউ? কিউকে খাওয়ানো, কিউএর পাশে দিন রাত্রি বসে থাকা, নানা কথার মাঝে কিউকে ব্যস্ত রাখা, আমার কাজের মধ্যে কিউকে টেনে আনা, আমার কাজে উৎসাহিত করা ছাড়াও মাঝে মাঝে কিউকে স্নান করার জন্য বাথরুমে পাঠানো, গায়ে পাঠে হাত বুলিয়ে খাওয়ানো, রাত ভরে নিদ্রাহীন কিউ এর পাশে বসে থাকা, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ানো, সব কিছুই করতে হয়েছে। মানসদার আমার প্রতি বিশ্বাসের মর্যাদা এবং কিউ এর প্রতি স্নেহ থেকেই আমার কিউ এর মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থা দূর করা. প্রয়াস শুরু। রুচীর সাথে আমার জীবনের শীতলতা অবস্থার কারণে আমার মনে তখন প্রচণ্ড শূন্যতা। চারটে বই লেখা, বিভিন্ন ভাষায় তার প্রকাশ, বিশ্বজুড়ে আমার কাজের স্বীকৃতি, আমার সম্মান উচ্চ চূড়ায়, কিন্তু বিপর্যস্ত দাম্পত্য জীবন আমার ইচ্ছার ও কাজের মৃত্যু ঘটিয়েছে। অসার মন, বেকার জীবনের এর একমাত্র কাজ ছিল কিউকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।

কিউ এর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয় আমার প্রতি তার আস্থা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। কিউ তখন আমার অনেক কাছের। কিউ আমার সাথে যাবে। আমার ঘরে শোবে, আমার তার কাছ ছাড়া হওয়া চলবে না কিছুতেই। সেখান থেকেই নতুন সম্পর্কের সূত্রপাত। ভীত সন্ত্রস্ত, কুণ্ঠিত, বিদ্ধস্ত যৌবনকে নতুন করে পূর্ণযুবতী হিসাবে বিকশিত করার জন্য যে শৈলীর প্রয়োজন ছিল—সেদিক থেকে আমার প্রয়াস ছিল নিখুঁত এবং আন্তরিক। যার জন্য আজকের কিউ এর সাথে সেদিনের কিউ এর তুলনা করা যায়না। এবং সেক্ষেত্রে এ বসন্তের আচরণ ছিল প্রকৃত মানবদরদি মনোবিদের । যদিও বসন্ত মানসিক দিক থেকে সেদিন ছিল নিঃস্ব। তার পরিণতি—

—টেবিলে চলো।

গ্লাস হাতে নিয়ে টেবিলে বসি। নিজ হাতে শূন্য গ্লাস আবার পূর্ণ করি। আমার নেশা হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি, নেশায় পেয়ে বসেছে। পা টলছে না ঠিকই। কিন্তু একটা

বাতিকে অনেকগুলো বাতি মনে হচ্ছে। কিউ এর গ্লাস ভর্তি। কিউ এর চোখ লাল, ঠোঁট আলগা। মনে মনে ভাবি কিউ তুমিও মাতাল হলে!

সোফা থেকে কিচেনে যাই। ওকে দেখার দরকার। আগুন জ্বালান, খাবার করা। অনেকটা মদ্যপান করেছে। যদি কোন অঘটন ঘটে! সত্যই কিউ এর হাত কাঁপছে, গলার স্বর সামান্য জড়ানো। ওকে সাহায্য করা দরকার।

—তুমি এলে কেন? টেবিলে বোসো। আমি যাচ্ছি।

—একসাথে বসবো। দুজনেই খাবার নিয়ে যাবো।

শাল খুলে রেখেছি। কিউ এর শালের একটা প্রান্ত মেঝেই। আমি ওর গায়ে জড়িয়ে দিই। ঠাণ্ডা লাগবে। রাত্রির পোষাক ছাড়া কোন কাপড় কিউ এর শরীরে নেই। মাংস পরোটা গরম করে দুজনে প্লেট নিয়ে টেবিলে। গীজার চালানো থাকে, জল গরম সর্বদাই চায়। মাংস, পরোটা স্যালাড।

দুজনের গ্লাসেই অ্যালকোহল বা মদ। সুস্বাদু মাংস, পরোটায় জড়িয়ে মুখে দিলাম। কিউ গ্লাসে ঠোঁট লাগিয়েছে। কিউ এর চোখ সামান্য লাল।

—আর খেয়োনা কিউ।

—কেন। আজ খাব বলে আগেই ঠিক করেছি। সেজন্যেই তো দিগ্‌কে।

—দিগের ছুটি।

—রাইট বসন্ত। মাংস ভাল খেতে?

—হ্যাঁ, তুমিও খাও।

—খাবো বসন্ত। জানো বসন্ত, তখন আমি ছোট, স্কুলে পড়ি। মানবদার সাথে আমার খুব ভাব, ছোটবেলা থেকে। মানবদা পরীক্ষায় পাশ করেছে, কলেজে ভর্তি হবে। আমায় জড়িয়ে ধরে কিছু না বুঝতেই আমার ঠোঁট কামড়ে দিল। আমি তখন কিছু না বুঝলেও জানতাম চুমু খাওয়াটা বড়দের ব্যাপার। আমি কাঁদতে লাগলাম। মানবদা লজ্জায় পড়ে গেছে, সে আমাকে অনুনয় বিনয় করে শান্ত করল। নিষেধ করল আমি যেন কাউকে না বলি। দিব্যি করলাম এতদিন সে দিব্যি মেনে চলেছি, আজ বলে ফেললাম।

—খুব অন্যায় করেছো। আর কাউকে বলবে না!

—কাকেই বা বলব? কে আছে যাকে বলা যায়?—একমাত্র তুমি। তারপর থেকে মানবদার কাছ একা যেতে ভয় করতো। তুমি বিশ্বাস করো মানবদাকে দাদা ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্কের কথা আমার মনে আসতো না। এমন কি বন্ধু হিসাবেও না। অথচ মানবদার সাথে আমার সম্পর্ক বন্ধুর অধিক ছিল।

—তুমি খাচ্ছো না কিউ।

—খাবো।

পরোটা ছিড়ে, মাংস জড়িয়ে ওর মুখে দিই। নিজে খাই। কিউ কথা বলে আমি শুনি। গরম খাবার ঠাণ্ডা হয়।

—তোমাদের ভাব হল কবে? বন্ধুত্ব?

—বন্ধুত্ব ছোটবেলা থেকে। দাদার মত, বন্ধুর মত। কারণ আমার পরিচয় আমার কাছে তখনো অজ্ঞাত। মানবদা জানতো। মানবদা কলেজে পড়ার সময় হতেই হয়তো তার মনের বাসনার সূত্রপাত অর্থাৎ সে আমাকে তার প্রেয়সি হিসাবে ভাবতে শুরু করে

এবং পরবর্তীকালে আমায় স্ত্রী হিসাবে পাওয়ার বাসনা রূপ পায় সে জন্য অবস্থা অনেকাংশে দায়ী।

—যেমন।

—পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ করে ফিরে আসার পর, আমার বাবা মায়ের প্রশ্নে আমার মন উত্তাল জীবন দুর্বিসহ এবং বাড়ি ছেড়ে, পৃথিবী ছেড়ে পালাবার জন্য আমি দিশেহারা সেই সময়ে মানবদার সান্নিধ্য, আমার অস্তিত্বের সঙ্কটকে দূর করে, অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব একমাত্র মানবদার ওপর নির্ভরশীল, ধীরে ধীরে মানবদা আমার একমাত্র ত্রানকর্তা এবং রক্ষাকর্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। মনে হয় মানবদাই আমার সব। তবুও প্রেমিক নয়।

—জানি।

—তুমি জানো না। আমায় মানস আঙ্কেল শাস্তি দিয়েছে। আমি দোষি নই। কোন দোষ করিনি।

—জানি। তুমি আর খাবে?

—না—না। খাবোনা।

—চলো হাত ধোবে। শোবে। অনেক রাত হয়েছে। শরীর খারাপ হবে।

কিউকে ধরে বেসিনে নিয়ে যাই। ওর হাত মুখ ধূয়ে দিই। ওর হাত মুছিয়ে দিই। বিছানায় বসিয়ে দিই। শাল চেয়ারে পড়ে আছে। ঠাণ্ডা তবুও আমার শাল, লাগছেনা। মদ্যপানের ফল। কিউ এর নিঃশ্বাস তপ্ত। হাত পা ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডায় ওর স্তন বৃন্তদ্বয় ওর পাতলা রাতের পোষাক উপেক্ষা করছে।

—শুয়ে পড়ো।

—না। শোবোনা। আজ রাত্রে ঘুম নেই। জাগবো। বসে থাকবো। কথা বলবো, আদর করবো। বসন্ত, তুমি আমার কাছে এসো। দেরি কোরোনা।

আমি টেবিলে রাখা গ্লাসের পানীয় গলায় ঢক্ ঢক্ করে ঢেলে দিই। আমি আজি মত্ত হবো। কিউ এর জন্য মত্ত হতে হবে। কিউ খাটে বসে। শোয়নি। কম্বল খুলে ওর গায়ে জড়িয়ে দিই। কিউ বাধা দেয় না। হাত ধরে আমায় কাছে ডাকে। হাত ছাড়িয়ে আমি ব্যালকুনির দরজা বন্ধ করি। বসার ঘরের লাইট নেভাই। টয়োলেট থেকে ফিরে বালিসে হেলান দিই।

কিউ টের পেয়েছে। সে উঠে আমার কোলে বসে রাতের পোষাকের বোতাম খোলে, হঠাৎই আমার শরীরের আগুন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, দিনভর "মানব" "মানব" শুনতে শুনতে আহত বসন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আক্রমণে উদ্যত হয়। অথবা কিউ এর ব্যথাহত মনকে শান্ত করার একমাত্র উপায় তার প্রাপ্য বুঝে নেবার সুযোগ করে দেওয়া। আমি প্রস্তুত। আমি উন্মত্ত কিউ এর কাছে। আমি, পূর্ণযৌবনা, স্বাস্থ্যবতী কিউ এর কাছে নবউদ্দীপনায় সমর্পণ করি। কিম্বা হঠাৎ প্রস্তুত কিউকে আমার সমস্ত মৃত ইচ্ছাকে পূর্ণজীবিত করে, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণজীবিত শক্তি দিয়ে গ্রহণ করি। জানি না হয়তো সে রাত্রে দুটি মনই একসময় গৌণ হয়ে যায়। দুটি শরীর শরীরে মেতে ওঠে। রাত ফুরিয়ে যায় টের পাইনি। দিন জেগে উঠেছে।

কোনদিন এই পাহাড়ে যা হয়নি, আজ তাই হল। ঘুম ভাঙল বেলা নটায়। তাও দিগে্র দরজায় ধাক্কা এবং সাহাব-সাহাব বলে ডাকায়। বিছানা থেকে নামলাম। বুক

খোলা কিউ ঘুমাচ্ছে। ইচ্ছা হচ্ছে, আরো ঘুমায়। কিন্তু নিরুপায়। কিউকে ঢেকে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিগের সদরের দরজা খুলে ওকে বললাম, তুমি টেবিল সাফ্ করো চা পরে বানাবে।

ঘরে ঢুকলাম। কিউ এর ঘুম ভাঙছে না। সে হাত দিয়ে কাউকে খুঁজছে।

—বসন্ত—বসন্ত—তুমি কোথায়? —এর মধ্যে উঠে পড়লে? ঘুম ভেঙে গেল।

—ওঠো কিউ। ন'টা বাজে।

—বাজুক। তাতে কি! আমি ঘুমাবো। আমার ঘুম পাচ্ছে।

আমি ওর পাশে বসে ওর চুলে হাত বুলাই। কিউ ওর মাথা আমার কোলে তুলে দেয়। দুহাতে ওর মাথায় চাপ দিই। কিউ গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে বিছানা ত্যাগ করে।

—বসন্ত, তুমি রিয়েলি সুন্দর! তুমি সুইট-সুইটেষ্ট!

—বেশ!

চট্ করে টয়লেট থেকে বেড়িয়ে দরজা খুলে কিচেনে। আমি ব্যালকুনিতে, রোদে ভরে গেছে। কিউ গরম চায়ের মগ হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্নানে চলে যায়।

—তুমি চা খাও। দিগ্ যে কাজ করছে করুক। আমি স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করবো।

চা খেলাম। সিগ্রেট ধরালাম। ঘণ্টা চারেক ভাল ঘুম হয়েছে। হবারই কথা। সে কারণে শরীরে সে-জড়তা নেই, মদ্যপান করলে মাথা জ্যাম্ হয়ে থাকে, তাও নেই। বাইরের রোদে দাঁড়িয়ে আরাম পাচ্ছি। গত কালের ঘটনাগুলো মনের সামনে ভাসছে। নৈনিতাল, ভীমতাল, সাততাল অবশেষে এই লজ। কেমন হাসি পাচ্ছে, নিজেকে পাগল পাগল মনে হচ্ছে। এখানে ওখানে কত জায়গায় যাই। হোটেলে থাকি, লজে, ইনেস্পেক্শান্ বাংলোতে থাকি, কিউ থাকে, কিউ থাকে, কিউ আমার সেক্রেটারি। কিন্তু গত দিন এবং রাত্রির ঘটনা ব্যতিক্রম। সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের। বিশেষ করে গত রাত্রের। মদ্যপান সচরাচর আমরা করিনা। করলেও অল্প মাত্রায় এবং স্বাভাবিকতা বজায় রেখে। কিউ সংযমি, আমিও সংযমের মধ্যে থাকি। কিন্তু গতরাত্রে কিউ ও আমার মদ্যপান, এবং আমাদের আচরণ, মানসিক ও শারীরিক; দুটিই আমাদের স্বাভাবিকতা বিরোধী। যাক্গে। গত দুদিনের মনের ওপর যে অসহ্য অবস্থা বিচরণ করছিল তা পরিষ্কার হলেই হলো। অন্ততঃ পাহাড়ে বেড়ানো বা অবসর বিনোদন অবশিষ্ট দিনগুলোতে সুন্দর হবে।

ধূমপান শেষ হল। সিগ্রেটের বাঁট দূরে ছুড়ে দিয়ে হাত পা টান্ টান করে আলসেমি ভাঙছি। কিউ বেরোলো বাথরুম থেকে। কিশোরী মেয়ের চাঞ্চল্য দেহে, মুখে চপল হাসি, গলায় গুন্গুন্ সুরে গান। হাত পা ছুড়ছে। তিরিং তিরিং করে, লাফাচ্ছে—এ কোন কিউটি!

—স্নান করে দারুণ আরাম হল। ভীষণ ভাল লাগছে। কলকাতায় গরমে কোন আরাম নেই। স্নান করার পর গা ঘামতে থাকে। স্নানের আগে ও পরে একই অবস্থা। পাহাড়ে খেয়ে ঘুমিয়ে বেড়িয়ে—সবেতে আরাম। পাহাড়ে থাকলে হয়। বসন্ত, তুমিও স্নান করে এসো ভাল লাগবে।

আমি কিউকে লক্ষ্য করছি। কিউ হাসছে, নাচছে, কথা বলছে। বাইরেব রোদে প্রকৃতি হাসছে পাখি ডাকছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কলকল্ করে কথা বলতে বলতে চলেছে স্কুলের দিকে।

—যাও, গরম জল আছে, বসন্ত স্নান করে এসো।

পোষাক পরছে কিউ। দিগ্‌ কিচেনে। আমি মনে কিশোরী লাবণীকে নিয়ে স্নানে ঢুকলাম। মানসদার কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে শোনা কিশোরী লাবণীর কথা।

পাঁচ বছর বয়স হয়েছে লাবণীর। স্কুলে ভর্তি করতে হবে। বাড়িতে বসে পড়াশুনা করলেই তো চলবে না। মানসদত্তের মেয়ের। স্কুলের ফর্ম ফিলআপ করতে হবে। ছাত্রীর নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ ইত্যাদি। নাম-পদবি, নাম তো লিখলাম পদবি কি হবে? বাবার নাম কি লিখবে? মানুষ করলেই কি বাবা হওয়া যায়? জন্মদাতা ছাড়া আইনতঃ কেউ বাবা হতে পারে? কি করবে মানস দত্ত? আগে ভাবেনি। সত্য কথা লিখতেও মন চাইছে না। প্রচণ্ড দ্বিধায় পড়েছিল মানসদা। ফর্ম হাতে নিয়ে বেশ কিছু সময়ে বসে ছিল। কিন্তু ফর্ম ফিলআপ তো করতেই হবে। এ ছাড়া বলা যায় না, কোন্‌দিন ইরফান ও লছমি এসে যদি তাদের মেয়েকে দাবি করে বসে, তাদের মেয়ে যদি তারা ফিরিয়ে নিতে আসে, মানস দত্ত কি আটকে রাখতে পারবে? লাবণীকে সে সময় প্রকৃত পিতামাতার কাছে ফিরে যেতে চাইবে না? মানুষ করছি বলেই কি এই শিশুর ওপর তার অধিকার জন্মে যাবে? যাবে না। অবশেষে স্কুলের খাতায় নাম ওঠে লাবণী খান, পিতা মহম্মদ ইরফান খান, অভিভাবক মানস দত্ত। ফর্ম ফিল-আপ করে স্কুলের শিক্ষিকাদের কাছে ওর পিতামাতার নামের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন মানসদা। দীর্ঘদিন স্কুল কৃর্তৃপক্ষ গোপনীয়তা বজায় রেখেছিল স্কুলের শিক্ষিকাগণও। মানস দত্তের মনে অকারণে একসময় প্রচণ্ড হতাশা ছিল। অভূতপূর্ব এ সম্পর্ক লাবণী ও মানসদার মধ্যে ছিল। মনে মনে মানসদা জানতেন লাবণী তার মেয়ে এবং লাবণী জানতো মানস দত্ত তার বাবা।

আর বসন্ত? তোমার সাথে কিউটির কি সম্পর্ক? সামাজিক মর্যাদা সে পায়নি। অথচ কিউটি তার সেই শক্তি, সেই অনুভূতি যার প্রভাবে সে তার মৃত জীবনীশক্তি ফিরে এসেছে এবং পূণরুদ্দমে সৃষ্টি কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এবং দেশ বিদেশ আমার কাজে উপকৃত হয়েছে, হচ্ছে. শিশু মৃত্যুর হার কমানো বা সন্তানসম্ভবা মায়েদের প্রতি সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমার সৃষ্ট সব কাজেই কিউ এর প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে অথচ সেই কিউ বা লাবণীর সামাজিক মর্যাদা আমি দিতে পারিনি। কিউকে আমি সুস্থ্য করে তুলেছি, তার প্রতিদানে কিউ নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলিয়ে দিয়ে আমার পূনর্জীবন দান করেছে। কিউ এর অনুরাগে আমি স্বার্থক আমি সম্পূর্ণ। প্রতিদানে কিউ এখনো নিস্ফল। প্রকৃতি—কিউ সেই পূণ্য বীজের জন্য অপেক্ষমানা যে বীজ ধারণ করে তার গর্ভে সৃষ্টি হবে তার ফল। নিস্ফলা কেন কিউ?

স্নান সেরে বেরোলাম। পাজামার ওপর লম্বা হাউসকোট চাপিয়ে, দাড়ি কেটেছি, হালকা শুকনো চুলে চিরুণী বুলিয়েছি।

—বাঃ, চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে। একদম নায়ক।

—ঠাট্টা করছো?—করো।

—নো। সিরিয়াসলি বলছি।

একসময় দেখতে খারাপ ছিলাম না। হালকা, মাঝারি শরীর, সাধারণ বাঙালির চেয়ে লম্বায় বেশি, রঙ ফরসা না হলেও কালো নয়। বিদেশে দেশে কাজ নিয়ে ঘুরতাম। বিদেশিনী, বয়সে ছোট বা বড় কাছাকাছি আসা বা আনন্দ পানে এগিয়ে আসতে কেউ

চাইতো না বলা ঠিক হবে না। কিন্তু কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, আবার কিছুটা ভয়ে এগোয়নি কারো কাছে। কেউ কেউ হতাশ হয়েছে। আমার দুঃখ নেই।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

—তবে মাঝে মাঝে তুমি কেমন হয়ে যাও, তোমাকে নিয়ে আমায় ভাবতে হয়।

—যেমন?

—যেমন গত কাল, তোমাকে তোমার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিলামনা।

—কি করে পাবে? তুমি কি গত রাত্রে প্রকৃতিস্থ ছিলে?

—কে বলেছে। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সজ্ঞানে ছিলাম। গতকাল আমার হঠাৎ যেন ইচ্ছা হল, তোমার সেবা, তোমার আদর, তোমাকে বিশেষ ভাবে, ভীষণভাবে পাবার জন্যই বেশি বেশি করে মদ্যপান করালাম। দেখলাম একসময় তোমার মনের সমস্ত অন্তরায় দূর হয়ে গেছে এবং বসন্ত তখন তুমি শুধুমাত্র আমারই ছিলে। সে কারণে তোমাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে তৃপ্তি হল, আমার সাধ মিটলো। আমি কৃতজ্ঞ বসন্ত।

—বেশ। খুশি? আমিও কোয়াইট ফিট ফর্ মাই লিট্ল্ কিউটি।

—তোমার খিদে পেয়েছে। টেবিলে বসো। হেভি ব্রেকফাস্ট। আমিও বসছি।

টেবিলে বসলাম। কিউ পাশে। কি আরামেই দিনগুলি কাটলো। গরম লুচি আর আলুর ঝাল ঝাল ছক্কা। ধনে পাতা কুচিয়ে ছড়ানো। মুখরোচক। দুজনেই চুটিয়ে খেলাম। চা দিল দিগ্, দার্জিলিংয়ের গন্ধ চায়ের কাপে।

—আজ দুপুরে না খেলেও চলবে।

—সব হজম হয়ে যাবে। ব্রেকফাস্টের পর বেড়োবো। হাঁটবো, পাহাড়ে চড়বো, সব হজম হয়ে যাবে। চলো আজ গ্রামের দিকে যাবো।

—তোমার যা ইচ্ছা।

—বসন্ত, তোমরা আমায় কিউটি নামে ডাকো কেন?

—সে কি? তোমার কি খারাপ লাগে! রুচী তোমাকে কখনো সুইট কখনো কিউটি বলে ডাকতো, তখন তুমি শিশু, সেই থেকে তুমি সুইটি, কিউটি হয়ে বিউটি হয়ে গেছো। খারাপ লাগলে—

—না-না। লাবণী যখন নেই, তোমার কিউটিই থাক। কিউটি অন্ততঃ বেঁচে থাক। চলো বেড়োই, রেডি হয়ে নাও। দিগ্ কাপ ডিস উঠিয়ে নাও।

আমরা জামা কাপড় চাপিয়ে বেড়োলাম। পিঠে সূর্যের উষ্ণ আলো, বুকে হিমালয়ের স্নিগ্ধ শীতলতা, চোখে সবুজ নবীন পাহাড়। কিউ হাঁটছে, কুমারী কিউ এর পরণের শাড়ি উড়ছে হাওয়ায়, চলায় হরিণের চাঞ্চল্য, হাওয়ায় শাড়ি উড়ছে দূর থেকে ছবি তুলে মেলালে, ডানা মেলা প্রজাপতি মনে হতে পারে।

—বসন্ত, আজ হাঁটতে কষ্ট হলেও কিছু বলতে পারবেনা। আজ আমি তোমার শহুরে স্পর্শ লাগা কুমায়ুন থেকে পালিয়ে প্রকৃত, অবিকৃত কুমায়ুন গ্রামে যাবো, যেখানে পাহাড়ি কুটীর আছে, পাহাড়ী মানুষ আছে, পাহাড়ি গাছপালা পশুপাখি আছে।

—চলো যাই। তবে মনে হয়না শহরের মানুষকে লুকিয়ে কুমায়ুন কেন, কোথাও কোনো জায়গা আছে। চলো।

চলা শুরু করলাম। কিউ এর কাছে জলের বোতল আছে। এক সময় পাকা পিচ ঢালা রাস্তার শেষ, কাঁচা ধূলোয় ভরা রাস্তা। এখান দিয়েই জিপ ট্রেকার যায়, রাস্তায় এক

হাঁটু ধূলো কোথাও কোথাও। এখানে কোন হোটেল নেই, নেই বিদেশী গাড়ি চলাচল। দুপাশে ফলের বাগান, ওক চির দেওদার—অনেক গাছ, অর্থাৎ কম গাছ কাটা পড়েছে। দু পাশে ফলের বাগান, ফলের গাছে থোকা থোকা ফল। জন মানব শূন্য ঠিক নয়, হালকা বসতি। দুজন পাহাড়ি রমণী ঘাস, কাঠ সংগ্রহ করছে, সংগ্রহ করছে শুকনো দেওদার পাতা, প্যাকিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়, বিক্রী করে টাকা পাবে। ফলের বাগানে কাজ করছে কেউ কেউ। কুমায়ুনের উত্তরে হিমালয়, দেখা যাচ্ছেনা হালকা ধোঁয়াশায় ঢাকা। চারপাশে উঁচু পাহাড়ের পাঁচিল। গায়ে গায়ে লাগানো। পাহাড় থেকে বোঝা যায় জল নামার নির্দ্দিষ্ট রেখা রয়েছে বর্ষায় বৃষ্টির জল ঝর্ ঝর্ করে পাহাড়ের গা বেয়ে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে সমতলে বয়ে যায়, কখনো কখনো এক বুক বালিতে ভরা পাহাড়ি নদীর বুক উপচে বন্যা হয়।

সামনে কাঠের বোর্ড লাগানো। এগিয়ে কিউ দেখে ফিরে এল, বলল—কোনো আশ্রমে যাবার সংকেত। এগিয়ে গিয়ে দেখি সরু একটা পায়ে চলা অস্পষ্ট পথরেখা পাহাড়ের পাদদেশের দিকে চলে গেছে। অর্থাৎ ঐ পথ দিয়ে কোন এক আশ্রমে যাওয়া যায়। এই পাহাড়ে কোন আশ্রম বা কোন সাধু থাকে বলে জানা নেই। থাকবেই বা কি করে? জল নেই, আলো নেই, নেই কোন বাঁচার সাশ্রয়। তবুও?

চিন্তা করছি। এ সময় একজন মানুষকে ঐ পথ বেয়ে ওপরে উঠতে দেখলাম। পরণে গেরুয়া। কোন সন্দেহ রইলনা যে আশ্রম আছে এবং সেই আশ্রমে লোক বাস করে। লোকটি পাহাড়ি। এগিয়ে ওর সাথে কথা বললাম। সত্যই সেখানে আশ্রম আছে। সাধু বাবা থাকেন না। পূজা হয়। গান হয়। বঙ্গালি বাবা। বঙ্গাল দেশের রাম আউর কিষাণ ঠাকুরের বাবা আছে। অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মঠ বা আশ্রম জাতিয় কিছু। জানতে পারলাম এই পাহাড়ে নয়, সামনের পাহাড়ে, অর্থাৎ এ কাঁচা রাস্তা এ পাহাড়ের পাদদেশ হয়ে সামনের পাহাড়ে উঠেছে। যার উল্টোদিকে প্রত্যক্ষ হিমালয় পর্বত শ্রেণী। সেখানে অনেক জায়গা জুড়ে রামকৃষ্ণ আশ্রম বানিয়েছে কোন মঠের বাঙালি সন্ন্যাসি। সেখানে সন্ন্যাসি বাবা থাকেন। সামনে হিমালয়, জনমানব নেই। কখনো কখনো বস্তিতে সেবা করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মঠের সন্ন্যাসিরা এখানে ধ্যান করতে, হিমালয় দর্শন করতে আসেন। একমাত্র পথ এই পাকদণ্ডি। এখান থেকে অনেক দূর। যেতে অনেক সময় লাগবে। আমরা শুধু শুনলাম। কল্পনায় সেই মঠ বা আশ্রম দেখলাম। কারণ আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। সকলেই কি সব জায়গায় পৌঁছাতে পারে?—পারেনা।

উনার কাছ থেকে জানলাম, এই কাঁচা রাস্তা একটার পর একটা পাহাড় পার করে মিশেছে আবার অন্য দিক থেকে আসা পিচ ঢাকা রাস্তায়। সামনে দুপাশে আরো গাঁও আছে, বাগান আছে, হোটেল ভি আছে। মানুষ বাস করে ফসল হয়, চাষ হয়, জীবনযাত্রা অব্যাহত।

লোকটি চলে গেল। পদক্ষেপে ক্লান্তি নেই। ক্লান্তি আমাদের জন্য। পাহাড়ে বসে জিরিয়ে নিয়ে ফেরার উদ্যোগ নিলাম। ফিরতে দেরি হতে পারে, উদ্যোগ হারালে চলবেনা।

অষ্টম অধ্যায়

মানুষের মন ভাল থাকলে কথা বলতে ইচ্ছা হয়, গল্প করতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হয় কথার মাঝে হেসে উঠতে, চলার মধ্যে আবেগ আসে। আসে অকারণ চাঞ্চল্য। কিউ এর মন ভাল আছে। কলকাতায় স্বল্প স্থানের মধ্যে একই ঘরে একই আসবাবপত্রের মধ্যে, একই কাজের মধ্যে মনের স্বাধীনতা সীমিত। কুমায়ুনে এসে কিউ স্বাধীন। মুক্ত প্রকৃতি কিউ এর মনের দরজার অর্গল খুলে দিয়েছে, সেখান হতে নির্গত হচ্ছে কিউ এর অতিত কখনো মিষ্টি ছেলেবেলা কখনো নিষ্ঠুর জীবনের সত্যরূপ।

---পড়াশুনার ব্যাপারে মানস আঙ্কেল অত্যন্ত সিরিয়াস ছিলেন। তিনি বলতেন ভাল স্কুল না হলে ভাল পড়াশুনা হয়না, ভিত কাঁচা থাকে। যেমন মানবদা পড়তো সেণ্ট জেভিয়ার্সে আমি বেথুনে।

---আমি জানি, তোমার পড়ার বা জ্ঞানের গভীরতা আছে। অন্তত ফাঁকি দাওনি।

---ফাঁকি দেবার কোন উপায় ছিলনা। আমার পড়ানোর জন্য তিনজন হোম টিউটর ছিল। তার মধ্যে দুজন পার্মানেন্ট, মানবদা এবং একজন ভ্যাকেশন্যাল, সে মানস আঙ্কেল। তখনো মানস আঙ্কেল বাইরে, সল্ট লেকের বাড়িতে মা, মানবদা এবং আমি। ছুটীতে এসেই মানস আঙ্কেল বই পত্র নিয়ে বসে আমাদের প্রগ্রেস যাচাই করতেন। হাসতে হাসতে মাকে বলতেন আমি দেখছি তুমি তোমার ছেলেমেয়েকে কেমন মানুষ করছো। মা হেসে উত্তর দিতেন---নিয়ে যাও তোমার ছেলে মেয়ে, আমার দরকার নেই। জানতেম বাবা মায়ের সেটা আমাদের নিয়ে মজা বা কৌতুক। বাবা হাসতেন, মা হাসতেন, মানবদা আমি---সকলে হেসে, খুশিতে ডগ্‌মগ্ করতাম।

কিউ যখন কথা বলে, আমার ভাল না লাগলেও আমনোযোগি হয়না, কিউ কষ্ট পায়। তবুও মাঝে মাঝে চোখের দৃষ্টি, মনের অভিমুখ বদলে যায়।

---দেখো, দেখো---ঐ দেখো এত বড় ঐ দাঁড়কাক দুটো, শালিখ, কত ছোট পাখি, ওদের তাড়া করছে।

---করবেই তো কাক দুটো শালিখের বাসা টার্গেট করেছে, সম্ভবত সেখানে শালিখের ডিম বা বাচ্চা আছে। মারবো কাককে।

একটা পাথর টুকরো তুলে ছুড়ে দেয় কিউ। পৌঁছায়না। যাঃ হতাশ কিউ। আমার হাসি পায়, হাসি। কিউ কপট রাগ দেখায়।

---একটা পড়ার টেবিল। মানবদা আর আমি শেয়ার করতাম। আমার অভ্যাস ছিল জোরে জোরে পড়া, না হলে মুখস্থ হতো না। মানবদা পড়তো মনে মনে। আমার পড়া শুরু হলেই মানবদা রেগে যেত, আমার মাথায় চাঁটা মারত, চুল টেনে দিতো, আস্তে পড়ার হুকুম করতো, নিজের পড়া নিজের কানে না শুনলে আমার হয়না না। আমায় রান্না ঘরে ডেকে নিয়ে মা বলতেন, তুমি এখানে বসে পড়। আমি তাই করতাম। কিছু সময় পরে মানবদা টেবিল ছেড়ে রান্নাঘরে, সেও রান্না ঘরে পড়বে। ছোটবেলায়---

---বুঝলাম, তোমরা দুজনে একসাথে পড়াশুনা করেছো। আমি সব জানি।

কিউ এর কথা বলা শুনতাম। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতাম কথা বলার সময় কিউ এব চোখ মুখের চেহারা। বিশেষ করে মানবের স্মৃতি কিউএর মনে একটা স্থায়ী স্পর্শকাতর জায়গা দখল করে বসে আছে। মানবের স্মৃতি চারণা করার সময় কিউ

কখনো কখনো বড় অস্বাভাবিক আচরণ করে। দেখেছি মানবের সম্পর্কে কথাবার্তা বলার সময় কখনো ওর মুখে সুখের অনুভূতিতে উজ্বল আবার পরক্ষণেই যন্ত্রণাকাতরতা। এ যেন আকাশে মেঘ ও সূর্যের খেলা। কারণ মানবের প্রভাব কিউ এর জীবনে অত্যন্ত প্রবল। কৈশরে পিঠে পিঠে ভাই বোনের মত মানুষ হয়েছে আবার যখন কিউ বুঝতে পেরেছে আসলে মানব তার নিজের দাদা নয়, মানব ও তার মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই সেই সময়ে ওদের সম্পর্কে স্নেহের সাথে প্রণয়ের সমন্বয় হয়। কখনো ভাই বোন, কখনো বন্ধু, কখনো প্রেমিক-প্রেমিকা, ইতিমধ্যে শরীরের নিয়মে যৌবনের দরজায় দুজনে-মনে বসন্তের উষ্ণতা। কিন্তু সে সম্পর্কে কোনদিন যৌনতার আবেদন, আকর্ষন বা যৌন ঘটিত কোন কামনার স্থান ছিল না। বিশেষ করে লাবনীর মধ্যে তখনো সে জাতিয় কোন আকাঙ্খা বা রোমাঞ্চের স্থান ছিলনা। কোন একদিন সরস্বতী পুজার সময় মানব লাবনীকে চুমু খেয়েছিল, যে কারণে লাবনী লজ্জা পেয়েছিল ঠিকই এবং তা অত্যন্ত সাময়িক এবং বেশিদিন মনেও ছিলনা। পরবর্তী সময়ে মানব ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সময় মানবের মনে কিউএর প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ জন্মায়। যদিও তার জন্য কিউ এর হঠাৎ আঘাত প্রাপ্তি দায়ী। কিউএর মানষিক শুশ্রুষার সময় মানব কিউ এর প্রতি মানসিক ভাবে বন্দি হয়ে যায়। এবং কিউকে স্ত্রী হিসাবে, শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পাওয়ার জন্য মানব ব্যাকুল হয়। কিউ এর রূপ, যৌবন, মন মানবকে অস্থীর করে তোলে, এর জন্য অনেকাংশে দায়ী মানসদা এবং বৌদির অমানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যা মানব এবং কিউকে প্রচণ্ড ভাবে একাত্ম করে তোলে। জানিনা কেন, মানব যাকে চায়তো; লাবনীকে, লাবনীর মত মেয়ে সচরাচর পাওয়া যায়না, মানসদা তাকে বধূ হিসাবে মেনে নিতে পারলনা। লাবনী যারই স্ত্রী হবে, যে বাড়ির বধূ হবে, সে বাড়ি বা সে পুরুষ যে পরম সুখী হবে. এ বিষয়ে আমার কোন দ্বিধা নেই। সংসার সমাজ মানসদাকে ও লাবনীকে দুরে সরিয়ে দিল। প্রথমতঃ তারই বাড়িতে কাজ করা একজন সারভেন্টের মেয়ে, তার ওপর বাবা মুসলমান, মানবতার খাতিরে, তাকে সাহায্য করা যায়, স্নেহ করা যায়, কিন্তু পুত্র বধূ হিসাবে মেনে নেওয়া যায়না।

—মানবদা কিন্তু সমস্ত ঘটনা জানতো। জানতো তারও আমার মধ্যে ভাইবোনের সম্পর্ক নয় তবুও মানবদার আচরণে প্রাথমিক ভাবে কোন দিনই সত্য কথা প্রকাশ হয়নি। মানবদার আচরণে দাদার যেমন আচরণ হওয়া উচিৎ, তার কোন অন্যথা ছিলনা। একদিনই ভুল করে বা হঠাৎই আমায় চুম্বন করেছিল, অর্থাৎ মানবদার মনের গোপনে হয়তো কামনা ছিল, অপ্রকাশ্য। জানি না।

—স্কুলের ফ্যাইন্যাল পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ করার সময়, আমাদের হেড দিদিমণি নির্জনে আমার ফর্ম ফিলআপ করার সময় আমার ও বাবার প্রকৃতনাম উনি ডিক্টেট্ করলেন। আমি লিখতে রাজি হইনি। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসি। মায়ের কাছে, বাবার কাছে জানতে চাইলাম সত্য ঘটনা কি? দুজনে নীরব রইলেন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, জেদ করলাম, আমি পরীক্ষা দেবনা, আমি পালিয়ে যাব ফিরে যাব আমার নিজের বাবা মায়ের কাছে।

—আমি জানি কিউ।

—মা স্বান্তনা দিলেন, বাবা অর্থাৎ মানস আঙ্কেল স্বান্তনা দিলেন, বললেন, আমরা আছি, কাগজে কলমে যাই লেখা হৌক তুমি আমাদের মেয়ে, আমাদের একজন। আমি

কাঁদতে শুরু করলাম কথা বলা বন্ধ করলাম, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করলাম। সেই সময় মানবদা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ফর্ম ফিলআপ করালো। সেই থাকে একমাত্র মানবদাকে ছাড়া আমি কাউকে বিশ্বাস করতামনা, সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হল। সেদিনের মনের অবস্থা তোমাকে বোঝাতে পারবনা বসন্ত।

—জীবনে কারোরই সবদিন সমান যায়না। ভাল আসে, মন্দ আসে সুখ আসে দুঃখ আসে—সব কিছুকে গ্রহণ করতেই হবে। স্বাভাবিক ভাবে আর যে কারণে নিজেকে দুঃখী ভাবছো, বা নিজেকে অপরাধি বলে মনে হচ্ছে, সেটাও তোমার ঠিক নয় কারণ প্রকৃত ঘটনার জন্য তুমি মোটেই দায়ি নও। তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

—দোষ গুণের নয়। অসহায়তা। পৃথিবীতে এমন মানুষ ক'জন আছে যার মা ও বাবা আছে কিনা সে জানেনা। মা ও বাবা তাদের সন্তান পরিত্যাগ করে। লুকিয়ে ঘর ছেড়ে যায়, এবং যাদের মা বাবা বলে এতকাল জানতাম, তারা মা বাবা নয়। মানুষ কত নিষ্ঠুর হলে এ ভাবে নিজেব সন্তানকে ত্যাগ করে পালিয়ে যায়!

—তারা হয়তো ভেবেছিল, তাদের মনিব নিশ্চয় তাদের সন্তানকে পালন করবে, নাহলে তা যাওয়ার আগে হত্যা করতে পারত। করেনি। এটাই সত্য এবং নিয়তি।

নিষ্ঠুর নিয়তি বড় কঠোর। আমি সেই থেকে বার বার নিজেকে আয়নার সামনে রেখে মনে মনে মায়ের, বাবার ছবি কল্পনা করে নিয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরেছি। কিন্তু মেলেনি।

—বাবা মা চিরকাল বাঁচেনা। অনেকের মা জন্মলগ্নেই মারা যায়। ধরে নাও, তোমার বাবা মার কোন দুর্ঘটনায়—

—সব কিছুই কি এত সহজে মেনে নেওয়া যায়? তুমি অন্ততঃ এতদিন পরে মিথ্যা স্বান্ত্বনা দিওনা, তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমিই তো আমার একমাত্র ভরসা, বাকি সব মিথ্যা।

আমি থেমে যাই। কিউ এর আত্মগত কথায় আমার দখল দেওয়া ঠিক নয়। কিউ এর মনে দুঃখ আছে, বেদনা আছে, ক্ষোভ আছে, দীর্ঘদিন যুক্তির নিরিখে সেগুলো বিচার করেছে, বাস্তবের সাথে নিজেকে উপযুক্ত করার প্রয়াস তার আছে, তবুও আবেগমুক্ত বা ব্যাথাশূন্য নয় সে। সূর্য প্রায় মাথার ওপর, রৌদ্রে হাঁটছি, সোয়েটারে অসুবিধা হচ্ছে, একটা গাছের ছায়ায় দাড়ালাম, সিগ্রেট জ্বাললাম।

—ফর্ম ফিলআপ করলাম। মানবদা জোর করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম জমা দেওয়ালো। কিন্তু পড়া বন্ধ হয়ে গেল, কোচিং যাওয়া বন্ধ হল। বই খুলতে ইচ্ছা করতনা, অন্ধকারে ছাতের ঘরে একা একা বসে থাকতাম। মালবিকা অর্থাৎ মালুকে কোলে নিয়ে বসে থাকতাম। ঐ বাড়িতে নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবতাম। নিজেকে অপরাধি বলে মনে হত। মনে হত ঐ খাট বিছানা, জামা কাপড় কোন কিছুর ওপর অধিকার নেই। ঐ বাড়িতে আমার ভূমিকা আমার মায়ের মত হওয়া উচিৎ—দাসীর মেয়ে দাসী। সেই থেকে হীনমন্যতার সূত্রপাত। নিজেকে ছোট বলে মনে হত। মানবদার সাথে আমার সম্পর্ক মনিব ও দাসীর সম্পর্ক। আবার মানবদার স্নেহ, আদর, স্বান্ত্বনা, ভালবাসার আকর্ষণে মানবদার কাছ থেকে দীর্ঘসময় দূরে থাকতে পারতামনা। সেটাই ছিল ভুল।

—ভুল নয়। ঠিক। তোমার ও মানবের কোন ভুল ছিল না।

—তুমি বললে হবে, মানবদা চলে গেছে, এবং যাবার ফলে আমার মনের যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তা সারবার নয়।

সময় ঠিক সারিয়ে দেবে। মনটাকে শক্ত করো, সবঠিক হয়ে যাবে।

আস্তে আস্তে কিউ এর মাথায় হাত রাখি। ওর চুলের মধ্যে আমার আঙুল ডুবে যায়। কিউ ভেঙে পড়েনি, ওর চোখেও জল শূন্য। কিউ কিছুদিন আগে হলেও ভেঙে পড়ত। কিউ আজ অনেক শক্ত। কথাগুলো বলছে আবেগ শূন্য কণ্ঠে। দৃঢ় মন নিয়ে কোমল পায়ে পাহাড় ভেঙে ওপরের দিকে তারযাত্রা, আমি অনুসরণ করছি। রেস্ট হাউসে ফিরতে হবে। ক্লান্তি লাগছে। একটা পাথরের ওপরে বসলাম। কিউ পাশে বসে আমার ডান হাতের ওপর মাথা রাখল। দূরে স্তব্ধ পাহাড় শ্রেণী, কিউ এর কথা তারা এতক্ষণ শুনেছে, তারা স্তব্ধ, নির্বাক—স্তব্ধ হাওয়া, শন্ শন্ শব্দ নেই। প্রকৃতি কিউ এর ব্যথা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিয়েছে ও নিচ্ছে।

নিস্তব্ধ সবুজ পাহাড়, কিউএর হৃদয় বাঙ্ময় করেছে। অতিত, বর্তমান এমনকি ভবিষ্যৎও কিউ এর মনের আড়াল হতে গড় গড় করে বেড়িয়ে আসছে। জীবন তার ঘটনার সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালার খোলা দরজা দিয়ে অতিতের আবেগ মেখে বর্তমানে হাজির। সে নিজের রূপ নিজে দেখছে, কখনো দুঃখের কখনো সুখের রঙে রাঙানো অতিত বিবৃত করছে সংবেদনশীল বসন্তের কাছে, অর্থাৎ নিজের অতিত প্রকাশ করে সে তৃপ্ত, স্মৃতিতর্পনের আনন্দে গলার স্বর, আবেগমথিত মুখের চেহারায় তৃপ্তির ঔজ্জ্বল্য—আমার ওতেই সুখ। আমি চাই কিউ সুখে থাকুক, ভাল থাকুক। কিউটির জীবনে বর্ষার মেঘ দূরিভূত হয়ে, শরতের আলোয় উদ্ভাসিত হোক ওর হৃদয়।

—চলো, উঠি।—উঠবেনা।

—আমার যে বসে থাকতে ইচ্ছা করছে বসন্ত। এই কুমায়ুন পাহাড়ে পাথরের ওপর, কলুষমুক্ত আকাশের নিচে, তোমাকে পাশে নিয়ে অনন্তকাল বসে থাকতে ইচ্ছা করছে। এই পাহাড়ে সবুজ গাছ যেমন স্বার্থক, সুন্দর, বিকশিত, সেই রকম তোমার বুকে, তোমার হৃদয়ে চির শান্তির স্থায়ী আশ্রয় পেতে চাই বসন্ত। আমায় তুমি দেবে তো বসন্ত?

কিউ এর কথা মন দিয়ে শুনি। সেই অবিশ্বাস, হারানোর ভয়। অতিতের অভিজ্ঞতায় বর্তমানেও সেই আস্থার অভাব; এতদিন ধরে আশ্বাস দিয়েছি, তবুও কিউ সম্পূর্ণ আশ্বস্ত নয়। হালকা হেসে, ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ওকে বলি—

—এতদিন পর তুমি আমার প্রতি এই সামান্য বিশ্বাসটুকুও রাখতে পারো না কিউ। মাঝে মাঝে ভাবি কোথায় আমার ব্যর্থতা, কেন এখনো তোমার মনের প্রীতি স্থাপনে আমি অক্ষম। কিউ আমি আমার শরীর মন দিয়ে তোমার ভালর জন্য ভাবি, তোমার ভবিষ্যতের জন্য ভাবি, তোমার সুখের জন্য সব সময় চিন্তা করি। তোমার সুখের স্পর্শ পেতে আমার মন সব সময় ব্যাকুল কিউ। আমি, এই পৃথিবী, এই প্রকৃতির অতুলনীয় সৃষ্টি অপেক্ষা, তোমাকে অনেক বেশি সুন্দর মনে হয়, আর সেই সুন্দরের সাধনা দীর্ঘদিনের, তুমি তো জানো কিউ।

—বসন্ত তোমার কথায় মানবদার কথার প্রতিধ্বনি। কেন বলতো, তোমার কথা, মানবদার কথা মর্মার্থের দিক থেকেই এক হয়, মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমার দুজনে একই শব্দে ভাব প্রকাশ করো। মানবদাও কত সন্ধ্যায়, কত পড়ন্ত বেলায়, আমার

দুটো হাত ধরে বসে থাকত কথা বলত খুব কম, আমি ওর হাতের স্পর্শে বুঝতে পারতাম, মানবদার হৃদয় মুখর, দুটি মানব-মানবির হৃদয়ের মুখরতা শব্দের অন্তরালে আপনি প্রবাহমানা। যাও কথা বলতো, স্বল্প, কিন্তু তার বাক্য বা ভাষা যেন তার কথার প্রতিধ্বনি তুমি করছো। কেন এমন হয় বসন্ত।

—জীবন রহস্যময় কিউ। অসীম রহস্য বোঝা দায়!

—মাঝে মাঝে তাই মনে হয়। নইলে একদা যে জীবনে ঘৃণা ধরে গিয়েছিল, জীবনের ইতি টানার কথা ভাবছিলাম। সেই জীবনকে ভালবেসে আবার বাঁচতে ইচ্ছা হয় বসন্ত, ইচ্ছা হয় ভালবাসার নতুন করে মঞ্জিল বানাতে।

—এইখানেই তো তোমার জয়। তুমি অবস্থাকে মোকাবিলা করেছো। কষ্ট পেয়েছো আবার জয়ী হয়ে ফিরে এসেছো জীবনে। তোমাব জয়ে আমার অহঙ্কার। একবার আমার কথা ভাবোতো?

—তোমার কথাই তো ভাবি। আর কার কথা ভাববো? কে আছে আমার? আমার সুখ তোমার ভাবনায়। তোমাকে ভালবেসে।

—আমি কৃতজ্ঞ কিউ। তবুও বলব, ভালবাসা কৃপণ নয়, সে উদার, আকাশের মতই উদার ভালবাসা মনকে সঙ্কুচিত করেনা, ভালবাসা মনের বিস্তার ঘটায়। তোমার মনের নতুন করে জন্ম নেওয়া ভালবাসায় অতিত মুছে যাবে, অসিম সুন্দব স্বার্থকতায় তোমার জীবন ভরিয়ে তুলবে এ আমার বিশ্বাস।

—তবে তাই হৌক! তুমি শিখিয়ে নাও, আমি যেন তোমার শেখানো সুখের বার্তায় জীবন মধুর করতে পারি।

—আর আমি এই প্রায়-বৃদ্ধ, তোমার যৌবনমদির ভালবাসার সিঞ্চনে যার হৃদয় উর্বর হল, সঞ্চারিত হল নতুন সৃষ্টির পাতা ফুল ও ফলে! আজ এ বৃদ্ধের যা কিছু কীর্তি সে তোমারই দান কিউ।

—মানবদা এই কথায় বলতো—বলতো আমার যা কিছু তা তোমারই।

—সেই মানবদাই তোমার বাঁচার অমৃত।

—অমৃত নয় বসন্ত গরল, মানবদা যা রেখে গেছে সে আজ অমৃত নেই সে গরলে পরিণত যা না পারছি গিলতে না পারছি ওগরাতে, গলায় এসে আটকে আছে—আমি নীলকণ্ঠ। মাঝে মাঝে সে গরল আমার শরীর ও মনকে গ্রাস করে।

—কিউ চলো ফিরে যাই। অনেক বেলা হল। তুমি তোমার সাথে মানবকে নাও, আমি কিউকে।

—না না কক্ষনো নয়। মানবদা নয়, আমি ফিরবো বসন্তকে নিয়ে। বসন্ত তুমি অনেক বড়।

—তবুও তোমার মানবকে ছোট করোনা কিউ, সে নির্দোষ।

পাথর ছেড়ে উঠে পড়েছি। চলতে শুরু করেছি। সূর্য মধ্য আকাশে। উদাস পাহাড় শ্রেণী। যুগ যুগ ধরে মানুষের পর মানুষ আসে তার সুখ দুঃখ, হাসি কান্না নিয়ে, ফিরে যায়-পাহাড় অবিচল। একমাত্র তার সন্তানের ক্ষতি করলে সে সহ্য করতে পারেনা। দগ দগ করে বিষাদের ক্ষত, মাঝে মাঝে ঝরে পড়ে টুকরো টুকরো পাথরখণ্ড। আমার মন চঞ্চল, কিউটির প্রত্যেকটি কথা আমার মস্তিষ্কে ধ্বনিত হচ্ছে। সকলেই যে যার কথায় ব্যস্ত থাকে, যেন, আমার যা বলার আছে; বলে নিই। কিউটিকেও যেন কথায়

পেয়েছিল, কত কথাই না বলে গেল, আমি ও শুনলাম। কিন্তু আমারও তো কোন কথা থাকতে পারে---আমারও তো কথা বলতে ইচ্ছা করতে পারে---কে শোনে, কেই বা বোঝে! সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। এমনকি কিউটিও। সে কিন্তু একবারও বলেনা---বসন্ত তোমার কথা বল, আমি শুনি। শ্রোতার অভাব। নইলে কিউ জানতে পারতো যে, আমি বসন্ত, শিশুর অকালমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে দেশে দেশে ঘুরেছি, নারী পুরুষ, বর্ণ, বয়স নির্বিশেষে নানান ধরনের লোকের সাথে মিশেছি। সেই মেশার মধ্যে অনুভূতি শূন্য বা আবেগ অনুপস্থিত ছিল---একথা বলা যায়না। কিন্তু সে অনুভূতি বা আবেগ কোনকালেই গণ্ডি অতিক্রম করেনি। ব্যতিক্রম কিউ। পরিবেশ, পরিস্থিতি, রিক্ত হৃদয়ে কিউ এর সরস যৌবন অভিসার ভেঙে দিয়েছে আমার সংস্কার, আমার সঙ্কল্প, শূন্যস্থানে কিউ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে রাণীর আসনে। তবুও কিউ কেন যে তার অতিত নিয়ে, তার মনের হাহাকার জানিনা। মাঝে মাঝে নিজেকে ব্যর্থ মনে হয়, তবুও কিউ এর সঙ্গ আমি ছাড়তে পারিনা।

হাঁটছি। এতক্ষণে শরীর বার্তা পাঠিয়েছে---তুমি ক্লান্ত বসন্ত, গত রাত্রে তোমার পূর্ণ বিশ্রাম দাওনি। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। বেশ কষ্ট করেই রেষ্ট হাউসে ফিরলাম, সামান্য মাথাব্যথা করছে---ঘুম সম্পূর্ণ না হলে যেমনটি হয়। এসেই পা ছড়িয়ে ধপ্ করে সোফায় বসলাম। কিউ কিচেনে। ব্যস্ততা। দেরী হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কিউ, সাথে দিগ্। চিকেন এসেছে, দিগ্‌কে দিয়ে আনিয়েছে। ফরমাস মত আদা, পেঁয়াজ রসুন কেটে রেখেছে। গ্যাস জ্বেলে বাইরে এসে কিউ জানতে চায়---চা খাবে কিনা। কারণ খাবার তৈরি হতে এক ঘণ্টা সময় লাগবে। হ্যাঁ, বলি। জল বসিয়ে জামা কাপড় বদলে নেয়। শরীর এলিয়ে বসি, খোলা দরজা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে আরাম লাগছে চোখ বন্ধ করি। দেখতে পাই বালিকা লাবনীকে, মানসদা আর বৌদির সাথে আমাদের ফ্ল্যাটে বেড়াতে এসেছে। গার্ডার আটকানো মাথার পেছন দিকে দুটি ঝুঁটি, ফ্রক পরে ঘরে বারান্দায়, আপন মনে, রোহিত অন্য ঘরে পড়াশুনা করছে, সবে সে লিখতে শিখছে, লাবনীকেও লিখতে হবে, তার পেন্সিল চায়, খাতা চায়, রোহিতের খাতা পেন্সিল নিয়ে টানাটানি। রোহিত দেবেনা, লাবনী নেবে। ঘরে রুচী আছে, মানসদা, বৌদি, আমরা হাসছি, কথা বলছি, মাঝে মাঝে শিশু লাবনীকে নিয়ে বলছি---সেই লাবনী, শৈশব গত, যৌবনের অবস্থান শরীর ও মনে দীর্ঘদিন হয়ে গেল, নেই সে চাপল্য নিরুদ্বেগ খেলা, বদলে পূর্ণ মানবি কিউটি, যার মনের ওপর দিয়ে বিষণ্ণ বাতাস প্রায়শঃই বয়ে যায়। কষ্ট পায়, আমিও ওর দুঃখে দুঃখী হই। চোখ বন্ধ করে সেই অতিত দেখতে পাচ্ছি---কি ছিল লাবনী আজ তার কোন পরিণতি, কি ছিলাম---আমি---আর আজই বা আমার কি পরিণতি---কি পারিবারিক আর ব্যক্তিগত জীবনে। সেদিন রুচী ছিল রোহিত ছিল, মানসদা, বৌদি ও শিশু লাবনী, আজো রুচী আছে, রোহিত আছে---আছে সকলেই তফাৎ একটাই, অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে সকলের জীবনে। সেদিনে যাদের শরীরে ও মনে যৌবন ছিল, যৌবন অস্তমিত বা অস্তমিত প্রায়, কারো শরীরে, কারো মনে, আবার কারোর শরীর এবং মনেও, সেদিনের বালক ও বালিকা, তারা যুবক বা যুবতিই নয় তারা পূর্ণ মানুষ। দ্বিতীয়তঃ সময়ের সাথে একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক বদলে গেছে। আসলে সম্পর্ক সব সময়ই আপেক্ষিক। তবুও মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, তবে কি মানুষের সাথে মানুষের কোন

স্থায়ী সম্পর্ক—রূপে রসে গুণে অনুভূতির স্থায়ী চরিত্র কল্পনা মাত্র না নেহাৎই সমাজের ভয়ে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে সম্পর্কের রূপ বজায় রেখে চলি। নইলে রুচীর সাথে আমার সম্পর্কের এ পরিণতি হবে কেন? আমাকে বিয়ের প্রস্তাব তো রুচীই করে। আমার সেদিনের সে-জীবনের পথ মসৃণ ছিল, বন্ধুর ছিলনা. ব্যস্ততা ছিল, তখন আমি কাজের মধ্যে প্রচণ্ড মগ্ন। একমাত্র স্নেহের উৎস বাবা, স্বর্গত। মা তো শৈশবেই মারা গেছে। বাবা আমার স্বপ্নকে চিরদিনই উৎসাহিত করেছেন। আমি বই, মানুষ, রিপোর্ট, সেমিনার, বক্তৃতা নিয়ে ব্যস্ত। রুচীর প্রস্তাবে, বিয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলাম। আর দেরী নয়, বিয়ে এবং অত্যন্ত সুখের দাম্পত্য জীবন। সেই রুচী আজো আছে, সে স্ত্রী কিন্তু রুচী ধীরে ধীরে দাম্পত্যের চেহারাটা বদলে দিলে, রুচী সামাজিক স্ত্রী, আত্মীক দিক থেকে অস্বাভাবিক বলা যায়না, কিন্তু স্ত্রীধর্ম থেকে বিচ্যুৎ হল। অবস্থাটা বদলে গেল সম্পর্ণ, কিউ এল—আমার জীবনে কিউকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে রুচীর ভূমিকা অনেকটাই। ভাবা যায়? অর্থাৎ রুচী পরিকল্পনা করেই সেদিনের বাস্তব অবস্থাকে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করে কিউটি, পূর্ণযৌবনা কিউটির ওপর ভার সঁপে দিয়েছিল। বুদ্ধিমতি রুচী বুঝতে পেরেছিল যে সে তার স্ত্রী হিসাবে দায়িত্বে পালনে অনিচ্ছুক এবং লাবনী অর্থাৎ কিউকে সে দায়িত্বভার দিয়ে, দায়মুক্ত হয়েছে। অথচ—

সেই লাবনী, ছোট, ছটফটে, ফুটফুটে লাবনী, তখনো কিউটি হয়নি। শিশুর সরল হাসিকে আমরা কিউটি বলতাম। রুচী বলতো ঐ দেখো তোমার কিউটি এসেছে।

—কিউটি এসেছে, রুচী ওকে আদর করত। আমি ওকে কোলে তুলে জড়িয়ে ধরে আদর করতাম, কিউটি, কিউটি বলে চুমু খেতাম। সেই থেকে লাবন্যে ভরা লছমি কন্যা মানসদার আদরের লাবনী আমাদের কাছে পরিচিত হল কিউটি নামে। কি অদ্ভুত কিউএর জীবন কথা। যাকে শৈশবে কোলে নিয়ে আদর করতাম, সে আজ আমার শয্যাবিলাসিনী। অসংযত যৌবনের ফসল, অসামাজিক ভাবে জন্ম দেওয়া বাবা মায়ের অবাঞ্ছিতা, পরিত্যক্তা শিশু লাবনীর জীবন বৃত্তান্ত অভিনব, অবিশ্বাস্য এবং দুঃখের। একই পরিবেশে, এক অবস্থানে জন্মগ্রহণ করলেও প্রত্যেকের জীবন কাহিনী এক নয়—ভিন্ন ভিন্ন, বৈচিত্রে ভরা। হয়তো এখানেই সৃষ্টির রহস্য। ভাবিনি কোনকালে। ইদানীং মনে হয়। আশ্চর্য্য হয়ে যাই। শিশুর জন্ম রহস্য, শিশুর করুণ জীবন বেদ নিয়ে চর্চা করতে করতে সময় পার হয়ে গেছে। অবসর পাইনি বা ইচ্ছা হয়নি জীবনের রহস্য নিয়ে চিন্তা করার। গত পরশু থেকে কিউটির প্রতিটি আচরণের প্রভাব আমার চিন্তার জগতে জীবনের রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন সৃষ্টি করছে। সে কারণে রুচী, কিউ, মানসদা মানব—সকলের কথাই টুকরো টুকরো ভাবে ভেসে আসছে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে। জীবনের গভীর রহস্যে আমি বড় অচেনা।

—তোমার চা বসন্ত।

—চোখ খুলি। সামনে চায়ের কাপ হাতে কিউ।

—কিছু ভাবছো না ঘুম পাচ্ছে? বসব তোমার পাশে।

আমি চোখ খুলে কিউকে দেখি। প্রশান্ত, স্নিগ্ধ মাতৃমূর্তি চেহারা, বিস্ময়। সহস্র প্রশ্নে ছিন্ন ভিন্ন আকুলতা উধাও চেহারা থেকে। স্নেহময়ী, সন্তান বাৎসল্য, না পতিব্রতা, স্বাধ্বী ভারতীয় নারী। সেই অনন্তকাল ধরে উত্তপ্ত পুরুষ হৃদয়ে শান্তির বারী সিঞ্চন করে মুগ্ধ

করেছে, শান্তির পরশ বুলিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে, অনুর্বর পুরুষ হৃদয়ে সৃষ্টি করেছে মানবতা পুষ্ট সুন্দর সরোবর। কিউ এর মুখে হাসি নেই, হাসি আছে চোখে প্রশান্তির, স্বান্ত্বনার। হাসছে ওর সুন্দর অধর, হাসছে মসৃণ কেশোদাম। সে হাসিতে উত্তাপ নেই, আছে শীতলতা, মনের চিন্তা জাল ছিন্ন ভিন্ন করে বসন্তের মনে উদয় হল সেই উত্তাপ, সে উত্তাপে শ্রষ্টা মুখর হয় আপন সৃষ্টিতে।

—বসন্ত, তুমি সুন্দর। পৃথিবীর সব থেকে সুন্দরতম ব্যক্তি তুমি আমার কাছে, এই পাহাড় বন পরিবেশ তোমার সৌন্দর্য্যের কাছে সব কিছু ম্লান হয়ে যায়।

—না কিউ নয়। তুমি রসিকতা করছো।

কোন উত্তর না দিয়ে গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে "তুমি সুন্দর হে সুন্দর....।" প্রাণ ঢেলে কিউ গানটি গায়। আমার সুর বোধ ভালো নয়। তবুও কিউ এর আন্তরিকতায়, গান আমি মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। মনে হল কিউ ইচ্ছা করলে গান শিখতে পারে বা সংগীত চর্চাও করতে পারে। গান গেয়ে বেশ আনন্দে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

—বুঝেছি, তোমার মন ভাল আছে। এই পাহাড়ে অবসর বিনোদনে শুধু আমার নয়, তোমরাও যথেষ্ট উপকার হয়েছে। কলকাতায় বদ্ধ মন এই পাহাড়ে এসে মুক্তি পেয়েছে। তোমার মুক্তির আনন্দে আমি ভেসে চলেছি এক অজানা জগতে।

—বসন্ত তোমার পথই যদি অজানা হয়। আমার—

—সে কথাই তো মাঝে মাঝে ভাবি। আমার পথ জানা হৌক বা অজনা হৌক, তার প্রান্ত নিকট প্রায়। কিন্তু তোমার পথ দীর্ঘ। সেই দীর্ঘ পথে কুসুম বিছানো না থাকতে পারে, কিন্তু সে পথকে সুন্দর করে তোলার জন্য সেই ব্যক্তির ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। তোমার পথ তোমাকে বাছতে হবে, তাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব তোমার। আমি যতদিন আছি, তোমার পাশে আছি, সব ঠিক আছে, তবু একা—

—একাই ভাল। আর, পথের ভাবনা আমি ভাবিনা, আমার কোনো পথ নেই।

—পথ আছে, পথ ছাড়া জীবন চলতোনা, কিন্তু কোন পথ ধরে তুমি এগোবে, সেটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার—

—আচ্ছা, বসন্ত, পথের ঝামেলা এড়িয়ে, পাহাড়ে থাকলে কেমন হয়?

—ভাল হয়। কিন্তু সেটা তো হবেনা। আবার কিছুদিন থাকলে, পাহাড়ও পুরানো হয়ে যাবে।

—যাই, রান্না শেষ করি।

কিউ কিচেনে। অতিতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ওকে সংসার বিমুখ করে তুলেছে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে। সে কারণে নতুন কোন কিছু ভাবতে সে চায়না। ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত সে। যেখানে আছে, সেখানেই সে নিরাপদ মনে করে এবং অতিত হতে আপাতত বর্তমানে কিউ আস্বস্ত এবং সুখী। আমি ব্যালকুনিতে যাই। চা খেয়ে, কিউ এর গান শুনে ঘুম ভেঙে গেছে। ক্লান্তি প্রশমিত। রেলিং ভর রেখে সিগ্রেট জ্বালাই।

বয়সের সাথে শরীর ক্রমোন্নতি এবং ক্রমঅবনতি হয়। কিন্তু মনের অবনতি শরীরের সাথে তাল মিলিয়ে ঘটেনা। যৌবন অবসানে শরীরের অবনতি শুরু হয় এবং চলতে থাকে যতক্ষণ না শরীরের মৃত্যু ঘটে। যদিও ব্যতিক্রম, শরীর ও মন, দুটিতেই আছে, তবে তা স্বাভাবিক নয়। এই পাহাড়ে শরীর বিশ্রাম পেয়েছে, পাচ্ছে। মন অর্থাৎ যে

কাজে সক্রীয় ছিল, তারও বিরতিতে বিশ্রাম হয়েছে অবশ্যই। একই কাজের পুনরাবৃত্তি ক্লান্তি এনে দিয়েছিল। এখানে এসে সে কাজে মনোনিবেশ না করার কারণে নিশ্চয় অনেকটাই ভারমুক্ত। তবে কি মন চুপ করে বসে আছে? মোটেই না। বরং অতিতের ঘটনাগুলো এক এক করে হাজির হচ্ছে, যে কথা বার বার বলে আমি আপনাদের ক্লান্ত করছি। তবুও বলছি, এ আমার আত্মকথন, আত্মকথনে পুনরাবৃত্তি হয়। যেমন মনে হচ্ছে, এই যে কিউ, প্রকৃত নাম লাবনী, যাকে মানসদা ও বৌদি নিজেদের মনের মত বড় করেছে, যদি তা না করে, কোন অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিত, তবে তো আজকের এই কিউ হয়ে উঠত না। কত শিশুই তো ঐভাবে বেড়ে ওঠে। অনাথ আশ্রম তবুও তো একটা নিরাপদ আশ্রয়, এমন অনেক শিশুই আছে, যারা কিউ এর মত অপরিচিতের গ্লানী নিয়ে জন্মায় এবং অত্যন্ত কষ্টে পথে ঘাটে, লাইনের ধারে বড় হয়, তাদের একজন হয়েও লাবনী বড় হতে পারত। তা না হয়ে মানসদা কেনই বা লাবনীকে নিজের করে মানুষ করল, লেখাপড়া শেখালো? তবে কি মানসদার মনে সেদিনের শিশুর দুর্ভাগ্যের কারণ হিসাবে নিজেকে দায়ি মনে হতো? না কি শুধু মায়া বা স্নেহ শিশুটির প্রতি, না লছমির সন্তানের প্রতি—জানিনা। তবে মনে হয় একমাত্র মানবিকতা বা মমত্ববোধ থেকেই মানসদা এবং বৌদি সেদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বা শিশুটিকে প্রাথমিক ভাবে রক্ষা করার সাথে তাদের মনে শিশুটির প্রতি স্নেহের উদয় হয়েছিল। ওরা পূর্ণ সন্তান স্নেহে লাবনীকে মানুষ করেছে। হায়রে পৃথিবীর বাবা মায়েরা যদি সমস্ত অনাথ শিশুদের এমনি স্নেহপ্রবণ হতো, তবে কেমন হত! তা হয়নি এবং হবেনা। নইলে পৃথিবীতে আজো অস্ত্রের বর্ষণ কেন? আর অস্ত্র বর্ষনে হাজারো হাজারো শিশু অনাথই বা হবে কেন! মানসদা আর শ্রাবনী বৌদি লাবনীকে প্রচণ্ড ভালবাসতো, আজো নিশ্চয় ভালবাসে। ভালবাসার মৃত্যু নেই। মানসদার সাথে আমি সম্পর্ক রাখতে চাই। মাঝে মাঝে লাবনীর কথা বলতাম, ওদের আগ্রহ দেখিনা। অনাগ্রহের কারণ কি লাবনীর ওপর রাগ না অভিমান না লাবনী জনিত পারিবারিক বিশৃঙ্খলা? বাবা ও মায়ের সিদ্ধান্তে তাদের সন্তান ক্ষুব্ধ, মর্মাহত। বলতে গেলে বাবা মায়ের সাথে মানব এক প্রকার সম্পর্ক ছেদ করেছে। চাকরীস্থল থেকে বাড়ি আসেনা। এর জন্য মানসদা নিজেকে দোষী মনে করে নিশ্চয়। লাবনীকে ত্যাগ করে যে মুক্তি ওরা চেয়েছিল, সে মুক্তি মেলেনি বরং সে সিদ্ধান্ত একটি পরিবারে সকলের দুঃখ ডেকে এনেছে।

সংসার যুদ্ধে পরাজিত মানসদা। পরিশ্রান্ত মধ্যবিত্ত একজন মানুষ। যার কথা মনে এলে আমার কষ্ট হয়। মানসদাকে আমি কম ভাল বাসতাম না। লাবনী যদি মানসদার পুত্র বধু হতো, কি এমন ক্ষতি হতো? কি এমন মান সম্মান, যার হানি হতো? মানসম্মানের মূল্য কি মানসিক সুখের চেয়ে বড়? কোন সে কল্পিত সমাজ যারা মানসদাদের শাস্তি দিত! কিসের ভয় মানসদা পিছিয়ে গেল—সমাজের না লাবনীর জন্ম পরিচয়ে? নাকি লাবনীকে মেয়ের মত ভালবেসে, তাকেই আবার পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করতে মন চাইছিলনা?—সে কারণেই কি লাবণীকে পরিত্যাগ করলো? যদি ত্যাগ না করে কোন সৎপাত্রের সাথে লাবনীর বিয়ে দিতো?—না কি; লাবনী অন্য কারো সাথে বিয়ে করতে অসম্মত ছিল?—জানিনা। এখনো লাবনীর বিয়ে হতে পারে। লাবনীর বিয়ের চেষ্টা আমার করা উচিৎ। কিন্তু লাবনী বিয়ে করবেনা—জিদ্ করে বসে আছে। জোরাজুরি করিনি। ওর বিয়ে দেবার আমার প্রয়াস নেই বললেই চলে। হালকা ভাবে

কিউকে বিয়ে করার কথা জিজ্ঞাসা করেছি দু একবার। তার মধ্যে বিশেষ আন্তরিকতা ছিলনা। আমি কোনদিনই লাবনীকে হারাতে চাইনি। আজো লাবনীকে ত্যাগ করতে পারবো না। রুচী পারতো, রুচী পারতো লাবনীকে আমার জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। সুস্থ্য পারিবারিক সম্পর্ক রুচীর কাছ থেকে এরকমই আচরণ আশা করে। কিন্তু রুচী সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ভাবে, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে কিউকে আমার জীবনে যোগ করে দিলে। আজ যদি আমি রুচী কে ত্যাগ করি রুচী কি মেনে নেবে? বুদ্ধিমতি মহিলা রুচী। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে নিজেকে ধীরে ধীরে আমার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে কেন? কি কারণে? এরজন্য কি আমি দায়ী? কিউ দায়ী? কে দায়ী? সর্বশান্ত, হতাশাগ্রস্ত, জীবন থেকে নির্বাসিত একজন নারী কিউ—মানবিকতা এবং স্নেহের আকর্ষনে কিউ আমাদের আশ্রিতা।

কিউ এ বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে রুচী ও আমার সম্মতিতে। এক কঠিন, অত্যন্ত কঠোর সিদ্ধান্তের ফলে নির্বাসিতা, নির্দোষ কিউ। ওকে শরীর ও মন দিয়ে শুশ্রুষা করে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবে রুচীর ও আমার। রুচীও সে দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয়নি। রুচীর অপেক্ষা আমার প্রতি কিউ এর আকর্ষণ অধিক ছিল। কিউ সুন্দরী, যুবতি, আমি পৌঢ়, আমার প্রতি তার আসক্তি এবং আমার তার প্রতি আকর্ষণ নতুন মাত্রা পায়। আমরা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। রুচীর শান্ত আচরণ, স্ত্রীর দায়িত্ব পালনে অপরাগ, তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমি কিউটিতে আসক্ত হই। কিউ এর মনের ও শরীরের সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হই, আবিষ্ট হই। সে কিউকে আমি ত্যাগ করতে পারি! আমি কোনভাবেই কিউ হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারেবো না। কিউ এর উষ্ণ আচরণে আমি আপ্লুত, আমি উষ্ণ, আমার জীবন ফিরে পেয়েছে সজীবতা। কিউ আমার। অন্য কারোর অধিকার কিউ এর ওপর নয়। কখনোও নয়।

না, আর ভাববোনা। বেড়াতে বেরিয়ে যদি নিজেকে নিয়ে ডুবে থাকি, তবে বেড়ানোর আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। বরং সামনের আকাশে টুকরো টুকরো মেঘসকল জমতে শুরু করেছে, দেখি। দেখি সূর্যের মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারা। ঐ সূর্যই তো তার উষ্ণতা দিয়ে পুঞ্জিভূত বাষ্প থেকে মেঘ সৃষ্টি করে, তাদের সাথে খেলা করে, আবার উষ্ণতার হেরফের ঘটিয়ে সেই মেঘ দিয়ে বারি সিঞ্চন করে পৃথিবী সাজায় সবুজ আবরণে, ফুল হয় ফল হয়। অনাদি অনন্ত কাল ধরে প্রকৃতির এ খেলা। এ খেলা এ জীবনে। প্রণয়ে সিক্ত আমি পেয়েছি সৃষ্টির উৎসাহ, আর আমার ভালবাসায় কিউ পেয়েছে বাঁচবার উৎসাহ। সেই কিউ ও আমি একে অপরকে ত্যাগ করি কি প্রকারে! শয়নে স্বপনে জীবনে মরনে কিউ আমার।

—কিছু বলছো বসন্ত?

—নাতো। আমি কিছু বলিনি। আমি কি তোমায় কিছু বলেছি? ডেকেছি তোমায়?

কিউ এর মুখে সেই হাসি—যার সঙ্গা প্রণয় ও নিবেদন।

—তুমি ডাকোনি। আমি ডাকছি। যাবে চলো।

—চলো।

হাত ধরে কিউ আকর্ষণ করে। যদিও সে আকর্ষণে কিউ কোন শক্তি প্রয়োগ করেনি। স্পর্শ করেছে মাত্র। তবুও মনে হচ্ছে, আমি শক্তিহীন, চলার শক্তি আমার রহিত, কিউ আমার একমাত্র শক্তি আমার জীবনরেখা। আমার মানসিক, দৈহিক শক্তি কিউ এর কাছ

থেকে অর্জন করেছি। কিউ ব্যতিত আমি চলৎশক্তিহীন—শরীর ও মন অকেজো। এ আমার নিজস্ব অনুভূতি, অত্যুক্তি করছিনা। কিউ এর অকৃত্রিম প্রণয় আমার জীবনীশক্তি বা বেঁচে থাকার ওষুধি। টেবিলে বসি দুজনে, গরম গরম সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করি।

কিউ নিজের খাটে। পরিশ্রান্ত, নীদ্রাহীন গত রাত্রি কেটেছে। বারান্দায় দিগ্ চেয়ার দেয়। বসি আরাম করে। পায় ইষৎ উষ্ণ রোদ্র, আরাম লাগছে। সিগ্রেট ধরালাম। দিগ্ থালাবাসন গুছিয়ে ওর খাবার গুছিয়ে নিয়ে নিচে চলে গেল। স্কুল থেকে ছেলে ফেরার সময় হয়েছে। দুজনে—বাপবেটায় তৃপ্তি করে খাবে। দূরে রাস্তার উচ্চতায় এক চিলতে ছাদে এক বৃদ্ধা রোজ বসে বসে কাজ করে, যেমন এখন সরসে ঝাড়াই করছে। ঘরের আশে পাশে, বা ফলের বাগানে অবহেলায় দু-একটা গাছে সরসে পেকেছে, ছাদে শুকিয়ে, বাছাই করছে। বিকালে রাস্তার কলে জল এলে মাথায় করে জল নিয়ে যাবে, ভর্তি করবে বালতি ডেকচি, ড্রাম ইত্যাদি। আলস্য এদের জীবনে নিষিদ্ধ। বিশেষ করে পাহাড়ি রমণীদের—ছেলে, বুড়ো, নাতি নাতনি, সকলের দায়িত্ব, প্রতিটি পরিবারে মহিলাকূলের। সংসার ধরে রাখে নারী, অথচ সেই মহিলারাই পরিবারের সবথেকে বেশি শোষিত। দান সামগ্রি পণ ছাড়া এখনো মেয়ের বিয়ে হয়না। এবং মেয়ের বিয়ে না দিতে পারলে কোন বাবা মা শান্তিতে থাকে!

সেই নারীদের এ হেন দুরবস্থা, সৃষ্টির উৎস, উৎস মূলেই যদি ফাঁকি থাকে, সে সমাজের উন্নতি পিছিয়ে থাকে। কাজ থেকে সাময়িক অবসর নিয়ে পালিয়ে এই কুমায়ুনে এসে কাজেরও বিরতি হলো। বিরতি নিতেই হবে, আর সত্যই পারছিনা। যেটুকু হয়েছে কিউ এর প্রচেষ্টায়, নইলে আমার লেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বছর পনেরো যোলো বছর আগে। শেষ বইটা অক্সফোর্ড পাবলিশ করছে।

কিউ জিদ করছে, আমার ছড়ানো ছিটানো, বিভিন্ন সময়ে বিদেশের জার্নালে ছাপানো লেখাগুলো থেকে সিলেক্টেড সেট বের করবে। ওর ইচ্ছা, নইলে ঐ মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ লেখাগুলো হারিয়ে যাবে। প্রস্তাব মন্দ নয়, তবে খুব কঠিন কাজ। যা পারে করুক, যা করবে, সবই ওর, সমস্ত বইয়ের কপিরাইট কিউএর নামে থাকবে।

এই অবসরে, বিশ্রামের সাথে আমার অন্য একটা লাভ হয়েছে। আমি আমার অতিতকে মূল্যায়ন করছি। দরকার, প্রতিটি মানুষের মাঝে মাঝে, না হলেও অন্তত: একটা সময়ে আত্মসমালোচনা বা আত্মউন্মীলন করা প্রয়োজন। এই পাহাড়ে, নিতান্ত অবসর আমার মন মনের গহনে ডুব মেরে আমাকে দেখে নিচ্ছে।

রুচী সবদিক দিয়ে অদ্ভুত মহিলা। আমার লেখার জগৎ থেকে যা প্রাপ্তি, সাম্মানিক হোক বা আর্থিক, কোন কিছুর ওপর তার আকর্ষণ নেই। অনেকে আছে, ছেলে মেয়ে বা স্বামীর গর্বে সে গর্বিতা, যেখানে যখন সুযোগ পায় বলে বা বর্ণনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। রুচীর এ সব স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। আমার অর্থের রুচীর প্রয়োজন নেই, বললে বলে, আমার টাকা কি হবে? স্বভাবতঃই আমার যা কিছু আর্থিক সঞ্চয় আমি কিউ এর নামে করে রেখেছি। বই এর স্বত্বও। অবশ্য বিগত পনের বছরের সব লেখার কৃতিত্ব কিউটির প্রাপ্য এবং স্বত্বও।

রুচীর চরিত্রে অনুভূতির প্রকাশ নেই বললেই চলে। স্থীতধী। বিয়ের পর মাত্র দুটি বড়জোর তিনটি বছর রুচীর চরিত্রে সাময়িক চাপল্য বা উল্লাস বা হাস্যমুখরতা দেখেছি। অধ্যাপিকার গাম্ভীর্য্য রুচীর ছিল যথার্থ—কি বাইরে অর্থাৎ কলেজে কি সংসারে এমনকি

রোহিতের সাথেও সে কম কথা বলে। রোহিতও কম কথা বলে। স্বামী বিদেশে যাবার আগে যে ব্যাকুলতা বা ফেরার পর যে সুখানুভূতি স্ত্রীর মধ্যে থাকে— আমি আমার জীবনে রুচীর কাছে থেকে তার আচরণের মধ্যে থেকে সে অভিব্যক্তি লক্ষ করিনি। জানিনা কেন? এ ঠিক স্বাভাবিক নয়। তবে কি রুচী নিজেই নিজের আবরণের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে এতকাল ধরে? তার কারণ কি? অথচ বিয়ের আগে রুচীকে এমন শীতল মনে হতনা। যদিও আমি এতকাল এসব বিচার বা ব্যাখ্যা করিনি। বিয়ের পরও তো রুচী কত সহজ ছিল, অনুভূতি ছিল প্রখর, শরীরের যৌবন কথায় বার্তায় আচরণে প্রকাশ উচ্ছলতায়। আনন্দ শিহরণে। আমিও মন ভরে সে আনন্দ পান করেছি পরম তৃপ্তিতে। কিউটি আসেনি। আমাদের মধ্যে রোহিত এসেছে। ধীরে ধীরে রুচীর আচরণে পরিবর্তন এল। রুচী রোহিতে নিমগ্ন হল দারুণ ভাবে। বাইরে কলেজ, ঘরে রোহিত। এ সংসারে রুচীর কাছে তৃতীয় কারোর, কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমি ডুব দিলাম কাজের জগতে। দেশে দেশে ঘুরলাম, তথ্য সংগ্রহ করলাম, লিখলাম, বিভিন্ন আলোচনা সভায় যোগ দিলাম। সবার শেষে বাড়ি ফিরে রুচীর শান্ত আচরণ আমার মনে হাহাকার সৃষ্টি করতো। বাড়িতে কাজ করতে ইচ্ছা করতোনা, রুচীর আচরণ কথা বার্তায় আমার কাজের উৎসাহ হারিয়ে যেতো। ভাবলাম, আমি কাজ ছাড়তে পারবোনা। কাজ ছাড়লে থাকবো কি করে। আলাদা ছোট ফ্ল্যাট কিনে আমার লাইব্রেরি, কম্পিউটার, আমার কাজের স্থান পরিবর্তন করলাম। কিন্তু হৃদয়ে তখন খরা চলছে, হৃদয়ের সবুজ বৃত্তি শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি আমার কাজ হারালাম। শুষ্ক হৃদয়ে কখনো সবুজ ফসল ফলেনা, সৃষ্টি বন্ধ্যা হল আচম্বিতে, মাত্র দুটো বই বেরিয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিদগ্ধ মহলে পরিচিতি হয়েছে। মন আরো কিছু দেবার জন্য ব্যাকুল—কিন্তু দেবার শক্তি হারিয়ে গেল। বার বার রুচীর কাছে আবেদন করলাম, রুচীকে বোঝালাম, রুচী নিস্পন্দ। নিজের বাড়িতে আমি যেন একটা প্রাণী মাত্র। সংসার চলছে ঠিক নিয়ম বেঁধে। পৃথিবীর কারোর জানার ক্ষমতা নেই যে আমরা স্বামী স্ত্রী একই ঘরে দুটি মেরুতে অবস্থান করছি। রুচীর দিক থেকে কোন অভিযোগ নেই। কেন আমি সংসারের কোন কাজে থাকিনা, কেন রুচীকে দেখিনা, কেন রোহিতের প্রতি আমার স্নেহপ্রবণতা নেই—কোনদিন কোনো অভিযোগ করেনি সে। এই অভিযোগ না করা, শীতলতম আমার প্রতি ব্যবহারে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেতাম। হৃদয়ে কান্নার বন্যা বয়ে যেতো। বিশেষ করে বিদেশ থেকে ফিরে রুচীকে কাছে না পেলে আমার কষ্টের কথা বলে বোঝাতে পারবোনা। মনে হতো, পড়াশুনো, সমাজের জন্য এই কাজ অর্থহীন। কি হবে কাজ করে! হতাশা, চরম হতাশায় আমি ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিলাম।

মানসদা, শ্রাবনী বৌদি মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতো। আগের মত গল্প করতাম। মানদা মাসি জলযোগের ব্যবস্থা করতেন, শ্রাবনী বৌদি রোহিতকে আদর করতেন। তখনো মালবিকা হয়নি। লাবনী আর আসেনা, সে স্কুলের পড়া নিয়ে ব্যস্ত। সংসার আমাদের সুন্দর চলছে। আমি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাচ্ছি, হারাচ্ছি নিজের সংসার। সংসারে দেনা পাওনার ঘর শূন্য থেকে যাচ্ছে। সংসারে হারিয়ে যা পেলাম, তাতে আমার মন ভরলো না। অতৃপ্ত মনে অর্থহীন হল সবকিছু। রুচী আমাকে হারালেও

রোহিতকে পেল। রুচীর অবলম্বন, আপন গর্ভের সন্তান রোহিত। তার স্বপ্ন, তার কামনা, তার চোখের মনি। আমি রোহিতের বাবা, জন্মদাতা মাত্র, অন্য কোনো কৃতিত্ব নেই। অধিকার নেই। এ সংসারে আমি বড়ই অপাংক্তেয়, অসহায়। ওরা সুখে থাক। আমি ডুবে যেতে থাকি ধীরে ধীরে, আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত, যদি কোনদিন শক্তি ফিরে পাই। বেশি বেশি করে দেশে দেশে ঘুরতে লাগলাম—এশিয়া আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ! বিক্ষিপ্ত মন।

নবম অধ্যায়

আমরা প্রায়শঃই একটা কথা বলি—মানুষের আন্তরিকতা বলে কিছু নেই, নগরায়নের সাথে সাথে মানুষ আত্মীয়তা, আন্তরিকতা এই গুনগুলো হারাচ্ছে। একই কমপ্লেক্সে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বছরের পর বছর বাস করে একজন প্রতিবেশি, তার পাশের প্রতিবেশিকে চেনেন না। গ্রামাঞ্চলে এখনো এ অবস্থাটি হয়নি। এখনো প্রতিবেশির সুখে দুঃখে অপর প্রতিবেশিরা এগিয়ে আসে। শহরে এগিয়ে আসা তো দূরের কথা নাম পর্যন্ত জানি না। বাইরের কোন লোক খোঁজ খবর করলে বলতে পারিনা। লজ্জার কথা। অথচ কুমায়ুন এই গ্রামে মানুষের আন্তরিকতা বা রীতিনীতির একটা ঘটনা বলছি। পাহাড়ি এক যুবকের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল আমাদের। এক সন্ধ্যায় যুবকটির সাথে আলাপ পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর প্রাক্কালে। আলাপ থেকে এক কথায় আত্মীয়তা ঐ পরিবারের সকল সদস্যের সাথে—তার মা, দাদা, বৌদি, তার, ভাই—ছেলে-মেয়ে সকলের সাথে। সকলেই জানে বাঙালীর প্রিয়খাদ্য মছ্‌লি। মছলি এই পাহাড়ে দুষ্প্রাপ্য। সেদিন সন্ধ্যায় মাছ খাওয়াবে। ঐ বাড়ির মেজো ছেলে আমাদের জন্য কোন তালাও থেকে মছ্‌লি সংগ্রহ করে এনেছে। এনে ঘরে নয়, বাইরে কোথাও তোলা উনুনে কাঠ জ্বালিয়ে মছ্‌লি পাকিয়েছে। সন্ধ্যার কিছু পর সেই যুবকটি, যার নাম মদন, মদন সিং বিস্‌ট্ টর্চ-জ্বালিয়ে আমাদের দুজনকে পাকদণ্ডি দিয়ে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। লজের অত্যন্ত নিকটে ওদের বাড়ি। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও যত্নের সাথে আমাদের বসালো। ছোট ঘর। উচ্চতা কম, ছোট জানালা একটা এবং দরজা, কাঠের সস্তা চেয়ার, কাঁচ দিয়ে ঢাকা নিচু টেবিল, ঘরের টিম্‌টিমে বিজলি বাতি। সকলেরই লক্ষ্য যেন আতিথেয়তার কোন ক্রটি না হয়। বৃদ্ধা মা, দাদা বৌদি, মদনের বৌ-বাচ্চাদের সকলের নমস্তে এবং হাসি মুখে নানান্ কথায়, গল্পে আলাপ। কিউ ও আমি বাচ্চাদের কাছে গিয়ে আদর করছি। কিউ এর কোলঘেসে দাড়িয়ে আছে মদনের বেটি কবু (কবোষ্ণা)। ওকে দেখে আমার ছোটবেলাকার কিউ এর কথা মনে পড়ে যায়। কিউ অনেকটা এরকমই ছিল। তবে যত্নে-আত্তিতে কিউ ছিল আরো সুন্দর।

এরপর খাবার পালা। সেই ছোট টেবিলটা ঘিরে বসলাম আমরা তিনজন, কিউ আমি আর মদনসিং। ভাত, রোটি আর মাছের কারী। আমি তো অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় পেলে তুমি। মাছ সংগ্রহ করার গল্প শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। ওরা মাছ খায়না, ওদের বাড়ীতে মাছ রান্না হয়না, অথচ আমাদের খাওয়াবে বলে তাদের আন্তরিকতা, আর প্রয়াস—কোথায় পাবো এমনটি! আমি ওকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো—ভাষা খুঁজে পেলামনা। অন্য সবজির মত করে মাছ রান্না করা হয়েছে। বাঙালিদের মাছ রান্না করার পদ্ধতি, মশলা ব্যবহার, ওরা জানবে কি করে? তবুও যদি

মাছ খাওয়ার চল থাকতো? পাহাড়ে মাছ পাবেই বা কোথায়?—তবুও মাছ বলে কথা—মাছের আঁসটে গন্ধ, প্রায় না ভেজে ঝোল বানিয়ে রাখা হয়েছে—খাওয়া যায়? নিন্দা করার জন্য বলছিনা, বমি হয়ে যাবার জোগাড়, তবুও খাওয়ার অযোগ্য হলেও খেলাম, সমস্ত কষ্টকে উপেক্ষা করে। অত্যন্ত যত্ন করে, পাছে ওরা বুঝতে পারে, ওদের আতিথেয়তার অপমান হয়ে যায়। সেদিনের সে মাছ খাওয়া মদন সিংয়ের বাড়িতে, তার অভিজ্ঞতা অনির্বচনিয়। মদনও খেল অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে। খাবার পর হাতে জল ঢেলে দেওয়া, সাবান তোয়ালে এগিয়ে দেওয়া—এর কোন মূল্যায়ন করা যায়? যায়না,। পুনরায় টর্চ জ্বালিয়ে আমাদের লজে পৌঁছে দেওয়া। কে এই মদন সিং? কি সম্পর্ক আমাদের সাথে? দেশে ফেরার সময় হয়ে এল। এত সময় কোথায় যে মদন সিংকে মনে রাখবো? আসলে জীবনে কোথায় কখন কি পাওয়া তা কি বলা যায়। কিউ লজে ফিরে গরম জলে সাবান দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে, ব্রাশ করে শান্তি পেল। তার চোখে মুখে হাসি।

—কি সহজ এবং সুন্দর এরা।

—আমি কোনদিন এদের ভুলবোনা। কবু কি সুন্দর বলো, লাল চেহারা, তুলতুলে নরম, ওকে ছাড়তে ইচ্ছা করছিলনা।

—মদনের মা?

—সত্যিকারের মায়ের মত।

—মা সত্যই।

ব্যালকুনিতে বসলাম। রাত বেশি হয়নি। কিউ রাতের পোষাকে। মিটমিট করে আলো জ্বলছে ঘরে। সে আলো ব্যালকুনিতে পৌঁছায়নি। আকাশে প্রায় পূর্ণ চাঁদ। নির্মল মেঘমুক্ত আকাশ। এ বাংলা দেশের আকাশ নয়, যখন তখন মেঘের কিম্বা কুয়াশায় অবগুণ্ঠনের নিচে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। এখানে মেঘ আসে, বৃষ্টি হয়, নইলে আঁধার নামলেই হারিয়ে যায়, পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয় সকালের উত্তাপের জন্য, গলে জল হয় এই পৃথিবীর জীবজগতের জন্য। কি অপূর্ব সমন্বয়, চক্রাকারে আবর্তন। চাঁদের আলোয় আলোকিত বনাঞ্চলে সমৃদ্ধ কুমায়ন কোথাও ঘন ছায়া, আলো আর আঁধার—প্রকৃতি সাজে নিজের খেয়ালে। আমরা ভুল করে দেখলে, এই প্রকৃতিই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

মনে আলো ছায়ার খেলা। পাশে বসেছে কিউ। চাঁদের মত স্নিগ্ধ স্পর্শ ওর ভালবাসায়, আমি অনুভব করি। মাঝে মধ্যে চাঁদের পাশে ওকে স্থাপন করি, তুলনা করি। এই পৃথিবীতে কত কি সুখ ছড়ানো, আমরা খুঁজে নিতে পারিনা। জীবনের গোলক ধাঁধায় সুখ পরশ পাথর হয়ে যায়।

গত কয়েকদিন হল হায়দ্রাবাদ থেকে ফোন পাইনি। রুচী এখনো তার স্বামীর নিয়ত খোঁজ খবর নেয়; শরীর-স্বাস্থ্য, সুবিধা অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করে। যান্ত্রিক হলেও দায়বদ্ধতা, সম্পর্কে সুতোয় বেঁধে রেখেছে। ছেড়েনি আজো। অন্ততঃ তার জন্য রুচীকে ধন্যবাদ, আমি অস্বীকার করিনা, আমি কৃতজ্ঞ। সম্পর্ক জিনিষটা এমনি, ছিন্ন হলেও মন গ্রন্থিবদ্ধ করে রাখে। মনে হচ্ছে, একবার ওদের ফোন করা উচিৎ হয় রুচী নয় রোহিত। যখনই বাইরে গেছি, বিয়ের পর যৌবনের সেই প্রথম দিনগুলোতে, রুচী কিম্বা আমি অন্ততঃ দিনে একবার কথা বলতামই, হয় রুচী নয় আমি ডায়াল করতাম। সেদিনের ফোনে ফোনে সেই কথাগুলোর কিছু কথা এখনো মনে পড়ে। মন সুখের হাসি হাসে,

আবার নেমে আসে বিষাদ। আজ আর সেই তাগিদ নেই, নেই সে সুখের আলাপন, তবুও অভ্যাস—

—ফেরার সময় হয়ে এল।

—ফিরতে তো হবেই।

—এখানে থাকার সময়টা বাড়ানো যায়না? এত তাড়াতাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছেনা।

—লজ খালি করতে হবে। হয়তো অন্য কেউ বুক করে রেখেছে। এর ওপর কয়েকটা কমিট্‌মেন্ট রয়ে গেছে। না ফিরলে, লেখাগুলো পাঠাবো কি করে? তারা এতদিনে মেলের পর মেল করে, হতাশ হয়ে পড়েছে হয়তো।

—হ্যাঁ। যেতে তো হবেই। তোমার সেই পুরানো লেখাগুলোর কালেক্‌শান প্রায় হয়ে গেছে। ফিরে, মাসখানেক খাটলে, প্রেসে দেবার মত হয়ে যাবে। ফিরে যাই, সময় মত পরে প্রোগ্রাম করা যাবে।

ফোন বাজল। রোহিত ফোন করেছে। মায়ের নির্দেশে আমার খবর নিল। সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা, তবুও তৃপ্তি।

বেশ কাটল কয়েকটা দিন। এক মাসে অভিনব অভিজ্ঞতা হল। লেখার তাগিদ ছিলনা, মনোরম পরিবেশ, আরামপ্রদ আবহাওয়া, পূর্ণ বিশ্রাম, পাহাড়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানো, সৌন্দর্য্য প্রাণভরে উপভোগ করেছি। আমার পাশে বসে আছে কিউ, পেয়েছে জীবনে মুক্তির স্বাদ। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বদ্ধ জীবন কিউকে যন্ত্রবৎ করে তুলেছিল, প্রায় মৃতবৎ জীবনে অভ্যস্ত কিউ বাঁচার অর্থ খুঁজে ব্যর্থ ছিল। কুমায়ুন কিউএর মনের বদ্ধ দরজা উন্মুক্ত করেছে, সেখানে শীতল উষ্ণ মধুর বাতাস বসন্তের আগমন বার্তা ঘোষণা করেছে। সে আজ অনেক সহজ, স্বাভাবিক, মনের বার্দ্ধক্য উধাও, যৌবনের বিকাশ সেখানে।

আমি এ অবসরে বাইরের সব কিছু ভুলে নিজেকে সন্ধান করেছি। এ রকমই হয়ে থাকে— যখন কোন দায়বদ্ধতা থাকেনা, কোন কাজের জন্য জীবনের কোন নির্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত থাকেনা, যখন অপরের, আত্মীয়স্বজনের জন্য কোন মাথা ব্যথা থাকেনা, খাওয়া, পরা, শোওয়া, বসার চিন্তা করতে হয়না, অর্থাৎ এক কথায় মুক্ত মন, সেই সময় শুরু হয় জাবরকাটা অর্থাৎ নিজের অতিত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক এক করে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে; রোমন্থন হয় কখনো গরল, কখনো অমৃত নির্গত হয়—তাই নিয়েই জুলজুল করে চেয়ে বসে সময় পার হয়ে যায়। মানুষ যখন এ পৃথিবীতে আসে, সে তো একাই আসে, যায় তখনও একা। যাওয়া আসার মাঝের সময়েই তো জল আসে বাতাস আসে, আসে প্রকৃতি পৃথিবী সৌরমণ্ডল, জীব জগৎ-আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধব সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি। অবসরে আমার মনে এই কথাগুলোই বার বার এসেছে এবং আমি উপভোগ করেছি। দারুন ভাবে। ঘুরে ফিরে এসেছে রুচী, রুচীর জটীল মন, নিঃস্ব হৃদয়, মরুভূমির মত শুষ্ক জৈবিক বৃত্তি। প্রায়শঃই রুচীর পাশে হাজির করে তুলনা করেছি দুজনকে। যদিও সম্পর্কের বিচারে নীতিগত ভাবে অন্যায়। প্রথমতঃ রুচী আমার স্ত্রী, রুচির শিক্ষা দিক্ষা, পারিবারিক মর্যাদা, সংযম তার সাথে কিউ এর তুলনা করা যায়না। তবুও রুচীর তুলনায় কিউকে বাস্তব কাছের মানুষ বলে মনে হয়, মনে হয় কিউ শুখে দুঃখে গড়া মানুষ, যার হৃদয় আছে। রুচী হৃদয়হীনা। জানিনা, এ আমার সঠিক পর্যালোচনা কি-না।

—তোমার শীত করছে না? একটা মাত্র হালকা জামা গায়ে—

—দরকার হলে চাদর নেব। তুমি শোবেনা।

কিউ পাশ থেকে প্রশ্ন করে।

এখনো ঘুম পায়নি। যতক্ষণ জেগে থাকা যায়। ঘুমনো মানেই তো সময়ের মৃত্যু। আমার জীবন থেকে ঐ সময়টুকু নিস্ফলা। কাজের ছুটী মনের ছুটী, আনন্দের ছুটী — জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় এই ভাবে মারা যায়। যদিও শরীর ও মনের সুস্থ্যতার কারনে বিশ্রাম প্রয়োজন।

—না ঘুমালেই পারো, বিশ্রাম না হলেও চলে যাবে!

—ঠাট্টা করছে? সম্ভব হলে ঘুমোতাম না।

—তার মানে, তুমি না ঘুমিয়ে, বাইরে বসে ঠাণ্ডা লাগবে। দেখি, কতক্ষণ না ঘুমিয়ে থাকতে পারো। আমিও ঘুমাবোনা।

—একটু পরেই উঠে যাবো। ঠাণ্ডা লাগতে আরম্ভ করেছে।

—চলো ঘরে বসবে। জানালা দিয়ে চাঁদ, পাহাড় গাছ, সব দেখতে পাবে। মন চায়লে আমাকেও—

মৃদু হাসি আসে। তাৎক্ষণিক। আবার মিলিয়ে যায়। কিউ দেখতে পায়না। নিস্তব্ধতা নেমে আসে। পাহাড়ের মতই চাঁদের আলোয় আলোকিত মন, পাহাড় যেমন নিস্তব্ধতায় মূখর তদ্রুপ এমন, কিউ এর চাঁদের কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ ভালবাসায় নিস্তব্ধ অথচ মূখর।

নায়িকা কিউ। যার কথা বলবার জন্য আমার এ গল্প বলার অবতারণা। তবুও ইচ্ছা না থাকলেও বাব বার আমার ব্যাক্তিগত জীবনের কথা এসে যাচ্ছে। বয়সের দোষ। এর জন্য মনে করবেন না যে আমি এ গল্পের নায়ক। নায়ক বলতে যা বোঝায়, তার কোন গুনই এ বৃদ্ধ বসন্ত বা আমার নেই। তবুও যেহেতু কিউ এর জীবনের বেশির ভাগ সময় আমার সাথে কেটেছে সেই হেতু আমার কথা, আমার পরিবারের কথা, আমার জীবনের কথা এসে যাচ্ছেই। এই বয়সে, অর্থাৎ কিউ এর সাথে আমার যে বয়সে আলাপ, এবং বর্তমানে আমার যা বয়স, কিউ এর তুলনায়, নিজেকে নায়ক হিসাবে কল্পনা কিছুতেই করা যায় না।

তাছাড়া নায়ক হতে গেলে যে চারিত্রিক উপাদানের প্রয়োজন, সাহস, চেহারা, কোন কিছুই আমার নায়কোচিত নয়। তবুও গল্প বলতে বলতেই, কখন যে নায়ক হয়ে বসে আছি, খেয়াল নেই। সে জন্য দায়ী অন্য কেউ নয়, দায়ী কিউটি। কিউটি আমাকে নায়ক বানিয়ে ছাড়বে—-এ যেন তার শপথ। অসুস্থ্য লাবণীকে সুস্থ্য করে তুলতে আমি সচেষ্ট হয়েছি অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, সেই অবসরে কিউ তার অন্তর আমার অন্তরের সাথে যুক্ত করেছে, বঙ্কিমবাবুর ভাষায় প্রণয় রজুতে বদ্ধ করেছে। আমাকে বাঁচিয়ে তোলার শপথ সেই মূহুর্ত হতেই। আমার মৃত সৃজনী শক্তি অর্থাৎ আমার লেখনি শক্তির পূণর্বাসন বা পূণর্জীবন দানে সে মগ্ন হয়েছে। তার ঐকান্তিক প্রয়াসেই আমার পূণরায় লেখা শুরু, যা আজো অব্যাহত, আর্ন্তজাতিক, খ্যাতি, অর্থ মান সম্মান প্রাপ্তি সবের জন্য মূখ্য অবদান কিউটির। তার এই ঐকান্তিক প্রয়াসে সে যদি নায়িকা সেজে আমাকে নায়ক গড়ে তুলেই থাকে, তার কৃতিত্বের প্রাপ্তি সবটাই কিউ এর। অথচ কিউ কেন বোঝে না যে তার প্রয়াস যতই অকৃত্রিম হৌক, সে নায়িকা হতে পারে, কিন্তু এ সমাজ আমায় নায়ক হিসাবে মানবেনা। জানিনা, কিউ ভাবতে পারে যে

সমাজ কোন জড়বস্তু নয়, সমাজ আমরা তৈরি করি. সামাজিক বিচার ধারা আমরা সৃষ্টি করি। অতিতের অভিজ্ঞতা সামাজিক বিচারধারা বিশ্লষণে সঙ্কল্পবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। সমাজ কখনোই নিজে ভাবে না। সমাজের ভাবনার খোরাক আমরা, আমরাই বিচার করি ঘটনার সত্যতা; অসত্যতা বা মিথ্যা এবং প্রয়োজনীয়তা সময়ের সাথে, বাস্তব ঘটনার সাথে, জীবনে প্রয়োজনের স্বার্থে, সামাজিক অনুশাষণ বদলায়। সহমরণ, এর স্থলে বিধবাবিবাহ—সময়ের আহ্বানে, জীবনের প্রয়োজনে, সামাজিক ভাবনার বিবর্তন। মানুষের জীবনে বাস্তব সত্য। এবং জীবনের যা কিছু প্রয়োজন তাই বাস্তব। জীবনের স্বার্থে বাস্তব চির পরিবর্তনশীল এবং বহুমুখি। স্বামী স্ত্রী, নায়ক-নায়িকার সঙ্গ কালে কালে বদলায়, সেকালের নায়ক একালের ভিলেন-এ উদাহরণ হাজার হাজার আছে।

—বসন্ত বেশ কাটলো সময়টা বলো। দেখতে দেখতে এক মাস পার হয়ে গেল, মনে হচ্ছে, এইতো সেদিন, আমরা আসার প্রস্তুতি নিচ্ছি ঠাণ্ডা জায়গা বলে, তুমি ভালো গরম জামা নেবার পরামর্শ দিচ্ছো। তা তোমার কেমন লাগলো? এ পাহাড়ে তোমার কি প্রাপ্তি?

—প্রাপ্তির কথা তো ভাবিনি। বিশ্রাম নিতে এসেছি, সুন্দর বিশ্রাম হয়েছে। বলতে পারো, এটাই আমার প্রাপ্তি। তার সাথে তোমার হাসি মুখ। কলকাতায় বিশ্রাম হয়? হয়না। শুধু কাজ আর কাজ, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতেই হাঁপিয়ে উঠি। তারপর আমন্ত্রণ লেগেই আছে। পালিয়ে এসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারলাম। কেন, ফেরার সময় হয়ে এল বলে এসব কথা মনে পড়ছে?

—আমাকে বলছো? আমার মনে ভাবার মত খালি জায়গা আছে?

—অর্থাৎ এই একমাস তোমার কাছে বেকার গেল। মনটাকে সামান্য হালকা করতেও পারলে না।

—হালকা হয়নি, তা নয়। অনেকদিন পর প্রাণ খুলে বেড়ালাম, প্রাণ খুলে হাসলাম, প্রাণ খুলে গল্প করলাম। মনের বোঝা এতকাল একা একা বয়ে বেড়িয়েছি, তুমি পাশে থাকতে ও সে বোঝার ভার তোমার ওপর চাপাইনি, এখানে এসে সে দুঃখের কথা, কেন যেন আপনা হতেই তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেল; হালকা কিছুটা হয়েছি বৈকি। অনেক কষ্ট, অনেক বেদনা দীর্ঘকাল অসহায় আমি, বয়ে বেড়িয়েছি, যা একমাত্র নিজে ছাড়া অন্য কারো কাছে, এমনকি প্রিয়তম বন্ধুর কাছে প্রকাশ করা যায়না, এ পাহাড় আমায় মুক্তি দিয়েছে। আমি পাহাড়ের কাছে, তোমার কাছে কৃতজ্ঞ বসন্ত। মনে হচ্ছে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখা যায়। রাত হয়েছে চোখে ঘুম আসছে না, বসে বসে গল্প করছি। কোন কষ্ট নেই। বরং কথা বলে আনন্দ হচ্ছে। তৃপ্তি পাচ্ছি, মনে বাসনার মুকুল ফুটছে! আমার মনের এই যে উচ্ছ্বাস, মনে হচ্ছে দুঃখ নয়, আমার জন্য আনন্দ বা সুখ অপেক্ষা করছে। মনে হচ্ছে আমি যদি এক পা এগোয় একটিবার সামনে দিকে হাত প্রসারিত করি, আমি যেন আনন্দের স্পর্শ পাবো, সুখ আমায় আবিস্ট করবে; সেই বার্তায় দিয়েছে এই কুমায়ুন, সবুজ, গম্ভীর, উৎফুল্ল, নিস্তব্ধ প্রকৃতি। বার্তা আমি শুনেছি ঐ চাঁদের কাছ থেকে, আর সর্বোপরি বসন্ত তোমার কাছ থেকে একান্ত আপন করে, এই একমাস তুমি শুধুমাত্র আমারই ছিলে বসন্ত।

—তুমি সুখে থাকো, আনন্দে থাকো কিউ। তোমার জীবন তোমায় আনন্দের জগতে

পৌঁছে দিক! নতুন করে তোমার হৃদয়ে ভালবাসা জন্ম নিক্!

—নতুন কোন ভালবাসার প্রয়োজন আমার নেই। এই বর্তমান, ভবিষ্যৎ, আমার ভালবাসা তোমাকে ঘিরে আবর্তিত হৌক, অন্য কেউ যেন সেখানে প্রবেশ না পায়।

—ভালবাসা কোনো মানুষ নাও হতে পারে—হতে পারে শিল্প, সংগীত, সাহিত্য। পারেনা?—পৃথিবীতে ভালবাসার বস্তুর অভাব নেই।

—যদি মন জীবিত থাকে?

—তোমার মনের মৃত্যু কোনদিন হয়নি। হলে আমায় পূর্ণজীবিত করতে পারতে না। মৃত মনে দ্বারা সৃষ্টি হয়না। মৃত অর্থে জীবনশক্তিহীন।

মৃত না জীবিত আমি জানিনা। তবে এটা নিশ্চিত এ চোখে সুন্দরকেও একদা অসুন্দর, হিংস্র মনে হতো। মনে হতো পৃথিবীতে আলো নেই, শুধুই অন্ধকার। চোখ বন্ধ করে রাখতাম, মনের দরজা বন্ধ। তারপর তোমার সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে বসন্ত তোমায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। তোমার দৃষ্টির বাইরে নিজেকে অসহায় ভীত মনে হতো। মনে হতো তুমি পাশে না থাকলে আমি বাঁচবোনা। মনে মনে প্রবল মৃত্যুর ইচ্ছা জন্ম নিয়েছিল। ভয় করতো, আমি তাই জড়িয়ে ধরে মৃত্যু ভয়ের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি, তাই আজো বেঁচে আছি। আর সেই নির্ভরশীলতা থেকে ধীরে ধীরে তোমাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। মনে হয়েছে তোমার ভালো হলে আমার ভালো হবে, এর জন্য তুমি যদি মনে করো, আমি তোমার সৃষ্টির পুনর্জীবন দান করেছি, সেটা তুমি আমাকে ভালবাসো বলেই, আমার গুনগান করে আনন্দ পাও।

—তুমি আমায় ভালবাসোনা?

—ভালবাসি কিনা জানিনা, তোমার কাছে থেকে, তোমাকে নিয়ে থেকে, তোমার কাজকে নিজের কাজ মনে করে ব্যস্ত থাকতে ভাল লাগে। তোমাকে ছাড়া নিজেকে অস্তিত্বহীন মনে হয়, মানসিক এই অবস্থাকে কি বলে জানিনা।

—কিউ তোমার ঠাণ্ডা লাগছে।

—না-না লাগছে না।

অনুরাগ জড়ানো কিউ এর কণ্ঠস্বর। অদ্ভুত এক মেয়ে। পৃথিবীতে সত্যই আমি ছাড়া যার কেউ নেই। স্বভাবতঃই সে সম্পূর্ণ ভাবে আমার ওপর নির্ভরশীল। ওকে ডান হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরি। আমার কাঁধে ধীরে মাথা রাখে। দুটি চোখ বন্ধ। মানব বাঙ্গালোরে। মানবের সাথে কোন সম্পর্ক নেই দীর্ঘদিন। তবুও স্মৃতিতে মানব আজো অমলিন। বারে বারে সুখের সে মুহূর্তগুলো ওকে প্রীত করে, কষ্ট দেয়। সুখ ও দুঃখের লড়াই কিউ এর মনে অহরহ। নিজের অসহায় অবস্থা ওকে ভয়ার্ত করে তোলে। মানুষের প্রতি হারানো বিশ্বাস কিউ আমার মধ্যে খুঁজে পেতে চায়, তখনি সে আমায় আঁকড়ে ধরে। মানুষ মাত্রেই নির্ভরশীলতা খোঁজে।

—কিউ তুমি গান শিখতে পারো। রবীন্দ্রসংগীত। তোমার গলায় ঠাকুরের গান ভাল শোনায়।

—রবীন্দ্রভক্ত তুমি কবে থেকে হলে?

—তোমার গলায় রবীন্দ্র সংগীত শুনে শুনে। ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পড়ে আমি প্রেরণা পেতাম। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের মত জীবন রসিক, কবি অথচ কর্মী, বাস্তববোধ, মানুষের জন্য ভাবনা পৃথিবীতে এমন মণিষী ক'জন আছেন?

—বসন্ত, আমি জানি, তুমি আমার কথা চিন্তা করো—

—কলকাতায় ফিরে ভাল করে রবীন্দ্র সংগীত শেখো না—

—হবে না। আমার দ্বারা—এই বয়সে—

—হবে কিউ। হবে।

দুটি হাতে কিউ এর মাথা বুকের সাথে চেপে ধরি। কিউ চুপচাপ বুকের মধ্যে মুখ গুজে বসে থাকে। কোনো উত্তেজনা নেই, স্পন্দন নেই, সমর্পণ, সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে অনুভব করে, বিশ্লেষণ করে নিজেকে। নিজের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত কিউ নিজে গ্রহণ করুক। আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তাই বলে আমি দায়মুক্ত হতে চাইনা।

রাত বাড়ে। ঘুমন্ত পাহাড়ের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। শুনতে পাই কিউএর বুকের তলায় ফুসফুসের শব্দ। কিউ এর মাথা সোজা করে বালিস টেনে মাথার নিচে দিই। কাত হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমোয়নি। ওর মনে নতুন করে বাঁচার স্বপ্নের আনাগোনা। চিন্তা মানুষের ঘুমকে দূরে সরিয়ে রাখে। কলকাতায় থাকতেও এমন অনেক রাত গেছে, কিউ না ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছে। কলকাতায় আমার ফ্ল্যাটে—দু কামরার ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট কাম আমার কাজের জায়গা বা লাইব্রেরি। সেই ফ্ল্যাটের দুটি ঘর আমার কর্মস্থল কাম বাসস্থান। যে ফ্ল্যাটে কিউ বার তেরো বছর বাস করছে। আমিও থাকি। প্রায় প্রতি রাতই এই ফ্ল্যাটে থাকতে হয়। সাদার্ন এভিনিউ এর ফ্ল্যাটের আকর্ষণ ছিল বহু দিনের। তাছাড়া কিউ একা থাকতে পারেনা। একা থাকতে ভয় পায়, একাকিত্ব ক্লান্ত করে, অতিত এসে দমবন্ধ করে দিতে চায়, কিউ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে—কেউ সে অবস্থায় দূরে সরে যেতে পারে?—পারে না। আমি পারিনি। আমার সাহায্যের হাত, স্বান্তনার স্পর্শ প্রসারিত করেছি। কিউ আমার বেদনা অনুভব করে অতি স্বাভাবিক ভাবে, আমার ব্যথার ভাগ বণ্টন করে নিয়েছে। একে অপরের সুখ দুঃখ ভালবাসা ভাগ করে নিয়েছি। পাশাপাশি বসে দুজনে কাজ করেছি, কথা বলেছি, গল্প করেছি, হেসেছি, খেলেছি, দুজনে দুজনের পাশে পাশাপাশি শুয়েছি। কোন জড়তা নয়, কোন লোভ বা লালসার সমর্পণ করে নয়, বরং অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে একে অপরের ওপর নির্ভর করেছি। যা আজ অভ্যাসে পরিণত। প্রথম প্রথম রুচীকে টেলিফোনে খবর দিতাম; রুচী অত্যন্ত শান্ত গলায় সমর্থন করেছে। উৎসাহিত করেছে বলা ঠিক হবেনা। বরং আমরা চরিত্রের মানবিক দিকটার প্রতি তার সমর্থন ছিল।

প্রথম অবস্থায়, সাদার্ন এভিনিউ এর ফ্ল্যাটে, কিউ রোহিত রুচী ও আমি এক সাথে থাকতাম। এই ফ্যাট কেনা হয়নি। কাজের পরিধি এত বিস্তৃত ছিলনা। রোহিতের কলেজ শেষ হয়েছে, থিসিস্ নিয়ে ব্যস্ত, রুচীর কলেজ, আমার দেশ বিদেশে যাওয়ার মাত্রা কমে গেছে, লেখার উৎসাহ নেই বললেই চলে, ফ্ল্যাটে আমরা দুজনে, কিউ ও আমি। নির্জন ফ্ল্যাটে দুজনে দুজনকে নিয়ে বেশ কাটতো। ইতিমধ্যে প্রথম কয়েক মাস; কোন কাজ করিনি, কিউ এর মানসিক চিকিৎসা করেছি। ধীরে ধীরে কিউ এর অর্ন্তবেদনা লাঘব হতে শুরু করেছে। স্বাভাবিকতা ফিরে আসছে, সাথে সাথে আমার প্রতি নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি অনুভব করছি। কিউ আমাকে ছাড়া একা খেতে, পরতে এমনিক ঘুমোতেও চায়না। এ এক সমস্যা। কিন্তু সমস্যা হলেও সে সমস্যাকে মোকাবিলা করেছি, কারণ কিউ এর প্রতি মানবিকতা মমত্বে রূপান্তরিত হয়েছে, কিউ এর প্রতি আমার স্নেহ

বা মায়া আমায় ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করেছে। আমি কিউকে ছাড়া থাকতে পারিনা। তার সাথে সমর্থন পেয়েছি রুচী ও রোহিতের কাছ থেকে।

ইতিমধ্যে, কিউ আমার লেখা, আমার কাজের মধ্যে ঢুকতে চাইছে। কোন কাজ ছাড়া কেউ বাঁচেনা। কিউ যত স্বাভাবিক হচ্ছে, ততই সে আমার লেখার মধ্যে উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছে। যা কোন কালে রুচীর মধ্যে ছিলনা। যাইহোক, বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমার লেখার জন্য অনুরোধ আসছে বার বার, আমি কিছু করতে পারছিনা। লিখতে বসলেই মানসিক অস্থিরতা পেয়ে বসে, রুচীর উপেক্ষা আমায় পীড়া দেয়, আমার বুভুক্ষু শরীর রুচীকে পাবার জন্য ছটফট করে। কিন্তু রুচীর শীতলতা এমন কি সরব অনীচ্ছা আমায় তীব্র ভাবে আঘাত করে। আমি যন্ত্রণায় ছটফট করি। নিজেকে অসহায় ও ব্যর্থ মনে হয়। লেখা বন্ধ। কিউ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে। আমার ব্যর্থতার কারণ আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হই। তবুও সে পারেনা, আমার হৃদয়ের কান্না প্রকাশ পায়না, চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়না, পারিবারিক কাজে কর্মে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। এমনবস্থায় কিউ আমাকে আমার লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করতে উৎসাহিত করে, নিজের উৎসাহ প্রকাশ করে। অন্ততঃ কিউ এর জন্য আমায় পুণরায় পড়াশুনায় আগ্রহ প্রকাশ করতে হয়। কিউ বিভিন্ন লাইব্রেরি, আর্কাইভ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহে প্রয়াসি হতো। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সাজিয়ে দিতো। কিউ কাজের মধ্যে মগ্ন হয়ে নিজের অতিতকে দূরে সবিয়ে রাখাব জন্য, আমার লেখা, আমার বিষয়ের প্রতি ধীরে ধীরে উৎসাহিত হলো। নতুবা একা থাকলেই অঝোর ধারে নেমে আসতো কিউ এর চোখের জল। প্রাথমিক অবস্থায় কিউকে স্বান্তনা দেওয়া, আশ্বস্ত করা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। মাঝে মাঝে রেগে যেতাম। তবুও কিউকে আঘাত দিইনি। দিন রাত্রি কিউ এর অশ্রুপাত রুচী সহ্য করতে পারতো না। রোহিত মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও বুঝতাম রোহিত বিরক্ত। তবুও নিরুপায় কিউকে আমি অন্য সকলের মত ত্যাগ করতে পারিনি। ঠিক এমনি ভাবে দুটি অশান্ত হৃদয় একে অপরের ওপর নির্ভরশীল বা আস্থাশীল হয়ে উঠে। একদিন বা একমাসে আমাদের মধ্যে এ পরিবর্তন আসেনি। দীর্ঘদিন উভয়ে উভয়ের সান্নিধ্যে অভ্যস্ত এবং সান্নিধ্য নির্ভর হয়ে উঠি। নতুবা আমার লেখা বা নতুন করে মননশীল জগতে পূণঃ প্রবেশ মোটামুটি অসম্ভব ছিল। পরবর্তী জীবনে আমার যা কিছু লেখা, বা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মূল্যবান তথ্যাদি সহকারে বই এর প্রকাশ, আর্ন্তজাতিক মহলে স্বীকৃতি বা পুরস্কৃত হওয়ার পিছনে কিউ এর অবদান অসীম। তবুও মানসিক ভাবে আমি প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত দ্বন্দ্বে ছিলাম, মনে হতো কিউ এর সাথে আমার শারীরিক এবং মানসিক যে বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে তা বেঠিক, সমানে নিন্দনীয়, তবুও রুচীর ব্যবহারে আমি অসহায় হয়ে, বিক্ষুব্ধ মনের পোতাশ্রয়ের মত কিউ এর আশ্রয়ে সঁপে দিয়েছি বলা অনুচিত হবে, প্রকৃত অর্থে অবস্থা আমায় কিউ এ লিপ্ত করেছে, কিউকে স্নেহ করেছি, ভালবেসেছি অবশেষে শ্রদ্ধা করি। মানুষ কিউ, কিউ এর আচরণ, আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ।

রোহিতের জন্মের পর থেকেই রুচীর এবং আমার মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। প্রথম প্রথম মনে হত রুচী সদ্য মা হয়েছে, আমার প্রতি তার আচরণ যদিও অপ্রত্যাশিত, তবুও হয়তো এমনি হয়; সন্তানের প্রতি স্নেহ এবং মাতৃত্বের দায়বদ্ধতায় তার আচরণে পরিবর্তন আসতেও পারে। ধীরে ধীরে রোহিত বড় হয়, কথা

বলতে শেখে, হাঁটতে শেখে, স্কুলে যেতে শুরু করে, রুচীর আচরণে কোন পরিবর্তন নেই, যেন এই সংসারে আমার উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নেই বা অতিতেও ছিল কিনা সন্দেহজনক, অথচ সাংসারিক বা সামাজিক ভাবে রুচীর আচরণে কোন সাদৃশ্যের বা সামঞ্জস্যের অভাব নেই। আমরা অতি উত্তম, সুখী দম্পত্তি, কিন্তু শারীরিক ভাবে আমায় বঞ্চনা, বঞ্চনা ঠিক নয়, রুচীর নিষ্ঠুর ব্যবহার অত্যন্ত মনোপীড়ার কারণ, ধীরে ধীরে আমায় অসুস্থ করে তোলে। এরপর রোহিত বড় হয়, কানপুরে পড়তে যায়, আমি সে সময় রুচীর দিক হতে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত এবং রুচী ও রোহিতের অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ দিশেহারা তবুও তার আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না। সত্য এটাই, যেটা আমি উপলব্ধি করতাম রুচীর জীবনে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। শুধু একটি ছাদের নিচে আমরা তিনটি পূর্ণ মানুষ-সম্পর্কে স্বামী স্ত্রী ও সন্তান যার মধ্যে কোন উষ্ণতা নেই, স্নেহ নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, যেন তিনটি সাজানো পুতুল। কেন এমন হল? ইতিমধ্যে কিউটির আবির্ভাব। এর জন্য কে দায়ী? আমি? রুচী? কিউটি? রোহিত? কিন্তু কিউটি কি করে হয়? আমাদের মধ্যে সম্পর্কের ব্যবধান সৃষ্টি তো কিউ আসার অনেক আগে হতে? তবে কি রোহিত? কি করে হয়? সন্তান তো বন্ধন। তবে কি আমার কাজের প্রতি বেশি মনোনিবেশ? রুচীতো আমার কাজে মুগ্ধ হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে? তবে কি কল্পনা ও বাস্তবের সংঘাত? তার প্রকাশ তো রুচীর আচরণে কোন দিন প্রকাশ পায় নি তবে কি এর নাম এক জাতিয় মনো বিকার? কার? জানি না। কারণ আমরা উত্তম দম্পত্তি। তবে এটা ঠিক কিউ এর আবির্ভাবের পর কিউ এর প্রতি আমার আচরণ, কিউ এর মানসিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসা এবং আমার প্রতি কিউ এর আস্থাস্থাপন এবং কিউ এর প্রতি আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া রুচীকে অসন্তুষ্ট করেনা বরং আশ্বস্ত করে। রুচীর হীনমন্যতা কিউ এর উপস্থিতিতে দূর হয় বলেই মনে হয় এবং রুচী ধীরে ধীরে নিজেকে আরো সঙ্কুচিত করে তোলে, ব্যবধানের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এককথায় রুচী কিউ এর হাতে আমায় তুলে দিতে পেরে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। কেন এমন হবে? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। তবে সত্য। এবং এও সত্য কিউ আমায় পূণর্জীবন দান করেছে, আমায় সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলেছে, আমি নতুন উদ্যমে বিগত আট নয় বছর ধরে কিউ এর সহযোগিতায় পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে চলেছি এবং স্বার্থকতায় পৌঁছেছি। সে কারণে কিউ ও আমার মধ্যে এ সম্পর্কস্থাপনে আমার কোন দুঃখ নেই, আফশোষ নেই, বরং তৃপ্তি আছে, শান্তি আছে। আমি সুখী। আমি চাই কিউটির সুখ স্থায়ী হৌক তবুও বয়সের ব্যবধান, আমার অবর্তমানে কিউ একাকি, সহায়হীণা, অপরিচিতা এক নারী। সে কারণেই আমার উদ্বেগ।

—তোমার গলায় যেটুকু রবীন্দ্র সংগীত শুনেছি, আমি গানের কিছু না বুঝলেও মনে হয়, গানে তোমার আন্তরিকতা, তোমার আকুতি যেন তোমার গলা থেকে নয়, হৃদয় থেকে পরিবেশিত হয়, উৎসারিত হয়, গানে, গানের সুরের সাথে প্রাণের সুর যোগ হয়। যে কারেণ শুনতে ভাল লাগে।

—স্কুলের ফাংসানে কখনো কোরাসে, কখনো একা একা গেয়েছি। দিদিমণিদের সেদিনের সে তালিম, কিছু কিছু মনে আছে, রেডিওতে, ক্যাসেটে শুনি, শুনে শুনে যা শেখা—

—তুমি গান ভালবাসো। তালিম নাও। এবার ফিরে একটা হারমোনিয়াম কিনে শুরু

করে দাও, চেষ্টা করলে মাষ্টার পাওয়া যাবে।

—এই বয়সে সারে গা—না, বাবা না—লোকে হাসবে।

—লোকের এতো সময় নেই।

—বরং আবৃত্তি—অনেক সহজ।

—তাও করবে।

—তোমাকে কে দেখাশুনো করবে?

—তুমি গান শিখলেও আমার যত্নের ত্রুটি হবে না। শোবেনা?

—না। তোমার ঘুম পাচ্ছে? কটা বাজে?

—মনে হয় মধ্য রাত পেড়িয়ে গেছে।

—সে আর এমন কত রাত! কলেজে পড়ার সময় কখন যে রাত কাবার হয়ে যেত, ভোরের আলো ফুটে উঠতো, বুঝতেই পারতাম না, বিশেষে করে অনার্স পরীক্ষার আগে। সাহিত্য আমার প্রিয়। বাংলা সাহিত্যের পরিধি এত বড়, কূল পাওয়া যায়না।

—এখন তো অনার্সের পড়া নেই। শোবে চলো।

—চলো শুয়েই পড়ি। বুঝেছি তোমার ঘুম পেয়েছে। আসলে এ পাহাড়ে, নিঝুম নিস্তব্ধ রাতে, তোমাকে পাশে নিয়ে বসে থাকতে, কথা বলতে ভাল লাগছিল। সে কারণে ঘুম আসছিল না।

—ঠিক আছে, আরো কিছু সময় বসি, ভয় করে, ফেরার আগে অনিয়মে, ঠাণ্ডা লেগে যদি শরীর খারাপ হয়—কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নাও। ঠাণ্ডা লাগবেনা।

দুজনে কম্বলে শরীরের অর্দ্ধাংশ আচ্ছাদন করে বসে থাকি। পাশেই কাঁচের জানালা দিয়ে চাঁদ ও তারার আলোয় গম্ভীর কুমায়ুন। কোন কথা বলছি না। কিছু সময় পর কম্বল থেকে হঠাৎ বেড়িয়ে পড়ে,—আহারে ভুলে গেছি, বলে বেরিয়ে ক্রিমের টিউব খুলে; আলো জ্বেলে নগ্ন হাতে পায়ে গায়ে গলায় ক্রিম ঘসে। আমি বালিসে হেলান দিয়ে বসে বসে দেখি। ঠাণ্ডা জায়গা, চামড়ায় টান ধরে, ক্রিম লাগালে, চামড়া নরম হয় চামড়া ফাটে না। চামড়ার যত্ন নিলে আর ফাটে না। কিউ স্নানের পর ও প্রতি রাত্রে শোবার আগে এভাবে গাত্র চর্মের পরিচর্য্যা করে। আমার এসব ভাল লাগে না বা ধৈর্য্যে কুলায়না। কোন কালেই আমার এ অভ্যাস ছিল না। অতিতে, রুচী যখন পাহাড়ে বা ঠাণ্ডা জায়গায় বেড়াতে আসতো, সেও এভাবে ত্বক পরিচর্য্যা করতো। আমি বড় জোর স্নানের পর বা দাড়ি কাটার পর কখনো সখনো স্নো ব্যবহার করেছি। এখন তারও দরকার হয়না। প্রায় মিনিট পনেরো পর কোন কথা না বলে ক্রিম মাখা শেষ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। সটান নিজের বিছানায়। ধীরে ধীরে শরীর টাকে কম্বলের নিচে চালান করলাম আমি। ঘুমানো দরকার। শরীর কম্বলের নিচে, মন তখনো বাইরে। বাইরে ঠাণ্ডা, শরীরের উষ্ণতা বজায় রাখতে কম্বলের নিচে শরীরকে লুকোলেও, মনের ক্ষেত্রে কম্বল চাপা দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কারণ এ মন শীতলতা ও উষ্ণতা মুক্ত, আচ্ছাদনের প্রয়োজন নেই। ঘুমের সময় পার হয়ে যাচ্ছে, অথচ ঘুম আসছেনা, একই কম্বলে কিউ আর আমি উভয়ে উভয়ের শরীরের সাথে শরীরের স্পর্শে উভয়ে উভয়ের শরীরের উষ্ণতা আদান প্রদান করেছি, নিত্যঅভ্যস্ত কিউ এর নগ্ন শোভনীয় ত্বক চর্চা আমার এ মনে উষ্ণতা সঞ্চার করেনি, না কুমায়ুনের শীতলতা স্পর্শ করেছে মন-পূর্ণ ভারসাম্য বিরাজমান শরীর ও মনে। শুধু চোখে ঘুম নেই। কিউ দু একবার সামান্য

নাড়াচাড়া করে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাসের শব্দ গম্ভীর। বিছানা ছেড়ে উঠলাম, শরীর মাথা শালে ঢাকলাম, গিয়ে বসলাম ব্যালকুনিতে। হাত পা ঢেকে নিলাম, শুধু দুটি চোখ খোলা, সামনে তাবায় ভরা আকাশ, আকাশের নিচে পৃথিবী, কুমায়ুন পর্বতমালা। না, ঘুম আসছে না। মাঝে মাঝে এমন হয়, মন জেগে ওঠে, চিন্তার শ্রোত কুলকুল কোরে বয়ে যায়-অতিত-শৈশব-কৈশর-যৌবন দাপিয়ে বেড়ায় মন জুড়ে। মুক্ত মন এ পাহাড়ে পূর্ণ স্বাধীন---নিজেকে নিয়ে ভাববার পর্যাপ্ত অবসর; কোন কাজের তাড়া; সংসারের তাড়া, পরিচিত জগতের তাড়া নেই। সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বিহার। বয়স হল। বার্দ্ধক্য এসে গেছে। যদিও পাহাড়ে চলাফেরা করি, ভয় করিনা অথচ পরিশ্রান্ত হয়। শরীরের ধর্ম, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। কিছুদূর চলার পরেই থামতে হয়, বিশ্রাম প্রয়োজন, খাবার খাই পরিমাণ মত, অহেতুক অত্যাধিক খাবার খেয়ে শরীর অসুস্থ করিনা। কোন ব্যাধি আজো নেই। তবুও মাঝে মধ্যে কোমরে ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করি। বয়স তার স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম বজায় রেখে চলেছে। শৈশব, কৈশোর, যৌবনে শরীরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিকশিত হয়েছিল, শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল ধীরে ধীরে সে শক্তি হ্রাস পেতে চলেছে। এমনি করেই একদিন নিস্ক্রিয় হয়ে যাবে; স্তব্ধ হবে রক্ত চলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস। এই প্রিয় পৃথিবী এবং প্রিয়তম সকলের মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে সকলের মত। ক্ষোভ দুঃখ সুখ প্রেম, প্রীতি ভালবাসা, স্নেহের মায়া কাটিয়ে। সব রয়ে যাবে, যারা থাকবে তাদের মত করে! তবুও ভুলে যায় এই চরমসত্য। সত্য। আকাশ, জল, বাতাস, পৃথিবীর মতই চরম সত্য এ জীবন এবং তার অনুভূতি সমূহ। সত্যের এ স্বরূপ আমার মনের চোখে বার বার ভেসে উঠছে। আমি প্রত্যক্ষ করছি মৃত 'আমি'কে। একমাত্র রোহিতই আমার মৃত শরীর স্পর্শ করে অঝোর ধারায় কাঁদছে। অন্য সকলের অনুভূতি অভিব্যক্তিহীন। তারা আমার দৃষ্টির বাইরে। সকলের কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট কানে আসছে, অথচ কারো কণ্ঠস্বর আমি চিনতে পারছি না, আমার চেতনার বাইরে, আমার দৃষ্টির বাইরে যে যার মত আছে। আবার অনুভব করছি, আমার মৃত্যুতে সকলেই শোকাহত, সকলের চোখে উদগত অশ্রু, আমার নিষেধ, উপেক্ষা করে সকলের কান্নায় আমি ভারাক্রান্ত হচ্ছি অথচ ওরা বুঝছেনা। বুঝছেনা মুমুর্ষ লোকের পাশে দুঃখ সংবরণ করতে হয়। মানুষ বড় অবুঝ। আমি জোর করে খোলা চোখের দৃষ্টি চারিদিকে বুলালাম। সকলেই আছে, কিন্তু রুচী নেই। কেন? রুচী নেই কেন? তবে কি আমার মৃত্যু রুচী সহ্য করতে পারছে না? তবে কি রুচী অন্য কোথাও লুকিয়ে আমার মৃত্যুর জন্য অশ্রুপাত করছে? কেন? রুচী কেন অশ্রুপাত করবে? রুচীকে আমার দেখতে ইচ্ছা করছে, আমি জোরে ডাকার চেষ্টা করছি, অথচ আমার গলার স্বর বেরোচ্ছে না। এমন কেউ নেই যে রুচীকে ডেকে আনে। রোহিত আমার পাশে, পাশে কিউ—অথচ রুচী, যার এ সময় রোহিতের পাশে থাকা একান্ত প্রয়োজন, সে নেই, আমি বিস্মিত বোধ করছি। কিউ রোহিতের পাশে দাঁড়িয়ে রোহিতের চুলে আঙুল ডুবিয়ে রোহিতকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। চেয়ারে শাল মুড়ি দিয়ে বসে নিজেকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে চোখ জুড়ে গিয়েছিল আর সেই অবসরে মনে এ এক অদ্ভুত, আশ্চর্য্য স্বপ্ন। জানি না মানুষ মৃত্যুর আগে এরকম স্বপ্ন দেখে কি-না। তবে কি আমার মৃত্যু আসন্ন। না কি ঠিক সময়ে ঘুম না আসার কারণে মস্তিষ্কের স্নায়ু সমূহের বিকার? জানি না। না, এবার যাই, ঘুমানো প্রয়োজন। বাথরুমের বেসিনের কল খুলে ঠাণ্ডা জল দিলাম ঘাড়ে মুখে, গলায়। ঢক্ ঢক্ করে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেলাম। সোজা কম্বলের

নিচে। কিউ কিছুই জানলোনা—না রুচী না রোহিত। প্রত্যেকেরই নিজস্ব, একান্ত নিজস্ব কিছু ঘটনা থাকে, যার সাক্ষী কেউ থাকে না। প্রত্যেকে সেটি নিজের মনে সযত্নে লালন করে। রুদ্ধ অন্তরে, লোক চক্ষুর, লোকে চেতনার অন্তরালে অত্যন্ত গোপন এবং কোমল স্থলে বাইরের হাওয়া বাইরের উজ্জ্বলতা কিম্বা কলুষ তাকে স্পর্শ করেনা। যার জন্ম কখনো কৈশরে কখনো যৌবনে এমন কি জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও। একটা জীবনে কত কি ঘটে আবার কত না ঘটায় ঘটনা বা এক কথা কল্পনা বা বাসনা অন্তর লোকে কখন কোন পরিবেশে, কোন মূহুর্তে, কোন উপলক্ষে উদয় হয়, তা কেউ বলতে পারে না। মন বড় চঞ্চল। প্রতি নিয়ত নিত্য নতুনে তার অভিষার, তার মধ্যে কোন্ মূহুর্ত মনে স্থায়ী আসন করে নেয়, কেউ বলতে পারেনা। এবং অনেকক্ষেত্রে তা এমনি সংবেদনশীল এবং গোপনীয় যা কারো কাছে প্রকাশ করা যায়না। আমি, বসন্ত, বৃদ্ধ বয়সে, মন যখন কঠোর বাস্তব স্পর্শে আবেগ বর্জিত, তখন এ জাতিয় স্বপ্ন সত্যই অবাস্তব এবং সেটি কোনো মতেই কারো কাছে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয় এবং বলাও যাবে না। স্বপ্ন স্বপনই, স্বপ্ন অবাস্তব, সত্য হয়না, হয়তো আমি নিজে এ স্বপ্ন একদিন ভুলে যবো । তবুও ঘুম না আসা পর্যন্ত, স্বপ্ন তিক্ত ও মধুর আবেশে মন রোমাঞ্চিত করে রাখলো।

এর পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, তবে নিশ্চয় রাত্রির চতুর্থ প্রহরে।

ঘুম ভাঙালো কিউ। স্বপ্নের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলাম। প্রথমে গায়ে ধাক্কা পড়ে সদ্য স্নাত, সুগন্ধিত গাল বৃদ্ধের গাল স্পর্শ করে মধুর কণ্ঠে।

—বসন্ত ওঠো। অনেক বেলা হয়েছে, উঠবে না?

—ওঃ, অনেক বেলা! যাঃ বাজে! দিলে তো সুন্দর স্বপ্নটা মাটি করে।

—আগামিকাল দেখো। এখন চা এনেছি, খাও।

গায়ে থেকে কম্বল সরিয়ে উঠে বসলাম। ঘর ভর্তি সকালের উষ্ণ রোদ্দুর। ঘুম সম্পূর্ণ হয়নি। যেটুকু ঘুমিয়েছি, তাও হালকা, গভীর ঘুম হয়নি। যে কারণে চোখে জ্বালা রয়েছে। একটা স্বপ্ন দেখছিলাম, অভূতপুর্ব এবং অত্যন্ত মধুর তার আবেশ যা এখনো মনে আবেশ সৃষ্টি করে রয়েছে। যদিও বাস্তবের সাথে স্বপ্নের কোন যোগ নেই। তবুও মধুর তার সুখ। কোন একটি পাহাড়ী জায়গা শীতল, ট্যুরিস্ট স্পট। হোটেলে উঠেছি, জাঁকজমক আছে, পরিষেবা উন্নত এবং আধুনিক। সকালের ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঘুরতে বেড়িয়েছি, আমার মাথায় টুপি, কোট প্যান্ট, হাতে গ্লাভ্স। কিউটির গায়ে গরম জ্যাকেট্ মাথায় সৌখিন টুপি। ওকে বিদেশিনীর মত দেখাচ্ছে। রুচীও আছে, পরনে দামী শাড়ি, কার্ডিগান, তার ওপরে কালো রঙের শাল, প্যারাম্বুরেটারের হাতল ধরে চলেছে ঠেলে ঠেলে, তাতে বসে একটি ফুট্ফুটে মেয়ে, এখনো এক বছর হয়নি, শীত থেকে রক্ষা করবার জন্য গরম রঙীন পোশাকে ওর শরীর মাথা ঢাকা, সুন্দর দেখতে—কিউটির মেয়ে। রুচীর সন্তান অর্থাৎ এই মেয়ে জন্মানোর পর থেকে, রুচী ওকে কোনদিন নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি। তিনজনে বেড়াতে বেড়িয়েছি। কিউটির মেয়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণ রুচীর, কিউএর কোন অসুবিধা নেই, আরামে ঘুরছে। রুচীর মাথায় কাঁচা পাকা চুল, পিঠ পর্যন্ত ছড়ানো। কিউ এর ছোট ছোট চুল, টুপিতে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। লোকজন আছে, তবে হালকা, দূরে পাহাড়, বেড়ানোর জায়গাটা অনেকটা সিমলার ম্যালের মত। শিশুটি দুহাতে তালি দিয়ে হাসছে, বসে বসে নাচবার চেষ্টা করছে। শিশুর হাসির ছাপ কিউটি এবং রুচী; উভয়ের মুখে। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই

সময় কিউটি ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ঘুম ভেঙে দেখলাম রুচী নেই, শিশু অসম্ভব, কিউ আছে, সদ্য স্নান সেরে চায়ের কাপ হাতে।

—তোমার চা। ওঠো চা খাও।

কিউ এর হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিলাম। কিউ অন্য কাপ নিয়ে বিছানার এক প্রান্তে। স্নান করেছে। এখনো চুল আঁচড়ায়নি, না ক্রিম ঘসেছে। স্নানের পর অগোছাল তাজা কিউকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে মনে বললাম—সত্যিই তুমি সুন্দরী, কিউ।

—দিলে তো ঘুম ভাঙিয়ে স্বপ্নটা মাটি করে।

—স্বপ্ন দেখছিলে? বলবে তো। তাহলে পরে ডাকতাম। কি স্বপ্ন?

—বলা যাবে না আর ঠিক মত মনে পড়ছে না, অসম্পূর্ণ।

মাথামুণ্ডু নেই। কিউকে এ স্বপ্ন বলা যাবেনা। স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন সত্য হয় না। তা আবার কিউকে বলার কি আছে!

সকালের রোদে পাহাড় আলো ঝল্‌মল্। পাহাড়ি অধিবাসীবৃন্দ যে যার নিত্যকার কাজ শুরু করেছে। রোদের জন্য সকালের শীতলতা, রোদের উষ্ণতায় বেশ আমেজি এবং আরামপ্রদ। দিগ্ বাহাদুর ঘরের কাজ শুরু করবে, তারপর বাগান পরিচর্য্যা, পুরানো ঝরা পাতা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার, নিড়ানি দিয়ে কোপানো, গাছে পাইপ দিয়ে জল দেওয়া। দু তিন ঘণ্টা ব্যস্ত। কিউ গতকালের কাগজ পড়ছে। চা পানের পর বিছানা থেকে অবতরণ, বাসি মুখে ধূমপান সেরে বাথে, আজ দাড়ি কাটতে হবে। গীজার অন্ করে, রেখেছে কিউ। কোন অসুবিধা নেই।

গত রাতের কথা মনে আসছে। মাঝে মাঝে জীবনও মৃত্যুর কথা মনের দরজা দিয়ে আপনা থেকেই প্রবেশ করে। রোহিত ও রুচী আছে অনেক দূরে। রোহিত আমার একমাত্র সন্তান, তবু ও তার সাথে সন্তানবৎ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কারণ রুচী রোহিতকে এমনভাবে আড়ালে রাখতো যে কোনদিনই আমি ওকে কাছে পাইনি, স্নেহ করার সুযোগ পাইনি, রোহিত দূরে রয়ে গেছে, পিতার দায়িত্ব পালনের সুযোগ হয়নি, তবুও রক্তের সম্পর্ক। রুচীর কথাও মনে আসছিল; এখনো আসছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে রুচীকে ফোন করবো। কয়েকদিন হল রুচীর সাথে কথা হয়নি। রুচী ফোন করে, কথা হয়। কয়েকদিন কোনো ফোন পাইনি। যে কারণে কথা হয়নি। ওর সাথে কথা বলা উচিৎ। শরীর খারাপ হতে পারে। বলা যায় না। আমার দিক থেকে ও ফোন করে খোঁজ নেওয়া উচিৎ। হয়তো রুচীর রাগ বা অভিমান হতে পারে। সম্পর্ক একদিক থেকে হয়না। রুচীও ভাবতে পারে, দেখি, আমি ফোন করি কি-না!

রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, লাভার মত গরম চিন্তার শ্রোত মাথার কোষ সমূহে গড়িয়েছে, উত্তপ্ত করে ঘুম তাড়িয়েছে স্নান করছি। স্নানের পর শরীরে স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে।

দাড়ি কেটে ভাল করে স্নান সেরে, পরিষ্কার পোষাক পরে ব্যালকুণিতে বসলাম। ঠিক যেখানে রাত্রে বসেছিলাম একা। অন্ধকার তারায় ঢাকা রাত্রি। শীতল। সকালে ও ঠাণ্ডা হাওয়া আছে তবে সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা নেই, সূর্যের আলোয় উষ্ণতা শীতলতা তাড়িয়েছে, বেশ আরাম লাগছে। ইতিমধ্যে দিগে্র ঘরের কাজ শেষ হয়েছে। কিউ দিগ্‌কে নিয়ে কিচেনে। ভাজা ডিমের গন্ধ পাচ্ছি। কিউ ওম্‌লেট্ ফেভার করে। ডিমের

পোচ বা হাফ্‌বয়েল হলে ওর চলবে না। ফোন বাজছে। সাত সকালে কেউ ফোন করে না। দিগের গলা শুনতে পাচ্ছি—সংক্ষিপ্ত উত্তর হ্যালো—জী-জী-জী। টেলিফোন রেখে আমায় ডাকে—অর্থাৎ আমার ফোন। ঠিক। রুচী। যার কথা গত রাত্রে কয়েকবার, এমনকি স্নান করার সময়ও মনে আসছিল। কয়েকদিন সে ফোন করেনি; প্রথাবিরুদ্ধ কাজ, রুচী প্রতিদিন না হলে ও একদিন অন্তর ফোন করবেই চিরকালের বাঁধা ধরা অভ্যাস। দায়িত্ব সচেতনতা রুচীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বেশ কিছু সময় কথা হোলো। প্রয়োজনীয় কথা রোহিতের বিয়ের কথা চলছে দীর্ঘদিন। এবার মনে হয় পাকাপাকি সম্পর্ক হওয়ার পথে, একমাত্র আমার জন্য আটকে গেছে। সিদ্ধান্ত হয়নি। হায়দ্রাবাদেই বিয়ে হবে, ওখানকার পাত্রী, প্রবাসি বাঙালী। পাত্রী শিক্ষিতা, চাকরী করে না। রুচী রোহিতের চাকরী করা মেয়ের সাথে বিয়ে দেবে না। তার মতে রোহিতেব বৌ হবে একদম ঘরোয়া, গৃহবধু। শুধু সংসাব করবে, স্বামী সন্তানকে ভালবাসবে, যত্ন করবে। রোহিতের আলাদা কোনো আয়ের প্রয়োজন নেই। আর, কবে ফিরবো? শরীর কেমন আছে, ইত্যাদি সাদামাটা প্রশ্ন। এমন কি কিউটির খবর ও নেওয়া চাই। কিন্তু আমি কথায় কথায় ভুলে গেলাম—রুচীর খবর জিজ্ঞাসা করা হলনা। তবে নিশ্চয় ভাল আছে, নইলে ফোনে এত কথা আলোচনা করতে পারতো না। এ কথা ভেবে দায়মুক্ত হলাম। পুনরায় ব্যালকুনিতে। নিশ্চিন্ত। গত রাত থেকে কয়েকবার রুচীর কথা মনে হয়েছে। রুচীর ফোন না পেয়ে মনটা খচ্‌খচ্‌ করছিল। ব্রেকফাস্ট রেডি। কিউ ডাকতেই খাবার টেবিলে। ডিমে ডুবিয়ে পাউরুটির টোস্ট। কড়া করে বাদাম তেলে ভাজা—গরম গরম। পরে মোটা গরম কফি।

—আন্টির শরীর ভাল আছে? রোহিত?

উত্তর দিলাম।

—আর মাত্র কয়েকঘণ্টা। 'বলো? বেশ সুখে ছিলাম ক'দিন, নিস্তরঙ্গ, উদ্বেগশূন্য সুন্দর অবসর।

উদাস কণ্ঠস্বর। কিউ উত্তর দেয়না। খেতে খেতে শোনে। গরম টোস্টের তেলে সাতসকালে ভেজা কিউটির লাল ঠোঁট। টোস্ট। কফিপান শেষ। সিগ্রেটের প্যাকেট টেবিলের অন্যপ্রান্তে ছিল, কিউ এগিয়ে দিলো। সিগ্রেট ধরালাম।

—চলো ঘুড়ে আসি।

—বেশি দূর যাবোনা।

—কেন? ভাল লাগছেনা?

—না। ঠিক তা নয়—

—তবে, বেড়িয়ে কাজ নেই। অনেক বেড়ানো হয়েছে। দিগ্‌কে বরং পাপিটাকে খুঁজতে পাঠাই। ধরে আনুক, দুদিন দেখিনি। চলে যাবো। দিগ্—

—জী মেম সাব্—

—ও কুত্তাকি বাচ্চি—

—জী।

—লে আওনা। ঢুঁড়কে দেখো। দোদিন্‌সে দেখি নেহি।

—জী মেম সাব্। জরুর।

দিগ্ কিউ এর প্রিয় কুকুরছানা খুঁজতে দ্রুত বেরিয়ে যায়। আমার আঙুলের মাঝখানে

সিগ্রেট পুড়ছে। আমি ব্যালকুনিতে বসলাম। কিউ পাশের চেয়ারে। পাহাড়ের গা কেটে কেটে রাস্তা নেমে গেছে ঢালুতে, এ পাহাড়টার পাদদেশের প্রায় কাছে ছোট বসতি আছে। ট্রাক একটা প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে নিচে নামছে। ব্যালকুনিতে বসে ট্রাকটাকে বড় ছোট মনে হচ্ছে। দু চার জন লোক জমি ঠিক করছে। ধাপে ধাপে আগাছা, পাথর পরিষ্কার করে বাগান করা হয়। এই হল পাহাড়ী ক্ষেত। সকালের রোদ্রে পাহাড়ে গাছের সবুজ পাতা উজ্জ্বল।

প্রতিদিন সকালের রৌদ্র গায়ে মেখে পাহাড়ে ঘোরা, প্রায় একমাস, অনেকটা নেশার মত হয়ে গেছে। আজ হবে ব্যতিক্রম। কিউ এর খারাপ লাগছে। বাড়ি যাওয়ার জন্য মন তৈরি। অগত্যা কুকুর ছানায় সে তৃপ্তি খুঁজছে, প্রকৃতই হয়তো কুকুর ছানাটির প্রতি মায়াই, কাছে পেতে চাইছে, আদর করতে চাইছে। কুকুব ছানাটিকে নিয়ে যাওয়া যাবেনা, যাবার আগে সে কারণে বেশি বেশি আদর করতে চায় কিউ।

মেয়েরা অতি সহজে কোন কিছুকে আপন করে নিতে পারে। তাদের গ্রহণযোগ্যতা পুরুষ অপেক্ষা অধিক। গ্রহণ করা, সব অবস্থার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, সব পরিবেশের সাথে নিজেকে উপযোগি করে তোলা, মেয়েরা যতটা পারে, যত তাড়াতাড়ি পারে, ছেলেরা পারেনা। প্রতিটি নারীর মধ্যে এই গুন বিদ্যমান—কিউটি, রুচীরা বা অন্য যে কোন মহিলা। কম বা বেশি হতে পারে। তবে কিউটির মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ। ভাবতে অবাক লাগে কিউটি অর্থাৎ লাবনী, প্রাথমিক অবস্থায় বাবা মা ভাই বোনের সংসারে, অর্থাৎ মানসদাদের বাড়িতে, তখনো সে জানতোনা যে রক্তের সম্পর্কে যারা তারা কেউ তার আপন নয়, পরবর্তীকালে চেনা জায়গায় অচেনার অন্ধকার, পুরাতন সম্পর্ককে নতুন সম্পর্কে গ্রহণ করা এবং তার সাথে মানসিক ভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং মানব এর সাথে চিত্তের সম্পর্ক বা বন্ধন, ফলতঃ সে পরিবার থেকে নির্বাসন এবং রুচী, রোহিত ও আমাদের সংসারে পুণর্বাসন এবং সর্বশেষ আমার সাথে, আমার লাইব্রেরীকাম ফ্ল্যাটে একা একা থাকা, নতুন ভাবে বেঁচে থাকার প্রয়াস, যদিও সে সময়ে ওকে সুস্থ্য করে তুলতে আমি অন্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছি এবং মানসিক বিদ্ধস্ত হতে অনেকটা স্বাভাবিক করে তুলতে শরীর, মন প্রাণ নিবেদন করেছি তবুও সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে এই অস্বাভাবিক জীবনকে মেনে নিয়ে, অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া বিস্ময়কর। আমি স্বীকার করছি কিউকে আমি যথার্থ আপন করে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখিনি। শারীরিক, মানসিক দিক থেকে কয়েক বছরের জীবনে প্রচণ্ড ঝড় ঝাপটার সাথে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস জীবনের জয় ঘোষণা করে। তবুও অতিতের স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়নি কিউ এর অন্তর থেকে—সুখের ও দুঃখের স্মৃতি আজো ভাস্বর। তবুও কিউ সময়ের সাথে, আমাদের পরিবারের সাথে, সর্বোপরি আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে শুধু নয় আমাকে আঁকড়ে ধরে, পুরাতন সুখস্মৃতি বহন করে, নতুন করে সুখ রচনা করে থাকার উৎসাহ ফিরে পেয়েছে—এর জন্য আমার অবদান থাকত্রে পারে তবে মূলতঃ দায়ি কিউএর মানসিক জোর বা সঙ্কল্প।

আমি বিশ্বাস করি সময় হল মনোরগের সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। সময়ের সাথে সাথে মানসিক জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। অতিত ধীরে ধীরে নতুনেব ভিড়ে পিছিয়ে যেতে যেতে একসময় হারিয়ে যাবে। নতুন ভাবনা, নতুন স্বপ্ন, নতুন সুখ দুঃখ এসে বর্তমানে

জুড়ে বসবে। কিউ নতুন করে বাঁচবে নতুন চেতনায়, নতুন উদ্দীপনায়, নতুন সুখে, এই ভাবেই জীবন এগিয়ে চলে, দুঃখ দৈন্য অশান্ত অবস্থা হতে শান্তির স্বপ্নে। এ জন্য চাই নতুন স্বপ্নের-সুখের উপকরণ। একাজের দায়িত্ব অর্থাৎ কিউএর সুখের রাস্তার সন্ধান করার দায়িত্ব আমারই। রুচীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিলনা। কিউ এর ক্ষেত্র এবং পরিবেশ ভিন্ন। মানুষের প্রতি বিশ্বাস, মানুষের প্রতি ভালবাসার স্নায়ুসকল মৃত প্রায়। সেই স্নায়ু সকলের পূণর্জীবন দান করা অর্থাৎ মানুষের প্রতি আস্থাশীল করে তোলার দায়িত্ব আমার। ওর মনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তাকে পূর্ণ করতে হবে।

দীর্ঘদিনের প্রয়াসে কিউ সুস্থ, তার মানসিক শূন্যতা অনেকাংশে পূর্ণ। তবুও মনে হয় এ পূর্ণতা সাময়িক, স্থায়ী হতে পারে না। অন্য কোন কারণ না থাকলেও বয়সের ব্যবধান এবং কিউ স্বজনহীনা। কিন্তু আমার এ প্রয়াসের অবকাশে কিউ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে আমার মনের মরুদ্যানে সিঞ্চিত করেছে প্রেমের বারি এবং রোপিত করেছে নিজেকে। আমি কিউকে বাদ দিয়ে নিজেকে ভাবতে পারিনা যেমন কিউ বসন্তকে বাদ দিয়ে নিজের অস্তিত্বে আস্থা হারায়। এই পাহাড়, কুমায়ুন পাহাড় নিজেকে কিউএর সাথে রুচীর সাথে নিজেকে, এই বিশ্বের সাথে নিজের মূল্যায়ন করতে সাহায্য করেছে। কিউটিও নিশ্চয় নিজেকে বিশ্লেষণ করেছে। করুক! কিউ বাঁচতে শিখুক!

কিউ বিশ্লেষণ করেছে। কিউ এর হৃদয়ে স্থান পেতে চলেছে আকূলতা, শান্তির বাতাস ওর মনে বইতে শুরু করেছে—আমি তার আওয়াজ শুনেছি। আমি অনুভব করেছি কিউ-এর উজার করে নিবেদনে সুখের সংগীত। কিউ ভাবুক। কিউ সঙ্কল্পে স্থির হৌক, ভবিষ্যতের স্বপ্নের কুসুম ওর মনে সুবাস ছড়িয়ে দিক! আমি কামনা করি। প্রার্থনা করি কিউ সুখী হৌক! রুচী তুমি তোমার পূর্ণতা রোহিতের মধ্যে দিয়ে অর্জন করো! রোহিতের নতুন জীবন মঙ্গলময় হৌক!

দিগ্ ফিরে আসে। কুকুর ছানার সাক্ষাৎ মেলেনি। দিগ্ দুঃখ পেয়েছে, কিউ আহত। কিউ দিগ্‌কে সাথে করে কিচেনে ঢোকে। কোন কিছু নির্দেশ দেয়। এই সাত সকালে রান্না করে কি হবে! আমি বলি—

—চলো কিউ, আমরা খুঁজে আসি। তুমি প্যান্ট গলিয়ে নাও। আমার শালটা দাও, জড়িয়ে নিই।

দশম অধ্যায়

ফেরার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ঢিমেতালে। নেহাৎই গুছিয়ে নিতে হবে তাই। মনের দিকে সায় নেই, নেহাৎই নিরুপায়। ফিরতে তো হবেই। অন্য কারোর এ স্থান ত্যাগ করে স্বগৃহে ফেরার আকর্ষণ থাকতে পারে। কিউও আমার উৎসাহ নেই, কিউএর ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। মন চাইছেনা সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে ফিরে যেতে। নির্মল, কলুষশূন্য পরিবেশ, শীতল আবহাওয়া, প্রকৃতির ছন্দে মানুষের বাঁচার ছন্দ—না আছে তাড়াহুড়ো, না আছে টেনশান্ ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দে অপরের হস্তক্ষেপ, সমালোচনা নেই। এক অপরের প্রতি শ্রদ্ধায়, সম্মানে, বন্ধুত্বের, আত্মীয়তার পরিবেশে বাস করে সকলে। হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি প্রতিবেশিদের মধ্যে অনুপস্থিত। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এখানে হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করেনা, উত্তেজনা বা বাক্‌যুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী এবং সমর্থকের মধ্যে হয়, কিন্তু হিংসার পরিবেশে নয়, যথার্থ গণতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশে। তাও

নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে ফল প্রকাশের সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সকলেই জানে ভোট আসে ভোট যায়—যারা পারে বা যারা ইচ্ছুক ভোট দেয়, যে দলই জিতুক কারোর কিছু আসে যায়না। কারণ সকলেই জানে, যে দলই জিতুক, ওদের জীবনে কোনো পরিবর্তন হবেনা, শিক্ষিত বেকারদের চাকরী হবেনা, সাধারণ মানুষের অবস্থার বিশেষ হেরফের হবেনা, বড়জোর ভোটের আগে স্কুলের ছাদ বা রাস্তা ঘাটের যেটুকু মেরামত হয়, পাহাড়ী আধিবাসীবৃন্দের সেটুকুই লাভ।

শান্ত, খোলামেলা প্রকৃতি, সুবজ বনানী মুগ্ধ করেছে কিউকে। মুক্ত হাওয়ায় উন্মুক্ত করেছে কিউটির হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার। মন খুলে প্রকৃতির সাথে গল্প করেছে, প্রকাশ করেছে দীর্ঘ বৎসরের জমে থাকা শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলির বিভিন্ন ঘটনা সমূহ, বদ্ধ হৃদয়ের ক্ষত হতে চুঁয়ে পড়া পূতিগন্ধময় বিষাক্ত বাস্তব। কিউ খুশী। আমি?—জীবনে এই প্রথম নিজেকে নিজের করে পেলাম। দায়মুক্ত, সময়ের যন্ত্রণামুক্ত, কাজের ছুটী, শুধু নিজেকে নিয়ে নিজের মধ্যে ডুবে থাকা, প্রকৃতির সাথে নিজেকে তুলনা করা—কুমায়ুন নির্জন, নির্বাক আমার অন্তরকে সবাক করেছে। তার ওপর কিউকে আবিষ্কার। এতদিন কিউ এর সাথে থেকেছি, একসাথে থেকেছি, শুয়েছি, বসেছি, কাজ করেছি, হেসেছি, খেলেছি, কিন্তু কিউকে সম্পূর্ণ ভাবে চিনতে বা জানতে পারিনি। কুমায়ুন কিউকে তার স্বরূপে আমার সামনে উপহার স্বরূপে হাজির করেছে। যে কিউটি সহজ সরল অবলা ভারতীয় নারী, সুখ আছে দুঃখ আছে, ভালবাসা আছে, আছে তীক্ষ্ণ অনুভূতি, আবেগ মথিত অনুভূতি। যে ভালবাসতে চায়, ভালবাসা জানে, ভারতীয় নারী নিজেকে দয়িতের কাছে বিসর্জন দিয়ে যেমন আনন্দ খোঁজে, সেই কিউকে আমি প্রথম পেলাম কুমায়ুনে। কিউটির গৃহিনীপনা, যত্নআত্তি, পাশে বসে খাদ্য পরিবেশন করা, এবং খাইয়ে তৃপ্তি লাভ আমার প্রথম সুখানুভূতি এই পাহাড়ে। মন খুলে কিউটি আত্মপ্রকাশ করেছে, অনর্গল নিজের কাহিনী বলেছে, আমি অত্যন্ত উৎসাহে তা শুনেছি, উপলব্ধি করেছি, নিজেকে সেখানে সংস্থাপন করে তৃপ্ত হয়েছি। পাহাড়ের মনোরম পরিবেশ কিউএর হৃদয়ে উষ্ণতা সৃষ্টি করেছে, যাতে দ্রবিভূত হয়েছে কিউএর বুকে জমে থাকা মেরু অঞ্চলের বরফ। ধীরে ধীরে সে অনুভব করতে পারছে ঘটে যাওয়া অঘটনই জীবনের শেষ কথা নয় এবং সে ঘটনার জন্য নিজেকে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো অসার। বরং সে ঘটনাকে মোকাবিলা করে এগিয়ে চলা জীবনের লক্ষ্য। এর জন্য প্রয়োজন সাহসী হওয়া, অতিতের দুঃখের গ্লানি হতে মুক্ত হতে হবে, নতুন করে বাঁচার রাস্তা খুঁজে নিতে হবে। এবং সেই প্রচেষ্টায় বসন্তকে একমাত্র বিশ্বাস করা যায়, বসন্তের ওপর নির্ভর করা যায়, বসন্তকে অবলম্বন করে সুখের স্বপ্ন রচনা করা যায় তাছাড়া কেই বা তার আছে! কেউ নেই। তিন মাসের শিশুকে জন্মদাতা; মা ও বাবা হত্যা না করে পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ, যাদের সন্ধান সে জানেনা। ছোট থেকে মা বাবা দাদা বলে যে পরিবারে বড় হয়েছে যখন জ্ঞান হল, হঠাৎ জানতে পারলো, তখনকার মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। যাদের বাবা ও মা বলে তারা সব কোথায় গেল! তারা আছে, যারা সন্তান স্নেহে কিউকে মানুষ করেছে, শেষ পর্যন্ত তারাই তারা বিরুদ্ধে শত্রুতা করল, চরম আঘাত করল, বহিষ্কার করল বাড়ি থেকে। কি নিষ্ঠুর মানুষ! কিউটি, লাবনী অর্থাৎ সে জানে যে সে কোনো অন্যায় করেনি। স্নেহ, ভালবাসার কোন মূল্য নেই। মানুষ বড় স্বার্থপর। আর যেই তাকে ত্যাগ করুক কিউকে যে কোলে পিঠে করে নিজের মেয়ের

মত করে মানুষ করেছে, যাকে কিউ নিজের মা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেনা, সেই মহিয়সী নারী মা, তিনি কি করে কিউকে ত্যাগ করতে পারেন! কতদিন হয়ে গেছে। একদিনের জন্যও কি খোঁজ নিয়েছে, লাবনী বেঁচে আছে কিনা! তাহলে ছোট থেকে বড় করা, লেখাপড়া শেখানো, আপত্য স্নেহে পালন করার কি প্রয়োজন ছিল? তাকে তো কোনো অরফ্যানদের কোনো আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে পারতো, কিম্বা লেখাপড়া না শিখিয়ে বাড়ির দাসীবৃত্তি করাতে বা আজকাল যেমন হয়, কোথাও বিক্রি করে দিতে? কেন তা করলেন না বা পারলেন না? লেখাপড়া শেখানো, নিজের মেয়ে মনে করে মানুষ করার কি প্রয়োজন ছিল? কি এমন দায়বদ্ধতা? উত্তর খুঁজে পায়না কিউটি। এসব প্রশ্ন নিজের কাছে বার বার করে কোনা সদুত্তর পায়নি কিউ। তাই মনকে সজীব করার প্রয়াসে সে গুন্‌গুন্‌ করে রবীন্দ্র সংগীত গায়, গানের সুরের শব্দের মদিরতায় মুগ্ধ হয়, অন্তর শীতল হয়। পাহাড়ি পথে হাঁটতে হাঁটতে বসন্তের হাত চেপে ধরে আত্মশিহরণ সম্বরণ করে। কিউটির শরীর ও মনের শিহরণে রোমাঞ্চের স্বাদ স্পর্শ করে আমার হৃদয়। যত ফেরার সময় নিকট হচ্ছে কিউ তত বেশি তৃপ্ত, তত দ্রুত যেন তার হৃদয়ের স্পন্দন-শিহরণ জড়ানো।

—কি হোলো? কিউ—

—কিছুনা।

ধীরে আবেশে আপ্লুত হয়ে উত্তর দেয় কিউ, মাথা দোলায় ধীরে ধীরে, চোখের নজর নিম্নমুখী ও গভীর। কিউ এর হাতের চাপ বৃদ্ধি পায়। স্বেদযুক্ত কিউ এর তালু। কিউ যেন তার হাতের তালুর সাহায্যে, আমার হৃদয়ে কোনো বার্তা প্রেরণ করে। নিবিড়, নির্ভরশীলতার বার্তা আমার অন্তর অনুভব করে, আমি নির্বাক তার জবাব দিই "আমি আছি কিউ। আমি তোমায় ত্যাগ করবোনা, তোমায় আঘাত করবোনা, তোমায় দুঃখ দেবোনা! মানস যা করেছে, তার জন্য আমার কিছু করার নেই, সে ব্যাপারে আমি বলতে নারাজ। তবে কথা দিচ্ছি মানসের মত ব্যবহার করা আমার দ্বারা সম্ভব নয় এবং আমি করবো না। আমি তোমায় কোন অজুহাতে ত্যাগ করবোনা, বরং পূর্ণ মর্যাদায়, যথার্থ শ্রদ্ধা সহকারে তোমার অবদানকে আমি স্বীকৃতি দেবো, ঘোষণা করবো কিউ এর অবদানে আমি পূর্ণ আমি কিউটির প্রতি কৃতজ্ঞ, আমি কিউটিকে ভালবাসি। কিউটি আমার শ্রস্টা।" জানিনা আমার নির্বাক উত্তর কিউ হৃদয়ঙ্গম করলো কিনা!

—মাঝে মাঝে আমার কষ্ট হয় বসন্ত, মনে হয় আমার জন্য তুমি তোমার সংসার থেকে আলাদা হয়ে গেলে।

—ঠিক নয় কিউ। একা আমি চিরকালই মাঝের দুটি একটি বছর ছাড়া। অবশ্য বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন বাবা আমার প্রিয়তম সাথী ছিলেন। রুচী আমার স্ত্রী। রোহিত আমার ছেলে, সামাজিক দিক থেকে যথার্থ তারা স্ত্রী এবং সন্তান। কিন্তু রুচীর সৃষ্টি রুচীর জগৎ, রুচীই সে জগতের প্রহরী। সেখানে প্রবেশে আমি ব্যর্থ। রুচী বুদ্ধিমতি, আত্মমর্যাদা সম্পন্না মহিলা। নিজের জগতে নিজে একাকি সুখ দুঃখ নিজে রচনা করে সে একাই উপভোগ করে, সেখানে অন্য কারো শেয়ার নেই। সে করতে চায়না। জানিনা, হয়তো তার জন্য আমার ত্রুটি থাকতে পারে, অস্বীকার করছিনা, একদা পড়াশুনা, নিজের গবেষণা নিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে পাগলের মত ঘুরেছি, দিবারাত্র ব্যস্ত থেকেছি, হয়তো ফ্ল্যাটে থাকতেও রুচী ও রোহিতের জন্য সময় দিতে পারিনি, তা বলে তাদের

প্রতি অবহেলা বা উদাসীনতা কোনদিন ছিলনা। আমি হলফ করে বলতে পারি আমি রুচীর প্রতি যথার্থ আন্তরিক ছিলাম। একথা ঠিক রুচী আমার কাজে কোন দিন বাধা দেয়নি, আমার কাজের সময় নিজের স্বার্থে চুরি করেনি। তবে রুচী কেন যেন নিজে একা থাকার অভ্যাস গড়ে তুলেছিল ধীরে ধীরে। একা একা বাঁচার কৌশল আয়ত্ব করে ফেলেছিল। রোহিত জন্মানোর পর রুচী রোহিত কে পেয়ে গেল, রুচীর জীবনে আমার আর কোন প্রয়োজন রইলো না। রুচী রোহিতের প্রতি সন্তানস্নেহে বিকল্প অবলম্বন খুজে পেল। রোহিত রুচীর মনের শূন্য জায়গা পূর্ণ করে দিলো। ওর কোন অসুবিধা হয়না। আমার জীবন থেকে রুচীর সরে যাওয়ার কারণ তুমি মোটেই নও। সরে যাওয়া ঠিক নয়—একা নিজের মত বেঁচে আছে সে, আমার জীবনযাত্রাকে সে ব্যাহত করেনা। তবে এটাকে তো সঠিক দাম্পত্য জীবন বলে না।

—শুধু তোমার জন্যই নয়, রুচী আন্টির জন্য আমাব কষ্ট হয়। তোমার মনেও তার জন্য দুঃখ আছে।

—থাকাটা স্বাভাবিক। রুচীর কঠোর জীবন যাপন, সংযম, শুধু আমাকে নয়, নিজেকে বঞ্চনা করা নিশ্চয়ই আমায় কষ্ট দেয়। কিন্তু প্রতিকারের উপায় খুঁজে পাই না। স্ত্রীর কাছে স্বামী শুধু সমবেদনা বা দায়িত্ব পালনই আশা করেনা, জৈবিক চাহিদা অস্বীকার করা যায় না। মনের সাথে মানুষের শরীরের ক্ষুধাও আছে। শারীরিক ধর্ম, অনেকাংশে জীবন যাত্রার মধ্যে দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে, সে আচরণে অকস্মাৎ বিচ্যুতি মানুষকে উন্মাদ করে তোলে। তাই বলে কি দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ হয়না? হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে, মৃত্যু হতে পারে, সে অবস্থা মানুষ সহ্য করে কি করে? করতে বাধ্য হয়। কিন্তু রুচী ও আমার মধ্যে দাম্পত্যজীবনে এ হেন যৌন নির্লিপ্ততা বড় বেদনাদায়ক এবং দুঃসহ। মানুষের সুস্থ চেতনা বিনষ্ট হয়, জীবনের ভারসাম্য ব্যাহত হয়।

—বুঝেছি।

—কিছু বোঝোনি। একজন পুরুষ তার নারীর কাছে থেকে শুধু সমবেদনা আশা করেনা। আশা করে অনেক কিছু।

—যথা।

আমি উত্তর দিই না। একমাত্র মাথাতুলে কিউএব চোখে চোখ রাখি।

—বুঝেছি। তোমাকে আর বোঝানোর কষ্ট করতে হবেনা।

—তুমি এ মনের অবসন্নতা দূর করেছো কিউ। নয়তো মৃতপ্রায় এ মনের মৃত্যু সম্পূর্ণ হতো নিশ্চয়।

—সেই অবসন্নতা তোমায় পুনরায় গ্রাস করতে পারে, পুনরাবৃত্তি তোমায় পীড়া দিতে পারে। পারবেনা?

—আশা পূরণ না হলে কষ্ট হয়, মন বিষণ্ণ হয়, আমার এই বয়সে নতুন কোনো আশা বা স্বপ্ন উদয় হবেনা, বলে মনে হয়। মনে হয় পৃথিবীর কাছে আমার নতুন কোন আকাঙ্খা নেই, সে কারণে হয়তো আশাহত হবার আশঙ্কা সে রকম নেই।

—নির্মম সত্য কথা। মানবদার মত সিরিয়াস ছেলেও বাবার কথায় আমাকে ভুলে গেলো, বিয়ে করে নতুন ভাবে ঘরসংসার করছে। আমি তো আজো পারলাম না। মানবদার প্রতি আমি আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম, মানবদার ভালবাসা ছাড়া আমার কাছে

অন্য জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব ছিল।

—মানবের আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। তোমায় যখন সে ভালবাসতো, তখন সে সাবালক তার বাবা ও মায়ের মানসিকতার খবর নিশ্চয় তার জানা ছিল। অন্ততঃ সজোরে সে ঘোষণা করতে পারতো তার ভালবাসার কথা, বাবা মায়ের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারতো। মানবের সেই সাহসের অভাব ছিল, নতুবা।—

—ভীরু! দূর্বল চিত্ত। তুমি বলো বসন্ত, আমার জন্মের জন্য কি আমি দায়ি?

—সাধারণ মানুষ সে কথা বিচার করেনা। বুঝলেও বাস্তবে স্বীকার করেনা।

—মানস আঙ্কেল কি সাধারণ মানুষ?

—বেসিক্যালি তাই, অতিসাধারণ দুর্বল মধ্যবিত্তের মানসিকতা—

—তুমি যদি সেদিন আমায় প্রত্যাখান করতে? রুচী আন্টি করতো—

—হয়তো সেদিনই তুমি তোমার সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করতে। অবস্থা মানুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে। যা হৌক তা যখন হয়নি—

—হয় আত্মহনন নয় প্রতিহিংসা—বিকল্প কোন পথ ছিলনা।

—তুমি ভাল মেয়ে।

—স্বান্তনা। স্রেফ্ স্বান্তনা বসন্ত। মাও বলতো, আমি ভাল মেয়ে। সেই মাও মানস আঙ্কেলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেনি। মানুষ ভাল না মন্দ নির্ভর করে বংশের ওপর, তার স্বভাব প্রকৃতির ওপর নয়—না! মায়ের মুখের কথা নিশ্চয় মনের কথা ছিলনা, অথবা শুধু ছলনা ছিল। ওরা আমার প্রবঞ্চিত করেছে।

—ছিঃ কিউ, এ সব বলতে নেই। ওরা গুরুজন।

—আর আমার নিজের বাবা মা, রক্তের অধিকারে যারা বাবা মা—

কাতর সপ্রশ্ন দৃষ্টি কিউ এর। দীর্ঘদিন পর সেই পূরানো কথা। অর্ন্তজ্বালা। বড় কষ্টের, বড়ই লজ্জার। যার দায় কিউ এর নয় অথচ ফল ভোগ করতে হচ্ছে কিউকে। দুটি জীবন-কিয়ৎকালের নির্বোধ কামনার ফসল কিউ। কোথায় তারা? কোন খবর নেই, জ্ঞানে অজ্ঞানে তাদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কোন সুযোগ নেই কিউএর। সেই অদৃশ্য বাবা মায়ের জন্য কিউ এর বিড়ম্বনা। নেহাৎই কারুণ্যে তার প্রতিপালন।

পাহাড়ে এক মাস কাটিয়েছে। ফিরতে হবে। তবুও পাহাড়ের পথে পথে হাঁটার আকর্ষণে শেষ লগ্নেও হাঁটতে বেড়িয়েছে। বেরিয়ে পাহাড়ে সৌন্দর্যের আকর্ষণ কে যথার্থ উপলব্ধি করেও দুটি হৃদয় দুটি হৃদয়ের কথা পাহাড়কে সাক্ষী রেখে ব্যক্ত করে চলেছে। মনোরম পরিবেশ। অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেও পাহাড়ী মানুষগুলো কে বেঁচে থাকতে উৎসাহিত করে। শহর থেকে পাহাড়ে এসে কিউ এর এটিই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। অশান্ত দুঃখ জর্জরিতা কিউ পাহাড়ের শীতলতায় মানসিক তৃপ্তি পেয়েছে। কর্মক্লান্ত জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে বেশ আরাম পাচ্ছে। অথচ এতকাল কি প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়েছে। মানুষ জানেনা কিসে তার সুখ, কিসে দুঃখ। সুখ দুঃখের বিচার না করে প্রলুব্ধ হয়, আঘাত পায়, দুঃখ নেমে আসে। মন যদি তৈরি থাকে, যথেষ্ট সবল হয়, তবে এই সবলা পৃথিবীর কাছে তাকে পরাভূত হতে হয়না, অকাঙ্খার কাছে পরাভূত হতে হয়না। মনের মধ্যে বিন্দু বিন্দু সঞ্চিত দুঃখের সাগর রচনা করতে হয়না। মানুষ পূর্বাপর চিন্তা না করে অহেতুক দুঃখের কাছে এগিয়ে গিয়ে দুঃখের সাগরে অবগাহন করে, হাহুতাশ করে। কিউ এখনো তার অতিতকে প্রাধান্য দিয়ে বর্তমানের সুখের মুহূর্ত

গুলোকেও হারাচ্ছে। হয়তো বা অতিতকে প্রত্যাখ্যান করার সঙ্কল্প করছে।

—আমার মনে হয়, তোমার বাবা মায়ের তোমাকে সেদিনে ত্যাগ করার জন্য দায়ী তাদের অসহায় অবস্থা। অপ্রত্যাশিত ভাবে তুমি জন্মানোর পর, দুটি সংসার অনভিজ্ঞ যুবক যুবতী, তোমাকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ তোমার জন্ম সমাজ সম্মত, ধর্মসম্মত নয়, তার ওপর, পরিবারের ভয়, সমাজের ভয়, আর্থিক অসহায়তা ওদেরকে প্রচণ্ড বিব্রত করে। মানসদার চাকরী বদলিযোগ্য। মানস শহরের বদলি হয়ে গেল, ওরা কোথায় যাবে, ইত্যাদি ভাবনা, তার ওপর একে অপরের প্রতি ভালবাসা, পাছে একে অপরকে হারাতে হয়, এই আশঙ্কায়, ওরা তোমাকে ত্যাগ করে। তবে, এ ভাবে পালিয়ে যাওয়াকে আমি সমর্থন করিনা। মানুষ অবস্থার দাস।

—আমার মা না হয় অসহায় ছিল। তার কোন জায়গা ছিলনা, কিন্তু বাবা?

—মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা কট্টর। হয়তো সে সমাজের ভয়কে উপেক্ষা করতে পারেনি, আবার তার ভালবাসার জনকেও হারাতে চায়নি। হয়তো অন্য কোথাও নিজেদের পরিচয় গোপন করে দুজনে নতুন করে সংসার পেতেছে।

—আমি কি সত্যিই সেদিন এতো বোঝা ছিলাম? আসলে ওদের অন্তরে স্নেহ প্রেম, দয়া, মায়া কিছু ছিলনা।

—না হয়না।

—সেটাই হয়েছে। যা ঘটনা ঘটেছে তা থেকে এই সিদ্ধান্তে সহজে আসা যায় যে ওরা আত্মসুখের জন্য আমায় বলিদান দিয়েছে।

—চলো ফিরি।

চমকে উঠে। কথা বন্ধ করে কিউ। ইচ্ছা না থাকলে উপায় নেই। ফিরে যেতে মন চাইছেনা। পাহাড়ে মায়া বসে গেছে। ইচ্ছা না থাকলেও ফিরতে হবে। প্রতিদিনের মত ছোট শিশুরা ইউনিফর্ম পরে স্কুলে চলেছে, চলেছে বড় মেয়েরা সালোয়ার কুর্তা পরে—সাদা সালোয়ার, নিল কূর্তা, সাদা ওড়না বুকের ওপর ছড়ানো। পাকা সড়ক নয়, পাকদণ্ডি ওদের পথ। পথের দু পাশে বাগান, ঘন সন্নিবিষ্ট, সামান্যতম চাষের জায়গাও ওরা অপচয় করেনা। অসমতল জমিতে ছোট ছোট নিচু ঘর, জানালা নেই বললে চলে, নিচু দরজা, ঘরের সামনে পিছনে ফুল ফুটে আছে। ফুল এদের প্রিয়। একজন বৌ, গাঁয়তি, খুরপি চালিয়ে জমি তৈরি করছে, টমেটোর চাষ করবে। পাহাড়ী মেয়েরা পরিশ্রমী, পাতলা গড়ন, মেদমুক্ত শরীর; শহর ও শহরতলীর মেয়েদের মত এদের শরীরের গঠন নয়, শহরের বেশির ভাগ মেয়েদের কুড়ি পেরোলেই শরীর গড়ন বদলে যায়, সেরকম শরীরের গঠন এ কদিনে আমার নজরে আসেনি। রুচী মোটা নয়, বিয়ের আগেও পরে, আজো সে স্থুলাঙ্গি নয়। মাঝারি উচ্চতা, পাতলা গড়ন, চোখে চশমা, ব্যক্তিত্বে উদ্বেল, ওকে অধ্যাপিকা হিসাবে যথার্থ মানায়। পরিমিত এবং পরিশীলিত কথা বলে, আবেগ শূন্য। রুচীর সাথে কথা বলে মনে হলো, হায়দ্রাবাদ ওর কাছে পুরানো হয়ে গেছে, হয়তো ফিরবে। ওর যেখানে ভাল লাগে, যা কিছু ভাল লাগে করুক আমি বাধা দিইনা, দেবোনা।

গেষ্ট হাউসে ফিরলাম। ফেরার পথে, স্বল্প সময়ে কত কিছু মনে এসে গেল, কিউটির জন্ম বৃত্তান্ত থেকে রুচীর অভ্যাস—সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি। সংক্ষিপ্ত জীবনের সংক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থার নিছক, সাদামাটা বর্ণনা।

সেই কিচেনে। কিউ নয়, আজ দিগ্‌কে বলা হয়েছে, যা করার সেই করবে। কিউটিওর নিজের ঘরে। আমাদের ফিরতে দুদিন বাকি আছে। সময় বড় দ্রুততার সাথে এগোচ্ছে। কিউ কিছু সময়ের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে কিচেনে দিগ্‌এর পাশে, ফেরার চিন্তায় কিউ সামান্য বিমর্ষ, চঞ্চলা ওর মন। আমার মনও হঠাৎ যেন চঞ্চল হয়ে পড়েছে। অতিত ভবিষ্যৎ বর্তমান---রুচী, রোহিত, কিউ, নিজেকে নিয়ে মনের ব্যস্ততা জীবনে প্রথম। সকলের কথা মন জুড়ে বসেছে, যদিও কিউ এর প্রাধান্য বেশি। স্বাভাবিক। বিশেষ করে কিউ এর আচরণের পরিবর্তন, কিউ এর মন খুলে কথা বলা বা বলতে পারাটা শুভ লক্ষণ। বিগত কয়েকবছর কিউ আমার কাছে আছে, মুমূর্ষু মনের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে। আমার সৌহার্দ্য, সাহচর্য, আন্তরিকতায় কিউ সুস্থ্য হয়ে উঠলেও স্বাভাবিক হতে পারেনি। যে কারণে ওর মানসিকতার প্রকৃত চিত্র ও তথ্য এতদিন আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। রোগের প্রকৃত বিশ্লেষণ না হলে যেমন রোগমুক্তি হয়না, হয়তো সাময়িক যন্ত্রণার উপশম হয়, সে রকমই কিউএর মানসিক যন্ত্রণার উপশম হয়তো হয়েছে কিন্তু মানসিক কষ্ট বা রোগের মুক্তি ঘটেনি। পাহাড়ে এসে ওর মনের ক্ষত আমার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ল। কিউ একদিকে তার যন্ত্রণা: তার জন্মগ্রহণ নিয়ে বিপত্তি তারপর কৈশরের শেষ লগ্নে, হঠাৎ জানতে পারে যে সে, যাদের বাবা মা ভাইবোন বলে জানে, তারা তার কেউ নয় এবং তার আপন বলতে কেউ নেই, সকলেই পর এবং সর্বশেষ, যৌবনের প্রথম প্রণয়ে বিপত্তি এবং প্রতারণা---সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে নিষ্পাপ জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা শূন্য লাবনী। স্বপ্নের রঙের মানুষ যখন মনের আকাশে উড়তে শুরু করেছে, কোথা থেকে যেন শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করে ফানুসগুলোতে ছিদ্র সৃষ্টি করলো, ধপাস পৃথিবী অর্থাৎ বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে পতন। সেই পতনের আঘাত সামলাতে যখন সে ব্যস্ত যৌবনের আকাঙ্খার কুঞ্জবনে ফুল ফোটালো মানব, একদা জানা তার নিজের দাদা, অথচ সে তার কেউ না। মনের ভিতরে বাঁশি বাজল বা রোপিত হল সেই বীজ, যার নাম প্রণয়, বঙ্কিম বাবুর ভাষায় প্রণয়রজ্জু। সীমাহীন এ স্বপ্ন। স্বপ্ন ভেঙে গেল, কিউ এর ভাষায় সে প্রতারিত হল। এই যে ক্ষত, যা কোনকালে জোড়া লাগেনা, এ ক্ষতের দাগ, শিশুকালে টিকার দাগের মত অন্তরে রয়ে যায়, কিউ এর অন্তরে আজো তা ক্ষত। হয়তো এ ক্ষত সেরে যাবে। কিন্তু দাগ রয়ে যাবেই। এই পাহাড়ে এসে আবিষ্কৃত হল প্রথম সেই ক্ষতের রূপ, আমার এবারে প্রচেষ্টা হবে ঐ ক্ষতকে সাড়িয়ে তোলা, জানিনা সম্ভব হবে কিনা, তবে প্রকৃত মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন। কতটুকু পারবো? এই বয়স, মনের ক্লান্তি বা অবসন্নতা! আমি কৃতজ্ঞ কিউ এর প্রতি কারণ কিউএর মৃতপ্রায় মস্তিষ্কের কোষগুলোকে সজীব করে সৃষ্টিশীল করে তুলেছে, সেই সজীবতা দিয়ে কিউ এর হৃদয়ের ক্ষত দূর হবে? তবুও কিউকে সারিয়ে তোলা, সজীবতায় ফিরিয়ে আনা, বিকশিত করা আমার দায়িত্ব।

এই লজের ব্যালকুনিটি আমার প্রিয়তম স্থান। এখানে বসলেই আমি আমার হাতের কাছে পাই আকাশ নানা বর্ণের, পায় সবুজ বনানী শোভিত কুমায়ুন, সারি সারি পর্বতমালা, দিনের সূর্য, রাতের চাঁদ তারা সর্বোপরি সম্পূর্ণ নিজেকে। এত সময় কিউকে নিয়েছিলাম, সেখানে স্থান কাল কিছু ছিলনা, ছিল একমাত্র বসন্ত আর কিউ। এবার আমি হাজির হয়েছি আমাব স্থানগত, আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতা মণ্ডিত স্থানে। দিগ্‌কে বলা আছে, একটা গাড়ি ব্যবস্থা করে দেবে, গাড়িতে করে কাঠগোদাম এবং ট্রেনে চেপে

কোলকাতায়, গরম আবহাওয়া, মানুষের ভিড়, ব্যস্ততা, দুটি ফ্ল্যাট একটাতে কিউ থাকে, আমার কর্মস্থল, লাইব্রেরি, কম্পিউটার, ম্যানুস্ক্রিপ্ট, ম্যাগাজিন, বই ইত্যাদি সাথে কিউ এর সংসার, সেখানে আমার সারা দিনের কাজ, শোওয়া বসা বিশ্রাম এবং প্রায়শঃই কিউ এর সাথে রাত্রিযাপন—অভ্যস্ত। অন্যটি শূন্য, আসবাব, পোষাক পরিচ্ছদ আর স্মৃতি বিজড়িত যৌবন। সে স্থান শূন্য। রোহিত থেকে গেছে হায়দ্রাবাদে। তার মা রুচী, ছেলের কাছে আছে দীর্ঘ কয়েকমাস। ফ্ল্যাটে থাকার মধ্যে মানদা মাসি রুচীর বিয়ের পর পর এই ফ্ল্যাটে এসেছে, আজো সে ঐ ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও যায়নি। ঘর দোর দেখাশোনা, কাজকর্ম করা। খাওয়া দাওয়া করা, রুচী যাওয়ার পর প্রায়শঃই একা থাকে। মাঝে মধ্যে আমার সকালের জল খাবার, দিনের বা রাতের খাবার করে দেয়, যেমন পারে। চলে যায়, আমার অভ্যাস আছে। বাড়ি ফিরে সেখানে গিয়ে থাকা—একা, ভাবলে ভয় করছে। এই বয়সে পাশে কেউ না থাকলে চলে? সাহচর্যের প্রয়োজন আছে। সোজা কলকাতায়, অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা মরে গেছে।

বেশ ছিলাম এখানে। কিউ নিজে হাতে রান্না করে, পাশাপাশি বসে যত্ন করে খাইয়েছে ও গল্প করতে করতে নিজে খেয়েছে। পাশাপাশি বসে প্রাণখুলে হাসা, গল্প করা, হাতে হাতে জড়িয়ে বেড়ানো, এক সাথে গায়ে গা মিশিয়ে কম্বলের নিচে ঘুমানো। মন খুলে দুটি অসমবয়সি নরনারীর হৃদয়ের সাথে হৃদয়ে ও শরীরে মিলন রচনা করা—কোলকাতায় ফিরলে, হবেনা। এত আরাম, নিশ্চিন্ত জীবন, অপূর্ব আবহাওয়া কলকাতায় আশা করা যায়না। পুরানো অভ্যাসের ফিরতে সময় লাগবে। একই অবস্থা হবে কিউয়েরও।

কলকাতার ভিড়, ব্যস্ত জীবন, শহরের পথঘাট জন সমুদ্র, জীবনযাত্রার উপকরণ সমূহের স্বল্পতা, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার কথা চিন্তা করলেই মন থমকে যায়। ফেরার উৎসাহ হারিয়ে যায়। হতো না যদি ঘরের আকর্ষণ থাকতো। কি ছন্নছাড়া আমাদের সংসার। তিনটি প্রাণী তিনজনের প্রকৃতি, মানসিক গঠন ভিন্ন। যদিও রুচী ও রোহিত একত্রে থাকে—একত্রে থাকতে অভ্যস্ত, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল এবং দুজনে দুজনের কাছ থেকে বাঁচার রসদ পাচ্ছে, আমার সাথে কারো মিল নেই। ওদের জগৎ ও আমার জগতের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। রুচী আমার জগৎ থেকে শুধু নিজেই সরে যায়নি, রোহিতকে যত্ন সহকারে আমার কাছে আসতে দেয়নি। ট্র্যাজেডি। আমি আজো বুঝিনা কি করে এটা সম্ভব। এই যে দিনের পর দিন আমি কিউ এর সাথে বাস করছি, কিউকে নিয়ে পাহাড়ে পর্বতে বিভিন্ন স্থানে দুজনে ভ্রমণ করছি রুচীর সে জন্য কোন উদ্বেগ নেই, রোহিতের মনে সংশয় নেই, অভাববোধ নেই—কি করে সম্ভব? ওরা তো আমার স্ত্রী ও সন্তান। কিউ কে? কিউ এর সাথে আমার কিসের সম্পর্ক?

আসলে রুচী আমার কাছ থেকে নিজে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিল, রোহিতকে একমাত্র তার নিজের করে বড় করে তুলেছিল, অথচ মনের মধ্যে দ্বন্দ ছিল, ছিল আত্মগ্লানি, কিউ আসার পর থেকে রুচী যেন আশার আলো দেখলো, যাক সে নিশ্চিন্ত, বসন্তকে দেখার জন্য কিউ আছে, ততদিনে কিউ ও আমি উভয়ে উভয়কে আঁকড়ে ধরে মানসিক স্থিতিশীলতা বা শান্তি পেতে চাইছি। সেই থেকে বোধ হয় রুচী নিশ্চিন্ত, মাঝে মাঝে কর্তব্যের খাতিরে খোঁজ করে আমি সুস্থ্য আছি কি-না।

সুস্থ্য আছি। ভালো আছি। এত ভালো কোনদিন ছিলাম না। কিউ না এলে আমার

অসম্পূর্ণ থাকতো। আমার সৃষ্টি অপূর্ণ থাকতো, মানসিক ক্লেশ সহ্য করতে না পেরে কোথায় ভেসে যেতাম, কে জানে!

কিউটির পুনরুত্থান ঘটছে, ও সম্পূর্ণ সেরে যাবে, আমার বিশ্বাস, আমাকে কিউ এর বেঁচে থাকার জন্য স্থায়ী অবলম্বন খুঁজে পেতে দিতে হবে, ওকে সমাজের আলোয় ফিরিয়ে আনতে হবে, অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ওকে বাঁচতে হবে কেন? কোলকাতায় ফেরার পর এটাই হবে বড় কাজ। এতকাল এ বিষয়ে গভীর ভাবে ভাবিনি। স্বার্থপরের মত ওর সেবা গ্রহণ করেছি। ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার মূল্য কিউ এর আত্মবলিদানে নয় বরং আত্মপ্রতিষ্ঠায়।

রোহিতের বিয়েব কথাবার্তা পাকা। শুধু আমার হায়দ্রাবাদে যাওয়ার প্রতীক্ষায়, আমার মত হলে দিনক্ষণ স্থীর হবে। বিয়ে বিষয়টা খুব জটীল। আমার নিজেকে দিয়ে মনে হয়। প্রবাসী বাঙালী, হায়দ্রাবাদ শহরে দীর্ঘদিন থাকে, মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। রোহিত যে ফ্ল্যাটে থাকে, তারই নিকটস্থ কোনো বাড়িতে থাকে। মেয়েটির বাবা সরকারী অফিসার। হয়তো যাওয়া আসার পথে রোহিতের সাথে পরিচয়, পরবর্তী সময়ে প্রস্তাব এবং মেয়েটিকে রুচীর পছন্দ। পছন্দ পাত্রীপক্ষের বাড়িরও। ওদের পছন্দ হলেই হলো, যারা বিয়ে করবে, তাদের, পছন্দই প্রথম এবং প্রধান কথা। আমার যাওয়া নেহাৎই সামাজিকতা। যেতে হবে নইলে সামাজিকতার দোষে আমি দোষী হব, রোহিত এবং রুচীর সম্মান রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। সংসারের দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। রোহিতের বিয়ের ব্যাপারে সামান্য ও দায়িত্বটুকু পালন করবো। সংসারী হিসাবে আমি প্রকৃতই ব্যর্থ।

কিউটির শেষ প্রচেষ্টা, বিভিন্ন সময়ে আমার লেখা প্রবন্ধগুলোকে গ্রন্থায়িত করার সে চেষ্টা করছে, অনেকটা এগিয়েছে, ফেরার পর সেটাকে যথার্থ রূপ দিতে হবে। বইটির স্বত্ত্বও লাবনীর নামে করে যাবো, ভবিষ্যাতে যাতে ওকে আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন না হতে হয়। যদিও এই ফ্ল্যাট এবং আমার আরো দুটি বই এর স্বত্ত্ব কিউকে নোমিনেট করা আছে।

দিগ্ আর কিউ কিচেনে। দিগ্ কিউটি ও আমার মধ্যে সাময়িক হলেও একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। দিগ্ ওপরে এসে কাজ করে, ওর বৌ তলায়, সন্ধ্যার সময়ে ঠিকেদারের কাছ থেকে দিনের কাজের শেষে ফিরে স্নান করে, জামা কাপড় কাচে, রোটি করে, সবজি বানায়, খেয়ে শুয়ে পড়ে। কিউকে দিয়ে দিগ্‌কে বলেছি, দিগ্ বৌ ছেলে নিয়ে ওপরে আমাদের সাথে খাবে। দিগ্ লজ্জায় মাথা নিচু করে বার বার নিষেধ করেছিল- - বাবুদের সাথে সাহাবদের সাথে খেলে ওর নোকরি চলে যাবে। অনেক বুঝিয়ে আপাততঃ নিমরাজি। কিউ বেজায় খুশি। সে নিজে দিগ্‌কে দিয়ে বাজার করিয়েছে, দিগ্‌কে দিয়ে কাটিয়ে রেডি করিয়েছে--সে নিজে রান্না করবে। নেপালে জন্মেছিল দিগ্ বাহাদুর, তার বৌ নেপালের মেয়ে, ছেলে জন্মেছে এদেশে—এ দেশেই বাস, কাজ কারবার, জীবনধারণ—নেপালি বলে চেনা মুশকিল। নেপালি স্বত্বা রূপান্তরিত ভারতীয় স্বত্বায়। ভাষা, জাতি, দেশ-সবই মানুষের সৃষ্টি মানুষের প্রয়োজনে আবার সেই মানুষই পার্থক্য ভুলে এক হয়ে যায় মানুষেরই প্রয়োজনে। দিগ্ বাহাদুরের সাথে পাহাড়ের অন্য মানুষের কোন প্রভেদ নেই এই কুমায়ুনে।

কিচেন থেকে রান্নার গন্ধ পাচ্ছি। কয়েক টুকরো নোনতা কাজু প্লেটে সাজিয়ে দিয়ে

যায় কিউ। একটা একটা করে মুখে ফেলি, সুস্বাদু কাজু চিবোয়, সামনের সবুজ পাহাড় দেখি, মাথার ওপর আকাশ আলোয় ভরা—একজন দুজন মানুষ, ছেলে মেয়ে কখনো সখনো চোখে পড়ে। অন্য নতুন কিছু দেখার নেই। যদিও এই দৃষ্টি নন্দন পাহাড়ের সারি মনের অফুরন্ত খোরাক জোগায়। কার্পন্য নেই। মন নিজে থেকে পাখা মেলে, সক্রিয় হয়, চিন্তার মহাসুমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে বেড়ায়, কখনো ডুব দেয় সৃষ্টির অপার অনাদি রহস্যে। আমি এই ক'দিন নিজের জীবন রহস্যে মনের সুখে সাঁতার কাটলাম, যোগ বিয়োগ করলাম। কিউ যুক্ত হল অতিতের বন্ধ ঘুলঘুলি থেকে। কফি নিয়ে এল কিউ, এক কাপ আমার জন্য অন্য কাপ ওর নিজের। বসলো আমার পাশে।

- লাঞ্চের দেরি হবে।

কোন অসুবিধা নেই। ভাল হয় যদি কিউ কিচেনে না ফিরে আমার পাশটিতে বসে থাকে।

তুমি বোসো। দিগ্ যেমন পারে রাঁধুক না।

--ঠিক আছে। দরকার হলে যাবো।

কফি পান শেষ করে দুজনে পাশাপাশি বসে আছি। কোন কথা নেই—নীরবে দুজনে। দূর পাহাড়ে দৃষ্টি অচঞ্চল। কিউ গম্ভীর অথচ লুকিয়ে আছে প্রসন্নতা। মনের কথা লেখা থাকে চেহারায়। কিউকে দেখলে বোঝা যায়।

--রুচী আন্টি কবে ফিরবে—কিছু জানিয়েছে?

---না তো।

--অনেকদিন গেছেন।

--রোহিত একা হয়ে যাবে।

---তুমিও তো একা।

--কেন? তুমি আছো। সেজন্যেই তো রুচী নিশ্চিন্ত। তোমার ওপর আমার ভার অর্পণ করে রুচী চিন্তামুক্ত।

---বেশ মজার কথা। এক দল আমার ভার তোমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে খালাস, আর আন্টি আমার ওপর তোমার ভার ছেড়ে দিয়ে মুক্ত।

---এসব কথা থাক্ কিউ, বরং অন্য কথা বলো।

—বলার কিছু বাকি নেই। ফিরে তোমার লেখার ম্যাটারগুলো তৈরি করার পরিকল্পনা করছি। সেটাই ভাবছি।

—যা করার তুমি কোরো।

--- বেশ।

—কম্পিউটারে করা আছে। একবার মিলিয়ে তোমায় প্রিন্ট বের করে দেবে, এডিট করে দেবে, আমি সাজিয়ে নেবো।

—রূপা বার বার তাগাদা দিচ্ছে। কালেক্টেড আর্টিকেল গুলো ওদের দেবো, ওরা পাব্লিশ করবে।

দিগ্ আসে কিউকে ডাকে। কিউ কিচেন থেকে ফিরে এসে খবর দেয় রান্না শেষ হয়েছে।

—বোসো। পরে খাবো। কথা বলো। ছবি দেখো। কাজের কথা না। কাজ কলকাতায় ফিরে করতেই হবে। কলকাতায় গিয়ে ভাবলেই হবে। বরং বাকি সময়টুকু অন্য কথা

বলো, যে কোনো কথা, কাজের কথা বাদ দিয়ে—

—ঠিক আছে। চেষ্টা করবো।

বসে। প্রশান্ত উদ্বেগহীনা কিউ। কোন কথা বলেনা। বলার নেই বা বর্তমানে বলতে ইচ্ছা করছেনা। বা তাৎক্ষণিক তার কোন কিছু বলার নেই। পরীক্ষার পড়ার মত মুখস্থ বলা নয়। যথার্থ পরিবেশে যদি বলার কথা মুখে আসে সে বলতে দ্বিধা করবেনা। বসন্তের কোনো ইচ্ছাই সে অপূর্ণ রাখবেনা। মনে মনে প্রস্তুতি নেই, ছোট্ট জীবনের মনের কোনে লুকিয়ে থাকার কথা, গল্প—মনে যেটুকু পড়বে কিউ বলতে দ্বিধা করবেনা। কিউএর প্রশান্ত চেহারার অন্তরালে উঁকি দিচ্ছে হাজারো কথা। কিছু সময় পরে দিগ্ মাথা নিচু করে ব্যালকুনিতে উঁকি দেয়।

—চলো খেয়ে নিই। দিগ্ ফ্রি হবে। রেডি করো দিগ্।

দিগ্ ঘাড় নিচু করে কিচেনে যায়। খাবার, প্লেট, গ্লাস, জল টেবিলে সাজায়। কিউ সাহায্য করে। আমি বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে টেবিলে বসি। দিগ্ খাইয়ে নিচে যায়। আমরা ব্যালকুনিতে বসি। সিগ্রেট ধরায়।

—বিকালের দুটো আইটেম্ করে রাখলাম। মাংস আর রুটি রাত্রে করে নেবো। দিগ্ ও রুটি করতে পারে।

—কাল চারটে নাগাদ বেড়োলেই হবে। দিগ্ বলেছে গাড়ি তিনটেয় আসবে।

—নো প্রবলেম্। আমি পুরো প্রস্তুত।

বিকেলে ঘুরতে বেরোয়নি, ব্যালকুনিতে বসে কাটিয়েছি দুজনে। দুপুরের বিশ্রাম কিউ চেয়ারে আমার পাশে বসে কাটিয়েছে। রাত্রে ঘুমিয়েছি দেরি করে। চুপচাপ বসে থেকেছি। মাঝে মাঝে কিউ গল্প করেছে, হ্যাঁ হুঁ করে সাড়া দিয়েছি—আমি শুনেছি। মাঝে মাঝে আমাকেও বলতে হয়েছে। বলার চেয়ে শোনার আগ্রহ আমার বেশি কারণ কিউ এর প্রতি আমার আগ্রহ, কিউএর অস্বাভাবিক অতীত। কিউএর কথার সাথে মিশিয়েছিল কোথাও সুখের শিহরণ কোথাও বা দুঃখের হা হুতাশ। সবুজ প্রকৃতির পাহাড় কোমলতা কুমায়ুনের শহর হৃদয়কে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। উত্তুরে হাওয়ায় পাতায় কখনো মৃদু কখনো তীব্র শিহরণ। সূর্যের আলোয় কখনো ঝিকিমিকি, সাঁঝের বেলায় নরম রোদে রাঙানো বারিহীন মেঘদল আবার রাতের তারায় ভরা আকাশের নিচে গম্ভীর মায়া জড়ানো প্রকৃতির বুকে দুটি অসম বয়সী মানব মানবী তাদের ভবিষ্যৎ বর্তমান বিস্মৃত হয়ে একাত্ম হয়ে গেছে।

কিউ কখনো কিশোরী, ভাই বোনে ঝগড়া, মায়ের আঁচল ধরে দাদার বিরুদ্ধে নালিশ, ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠা, মায়ের কোলে বসা আদর খাওয়া আর তার দাদা মানবের ভাগ্যে বকুনি। কান্না বন্ধ। স্কুল থেকে রেজাল্ট এনে মায়ের হাতে তুলে দিয়ে আনন্দ এটা ওটা বায়না করা। তখনো মানস আঙ্কেল কলকাতায় ফেরেনি। দুই ভাই বোনে একটা টেবিলের দু পাশে দুজনে বসে লেখাপড়া করতো। মানবের উঁচু ক্লাশের পড়া ওর নিচু ক্লাশের, কিউ জোরে জোরে চেঁচিয়ে পড়তো, মানব পড়ত মনে মনে। কিউ এর পড়ার শব্দে মানবের পড়ার অসুবিধা হতো। মানব মায়ের কাছে নালিশ করলে নিষ্পত্তি হতো কিউকে মায়ের পাশে কিচেনে পড়া মুখস্থ করা দুজনে এক সাথে খেলতো, মারামারি, ঝগড়া করতো, এক বিছানায় ঘুম—ভাব ছিল ভীষণ। সব বদলে গেল হঠাৎই। কিউ যখন নিজের পরিচয় জানতে পেরে দিশাহারা এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে পরীক্ষা দেবেনা,

পড়াশুনা করবেনা, যার কোন পরিচয় নেই, তার বিদ্যায় কি লাভ! মাকে ভাল লাগেনা, মালবিকা-বোনকে ভাল লাগেনা, বাবা পর হয়ে গেছে, এমনকি বন্ধু বান্ধবের সাথে নিজের প্রতি ঘৃণায় মুখ লুকিয়ে রেখেছে, সেই সময় একমাত্র দাদার মত ঠিক নয়, আত্মার আত্মীয়ের মত, সুহৃদের মত বন্ধুর মত, সখার মত আশ্রয় দিয়ে, স্বান্ত্বনা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে কিউকে বই খুলে বসিয়েছে, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করেছে, পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেছে, যার ফলে কিউ পরীক্ষায় ভাল ফল করে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে। মানব পূর্ণ যুবক, কিউটি অর্থাৎ লাবনী কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পা রাখছে অর্থাৎ বিকশিত হচ্ছে—শরীর ও মনে, লাবনী তখন সত্যিই লাবন্যময়ী। আসলে ঐ একটা বয়স বুঝি বাস্তব স্বপ্নের কাছে হার মানে। স্বপ্ন ফুলের ন্যায় পাপড়ি মেলে, যৌবন-সৌরভ যা কিনা পৃথিবীর সমস্ত সৌবভের অপেক্ষা মিষ্টি, মদিরতা ছড়ায়। জানিনা হয়তো সে কারণেই মানব ধীরে ধীরে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ করলো, তার আচরণ, কথার মধ্যে কাব্যের ছোঁয়া, বিজ্ঞানের ছাত্র মানব ধীরে ধীরে অলঙ্কার মিশ্রিত। প্রণয়াসিক্ত কথায় আমায় মুগ্ধ করতো। আমিও অনুভব করতে লাগলাম এ মানব সেই মানব নয়, যাকে আমি ছোট থেকে দেখছি, এ মানব সম্পূর্ণ ভিন্ন, ঈশ্বর প্রেরিত দূত শুধু আমার জন্য? আমার যা কিছু সুখ, দুঃখ সব মানবের জন্য। মানবের চোখের দিকে তাকিয়ে ঘোর লেগে যেতো, মানবদার কথা আমার মনে সুর সৃষ্টি করতো, মনে হতো এ যেন অমৃত অপেক্ষা মধুর। জানিনা হয়তো তাই ছিল আমার জীবন, প্রণয়ের পদক্ষেপ। লাবনীর তখন ভাববার বয়স নয়, ফলাফলের বিচারের বয়স নয়। কিন্তু মানবের তো বিচার করার বয়স হয়েছে। সে দিন বিচার করলোনা—এ হয়না, অসম্ভব।

—আচ্ছা বসন্ত, এই যে পরিণতি, অর্থাৎ আমাদেব সম্পর্কের নতুন অবস্থান, এর জন্য কে দায়ী? আমি না মানব?

হঠাৎ কিউ এর এ জাতিয় প্রশ্নে সম্বিত ফিরে পেলাম। কিন্তু প্রশ্ন আসবে, আমায় উত্তর দিতে হবে, তার প্রস্তুতি ছিল না, চুপ করে রইলাম। কিউ সামনের দিকে চেয়ে আমার উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে। যদিও কিউ নিজে এর উত্তর ঠিক করে রেখেছে, তবুও মিলিয়ে নিতে চাইছে, আমার দেওয়া উত্তরের সাথে মেলে কিনা। মানুষ মাত্রেই নিজের সমর্থক খোঁজে।

—কে দায়ী?—প্রশ্নটা তুমি আমাকেই করলে? প্রণয় ঘটিত অভিজ্ঞতা যার নেই বললেই চলে। তবুও যখন প্রশ্ন করেছো উত্তর দিচ্ছি—মানুষের চিন্তা ভাবনা, ভাব ভালবাসা, হাসি কান্না নির্ভর করে বাস্তব পরিস্থিতির ওপর, পারিপার্শ্বিকতার ওপর। বাঁধাধরা নিয়ম কানুনের বাইরে। গতানুগতিক সামাজিক রীতিনীতির বাইরে কত কি যে ঘটে যায়, তার খবর কে রাখে! জীবনের বৈচিত্র বলে শেষ হয়না। লিখে ফুরোয়না তার বিবরণ। আমার নিজের জীবনই কি স্বাভাবিক! ব্যতিক্রম নয়? আর শুধু কি আমার জীবন? বিশ্বে জানা অজানার বাইরে এমন উদাহরণ অনেক আছে। তবু বলব সবই জীবনের স্বার্থে। সেদিনের বাস্তব পরিস্থিতি, সময়, বয়সের কথা, শারীরিক ধর্ম ও মননের কথা বিচার করলে তোমরা উভয়েই নির্দোষ, আজো নির্দোষ।

কিউ মনযোগ দিয়ে শোনে। উত্তর দেয়না। নিজের তৈরি করার উত্তরের সাথে আমার দেওয়া কিউটির প্রশ্নের উত্তবের সাথে মেলাবার চেষ্টা করে। প্রশ্নটা করার

পিছনে অতিতের নিজের কাজের পূর্ণমূলায়ন করে নিতে চায়। কিউ ভাবুক। কিউ নিজের সম্যক সমস্যার সমাধান নিজে খুঁজে পাক।

চা খায়, কফি খায়, স্ন্যাক্স, কাজু, কখনো দিগ্, কখনো কিউ নিয়ে আসে। কখনো ব্যালকুনিতে বসে, কখনো খাটে কম্বলের নিচে, কখনো খাবার টেবিলে বসে আমরা আমাদের কথা বলি। কিউ বলে আমি শুনি। কিশোরী লাবনী স্কুলে যায়। ভাল স্কুল, পড়াশুনায় মনযোগি, পরীক্ষায় ভাল করে। ক্লাসের শিক্ষয়িত্রীই নয়, সকল দিদিদের কিউ প্রিয়। সহপাঠিনীদের প্রিয়। স্কুলের ফ্যাংসনে সে নাচে, গান গায়, আবৃত্তি করে—পুরষ্কার পায়, নাচতে নাচতে মায়ের হাতে তুলে দেয়। তার ওপর সে সুন্দরী, সকলে মিলে আদর করে, দিদিরা চুমু খায়। সেই কিউএর কাছে স্কুলের দরজা, দিদিদের স্নেহ, বান্ধবীদের ভালবাসা এক মুহূর্তে হারিয়ে গেল। নিজের পরিচয় যেদিন সে জানতে পারলো, নিজে থেকেই ভালবাসার, স্নেহের দরজা গুলো কিউ নিজে থেকে বন্ধ করে দিলো। পৃথিবী নিমেষেই অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হল সকলেই যেন তার শত্রু—কেউ তাকে ভালবাসেনা। যার মা নেই, বাবা নেই, এ পৃথিবী তাদের জন্য নয়। এই লাবনী তার স্কুলে আসল লাবনী নয়, নকল লাবনী। লাবনী মিথ্যা—মিথ্যা লাবনীর সাথে এ পৃথিবী সম্পর্কহীন। তার বাবা মা, দাদা বোন সকলেই নকল, মিথ্যা। তাদের স্নেহ, ভালবাসা মিথ্যা। কি হবে পরীক্ষা দিয়ে? সে পরীক্ষা দেবেনা। সে অবাঞ্ছিতা।

সেই করুণ মুহূর্তে দেবদূত হয়ে আবির্ভাব হল মানবদা। মানবদা আমায় দুঃখের সাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য সাগরে নামল, জানতোনা যে তাব কাপড় শুকনো রইবেনা। বসন্ত, মানবদা আমায় আশ্বস্ত করলো, পরীক্ষা দিলাম, ভাল ফল হল। বাবা মার দুঃখ ভুলে মানবদার উৎসাহে বাংলা নিয়ে লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজে ভর্তি হলাম। নতুন করে বাঁচবার, নতুন পরিচয়ে জীবন শুরুর পাঠ পেলাম মানবদার কাছ থেকে। নিষ্পাপ কামনাশূন্য শুধু দুটি অন্তরের বিশ্বাস, ভালবাসা, জীবনে সুর এল, ছন্দ এল, গান এল, আকাশ হল রঙিন, বাতাস মধুময়, বাঁচার ইচ্ছা হল প্রবল একমাত্র মানবদাকে আশ্রয় করে। মানস বাবু হলেন আঙ্কেল, মাকে আন্টি বলতে পারিনি, মা বলে আজো ডাকি। লাবনীর পূর্ণজন্ম হল। লাবনী মরে বাঁচলো। সে দিনগুলোর আলোর গল্প পূর্ণিমার রাত্রে ঝর্ণার মত উচ্ছল ভোরের শিউলির মত কোমল, মিষ্টি গন্ধে ভরা। মানবদা যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারীং পড়ে। ছুটীর জন্য অপেক্ষা করে। ছুটী পেলেই সুযোগ পেলেই বাড়ি আসে। খাওয়া নাওয়া ভুলে আমার পাশে বসে থাকে, আমার সাথে কত কথা বলে। সে কথার নির্দিষ্ট কোনো বিষয় সূচি থাকে না। কলেজের কথা, বন্ধুদের কথা, আকাশের কথা, পাখীর গানের কথা, স্বপ্নের কথা—মুহূর্ত, ঘণ্টা দিন পার হয়ে যায়—দুজনে কেউই বুঝতে পারিনা।

এদিকে আমাদের ঘরে ফেরার গাড়ি আসে যথাসময়ে। মালপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠি। পাহাড় ছাড়ি। কয়েকজন প্রতিবেশি গাড়ির পাশে, কারোর নাম জানিনা, যদিও তাদের দেখেছি প্রতিদিন, কবু আসে, কিউ আদর করে। দিগ্ বাহাদুর বিনীত ভাবে হাত জোড় করে-একপাশ দাড়িয়ে, ওর চোখে জল ছিলনা, তবুও গলার স্বর ভার। দেখা গেলনা সেই কুকুর ছানাটিকে, যাকে দেখার জন্য কিউএর চোখ আতিপাতি করে খুঁজছিল। সকলকে শুভেছা জানিয়ে গাড়ি ছাড়তে বললাম। বিদায় মুহূর্ত প্রতিবেশিদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন আমাদের স্পর্শ করেছিল। ভেবেছিলাম ঐ পাহাড়ে পুনরায় আসবো, হয়ে ওঠেনি

আজো। কিউটি ভবিষ্যতে কুমায়ুনে যাবে কি-না সে জানে কারণ কিউটির তৃতীয় বারের জন্য "পুণর্জীবন প্রাপ্তি" এই কুমায়ুনে। কে জানে, আগামী দিনে কি বলবে!

একাদশ অধ্যায়

কৈফিয়ৎ দিয়ে শুরু করি। যদিও গল্পটা বলার সময়েই পাঠকের কাছে অকপটে স্বীকার করেছি। আমার বয়স ষাট বছর পার হয়ে গেছে বছর পাঁচেক হলো। এই বয়সে মানুষ শুধু বেশি বলেই না ভুলও বকে, কথা বলার তাল কেটে ফেলে, ধারাবাহিকতা হারায়—এক কথা বারবার অগোছাল নিশ্চয়, যদিও সবটাই আবোল তাবোল নয়, আমিও গল্পটা শুরু করেছি শুরু থেকেও নয় আবার শেষ থেকে পিছোতে পিছোতে শুরুতে গিয়ে হাজির হওয়া সে রকমও নয় --এ যেন যেখানে থেকে হোক বললেই হল, অনেকটা এই রকম। যাই হোক চেষ্টা করি অতিতকে স্মরণ করতে, আমার গল্পের শুরুর কি শুরু ছিল?

কলকাতার জন্ম যেমন অকস্মাৎ, বিদেশী শাষকদের স্বার্থে বৃদ্ধি ভারসাম্যহীন এবং অপরিণত। বার্দ্ধক্য হাজির ইতিহাসের হিসাবে বড্ড তাড়াতাড়ি। কলকাতা বৃদ্ধ বা পুরানো হয়ে গেছে। পরিকল্পনা না থাকলে কোন কিছুই যথার্থ পূর্ণতা পায়না। সেই পুরানো কলকাতা বাড়ছে। রাজনৈতিক দূরদর্শীতার অভাব এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঘৃন্যতম প্রয়াসে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছে খণ্ড বিখণ্ড চেহারা নিয়ে—শুধু ভৌগলিক দিক থেকেই নয় খণ্ডিত মানষিকতা নিয়ে। ভিটে মাটি হারানোর দল শহরে ঢুকছে হু হু করে, যে যেখানে স্থান পাচ্ছে শহরে, শহরের উপকণ্ঠে, গ্রামে, সীমানার প্রান্তে প্রান্তে মাথা গুঁজবার জন্য কোন রকম ভাবে আচ্ছাদন রচনা করছে। আমার ধারণা সে দিনের রাজনৈতিক অনেক নেতাই, পরবর্তীকালে তাদের অনেকেই স্বাধীন দেশের শাষণ ক্ষমতায় স্থান পায়, তারা অনুমান করতে ব্যর্থ ছিলেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, শরণার্থী সমস্যা এত তীব্র হবে। ভায়ের রক্তে ভায়ের হাত লাল হবে। সে কারণে স্বাধীন সরকারের কাছে শরণার্থী সমস্যা একটি গুরুতর সমস্যা এবং সরকারকে সমস্যা মোকাবিলায় স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নিতে হয়। নতুন নতুন উপনগরী গড়ে উঠতে থাকে—কল্যাণি, বিধাননগর প্রভৃতি, যদিও এই স্বল্প পরিসরে প্রয়োজনের তুলনায় নেহাৎই সামান্য। বিধাননগর উপনগরীর জমি বণ্টিত হয় সরকারী উদ্যোগে কিছুটা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। সেই সময়ে এক টুকরো জমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। একজন সরকারি ইঞ্জিনিয়ার, কর্মসূত্রে যাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করতে হয়, শ্রী মানস দত্ত।

মানসদত্ত কলকাতার আবাসিক পিতৃ সূত্রে বৌবাজারের এক ভাড়া বাড়িতে। সেই সময়ে কলকাতার এক নামি স্কুলে পড়তো শ্রী মানস দত্ত এবং তার থেকে দুক্লাশ নিচে বসন্ত বাসু। বসন্ত বাসুর পিতৃ পুরুষের সাবেকি বাসস্থান কলকাতায়। লেখাপড়ায় গুনি ছাত্র মানস দত্ত, বসন্ত বাসু অসাধারণ নয় তবুও মনোযোগি, চেষ্টা আছে বড় হবার। শ্রেণী কক্ষের ব্যবধানে ও ওদের দুজনের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠতে কোনো বাধা হয়ে ওঠেনি। মানস দা ও বসন্ত স্কুল জীবন থেকে কাছের বালক। স্কুলের পাঠ শেষ করে ইঞ্জিনিয়ারীং পড়ার জন্য মানস দত্ত ভর্তি হয় কলেজে। তার দু বছর পর বসন্ত বাসু সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করে প্রিয় বিষয় ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি। মানস পাশ

করে সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ভারত সরকারের অধীনে নির্মাণ বিভাগে. বসন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ পড়ে এবং প্রস্তুতি শুরু করে গবেষণা বা ডক্টরেট করার জন্য। অত্যন্ত স্পর্শকাতর মানবিক বিষয়, বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোতে যার প্রকোপ ভয়াবহ -- শিশুমৃত্যুর কারণ ও প্রতিকার। প্রবন্ধ লেখে তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ সেই বয়স থেকেই পত্র পত্রিকায় প্রকাশ হয়, বিভিন্ন আলোচনা সভায় কলেজে, ক্লাবে সদ্য যুবক বসন্ত বাসুর অনুরোধ আসে বক্তব্য রাখার। বসন্ত অর্থাৎ সেদিনের আমি বক্তব্য রাখি আন্তরিকতা নিয়ে। আপ্যায়িত হই, অভিনন্দিত হয় সে কারণে কাজের উৎসাহ বেড়ে যায়, নেশার মত ঐ সমস্যার কারণ অনুসন্ধানে লেগে যাই। এমনি একটি অনুষ্ঠানে রুচী আমায় চিহ্নিত করে, পরিচিত হই রুচীর ইচ্ছায়, রুচীর অধ্যাপক কাকার মাধ্যমে। সেই কাকা অর্থাৎ আমার খুড়শ্বশুর মহাশয়ের; স্যারের ভাল লেগেছিল আমার কাজের প্রতি নিষ্ঠার জন্য। উনি আমার কাজকে শ্রদ্ধা করতেন, কাজের প্রতি আমার ঐকান্তিকতায় উনি আকর্ষিত হয়েছিলেন, আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে। পুরানো কলকাতার বনেদি লোক, বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব, প্রখর ব্যক্তিত্বে আমিও মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেখানে রুচী আমার সাথে আলাপ করে। হয়তো রুচীর সেদিন আমার প্রতি বিস্ময় ছিল; লাভ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট্, এবং কাকার মাধ্যমে প্রস্তাবের সূত্র ধরে রুচী ও আমার পরিণয়। যাক্ এই ছিল সেদিনের আমার রুচীর পূর্বরাগ, রুচী তখন কলেজে পড়াতে শুরু করেছে, তন্বী, মৃদুভাষী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রুচীর প্রতি আমিও অনুরক্ত হই। আমি স্বীকার করি অকপটে। আপাততঃ আমার কথাই না গিয়ে দেখিনা মানসদা কি করছে? কেমন আছে মানসদা? তখন মানব ছিল না, ছিল না মালবিকাও। মানসদা, শ্রাবণী বৌদি, মালবিকাদের কথা তো বলাই হয়নি। কোথায় তারা? কি করছে? কাশ্মীরের কথা, বাঙ্গালোর, বিধাননগর লাবণী যাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে স্নেহ পেয়েছে, ভালবাসা পেয়েছে, সন্তানের মর্যাদা পেয়েছে এবং হারিয়েছে এবং যেখান থেকে নির্বাসিত হয়ে আমাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছে তাদের কথা না বললে, তাদের প্রতি প্রকৃত বিচার করা হবে না।

জীবন সরলরেখায় চিরকাল চলে না। চলা সম্ভব নয়। সব সময় চলার পথ, বিশেষ করে আমাদের মত অনুন্নত দেশে সর্বদা মসৃণ হবে, মনোরম হবে, গ্রীষ্মের দাবদাহ থাকবেনা, শীতের শৈত্য থাকবেনা, বর্ষায় বৃষ্টি হবেনা, গা মাথা ভিজবেনা বা শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় ক্লান্তি আসবে না, কষ্ট হবেনা---এতো হতে পারেনা। এ ছাড়াও চলতে চলতে চলার শক্তি হ্রাস হবে। উদ্যমের ঘাটতি হবে চলার স্বাভাবিক নিয়মেই। মানস দত্ত ও তার পারিবারিক জীবনও ব্যতিক্রম নয়। নয় বসন্তের বা আমার জীবন। টানা-পোড়েন, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে জীবন বা জীবনের বৈচিত্র্য। জীবন কখনো মধুর, কখনো দুঃখ জর্জর, কখনো যোগ কখনো বা বিয়োগ, কখনো হাসি কখনো কান্না---জীবনে বৈচিত্র স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা। তবুও জীবনের আকর্ষণ অফুরন্ত, গভীর তুফানে নিপতিত মানুষ, অর্ধ সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপিত মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়াসে ক্লান্ত হলেও ক্ষান্ত হয় না। একটুকরো কাষ্ঠ খণ্ড এমন কি শবদেহ আশ্রয় করে ডাঙ্গার জন্য, কূলের আশায় প্রয়াসী হয়, কিনারায় পৌঁছতে চায়। এটাই বিস্ময় এবং সত্য, এর নাম জীবন।

মানসদা আমার বালক বয়েসের বন্ধু, একই স্কুলের পড়ার সূত্র ধরে, শ্রাবণী দত্ত,

বৌদির স্নেহপরায়ণতা, আত্মীয়তা আমার বিস্ময়, কেমন আছে, এই মূহুর্তে আমার অজানা, তবুও যে টুকু মনে পড়ছে পাঠকবৃন্দকে জানানো আমার দায়িত্ব। মাঝে মাঝে যেমন মনে পড়ছে, একমাত্র আমার গল্পই বলে গেছি, যদিও অনেক বলার কথা বলা হয়নি, সম্ভবত নয়, মনে থাকেনা। কিশোর বয়সে, পাশের বাড়ির এক কিশোরী, নাম মনে নেই, আমার বাংলার নোট্‌স্‌ দেখতে চেয়েছিল, আমি দেখতে দিইনি বলে ভেংচি কেটেছিল, আমি আমার বাবার কাছে কম্‌প্লেন করেছিলাম, ভুলে গিয়েছিলাম। মনে ছিল না লণ্ডনে এক সেমিনারে, এক প্রতিনিধি, বয়সে বড় না হলেও সমবয়সি হয়তো ছিল; সেমিনারের অবসরে আমার সঙ্গ প্রত্যাশা করে প্রস্তাব করেছিলেন, আমি সে প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারিনি বলে "অসভ্য" এই মন্তব্য শুনতে হয়েছিল। মনে ছিলনা বাবা মুখে সুযোগ পেলেই তার বন্ধু মহলে আমার গুণগান করার কথা বাবার বন্ধুদের কারো চেহারা কেমন ছিল, বলতে পারবোনা। নিজের মায়ের কথা মনে রাখা অসম্ভব, কারণ আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল, আমার বয়স যখন সবে তিন বছর। মায়ের মৃত্যু হয় মায়ের দ্বিতীয় সন্তান প্রসব কালে, আমার মা সেই গর্ভস্থ শিশু সহ প্রসবের সময় মারা যান—সেই সময় চিকিৎসার আধুনিক সুযোগ সুবিধার অভাব ছিল। আমার বাবা সে কারণেই শিশু মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের কাজে আমায় উৎসাহিত করেছিলেন। বাবার চেহারাই একমাত্র, আমি একটুও বিস্মৃত হইনি।

উত্তর কলকাতার জল জমা হতো, সল্টলেকে, যার নামকরণ হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামে বিধাননগর। সল্টলেককে ভরাট করে মানুষের বাসযোগ্য জমি তৈরি করে বণ্টন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই প্রাথমিক পর্বে, তখনো সল্ট লেকে বসতি গড়ে ওঠেনি। মানস দা বুদ্ধি করে নিজেদের বাসস্থানের জন্য এক টুকরো জমি সংগ্রহ করে। ইতি পূর্বে কলকাতার জল নিস্ক্রমণ হতো আদি গঙ্গা দিয়ে, আর বেশির ভাগ জল জমা হতো অপেক্ষাকৃত কিছু জলাভূমি সল্টলেকে ডাঃ রায়ের পরিকল্পনায় আজকের বিধাননগর। প্রকৃত অর্থে মানসদা শরণার্থী না হলেও বাস্তুত্যাগি, মানসদাদের পিতৃপুরুষের জন্ম পূর্ব পাকিস্তানে তথা অধুনা বাংলা দেশে। মানসদার বাবা চাকরী করতে কলকাতার সাধারণ ডাকঘরে, বাস করতেন বৌবাজের এক পূরাতন বাসা বাড়িতে— সেকেলে বাড়ি। মানসদা ছিল তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। মানসদা তার বাবা মায়ের তৃতীয় এবং একমাত্র জীবিত সন্তান। মানসদের জন্মের পূর্বে—দুটি সন্তানের জন্মের কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যু হয়। সে সময় কলকাতায় শিশু চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল অত্যান্ত প্রাথমিক স্তরে। দুটি সন্তানের মৃত্যুর পর তৃতীয় সন্তানের জন্ম গ্রহণ এবং সুস্থ জীবন তার বাবা মায়ের কাছে দেবতার আশীর্বাদ, আর সেই সন্তান, মানসদার বাবা মায়ের অত্যান্ত যত্নের, আদরের এবং মানসদা দেবদূতের সমান। তাকে বড় করা নয়, লেখা পড়া শিখিয়েছিলেন অত্যান্ত যত্ন করে। মানসদা পড়াশুনাতে ভাল ছিল, মেধাবি ছাত্র ছিল সে, ছিল স্কুলের শিক্ষক বৃন্দের প্রিয়ছাত্র, ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে সে যখন শিবপুরে পড়তে যায়, আমরা বিস্মিত হইনি। আশ্চর্য্য হতাম মানসদা যদি ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার না হতো। স্কুলে মানসদার আমি ছিলাম বড় ভক্ত। সুযোগ পেলেই গলির পর গলি পার করে প্রায় অন্ধকার বৌবাজারে মানসদার বাসায় আমি প্রায়শঃই যেতাম। বিশেষ করে ছুটীর দিনে। মানসদার বাড়িতে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল পড়াশুনা, স্কুল এবং স্কুলের শিক্ষক বৃন্দকে নিয়ে, আলোচনা হতো মানসদার ছোট পড়ার টেবিলে।

মানসদার কাছ থেকে অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক সাহায্য পেয়েছি। অঙ্ক ও বিজ্ঞানে আমি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিলাম। পরবর্তী কালে মানসদার সাথে সম্পর্কে আপনি, তুমি থেকে তুই এ নেমে আসে। মানসদা স্কুল কলেজ ছেড়ে যখন শিবপুরে পড়তে গেল, তখন মানসদার সাথে স্বভাবতঃই যোগাযোগ ঘাটতি হলো কারণ সুযোগের অভাব। তবুও আমাদের মধ্যে সম্পর্ক অটুট ছিল। যেকোন ছুটীতে মানসদা বাড়ি ফিরলে সেই স্কুল লাইফের হৈ হুল্লোর সমানে চলতো। মানসদার মা. অর্থাৎ জেঠিমা ছিলেন সাক্ষাৎ প্রতিমা, দেখতে যেমন সুন্দর, চেহারায় লক্ষ্মীর মত ভাব। প্রতিটি কথায় স্নেহ বর্ষিত হতো। অতুলণীয়া, আচরণে আমি আবিষ্ট। মাতৃত্ব এমনি মাধুর্যমণ্ডিত! আমি জেঠিমাকে ভীষণ ভালবাসতাম, ভক্তি করতাম। আমি নিজে মা হারা, আমার কষ্ট হতো, ভাবতাম, আমার মা বেঁচে থাকলে আমি ও আমার মায়ের কাছ হতে এমনি স্নেহ ও যত্ন পেতাম। মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতাম। মাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত আমি, বুকের মধ্যে মায়ের অভাব অনুভব করতাম। এক মুখ স্নেহ মেশানো হাসি নিয়ে জেঠিমা সকালের জল খাবারের জন্য সুস্বাদু খাবার নিজের হাতে তৈরি করে আমাদের অত্যন্ত সযত্নে খাওয়াতেন। গরম গরম লুচি কিম্বা পরোটা একটা একটা করে ভেজে ভেজে পাতে তুলে দিতেন, সাথে কোনদিন আলু কুমড়োর ছক্কা, কোনদিন বেগুন ভাজা আর ঘরে তৈরি আমের কাসুন্দি নয়তো নারকেল নাড়ু। আমাদের খাইয়ে তিনি প্রচণ্ড তৃপ্ত হতেন, আমি বুঝতে পারতাম।

মানসদা আর আমি মনের আনন্দে গল্প করতাম। শুনতাম মানসদার কাছ থেকে ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের নতুন নতুন গল্প, বিভিন্ন ভাষা ভাষি, বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন আচরণ, তাদের মিলিত সংস্কৃতি, অধ্যাপক বৃন্দের ভিন্ন ভিন্ন ভাঙ্গিমা। অপেক্ষা করতাম কবে মানসদা কলেজ থেকে ছুটী পেলে বাড়ি আসবে আমি জানতে পারবো মানসদার নতুন নতুন অভিজ্ঞতার কথা। আগের মত মানসদার কাছে আমার অঙ্ক কষা হতো না। বরং নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার উচ্ছল বর্ণনা শুনতে শুনতে ছুটীর সময় ফুরিয়ে যেতো। এমনি করে কয়েকমাস অতিক্রম করার সাথে সাথে মানসদার পড়ার চাপ বেড়ে গেল, ছুটী কমে গেল, আড্ডা মারা কমে গেল ধীরে ধীরে।

আমি স্কুলের পাঠ শেষ করে সাহিত্য নিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম। ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান আমাব প্রিয় বিষয়। স্কুলের শিক্ষক মশাই যখন দেশ বিদেশের রাজাদের কথা, দেশের শাষণ ব্যবস্থা, মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার কথা পড়াতেন আমি গভীর আগ্রহে শুনতাম। মানুষের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিবর্তন, আদি সমাজ ব্যবস্থা থেকে আজকের আধুনিক জীবনের উত্তরণ, শিল্পের বিকাশ, রাষ্ট্রের বিকাশ, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ, প্রাকৃতির পরিবেশের সাথে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন আচার এবং ভিন্ন ভিন্ন জীবন ধারার বিকাশ, তার ধারাবাহিকতা আমি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শুনেও অতৃপ্ত থাকতাম। বিভিন্ন পাঠাগার থেকে বই সংগ্রহ করে পড়তাম, তুলনা করতাম বর্তমান অবস্থার সাথে। মানুষের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিবর্তন আমায় আকৃষ্ট করতো, যা আজো করে।

শিক্ষার বিস্তার, বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি, জীবনমানের উন্নতি. তবু ও মানুষে মানুষে ঘৃণা, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিদ্বেষ, ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ, যুদ্ধ, আর্থিক এবং সামাজিক তীব্র ব্যবধান, ইত্যাদির কারণ অনুসন্ধানে বই সংগ্রহ করা আর পড়া আমায় নেশার মত পেয়ে

বসেছিল। পড়ার সাথে আমার অন্য একটা নেশাও ছিল।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু, তাদের দূর্বীসহ জীবন যন্ত্রণা, তাদেব বাসস্থানের সমস্যা, শিক্ষার অভাব, যাদের অভাব, আমায় পীড়িত করতো। আমি সময় পেলেই বিভিন্ন অস্থায়ী বাস্তু হারাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরতাম। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতো, পকেটে টাকা পয়সা থাকলে মাঝে মাঝে সাহায্য করতাম। লেকের ধারে, রাস্তার ধারে, ট্রেন লাইনের ধারে, রেল স্টেশনে ছিল ওদের আস্তানা। তার মধ্যে থেকেও তাদের বাঁচবার জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি, রুগ্ন চেহারা শতছিন্ন পোষাক, শিশুদের অপুষ্ট চেহারা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আমার কাছে সভ্যতার উপহাস বলে মনে হতো।

বাবা জানতেন। তবু আমার এ জাতিয় অস্বাভাবিক আচরণে তিনি বাধা দেননি হয়তো মা না থাকার জন্যই বাবার আমার প্রতি অধিক দুর্বলতা ছিল। আমাদের বালিগঞ্জের সংসারে বাবা আমি জেঠতুতো দাদা বৌদির যৌথ সংসার। সে কারণেও মানসদার মা অর্থাৎ জেঠিমার স্নেহধন্য ছিলাম আমি। জেঠিমার অনেক কথাই আজো মনে আছে।

বৌবাজারে মুচিপাড়ার সামনে একটা পার্ক ছিল, নাম মনে নেই। মাঝে মাঝে মানসদা ও আমি বিকালে ঐ পার্কের বেঞ্চে বসতাম। তখনো, হাঘরে বলে যারা পরিচিত, পার্কের রেলিং এর বাইরে ফুটপাথের অস্থায়ী ঝুপড়ি বাঁধলেও, পার্কের ভিতরে ভিড় সেরকম হয়নি। অস্থায়ী ঝুপড়ির অধিবাসিরা গঙ্গার কলের জলে কাপড় কাচতো, স্নান করতো, ইট দিয়ে উনুন বানিয়ে বাজার থেকে কুড়িয়ে আনা শাক পাতা, পচা সবজি ও মাছ ফুটিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতো। পার্কের বেঞ্চে বসে বাদাম খেতাম, আইসক্রিম খেতাম। হাঁটতাম, গল্প করতাম কলকাতার রাস্তার চলমান মানুষ দেখতাম। কখনো কখনো হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম বৌবাজার স্ট্রীটে, সেখানে বাস ছুটতো, ট্যাক্সি ছুটতো, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম, ট্রামের সিট খালি পড়ে থাকতো, তখনো এত ভিড় হয়নি। ঠেলা রিক্সাও চোখে পড়তো। হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে কলেজ স্কোয়ারে। ছোট ছেলে মেয়েরা ঘেরা জায়গায় সাঁতার কাটতো, বড়রা সাঁতার কাটতো, খেলা হতো ওয়াটার পোলো, বল নিয়ে সাঁতরে বল ছুড়ে এক পক্ষ অন্য পক্ষের গোলে বল ফেলা অর্থাৎ গোল দেওয়া। চলতো দু পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতী। আমরা রেলিং ধরে দেখতাম, দারুণ মজাদার খেলা, আমরা দুজনে দুটি পক্ষকে সমর্থন করতাম, গোল হলে হাততালি দিতাম। কোন কোনদিন মানসদা কোনদিন আমি জিততাম। অথচ যারা খেলছে তারা কোনদিনই জানতে পারতো না দুটি বালক তাদের ঘোর সমর্থক। কোনো কোনোদিন পুঁটিরামের দোকানে কচুরি খেতাম, সন্দেশ খেতাম। আমার পকেটে সব সময় টাকা থাকতো। বাবা প্রায়শঃই আমাকে দশ, বিশটা করে টাকা দিতো। পাছে আমার কষ্ট না হয়, মা মরা ছেলে—বাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাকে কষ্টের হাত হতে রক্ষা করা। কখনো সখনো ফুটপাথে বইয়ের পাতা উল্টে দেখতাম। এর পর ট্রামে চেপে বৌবাজারে নেমে বাসায়, আমি ফিরতাম শ্যামবাজারে।

মানসদা আমার বাড়িতে আসতোই না বলা চলে। কারণ লাজুক মানসদা আমার বৌদিকে দেখে লজ্জা পেতো। অনাত্মিয়া মহিলার সামনে বাল্যে মানসদাকে কোনোদিন মাথা উঁচু করে কথা বলতে আমি দেখিনি। কখনো কথা বলার দরকার হলে মেঝের দিকে দৃষ্টি রেখে কথা বলতো। লজ্জায় অর্দ্ধেক কথা মুখের ভিতর থেকে বাইরে

বেরোতোনা। মানসদার বাবা, অর্থাৎ জ্যেঠামশায়, তার একমাত্র ছেলের উচ্চ শিক্ষার্থে ইঞ্জিনিয়ারীং পড়ার জন্য শিবপুরে পড়তে পাঠিয়েছিলেন; সেখানে মানসদাকে হস্টেলে থাকতে হতো ছেলের জন্য দুশ্চিন্তায় ভুগতেন। তার মনে হতো, মানসদা হয়তো ঠিক মত খেতে পাচ্ছে না। শুতে পারছে না, শরীর খারাপ হয়ে যাবে ইত্যাদি। যদিও মানসদা ছুটিতে প্রতি সপ্তাহে না হলেও প্রতি পক্ষে নিশ্চয়ই বাড়ি আসতো, তবুও জ্যেঠামশায় সপ্তাহের মধ্যভাগে এক দুবার মানসদাকে দেখে আসতেন, মায়ের হাতে তৈরি প্রিয় খাবার পৌঁছে দিয়ে আসতেন। মাঝে মধ্যে আমিও দু-একবার গেছি জ্যেঠামশায়ের সাথে। দেখা করে খাবার পৌঁছে, জ্যেঠামশায় ফিরলেও আমি আরো কিছু সময় মানসদার সাথে থেকে যেতাম; বসে বসে গল্প করতাম, মানসদা পাজামার ওপর সার্ট গলিয়ে আমার সাথে ক্যাম্পাসের বাইরে বেরেতো। আমাদের দুজনের কথাবার্তা ফুরতো না। জানিনা ঐ বয়সে সকলেই আমাদের মত বেশি কথা বলে কি-না। এক কথায় আমরা ছিলাম সত্যিকারের প্রাণের বন্ধু। মাঝে মাঝে মানসদার কলেজে যাতায়াতের ফলে মানসদার অনেক বন্ধুর সাথে আমার সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। মানসদার সাথে আমার বন্ধুত্বের কথা, বাবা, দাদা, বৌদি জানতো। মানসদার প্রতি আমার বৌদির পক্ষপাতিত্ব ছিল, বিশেষ করে তখনকার দিনে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্রকে অনেকেই সমীহ করতো। ভাল ছাত্র হিসাবে বাবাও মনে মনে মানসকে ভালবাসতো, এবং মানসদার সাথে তার পরিবারের লোকজনের সাথে মেলামেশা বাবা পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিতেন। বাবা জানতেন আমি কোনদিনই আড্ডা দেওয়া, সিনেমা দেখে, খেলা দেখে সময় নষ্ট করার মত ছেলে নই। অনেকে মানস ও আমাকে পিঠে পিঠি দু ভাই মনে করতো— এমনি ছিল আমাদের বন্ধুত্ব, বা বন্ধুর চেয়েও উৎকৃষ্টতর ছিল আমাদের সম্পর্ক। কোন অশ্লীল আলোচনা, মেয়েদের সম্পর্ক কু-রুচিকর মন্তব্য আমরা কখনো করিনি। না ছিল সমবয়সি মেয়েদের ব্যাপারে আমাদের কৌতূহল। তাই বলে আমাদের ব্যাপারে কোনো কোনো মেয়ের কোনো কৌতূহল বা ঔৎসুক্য ছিলনা বলা ঠিক হবে না, তবে আমাদের দুজনের কারোরই মেয়েদের বিষয়ে সে সময়ে কোন উৎসাহ ছিল না। বিশেষ করে মানস ও আমার কলেজ জীবন পর্যন্ত কোন নারীর প্রতি বিশেষ কোনো আকর্ষণ বা প্রেমের সঞ্চার বা অভিসার ঘটেনি। ইতিমধ্যে মানসের ও আমার বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা বেড়েছে, মানসের বন্ধুরা আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধুরাও মানসের বন্ধু, সমবয়সি হলে যা হয়, যদিও অনেক চেষ্টা করেও আজ কারোর নাম মনে নেই। সমবয়সি সকলের চিন্তার জগৎ সাধারণভাবে এক হয়, হৃদয়ের আয়তন হয় প্রসারিত এবং বন্ধুত্ব অতি সহজে গড়ে ওঠে, পড়া শেষে, যে যার মত নিজের কাজের জগতে চলে যায়, ধীরে ধীরে একজন দুজন ছাড়া সকলের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। ঢেউ যেমন কূলে আঘাত লেগে হারিয়ে যায়, আমাদের বন্ধুত্বও তেমন জীবনের কূল স্পর্শে হারিয়ে গেছে, ব্যতিক্রম মানসদা। আমাদের সম্পর্ক ইস্পাতের মত অটুট ছিল সে কারণে সময় এবং স্থান ব্যবধান দীর্ঘ করলেও সম্পর্কে ছেদ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। আত্মিক সম্পর্ক ছিল মানসদার বাবা মা অর্থাৎ জ্যেঠামশায় ও জেঠিমার সাথে। জেঠিমা মারা গেছেন বহুবছর আগে তবুও আজো যেন জেঠিমার স্নেহের স্পর্শ অনুভব করি।

আমি কলেজে ভর্তি হওয়ার পর আমার পড়ার চাপ বেড়ে যায়। মানসদার পড়ার চাপ বাড়ে। মানসদা ইঞ্জিনিয়ার হবে, আমি সাহিত্য নিয়ে পড়ছি। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য

দেশের মানুষের সামাজিক আর্থিক, সাংস্কৃতির অবস্থার কথা, নানা মানুষের অতিতকে জানা। একই স্কুল হতে শুরু করলে কি হবে, জীবনের ঐ লগ্ন থেকেই আমাদের লক্ষ্য ও পথ পৃথক হয়ে যায়। আমরা দুজনে নতুন জগতে নতুন পথরেখা ধরে জীবন-যাত্রা শুরু করি।

চার বছরে কলেজ জীবন শেষ হওয়ার আগেই মানস চাকরির নিয়োগপত্র পেয়ে যায়। ভারতসরকারের অধীনে নির্মাণ বিভাগে, বদলিযোগ্য চাকরি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাকে যেতে হবে। প্রথম পোষ্টিং দিল্লী থেকে দূরে বেরিলিতে। সদ্য পাশ করা টগবগে তাজা যুবক, দেশ গড়ার কাজ, সরকারী কাজে যথার্থ দায়িত্ব পালন করার সঙ্কল্প মনে মনে। কলকাতার বাইরে জীবনের প্রথম, নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে নতুন নতুন লোকের সাথে জীবিকা নির্বাহ করা। জেঠিমার অর্থাৎ মানসদার মায়ের পর পর দুটি কন্যা সন্তান মারা যাওয়ার পর একমাত্র সন্তান, কলেজে পড়ার সময় হষ্টেলে থাকতো, তবুও তো কলকাতায়, যখন তখন ইচ্ছা করলে আসতে পারতো, ওর বাবা অফিস ফেরৎ দেখে আসতে পারতো, কিন্তু উত্তর প্রদেশে বেরিলি, সে তো হাজার মাইল দূরে, যেখানে চেনা জানা কেও নেই। কোথায় থাকবে? কি খাবে? কে রাধবে? মাছ পাওয়া যায় কিনা জানে না, জেঠিমার চিন্তায় ঘুম নেই। মানসের বাইরে যাওয়ার কথা শোনার পর থেকেই, বারে বারে কান্না পাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে হু হু করে। মানসকে যেতে নিষেধ করার জন্য করুন চোখে মানসের বাবার কাছে আর্জি জানায় জেঠিমা। ওর বাবা যদি নিষেধ করে মানস, নিশ্চয় বাবার কথা রাখবে, মানস বাইরে যাবেনা। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে মানস বাইরে যাবার সিদ্ধান্ত বদল করুক। দেশের বাইরে গিয়ে চাকরি করার দরকার নেই, বাবা যে টাকা পেনশান পায় তাতে চলে যাবে। হায়রে মায়ের মন! জ্যেঠামশায় কিছু বলেন না, কারণ তিনি চান তার ছেলে সরকারী চাকরি করুক। ছেলে কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরি পাওয়ায় তিনি মনে মনে খুশি। প্রথম চাকরি, গেজেটেড্ র‍্যাঙ্ক। পশ্চিম বাংলার বাইরে, সে আর কি করা যাবে। দুচার বছর বাইরে কাটিয়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসবে। একা কষ্ট হবে—বিনা কষ্টে উন্নতি হয়না। নিজে সরকারী চাকরি করতেন, সরকারী চাকরীর কদর আলাদা।

—না, মা, তোমার কোন ভাবনা নেই। বড় প্রোজেক্ট, অনেক লোক কাজ করে। আমাদের থাকার ব্যবস্থা আছে, সরকারী আবাসনে। আমার মত অনেক লোক আবাসনে থাকে।

—লোক থাকলে কি হবে? তারা তোর কে? তোর কেউ হয়? খাওয়া-দাওয়া, যদি শরীর খারাপ হয়, কে দেখবে?

—শরীর খারাপ হবে কেন? খাওয়া দাওয়া, অন্য সকলের যে ভাবে হবে, আমারও হবে।

—ওরা বিহারী, ওদের খাবার তুই খেতে পারবি?

—বিহারী কেন হবে? বেরিলি বড় শহর, বিহারে নয়, উত্তরপ্রদেশে।

—ঐ হলো। ওদের রান্না করা খাবার, তুই খেতে পারবি?

—হস্টেলে খেলাম কি করে চার বছর?

—হস্টেলে বাঙালী বামুন রান্না করতো।

—উড়ে বামুন। কোনো অসুবিধা হবে না মা।

—আমি তোকে ছাড়া থাকতে পারবে না।

—তোমাকে নিয়ে যাবো। বাবাও যাবে।

—আমি যাবো না। দরকার হলে তোমার মাকে নিয়ে যাও।

—বাবা, তুমিও কি মায়ের মতে মত দিচ্ছো না কি। এখনো দেরি আছে—রেজাল্ট বেরোক, ওরা জয়েন করার ডেট্ জানাক্।

—তুই গেলে আমি বাঁচবোনা বাবা।

—বাবা! মা!

সে এক করুণ চিত্র। মানসদা হস্টেলে গেলে জেঠিমা এমনি করে কেঁদেছিলেন। সেদিনের করুণ দৃশ্য সমূহের আমি সাক্ষী ছিলাম। জেঠিমার শরীর এমনিতে রুগ্ন, মাথার চুল পাতলা, বেশির ভাগ পাকা। হাতে চামড়া কোঁচকানো। দু'দুটি মেয়ের মৃত্যুর সময় শোকে শরীর ভাঙতে শুরু করেছিলো, এখন বৃদ্ধাবৎ পর্যায়ে চলে গেছে। সে তুলনায় জেঠামশায় শক্ত। জেঠিমা কথা বলার সাথে সাথে কাঁদছিলেন, চোখ লাল, আমার কষ্ট হচ্ছিল। গম্ভীর হয়ে সে করুণ দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে বসেছিলাম, নিস্তব্ধ এবং হতবাক্।

পরীক্ষা শেষ হলে মানস বাড়ি ফিরেছে, হস্টেলের পাট শেষ, সরকারী চাকরি জুটে গেছে। মন প্রফুল্ল, কিন্তু জেঠিমার কথায় মনে প্রফুল্লতা উধাও। মানস বাসায় বসে রইলো গম্ভীর হয়ে। বদ্ধ ঘরে আমাকে নিয়ে চারটি প্রাণী; কারো মুখে কোনো কথা নেই, হারিয়ে গেছে, আনন্দের বদলে দুঃখের বাতাবরণে চারটি প্রাণী কথা না বললেও মনের ভিতরে অসংখ্য কথার তোলপাড়। আমিও কিছু বলতে পারছিনা, আমি মানসদার ফেরার খবর শুনে মানসদার সুখবরে আনন্দ করবো বলে হাজির হয়ে চুপচাপ বসে ছিলাম। এক সময় মানসদার স্তব্ধতা ভেঙে বলল—

—চল গঙ্গার ধারে ঘুরে আসি, যাবি?

সেই ভালো। বাইরে বেরোলে মন ভাল হবে। দুজনে বেরোলেম। সূর্যের রোদ নেই। আঁধার নামেনি দোকানে দোকানে আলো জ্বলতে শুরু করেছে, ল্যাম্প পোস্টের আলো জ্বালানো হয়েছে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের পাশ দিয়ে, বৌবাজার স্ট্রীট, ধর্মতলা, রাজভবন, ইডেন উদ্যানের পাশ দিয়ে গঙ্গার ধার; আউটরাম ঘাট। শহর কলকাতার মনোরম বেড়ানোর জায়গা। ব্যস্ত ধর্মতলা, রাজপথে গাড়ির ভিড়, নিয়ন আলোর ঝলকানিতে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, মানুষ ব্যস্ত, কথাবার্তায় মুখর, হকারদের গলার জোরে মালপত্র বিক্রীর প্রতিযোগিতা, গঙ্গার তীরে ব্যস্ত শহরে, আধুনিকতার মোড়কে সাজানো প্রাকৃতিক পরিবেশে নির্জনতার সামান্য ঘোমটা। সূর্য অস্ত গেছে। গঙ্গার ওপারে হাওড়া-স্টেশন, গোডাউন, ময়দা কল, মিল ইত্যাদি। প্রসস্ত গঙ্গা। জোয়ারের জল নির্ঘণ্ট মেনে আসে উজানে শ্রোত বয় আবার ভাঁটায় জলের গতি সমুদ্রের উদ্দেশ্যে। মাঝে মাঝে বাণ আসে জল উঁচু হয়ে সশব্দে, নৌকাগুলো বাঁধন খুলে মাঝ গঙ্গায় ভাসতে থাকে। ছোট নৌকগুলো গঙ্গার তীরে গাছে বাঁধা। জেলেরা মাছ ধরে। এখন তারা উনুন জ্বেলে ভাত চাপিয়েছে। সন্ধ্যা রাতেই রাতের মত পেট ভরে ভাত খেয়ে নেবে। এছাড়াও ভাড়া পাওয়া যায় ছৈ দিয়ে ঢাকা ছোট নৌকা, কখনো কখনো উৎসাহি প্রণয় যুগল ঐ নৌকায় চেপে গঙ্গার হাওয়ায় প্রেম করে। একটা ছোট জাহাজ বাঁধা কিছুটা দূরে। আলো জ্বলছে জাহাজের বিভিন্ন অংশে—দেখতে ভাল লাগে, কোনো মানুষ নজরে পড়ছেনা। গঙ্গার বুকে গাদা বোট্। দেখি স্টীমার আছে, চলেনা। অধিকাংশই। কাঠের বেঞ্চ একটাও খালি

নেই, সব দখল হয়ে আছে। আমরা, দুই যুবক ধীরে ধীরে গঙ্গার ধারে বাঁধানো রাস্তা ধরে হাঁটছি --দুএকজন বাদাম ওয়ালাকে ফিরিয়ে দিয়েও শেষ-মেষ কাগজের ঠোঙায় চিনে বাদাম কিনলাম। হাটার সাথে বাদাম ভেঙে একটা একটা করে ভাজা বাদাম মুখে দিচ্ছি, আমি নিরুদ্বিগ্ন, মানসদা চিন্তামগ্ন। মাকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়লাম। কি করি বল্‌তো বসন্ত? মা কিছুতেই বুঝবেনা যে আমার মত অনেকেই ঐ প্রকল্পে কাজ করছে। কোথায় কোন রিস্ক নেই। প্রোজেক্টে কাজ না করলে কাজ শিখবো কি করে। অভিজ্ঞতা হবে কি করে? এ রকম বড় প্রোজেক্টে কাজ করার সুযোগ সকলের কাছে সব সময় আসে না। এ সুযোগ হারালে আর কবে সুযোগ পাবো, জানিনা।

--সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি দূরে চলে গেলে জেঠিমার মানসিক অবস্থা অসহনীয় হয়, তুমিও জানো, আমিও জানি। তুমি যেখানেই যাও, এক অবস্থা হবে, তুমি আটকাতে পারবে না।

—এই অবস্থাই খুব খারাপ লাগছে। মায়ের কষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থায় পড়তে হবে জানলে ক্যাম্পাসের সময় অন্য চিন্তা ভাবনা করতাম। কষ্ট আমারও হবে, তবে খানিকটা অভ্যাস হয়ে যাবে চার বছর হস্টেলে কাটালাম তো, বাইরে থাকার অভ্যাস হয়ে গেছে। অসুবিধা খুব একটা হবে না। জানতাম মা বাবার অসুবিধা হবে, তবে এতটা—

—স্টেডি হও মানসদা।

—দেখছি, রিটায়ার করার পর দ্রুত বাবার শরীর ভেঙে যাচ্ছে। মায়ের চেহারা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। হাওয়া বাতাস নেই, পুরানো কলকাতার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া—কিছু দিনের জন্যও ওদের বাইরে নিয়ে যাওয়া দরকার।

—জেঠি মাকে বুঝিয়ে বলো। জয়েন করে, ভাল বাড়ি দেখে ওদের নিয়ে যেও।

—সে রকমই তো ভেবেছি। তবু মা ঐ রকম করলে কি করে যাই বল্‌তো?

—নিশ্চয়ই পেনফুল, ধৈর্য্য ধরো ঠিক হয়ে যাবে।

ভাজা বাদাম খেতে খেতে হাঁটি. হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি। মানসের মনের চাঞ্চল্যও উদ্বেগ, গঙ্গার ধারের সৌন্দর্যও দূর করতে পারেনি। জেঠিমার কান্নায় আমার চোখে জল আসছিল, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে আমি চোখের জল লুকিয়ে রাখি। মানসদার অবস্থা নিশ্চয়ই অনুমেয়। যুবক ইঞ্জিনিয়ার মানস দত্ত, যার মনে টগ্ বগে স্বপ্ন, বড় হবার বাসনা তীব্র, দেশ গড়ার কাজে দ্রুত হাত লাগাতে চায়। পশ্চিম বাংলায় হাজার হাজার বেকার, সেই অবস্থায় ভাল ছাত্র কলেজ পেরোবার পূর্বেই সরকারী চাকরি পায়। পায় নতুন পরিবেশ, পূর্ণ যৌবন শক্তি নিয়ে কাজ করার সুযোগ, সেই অবস্থায় মাতৃস্নেহের তীব্র আকুলতা, অসহায়তা তাকে বিচলিত করে, অন্যদিকে বাবার বার্দ্ধক্যজনিত দূর্বল শরীর, সন্ধ্যায় গঙ্গাপারের মনোরম পরিবেশে সে অসহায়।

সান্ত্বনা দেওয়ার মত কিছু নেই, বলার মত ভাষা পাচ্ছি না, একমাত্র আমি সমব্যাথি হতে পারি। বেঞ্চে যারা বসে আছে, ওঠার নাম নেই, বসতে পারলে হতো। কলকাতায় নির্জনতার অভাব। গঙ্গার ধারে মাত্র কয়েকটা বেঞ্চ হাজার প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে ক'জনেরই জায়গা দিতে পারে। তারা পাশাপাশি বসে একটু মনের কথা বলবে, সে সুযোগও নেই।

আমরা অতএব হাঁটছি। গঙ্গার জল স্পর্শ করা পবিত্র, মনোরম, মৃদুমন্দ হাওয়া

মানসের গায়ে মুখে মাথায় আদর পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। বাংলার জল হাওয়ায় মানুষের হৃদয় আদ্র—সহজেই স্নেহ ভালবাসা, কামনা করুণা, মায়া মমতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি তথায় জন্ম নেয়।

অন্ধকার নেমে এসেছে পুরোপুরি, যদিও বিজলি আলোয়, গাড়ির হেড লাইটের আলোয় ঝলমলে কলকাতা। তবুও গাছের পাতা অন্ধকারে কালো, কালো, গাছের আড়ালে দেখা যাচ্ছে না রাজভবন, আলো অন্ধকারে কুলফি ওয়ালাদের মিষ্টি সুরে আবেদন। ফুচকার চারপাশে ভিড় খুব।

—চলো ফিরি। জেঠিমা। চিন্তা করছেন।

—ফিরবো!

ফেরার উৎসাহ নেই, সদ্য পরীক্ষার চাপ কাটিয়ে মা বাবার কাছে ফিরেছে, দুচার দিন পরে চাকরি স্থলে রওনা দেবে, এ সময়ে বাবা মায়ের কাছে বাড়িতে থাকতে ভাল লাগার কথা, গল্প করবে, হাঁসবে, এটা ওটা খাওয়ার বায়না করবে, খাবে, স্বপ্ন দেখবে কিন্তু বাড়ির পরিবেশ। বাড়ি ফেরার উৎসাহে বাধা সৃষ্টি করেছে। অস্থীর তার মন। তবে কি মাকে কষ্ট দিয়ে সে সুখী হবে? সে কি ভুল সিদ্ধান্ত নিল?—ইত্যাদি নানান প্রশ্নে তার মন ব্যাকুল। অন্যদিকে হাজার হাজার বেকার, বেকার পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার, সে ভাগ্যবান ভাল চাকরি পেয়েছে। পেয়ে ছেড়ে দেবে? ঠিক হবে না। বাবা ছ'বছর রিটায়ার করেছে, সঞ্চয়ের টাকা ফুরিয়েছে, পেনশানের টাকায় চলে? তার ওপর বাবার ও মায়ের দূর্বল শরীর। এ অবস্থায় চাকরি তাকে করতেই হবে। সে স্থীর করে সে কাজে যোগ দেবে। বাড়িতে কোন কথা না বলে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসবে।

হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলায়। মানস নিজের বাসায়, আমি ট্রাম ধরে নর্থে। বাড়ি ফিরে মানস বোঝে ঘরের বদ্ধ হাওয়া ভারি, মা ও বাবা খাটে বসে চুপচাপ। অর্থাৎ মানসের অনুপস্থিতিতে নিজেরা একে অপরকে বুঝিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে। ঘরে ফিরে তার যাওয়ার ব্যাপারে আর কোনো আলোচনা হয় না। রাত্রে তার প্রিয় খাদ্য রান্না করে মা তৃপ্ত মুখে পরিবেশন করছে, চোখে অনন্ত আকুলতা। মানসের কান্না পায় তবুও কান্না রোধ করে রাতের খাবার শেষ করে বিছানায়। হায়রে নিষ্ঠুর পরিহাস, মায়ের স্নেহে দুঃখের এ কি স্বাদ!

অবশেষে, রেজাল্ট বেরোনোর পর রেজাল্ট হাতে নিয়ে মানস প্রথম কর্মস্থল বেরিলির উদ্দেশ্যে ট্রেনে চাপে, আমি হাওড়া স্টেশনে ছিলাম। অমৃতসর মেল প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে গেল আমি প্রার্থনা করলাম—বললাম—মানসদা তুমি বড় হও!

দ্বাদশ অধ্যায়

সময়ের সাথে জীবন এগিয়ে যায়। অতিত বৃদ্ধিপায়, জীবনের ভবিষ্যৎ হ্রাস পায়। সীমিত দিন নিয়ে একটি জীবন, নিয়ত হ্রাসমান প্রতিটি মুহূর্তের সাথে। মানসের জীবন এগিয়ে চলে দ্রুতপদে ভবিষ্যৎকে প্রতি নিয়ত পিছনে ফেলে। এগিয়ে চলে মানসদার বাবা ও মা অর্থাৎ জ্যেঠামশায় ও জেঠিমা তাদের জীবনের অন্তিম তটরেখার দিকে। কাজে যোগ দিয়েছে মানসদা, মাঝে মাঝে আমায় চিঠি দিয়ে খোঁজ খবর জানায়, আমি কলকাতার, আমাদের, আমার খবর পাঠাই। বৌবাজারে জেঠিমার কাছে যাই, নিয়মিত নয়। বসে বসে দীর্ঘ সময় গল্প করি, জেঠিমার কান্না শুকিয়ে গেছে, অশ্রু ঝরেনা, যখন

কথা বলেন, চোখের তারা কখনো সখনো লোহিত বর্ণ ধারণ করে। বিষয় বস্তু একটাই মানস, মানসদার কৈশোর। স্মৃতিচারণ জেঠিমার একমাত্র সঞ্জিবনী। জ্যেঠামশায় কম কথা বলেন, চিরকালই স্বল্পবাক। তবুও মানস বাইরে চলে যাওয়াতে তিনি দুঃখী। তিনি মনে আশা রাখতেন যে তার ছেলে মানস সরকারি চাকরি করুক। কিন্তু ভাবেননি যে সরকারি চাকুরির জন্য পশ্চিম বাংলার বাইরে যেতে হবে। তিনি নিজে সরকারি অফিসার ছিলেন এবং সে কারণে মনে মনে তার গর্ববোধ ছিল। পশ্চিম বাংলায় চাকরির অবস্থা খুব খারাপ। দিনে দিনে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, পশ্চিম বাংলার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার সমস্যা ভয়াবহ। একে তো কল কারখানা গড়ে উঠছে না, চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না, তার ওপর অনেক চালু কল কারখানা একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তুঙ্গে, কল কারখানায় শ্রম দিবস, উৎপাদন নষ্ট হচ্ছে, তবুও রাস্তা, ঘাটে, অফিসে, স্কুলে, কলেজে দাবী আদায়ের শ্লোগান-কাজের চেয়ে শ্লোগান বেশি। দায়বদ্ধতা নেই, দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন আছে। মালিকপক্ষ মুনাফা চায়, মানুষের জন্য তাদের ভাবনা নেই। রাজনৈতিক দল—কি কম্যুউনিষ্ট, কি কংগ্রেস শতধা বিভক্ত। যত দল, উপদল তত ট্রেড ইউনিয়ন, যত ট্রেড ইউনিয়ন ততই আন্দোলন। অস্থীর রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। ফলতঃ বেকার যুবকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমত অবস্থায় জ্যেঠামশায়ের ইচ্ছা না থাকলেও মানসের বাংলার বাইরে চাকরির সুযোগ গ্রহণকে তিনি বাধা দেননি। মানস বাইরে যাওয়ার পর থেকে তার অভাববোধ তিনি তীব্র ভাবে অনুভব করছেন। প্রকাশ করতে পারছেন না পাছে জেঠিমার কষ্ট বাড়ে, তিনি মানসের ব্যাথা অনুভব করছেন অন্তরে। দু-দুইটি কন্যা সন্তান জন্ম হয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে, সে সময় মানসের মা প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলেন, হতাশা গ্রাস করেছিল, তার সন্তান বাঁচবেনা এমনি ধারণা তার মনে দৃঢ়ভাবে স্থান পেয়েছিল। এমনি হতাশা আর আতঙ্কের মধ্যে মানসের জন্ম, একমাত্র সন্তান যে সুস্থ হয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, লেখাপড়া করেছে, পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে। আর তিনি দিবারাত্র মানসকে আগলে রেখেছেন, চোখে চোখ রেখেছেন, সম্ভাব্য সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। সেই সন্তান মানস। যতক্ষণ মানস পড়তো, দিনে হোক রাত্রে হোক, তার পাশটিতে বসে থাকতেন জেঠিমা, মানসের ঘুম পেলে তিনি জাগিয়ে পাশে বসে থাকতেন, তার ঘুম পেলে পায়চারি করে ঘুম তাড়িয়ে জেগে রইতেন। মানসের পড়া শেষ হলে মানস ঘুমোলে তবেই তিনি শুতে পারতেন আবার জেগে উঠতেন সবার আগে। অফিসের রান্না, স্কুলের খাবার তৈরি করা, টিফিন তৈরি করে বাক্সে গুছিয়ে দেওয়া, জামা জুতো পরিয়ে সাজিয়ে স্কুলে পাঠানো। বইখাতা গুছিয়ে ব্যাগে দেওয়া—তিনি একা করে গেছেন। ক্লান্ত হয়েছেন, অসুবিধা হয়নি।

সেই জেঠিমার আজ কোনো কাজ নেই। ছোট এক টুকরো বাসা, দুটি মাত্র প্রাণী, খাবার ইচ্ছা হয় না, তবুও বেঁচে থাকার জন্য দুমুঠো রান্না, কখনো সখনো হালকা শুকনো খাবার খেয়ে রাতের খাওয়া সেরে নেন। মানস নেই, কার জন্য সখ্ করে এটা ওটা রান্না করবেন—কে খাবে! রান্নার উৎসাহ নেই। খিদে নেই, যত বয়স বাড়ছে, ততই খিদে এবং খাবার উৎসাহ কমে যাচ্ছে। সামান্য কিছু খেয়েও হজম হতে চায়না। এই সব কারণে বড় তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছেন দুজনে, বার্দ্ধক্যের সাথে ব্যামো—বাত বেদনা শ্বাষ কষ্ট, বদহজম ইত্যাদি। মানস নিয়মিত চিঠি লেখে—সপ্তাহে দুটি করে চিঠি

পান তারা—উত্তর দেন সময় মত, উত্তর মানেই ভালো থাকার, ঠিক মত খাওয়া দাওয়া করার উপদেশ এবং বাড়ি ফেরার সময় জানতে চাওয়া। সরকারি কোয়ার্টারে মানস এবং আরো কয়েকজন মিলে মেস্ মত করে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কোন কষ্ট নেই। প্রচণ্ড কাজ ব্যস্ততা দিনে এমনকি রাত্রেও। সব জেনেও দুজনে অশান্ত এবং মনোকষ্টে আছেন। মানস যাওয়ার পর থেকে দুজনে হাসতে ভুলে গেছেন। কোন রকমভাবে মানসের স্বপ্নে, মানস ফিরে আসবে, সেই আশায় বেঁচে আছেন তারা।

মানস লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি করছে। বয়স হয়েছে বাবা মা হিসাবে তাদের একটি মাত্র দায়িত্ব, তার জন্য সুন্দর একটা বৌ এনে দেওয়া, অর্থাৎ সুপাত্রী দেখে মানসের বিয়ে দিতে পারলে ইহজীবনের জন্য তাদের আর কোনো দায়িত্ব থাকবে না। বাড়ি ফিরলে মানসের সাথে কথা বলবেন, তার পছন্দ অপছন্দের কথা জেনে নিয়ে তবে এগোবেন। যদিও দুজনে বিশ্বাস করেন, তাদের পছন্দ করা পাত্রীর সাথে বিয়ে করতে মানস অমত করবে না, তবুও সে বড় হয়েছে, স্বাবলম্বি, নিজে উপার্জন করে, তার পছন্দ অপছন্দের কথা জেনে এগোনো ভালো। জ্যাঠামশায় মনে মনে পরিচিতদের দু-একজনকে পছন্দ করেছেন জেঠিমার সাথে এক প্রস্থ আলোচনাও হয়েছে, তবুও মানসের সাথে কথা না বলে প্রস্তাব পাঠানো যায়না। এদিকে একদিন দুদিন করে প্রায় ছ'মাস অতিক্রান্ত হলো, মানস ফেরেনি, এমনকি দূর্গাপুজাতেও নয়। পূজার আনন্দে সকল বাঙালী বাড়ি যখন মুখর, বৌবাজারের বাসায় দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধা দুঃখে জর্জ্জর, আনন্দ তো নেইই। কারণ এই প্রথম একটি বছর, যে বছরে তাদের একমাত্র সন্তান, মানস, তাদের কাছে নেই। বাবা মার এ দুঃখ একমাত্র যে বাবা মায়ের এ জাতিয় অভিজ্ঞতা হয়েছে তারা ছাড়া অন্য কেউ অনুভব করতে পারবেনা। একমাত্র সান্ত্বনা, দেওয়ালিতে ছুটী পাবে, সে সময় মাত্র কয়েকদিনের জন্য সে আসবে, মনে মনে তার প্রস্তুতি এবং প্রতীক্ষা।

পূজার কটা দিন, ইচ্ছা থাকলেও জেঠিমার কাছে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মাসে কম করেও তিন থেকে চারদিন আমি যাই একমাত্র জেঠিমার কষ্টের কথা ভেবে, জেঠিমার স্নেহের আকর্ষণে। তার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা আজো অটুট্, মানসের অবর্তমানে তার কোনো হেরফের ঘটেনি। মানস থাকলে সপ্তাহে দুবার তিনবার যেতে হতো মানসের আকর্ষণে। তাছাড়া পড়াশুনার চাপ বাড়ছে। লাইব্রেরী, বাড়ি, ইউনিভারসিটি, গাইড্ ইত্যাদি নিয়ে এত ব্যস্ত, সময় হয়না, এর ওপর বস্তিতে ঘোরার নেশা, এখানে সেখানে আলোচনা, সেমিনারে যাই, আলোচনা শুনি, নোট করি, বস্তির অভিজ্ঞতা টুকে রাখি—বড় তাড়াতাড়ি সময় ফুরিয়ে যায়। অবুঝ। অবোধ শিশুর যন্ত্রণা আমায় বিদ্ধ করে। অসহায়, গরীব জননীর সন্তান হারা বেদনা আমার হৃদয় স্পর্শ করে, মানুষের দুঃখ দুর্দশা আমার অর্ন্তজ্বালা সৃষ্টি করে। কারণ অনুসন্ধানে এবং গভীর সমস্যা সমাধানের পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য এই যৌবন হৃদয়ে বাসনার জন্ম নেয়। যে কারণেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, বিভিন্ন গ্রন্থাদি, বিভিন্ন আলোচনায় আমি অংশ গ্রহণ করি, বাবার সাথে আলোচনা করি, বাবার কাছ থেকে উৎসাহিত হই আমি আমার ইচ্ছা মত লক্ষ্য পূরণে আত্মনিয়োগ করি। বাবার স্নেহ হৌক, বা বাবার অপ্রকাশ্য কোনো স্বপ্ন হৌক, বাবা আমার স্বপ্ন স্বার্থক করে তুলতে উৎসাহিত করে, আমার সহযোগীতা করে। আবার এও হতে পারে, মায়ের অকাল মৃত্যু এর জন্য দায়ী। যাইহোক আমি সমাজের জন্য নিজের

চরিত্র গঠনে ব্রতী হই। দুর্গাপূজার উৎসব মুখরতা আমায় আমার নিত্য পঠন পাঠন থেকে বিরত করতে সক্ষম হয়না। দুর্গাপূজার দিনগুলিতে কলকাতা স্বাভাবিক কলকাতা থাকে না। পাড়ায় পাড়ায় পূজা, লাইট প্যাণ্ডেল, বাজনা লক্ষ লক্ষ মানুষের হৈ হল্লা, আনন্দ উল্লাস। নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে, শিশু বৃদ্ধ যুবা, নারীপুরুষ নির্বিশেষে, মানুষ উৎসবের আনন্দে মগ্ন থাকে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার এই ভিড় ভালো লাগে না। মানুষের হৈ হল্লা কাতারে কাতারে প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ঘোরা, বিদ্যুতের অপচয়, শ্রমের অপচয়, এই গরীব দেশের পক্ষে অনুচিত বলে মনে হয়। তবুও আনন্দ-উৎসব, পূজা পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান তো হবেই। আমি এই কটা দিন পত্র পত্রিকা নিয়ে সময় কাটাই। পূজা উপলক্ষে অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলো পড়ি। একবার চেষ্টা করেছিলাম, মানস দা আসেনি, জেঠিমার কাছে যাই, সম্ভব হয়নি, ভিড়ের ভয়ে পালিয়ে ঘরে ঢুকে বইয়ে মুখ লুকিয়েছি। মানুষ দুটির জন্য দুঃখ হয়। দুঃখ হয় ওদের একাকিত্বের কথা ভেবে। এই বয়সটা বড় কষ্টের—এই বয়সে কোনো কাজ থাকে না, কাজ করার শক্তি হারিয়ে যায়, অথচ বেঁচে থাকতে হয়, যেন মরণ হলে ভালো হয়, অথচ মানুষের মরণ তো ইচ্ছাধীন নয়। আবার যাদের ছেলে মেয়ে নাতি নাত্‌নিদের নিয়ে সংসার তারা চেষ্টা করে কচি কাঁচা নিয়ে সময় কাটাতে। তাদের মানুষ করা, ছেলে বৌমার সংসারে হাতে হাতে কাজে সাহায্য করা—কিছুটা অন্ততঃ ব্যস্ত থাকা যায়। অসুবিধা যত জেঠিমা, জ্যেঠা মশায়দের জন্য। একমাত্র ছেলে এই প্রথম বছর, পূজার সময় বাড়িতে নেই, শূন্য ঘরে দুর্বিসহ জীবন। পূজা এই দুটি জীবনে আশীর্বাদ না হয়ে যেন অভিশাপ।

এর মধ্যে বৌবাজারে একদিন কালীদা এসেছিলেন। কালীদা দূর সম্পর্কে জেঠিমার ভাই, অর্থাৎ মানসের মামা, মানস চেনে। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে, তার এক বন্ধুর মেয়ে, কোন এক কলেজে কালীদার বন্ধু পড়ান, তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। শ্রাবণীর রূপ লাবণ্য বর্ণনা মাঝে মধ্যেই জেঠিমার কাছে করতেন, মানস যখন থেকে কলেজে পড়তো, তখনই জেঠিমাকে মেয়েটির বিষয়ে বলে রেখেছেন। শশধর মিত্রের দুটি মেয়ে, বড়টির বিয়ে হয়ে গেছে, শ্রাবণী তার ছোট মেয়ে—তিনি জেঠিমাকে বলে রেখেছেন মানস চাকরী করতে আরম্ভ করলে শ্রাবণীর সাথে মানসের বিয়ে দেবেন। শ্রাবণী ভাল মেয়ে, রূপসী, গুণবতী, গান জানে, সেলাই পোড়াই রান্না, ঘরের কাজ সব করতে পারে, নম্র স্বভাব। লক্ষ্মীর মত মুখের গড়ন সুন্দর শরীরের গড়ন মানসের সঙ্গে ভালো মানাবে, মানসদা চাকরীতে যোগদান করার পর পরই কালীদা পুরানো প্রস্তাবটি পুণরায় পেশ করলেন। মানস দূর্গপূজায় ফিরবে, একথা জানতেন কালীদা, সে কারণে তড়িঘড়ি তিনি চলে এসেছেন, যাতে অঘ্রান মাসেই ওদের বিয়েটা হয়ে যায়। বিজয়ার পরের দিন তিনি এসে হাজির—বিজয়ার নমস্কার জানানো এবং মেয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করাও হবে। কিন্তু মানস বাড়ি ফেরেনি, যার জন্য কালীদার কাজ না হলেও নিরাশ হোননি। শ্রাবণী তার বন্ধুর মেয়ে, ঘন ঘন সে বাড়িতে যাতায়াত আছে। শ্রাবণীর মিস্টি স্বভাব এবং বন্ধুপ্রীতি কালীদাকে শ্রাবণীকে সুপাত্রস্থ করার জন্য প্রভাবিত করেছে। পাত্র হিসাবে তখনকার দিনে মানস অত্যন্ত মূল্যবান ছেলে, পরিচিত ঘর, সে কারণে জেঠিমার কাছে মানসের জন্য পাত্রী হিসাবে শ্রাবণীর নাম আগাম জানিয়ে রেখেছেন। ইতিমধ্যে শ্রাবণী স্কুলের চৌকাঠ পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ইচ্ছা ছিল মানস পূজার সময় ফিরলে অন্ততঃ মেয়ে দেখা পর্বটা তিনি শেষ করতে পারবেন, কিন্তু মানস না ফেরায়

জেঠিমাকে পূর্ব প্রস্তাব স্মরণ করিয়ে অগত্যা বিজয়ার মিস্টিমুখ সেরে উত্তরপাড়া ফিরে গেলেন এবং ফেরার আগে জেঠিমার কাছ থেকে প্রায় প্রতিশ্রুতি আদায় করতে সমর্থ হলেন। যদিও জ্যেঠামশায় এত তাড়াহুড়ো করার পক্ষপাতি ছিলেন না।

—মানসের বিয়ে দেবো, আমাদের দায়িত্ব আছে—সব ঠিক আছে। কিন্তু সে ফেরার আগে তোমার এভাবে কথা দেওয়া ঠিক নয় সে ফিরুক, সেখানে কিভাবে আছে, বিয়ে এখনি আদৌ করবে কি-না, কোয়ার্টার বা বিয়ে করে সেখানে সংসার পাততে পারবে কি-না, সংসারের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি, ব্যবহার্য্য সামগ্রি সংগ্রহ করা ইত্যাদি মানসের সাথে আলোচনা বা মতামত না নিয়ে এগোনো ঠিক নয়।

—আমি কি কালীদাকে পাকা কথা দিয়েছি?

—পাকাপাকি না হলে ও কথা দিয়েছো।

—কালীদাকে তুমি চেনো না, আমি চিনি। কালীদার পছন্দ করা মেয়ে নিশ্চয় ভালো হবে। মানসের জন্য সে খারাপ সম্বন্ধ আনবেনা।

—সব ঠিক আছে, কালীদার পছন্দ করা মেয়ে ভালো হবে মানলাম, তাই বলে যে বিয়ে করবে তারও তো মতামত আছে—

—মানসের আবার কিসের মতামত? আমরা যার সাথে বিয়ে ঠিক করবো, সেটাই পাকা, তাতেই তার সম্মতি থাকবে। তুমি চুপ করো, আমি তার মা, আমি জানবোনা ছেলের কি পছন্দ অপছন্দ।

—বেশ, চুপ করলাম। মানস ফিরুক দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলো। আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না, কখন কি হয় কে জানে!

—তোমার শরীর ভাল নেই, আমার ভালো আছে?

—দুজনেরই খারাপ। আমিও চাই, মানসের বিয়ে হৌক। ঘর সংসার পাতুক। একা একা থাকে, কি খায়, কি করে? বৌমা সাথে থাকলে, ভালো হবে, চিন্তা দূর হবে।

—সেজন্যই তো তাড়া। কে জানে কত না কষ্ট পাচ্ছে!

কালীদা বিজয়া সেরে ফিরে যাওয়ার পর জেঠিমা ও জ্যেঠা মশায়ের মধ্যে যাকে নিয়ে আলোচনা সেই মানস ছুটীতে এলো ঠিক কালীপূজার আগের দিন। কয়েকঘণ্টা লেটে ট্রেন হাওড়ায় পৌছেছে, মানস যখন ঘরে ফিরলো তখন দুপুর গড়িয়েছে। মানস ঘরে পা রাখতেই জেঠিমা রুগ্ন শরীরে মানসকে বুকে জড়িয়ে ধরে, মুখে তৃপ্তির হাসি চোখে নিষেধ না মানা অশ্রুধারা। রাত্রীর ট্রেনের ধকল, তার ওপর বেলা গড়িয়ে গেছে। ঠিক মত খাবার জোটেনি, পরিশ্রান্ত শুষ্ক চেহারা তার। জ্যেঠামশায় দেখছেন তার মানস কেমন আছে, তাকে কেমন দেখতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি, ইঞ্জিনীয়ার, গেজেটেড্ অফিসার, অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় অফিসারের এটাই তো গর্ব। রাজ্য সরকারি অফিসার এবং কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসারের মধ্যে ঢের পার্থক্য। এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা ক'জন রাজ্য সরকারি অফিসারের আছে! পূর্ণ যুবক, মজবুত লম্বাটে গড়ন। মোটা এবং সুন্দর করে ছাঁটা গোঁফ উজ্জ্বল বর্ণ, মাথা ভর্তি চুল তীক্ষ্ণনাসা, বলিষ্ঠ কোমড় এবং বুক—না, শরীর ঠিক আছে। উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। নিজের সন্তান বলে নয়, মানসকে দেখলে গর্ব হয়, পাঁচজনকে ডেকে ওকে নিয়ে গল্প করা যায়। কিন্তু বলার লোক নেই, কারণ তিনি ঘরকুনো মানুষ। একমাত্র বসন্তের সাথে মানসের গল্প করা যায়।

পরেরদিন কালীপূজা। রাত ভর বাজি পুড়বে, তুবড়ি, হাওউই, বোম পটকা রঙ

মশাল। আলো দিয়ে সাজানো হবে প্যাণ্ডেল, বাড়ির কার্ণিশ, ছাদ, দেওয়াল। দীপাবলী। দীপের আলোয় উজ্বল হবে শহর কলকাতা। সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরোতে ভয় করে। সে কারণে সকালেই বৌবাজারে হাজির। জেঠিমার দীর্ঘদিন পর উৎসাহে ভরপুর, হাস্যোজ্বল মুখ দেখলাম। সেই তৃপ্ত হাসি নিয়ে সাত সকালে গরম লুচি ভাজছেন, আমি যে ছ'মাস পর এ বাড়িতে আসিনি—আমাকে তার আপ্যায়ন করার উৎসাহ দেখলে, একথা কেউ বলতে পারবে না।

জ্যেঠা মশায় বাজারে বেড়িয়েছেন—অনেকদিন পর তিনি মনের সুখে বাজার করছেন, মানস যা যা খেতে ভালবাসে, তাকে সে সমস্ত জিনিষ কিনতে হবে—গল্দা চিংরি, কাতলার মোটা পেটি, নতুন ফুল কপি, তাজা বেগুন। রান্না ঘরের ঝুড়ি সবজি ভর্ত্তি হবে। বাজার সেরে ফেরার পর লক্ষ্য করলাম জ্যেঠামশায়ের পরনের ধুতি নতুন এবং পরিপাটি করে পরা, পাটভাঙা পাঞ্জাবি, জেঠিমার পরনে লাল পাড় শাড়ী।—খুশিতে ঝলমল্ কালীপূজায় বৌবাজারের বাসা। আমি যেন অতিথি সে-খুশির আসরে। সারাটি দিন কাটিয়ে বিকালে বাড়ি ফিরলাম, বাবাকে বলা ছিল। সন্ধ্যার পর জানালা বন্ধ করে বই নিয়ে বসলাম। বাইরে তুবড়ির ফুলকি, রঙমশালের আলোয় উজ্বল কলকাতা।

দিনভর মানসদার কাছে কাটিয়ে মানসদার গল্প শুনেছি—নতুন পরিবেশ, নতুন দেশের কাজ করার নতুন অভিজ্ঞতা, ভিন্ন দেশি মানুষের আচার আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি, পড়ায় মন বসছে না। কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেও, কাজের জায়গায় মানমর্যাদা থাকলেও, মাসের শেষে অর্থাগম ঘটলেও, সুখে নেই মানসদা। বাবা মায়ের জন্য বাড়িতে মন পড়ে থাকে, শান্তি নেই। মাকে বাবাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখবে, কিন্তু জব সাইডে সে রকম কোনো সুবিধা নেই। ক্যাম্প অফিস, যদি সরকার বাড়ি নিয়েছে, সেখানে ফ্যামিলি নিয়ে থাকা যাবে না, যদিও তার নিজের জন্য আলাদা ঘর আছে, খাওয়া দাওয়া করে মেস মত কোরে। কিন্তু বাবা ও মায়ের বয়স হয়েছে, একা একা কলকাতায়, দূরে থাকে তাদেরকে সেবা করা, অসুখ বিসুখের চিকিৎসা করানো, কাজে কর্মে সাহায্য করা সম্ভব হচ্ছে না। সে যেখানে আছে, সেখানে চিকিৎসার সুযোগ কম—কি করবে সে, ভেবে পায়না। বিশেষ করে মাকে, মানসদাও যে থাকতে পারেনা, বাইরে গিয়ে মায়ের অভাব প্রচণ্ড ভাবে অনুভব করে। কিন্তু আপাততঃ নিরুপায় সে।

ইত্যবসরে কালীদা আসে। কালীদা, সম্পর্কে মানসদার মামা, কারণ কালীবাবুকে জ্যেঠিমা কালীদা বলে ডাকে। তিনি তার লক্ষ্মৌ স্থীর। কদিনের ছুটীর মধ্যেই মানসদা শ্রাবণী নামক পাত্রীটিকে চাক্ষুস দেখে। বিয়ের পাত্রী হিসাবে মাত্র একজন এবং অত্যন্ত অল্প সময় দেখে শ্রাবণী বৌদির সাথে মানসদার বিয়ে স্থীর হয়ে যায়। মায়ের যখন পছন্দ হয়েছে, তার আর কিছু দেখার নেই, দেখতে হয় তাই নিয়ম রক্ষার্থে দেখা। শ্রাবণী বৌদি মানসদার কথায় ভাল মেয়ে, তার আপত্তি নেই, বরং সে খুশি। হঠাৎই বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, যদিও মানস এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত ছিলনা। বলতে গেলে বাবা মায়ের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তাকে সম্মত হতে হয়। মায়ের একান্ত ইচ্ছা, তারা বেঁচে থাকতে থাকতেই মানসের বিয়ে দেবেন।

মানসের বৌ দেখতে চান। তাদের অবর্তমানে মানস যেন একা না হয়ে যায়, অন্ততঃ একজনও মানসের পাশে থাকে। তিনি কোনোদিন ভাবতে পারেন না মানসকে একা থাকতে হবে। বিয়ের ব্যাপারে মানসের না মানসিক না সাংসারিক প্রস্তুতি মোটেই ছিল।

মাত্র দশ দিনের ছুটী অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে সে কর্মস্থলে ফিরে যায় একরাশ উৎকণ্ঠা ও নতুন জীবনের স্বপ্ন, দায়িত্ব আনন্দ ও উৎকণ্ঠার মিশ্র এক মানসিকতা নিয়ে। বিয়ে করে ঘর বাঁধা, তার জন্য মানসিক ও সাংসারিক প্রস্তুতির দরকার কোনটিও ছিল না তবুও তিন মাস পরেই একটি শুভদিনে মানসদার বিয়ে হবে। তার স্ত্রী হয়ে, প্রেয়সি হয়ে, পরিবারের বধু হয়ে লক্ষ্মীপ্রতিমার মত শ্রাবণী নামে উত্তর পাড়ার বর্দ্ধিষ্ণু এবং শিক্ষিত পরিবারের এক মেয়ে আসবে, যে এসে মানসদার ঘর সাজাবে, বাবা মায়ের সেবা করবে, যে হবে তার প্রথম প্রণয়, যাকে সে ভালবাসবে, আদর করবে! যুবক মানসদার সেই মহিলা হবে প্রথম প্রণয়, নবীনা প্রেমিকার সাথে সে প্রাণ ভরে গল্প করবে, হাসবে, খেলবে, একান্ত আপন করে ভালবাসবে—সুখের স্বপ্নে মশগুল মানসদা। সুখের ঘরের কল্পনা তার অন্তরে লহরীর সৃষ্টি করে। আবার আশঙ্কা যে একেবারে নেই, একথাও বলা যায়না, যে আসবে তাকে সে চেনে না, এবং নব বধু তার স্বামিটির সাথে পরিচিত নয়, দুজনের মানসিকতা মিলবে তো! সে তার মনের মত হবে তো! শ্রাবণী কি তার যথার্থ স্বামী হিসাবে মেনে নিতে পারবে তো! ক্যাম্প অফিসে শ্রাবণীকে নিয়ে আসা যাবে না। থাকবে কোথায়? যদিও আসে, বাবা মার সেবা কে করবে?—না, সে এমন স্বার্থপর হতে পারবে না। শ্রাবণী আপাততঃ বৌবাজারে বাবা মায়ের কাছে থাকবে। হেড অফিসে বদলি হলে হয় কোয়ার্টার নয় ভাল বাসা ঠিক করে সকলকে নিয়ে আসবে। অনেকগুলো প্রশ্ন, ভালবাসার স্বপ্ন, দ্বিধা ও সংশয় দোলায় দুলতে দুলতে ফেরার ট্রেনে চাপে, পাড়ি দেয় কর্মস্থলে।

মানস ফিরে গেছে। বিয়ের দিন পাকা। হাতে সময় তিন মাস। বিয়ের অনেক কাজ, শুরু হয়ে যায় কালীদার নেতৃত্বে বিয়ের আয়োজন। প্যাণ্ডেল বায়না দেওয়া, নিমন্ত্রিতদের তালিকা প্রস্তুত করা, নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানো, রসুই বায়না দেওয়া, তত্ত্বআদির লিষ্ট করা, একে একে যোগাড় করা, গয়না গাটি, শাড়ী জামা জুতো ধুতি পাঞ্জাবি আংটি বোতাম পছন্দ করা—সে এক বিশাল ব্যাপার। বাঙালিদের বিয়ের আয়োজন বড্ড বেশি। বৃদ্ধ জ্যেঠামশায় কালীদাকে নিয়ে একে একে কাজগুলো সারতে থাকে। সঞ্চিত টাকা তোলা, দোকানে দোকানে ঘুরে পছন্দ করা, বাড়িতে ফিরে খুলে খুলে জেঠিমাকে দেখানো এবং গুছিয়ে তোলা—চলতে থাকে। চাকরি জীবনের পুরানো সহকর্মী, এখনো যারা জীবিত, অনেকের সাথে সম্পর্ক আত্মীয়তার পর্য্যায়ে, তাদের বাড়ি একদিন একদিন করে গিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। গিয়ে চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ শুধু নয়, কোনো কোনো বাড়িতে কথা বলতে বলতে এক বেলা পার হয়ে যায়, অনেক সময় সে বাড়ি থেকে না খেয়ে ফেরা যায়না। এই ভাবেই তিন মাসে বিয়ের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। মাঝে মাঝে যেতাম, সাক্ষী ছিলাম ঐ কর্মকাণ্ডের।

মানসদা অফিস থেকে নিজের বিয়ের কারণে পনেরো দিনের ছুটী মঞ্জুর করিয়েছে। বিয়ের তিন দিন আগে সে কলকাতায় পৌঁছায়। শ্রাবণীকে এখনি কর্মস্থলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সে কারণে মানসিক কষ্ট তার আছে, কিন্তু প্রকাশ্যে সে বলতে পারছে না। কি করা যাবে, যে চাকরির যে দস্তুর তাতো মানতেই হবে। আপাততঃ কিছুদিন বাবা মার কাছে থাকুক। সান্ত্বনার কথা, যে প্রোজেক্টে সে কাজ করছে সেটি শেষ হবার মুখে। এর পর হয়তো অন্য কোন জায়গায় অন্য কোনো প্রোজেক্টে নতুবা সদর দফতর দিল্লীতে। সে সময় তদ্বির তদারক করতে হবে যাতে ভালো পোষ্টিং পাওয়া যায়, অন্ততঃ

সংসার পাতা যায়। মানসের নিমন্ত্রণ করার মত বিশেষ কেউ নেই। তার ব্যাচের ছেলেরা যে যার চাকরি বাকরি করছে, খুব একটা যোগাযোগ নেই, সীমিত কয়েকজন বন্ধুকে ফোনেই নিমন্ত্রণ সারে। এত অল্প সময়ে বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এমন একটা চাকরি সে করে, কাজের দায়িত্ব এতটাই যে ছুটীর কথা বলতে নিজেরই খারাপ লাগে, তবুও নিজের বিয়ের জন্য মাত্র পনের দিনের ছুটী মঞ্জুর করিয়ে, অন্য একজন সাইট ইঞ্জিনীয়ার কে কাজ বুঝিয়ে, হ্যাণ্ড ওভার করে আসতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে তার বস্ বিহারী ভদ্রলোক; ভীষণ ভালো ব্যবহার, তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। মানস দুদিন খুবই ব্যস্ত। নিজের পোষাক, শ্রাবণীর জন্য পছন্দের একটা অলঙ্কার, চুল কাটা, জুতো কেনা, ঘর দোর গোছানো, নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। আমিও থেকেছি পাশা পাশি।

মাঘ মাসের এক শুভদিনে মানসদার বিয়ে হয় শ্রাবণীবৌদির সাথে। বনেদি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। শিক্ষিত পরিবার। শ্রাবণী বৌদির বাবা অর্থাৎ মানসদার শশুর মশায় মফঃস্বলের কোনো কলেজে অধ্যাপনা করেন। শাশুড়িমা আগের দিনের লেখাপড়া জানা মহিলা। বাড়িতে লেখাপড়ার চর্চা, রুচীশীলতা, সংস্কৃতি মনস্কতার পরিচয় স্পষ্ট। শ্রাবণী বৌদি সাহিত্য নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু পরীক্ষায় বসতে হলোনা, কালীদার উৎসাহে এবং ঘটকালিতে কালীদার বন্ধুর মেয়ে শ্রাবণীর বিয়ে হয়, অর্থাৎ মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা অর্থাৎ বিয়ের পিড়িতে লালবেনারসী জড়িয়ে বসতে হয়। শ্রাবণীর বৌদিরকাছ থেকে পরবর্তীকালে জেনেছি, সে অখুশি নয়। প্রাথমিক ভাবে, বিয়ের প্রস্তাবে আপত্তি ছিল তার, কিন্তু মানসদাকে দেখে এবং মানসদার কথা শোনার পর তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, এবং মানসদাকে বরের আসনে বসিয়ে সুখস্বপ্ন দেখতে শুরু করে, এবং খুশির জোয়ারে ডুবে যায়। খুশি শ্রাবণী বৌদি এবং মনে মনে কালী জ্যোঠার কাছে কৃতজ্ঞ। বিয়ের আসরে শ্রাবণী বৌদির চোখের তারায় খুশির ঝলক আমি দেখেছিলাম। মানসের কথা আগেই বলেছি, শ্রাবণীর রূপে সে মুগ্ধ। শ্রাবণী বৌদিকে পেয়ে সে আনন্দিত। এবং জেঠিমার কাছে সে কৃতজ্ঞ। শ্রাবণী বৌদি এক কথায় প্রকৃত সুন্দরী। বিয়ে হয় মহাসমারোহে।

মানসদার বিয়ের জন্য গত এক মাস ব্যস্ত ছিলাম। মানসদার অনুপস্থিতি এবং জেঠিমা জ্যেঠামশায়ের বয়সের কারণে আমাকে মানসদার বিয়ের দায়িত্ব অনেকটাই পালন করতে হয়। বরযাত্রীদের, বরকে সসম্মানে বিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া, তাদের যথাযোগ্য আপ্যায়ন হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখা, বিয়ের সংক্রান্ত টুকিটাকি কাজ, বিয়ের পর সকালে নিয়ে আসা বরপক্ষের দায়িত্বও আমার ওপর। মানসদার চেয়ে বয়সে ছোট আমি, বসন্ত। বৌভাতের দিনও তদনুরূপ দায়িত্ব আমি পালন করি। এ যেন আমার নিজের দাদার বিয়ে। এবং যথার্থ দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি খুশি। বিয়ের মাত্র ক'দিন পরেই, অর্থাৎ বিয়ের পর যে সব আচার অনুষ্ঠান থাকে, সেগুলো সমাপ্ত করে মানসদাকে নতুন মনে হয়েছিল। সেদিনই মনে মনে মানসদার জন্য বেদনা অনুভব করেছিলাম, মনে হয়েছিল এতদিনে সত্যি সতিাই মানসদা আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেল, সৃষ্টি হল এক স্থায়ী ব্যবধান।

একমাস পর আমি ফিরলাম আমার জগতে। এক মাস কিছুটা পিছিয়ে গেছি আরো বেশি সময় বেশি মনযোগ দিয়ে অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করলাম। মানসদাও জেঠিমার চিন্তা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকলো।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল জ্ঞানের জগৎ। বিভিন্ন বিষয়, ব্যাপক তার কর্মজগৎ। হাজার হাজার পড়ুয়ার জগতে আমি একজন পড়ুয়া, ব্যাপক এই শিক্ষা জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ আমি, শিশুর ঔৎসুক্য নিয়ে দেখার এবং জানার চেষ্টায় রত। শুধু শিক্ষা নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, কাব্য, সাহিত্য, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি। ছাত্র শিক্ষক, অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সদা আলোচনায় মুখর। এখান থেকে শুরু হয়েছে, শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার এবং স্বাধীনতার আন্দোলন। আগামি ভারতবর্ষের রূপরেখার প্রথম রেখাপাত হয়তো এখান থেকে। আবার অনেক সময়ে ঘর বাঁধবার একে অপরের সাথে, একজন যুবতি একজন যুবকের সাথে প্রথম কথা এই চত্বরে উচ্চারিত হয়। স্বপ্ন দানাবাঁধে। পশ্চিম বাংলা তথা সমগ্র ভারতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অসীম। এ যেন বাঙালি জীবনের কেন্দ্রস্থল। এখান থেকেই অনেক যুবক যুবতি রাজনীতির প্রথম পাঠ নেয়। অনেক আগে পাঁচজনের সামনে আসার, বা নিজেকে সকলের সামনে প্রকাশ করার বাসনা নিয়ে, অনেক দেশ প্রেমের স্বপ্ন নিয়ে, দেশকে জাতিকে ভালবাসার সেবা করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংস্পর্শে, রাজনৈতিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ প্রাপ্ত হয়ে প্রত্যক্ষ দলের নির্দেশে দলের নীতিও কর্মসূচি রূপায়নে ব্রতী হয়। যদিও এই জাতিয় সুযোগ আমি গ্রহণ করিনি কোনো দিন, ইচ্ছাও নেই। আমি বইএর পোকা, বই ছাড়া কিছু চিনিনা, জানিনা।

পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল অত্যন্ত উত্তপ্ত। মতাদর্শগত বা পদ্ধতিগত বা প্রয়োগপদ্ধতিগত কমিউনিষ্ট পার্টির বিতর্ক, ব্যবধান, প্রধান ও নবীনদের মধ্যে সংঘাত, সংশোধন বাদ, অতিবিপ্লবি, ভারতবর্ষের বাইরে কমুউনিষ্ট দেশকে সমর্থনের প্রশ্নে অর্ন্তদন্ত এবং বিভাজন, পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং নতুন করে উদ্বাস্তর শ্রোতে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্লাবন তথা জনবিস্ফোরন, বাসস্থান সমস্যা, বেকার সমস্যা, পরীক্ষায় গণ টোকাটুকি—একটা অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল। একে ব্রিটিশ শাসনে পঙ্গু অর্থনীতি, স্বাধীনতা পূর্ব দেশাত্মবোধ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে প্রায় শূন্যে পৌঁছেছিল, আদর্শের পরিবর্তে স্বার্থান্বেষিদের ভিড় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলিতে, ফলে দেশ গঠনে সদীচ্ছার অভাব প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের যে সামান্য উন্নতি ঘটিয়েছিল, তা ছিল তাদের শাষনের সুবিধার্থে, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে, স্বাধীনতার পর উন্নতি সাধিত হয় ব্যক্তি পুঁজি এবং পুঁজিবাদের স্বার্থে, প্রকৃত অর্থে ব্রিটিশ উপনিবেশের ফলে শোষিত পঙ্গু ভারতবর্ষের অর্থনীতি সাধারণ মানুষের স্বার্থের অনুকূলে ছিলনা। কৃষি বা শিল্পে যে উন্নতি হয় তো মুষ্টিমেয়ের আর্থিক বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ বঞ্চিত থেকে যায়। তার ওপর সাংস্কৃতিক অবনমন তো ছিলই, দ্বিখণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা ছিল তীব্র, জাতিগত সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, শিক্ষায় অবনমন জটিলতর। জটিল সমস্যার আবর্তে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ; শিক্ষক, ছাত্র যুবক ব্যবসায়ী, কৃষক তথা সকল স্তরের মানুষ। চলতি মূল্যবোধ, তথা সমাজ সেবিদের প্রতি, জ্ঞানিগুণি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি এক শ্রেণীর বিদ্বেষ, সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে রক্তাক্ত রাজনীতির উত্তরণ এবং সেই সুযোগে সমাজবিরোধিদের অনুপ্রবেশ এবং রাজনীতির নামে অহেতুক গণহত্যা। সেই সঙ্গে প্রতিক্রীয়াশীল রাষ্ট্রীয় সহায়তায় সাধারণের মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও

নিপীড়ন তথা হত্যালীলা—ইতিহাসের এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ অতিবাহিত করছিল—বিশেষ করে কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তরুণ উর্বর মস্তিষ্কের এক তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণ। তার কিছু দিন আগে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে চীন ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে, সেই যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার দুর্বলতাগুলো বুঝতে পারে। শুরু হয়ে যায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার প্রস্তুতি। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, আধুনিক অস্ত্র ক্রয় করা, সংগ্রহ করা, অস্ত্রের মজুদভাণ্ডার গড়ে তোলা ইত্যাদির জন্য উদ্যোগি হল ভারত সরকার। অনেক কমিউনিষ্ট নেতাকে কারা অন্তরালে বন্দি রাখা হল, অনেকে আত্মগোপন করল। কাগজে কিম্বা গোয়েন্দা রিপোর্টে কোথাও কোথাও পশ্চিমবাংলার কারো কারো বিরুদ্ধে চিনের সহযোগি হিসাবে দোষারোপ করা হল। ফলতঃ গোয়েন্দা তৎপরতা, অহেতুক সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেপ্তার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা হল। কোন কোন রাজনৈতিক দল সরকারি কুনজরে পড়ল—তখন রাজ্যে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেসি সরকার। দেশের খুব দুঃসময়।

দলে দলে বেকার যুবক সৈনবাহিনীতে নাম লেখানোর জন্য গোখেলরোডে লাইন দিয়ে, যোগদান করল। এমনি এক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ছিল সে সময়। আমি সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র, আমি সমাজের এহেন অবস্থার কারণ অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ ছিলাম।

যাক্, সে সময়ের ইতিহাস লেখা আমার এ গল্পের বিষয়বস্তু নয়। তবুও দু এক কথায় সেদিনের ছাত্র এবং যুবক এই বসন্ত বসুর দুচার বাক্যে সেদিনকার পত্র পত্রিকা পড়ে যা মনে হয়েছে তাই বলল। ইতিহাস সব সময় বিতর্কিত বিষয়—লেখক, পাঠক, সমালোচক সকলের কাছে। আমার বক্তব্যেও সকলে সহমত নাও হতে পারেন, আমার বলার উদ্দেশ্য হল—যেহেতু ঐতিহাসিক ঘটনা মানুষের চিন্তাভাবনা, চরিত্রগঠন নিয়ন্ত্রণ করে। এবং সেদিনের যে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ গল্পের নায়িকা লাবনীর চরিত্র গঠিত হয়েছিল, মানসিকতার উন্মেষ ঘটেছিল, সেই হেতু সংক্ষিপ্ত ভাবে তার উল্লেখ করলাম। পরিবেশ, প্রকৃতি এবং অবস্থান গত অনুকূল অথবা প্রতিকূল পরিবেশের ওপর তাবৎ জীবজগতের শারীরিক এবং মানসিক গঠন নির্ভর করে মানুষ তার ব্যাতিক্রম নয়। বাঘ জীব, বেড়ালও জীব, দুটি জীবই আমিষভোজী, কিন্তু ব্যবধান দুটির মধ্যে বিস্তর। নদীর কিনারে বৃক্ষাদি এবং মরু অঞ্চলে বৃক্ষাদি এক রকম নয়, সে রূপ মানুষে মানুষে পার্থক্য প্রকৃতিগত ও আকৃতিগত—পরিবেশ নির্ভর। আবার ভৌগোলিক পরিমণ্ডল অপরিবর্তিত থাকলেও ঐতিহাসিক পটভূমিকার সাথে মানসিক গঠনের পরিবর্তন হয়। সেকারণে স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তর মানুষের মানসিক গঠনে ঢের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য প্রভাব থাকে এবং থাকবেও।

যে সময়ের কথা এ অধ্যায়ে বললাম, সে সময় লাবনী জন্মায়নি। লাবনীর জন্ম কোথায়, কি ভাবে, কি পরিবেশে সে গল্প আগে বলেছি, এখন বলছি তাদের কথা নায়িকা লাবনীর সাথে যাদের যোগ অবিচ্ছেদ্য। লাবনী তো একা এবং একক নয়, আকাশ থেকে পড়েনি, এই পৃথিবীতে অন্য পাঁচজন মানুষের মত তার জন্ম, যদিও সামাজিক রীতির বিচারে অসামাজিক ভাবে। বেড়ে উঠেছে এই সমাজে পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে, তাদের প্রভাব নিশ্চয় লাবনীর জীবনে আছে, সে কারণেই তাদের কথা এসেছে।

আসছে মানস দত্ত, শ্রাবণীবৌদি, মানদত্ত, বসন্ত বসু, শ্রীমতি রুচী বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

মানসদা বিয়ে করে কর্মস্থলে ফিরে গেছে। বিয়ের পর মাত্র একসপ্তাহ স্বামী সহাবস্থান করেছে শ্রাবণী বৌদি, অপেক্ষা করছে, মনে মনে প্রার্থনা করছে যেন মানসদা কোয়ার্টার বা বাসা পায়, যেখানে সে যেতে পারবে। অল্প বয়সে, শরীর ও মনে বসন্তের লাল সিমূল, শরীরের ভালবাসার স্বাদ প্রাপ্তি, প্রাপ্তির আকাঙ্খা বাড়িয়েছে, নেহাৎই চাকরিস্থলে যাবার পরিবেশ নেই, সে কারণে নিরুপায় হয়ে সে দূরে পড়ে আছে, নইলে অবশ্যই ছুটে পালিয়ে যেতো। মাত্র কদিনেই শ্রাবণীবৌদি বুঝেছে, তার স্বামী, লোকটি নিখাদ—ভালোবাসতেও জানে! এদিকে শ্বশুরমশায় ও শাশুড়ি—বাবা ও মা, তারাও সেবা পেতে চায়, এই সুযোগে শ্রাবণী বৌদি মনপ্রাণ দিয়ে তাদের সেবায় রত। আবার নিজের বাবা উত্তর পাড়ায়, যার জন্য মন খারাপ হলে ট্রেনে চেপে উত্তর পাড়ায় যায়, কিন্তু থাকতে পারেনা, একবেলা থেকেই বৌবাজারের বাসায় ফিরে আসে। আমি সময় পেলে মাঝে মধ্যে যাই, জেঠিমা ও জ্যেঠামশায়ের প্রতি আমার আকর্ষণ অম্লান। আমি ওনাদের না দেখলে থাকতে পারিনা। বৌদির সাথে গল্প করতে হয়। সরল, কোমল বধূ, শ্রাবণী বৌদির এই দেবরজির প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং স্নেহ দুটিই বর্তমান। আমার ভাল লাগে। কথা বলি, পড়ার চাপে ফিরে যাই। সময় এগিয়ে যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোনোর বিলম্ব নেই।

তবুও মাঝে মাঝে সেই অস্থায়ী তাঁবুগুলোতে যাই, যাই অস্থায়ী চালাঘরগুলোতে—হয়তো বা সেগুলোই তাদের আমৃত্যু বা স্থায়ী বাসস্থান, যেখানে মানুষ বাস করে সেখানে পশুর চেয়ে অধম পরিবেশ। সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, নেই মলমূত্র ত্যাগের জায়গা। দিনান্তে বিশ্রামের জন্য ডালপাতার ছাউনি দেওয়া ঘরে এবড়ো খেবড়ো মেঝেতে মাদুর পর্যন্ত কেনার সামর্থ নেই, যেখানে অসুস্থ মাতৃগর্ভে স্বভাবতঃই অসুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীর জল হাওয়ায় কেউ কেউ বড় হয়, কেউ কেউ মারা যায় প্রসবের পূর্বে এবং পরে, যাদের খাবার জোটেনা। এমনকি মাতৃদুগ্ধ, কারণ সে মাতার অপুষ্ট স্তনে তার সন্তানের জন্য দুগ্ধ সৃষ্টি করার মত শারীরিক ক্ষমতাও নেই। কষ্ট হয়, তবুও যাই। এ আমার আবাল্য নেশা। বর্ষায় ওদের মাথায় জল পড়ে। অধিক বৃষ্টিতে আশ্রয়হীন হয়ে কখনো কখনো রেলস্টেশনে স্থান নেয়। কাজ বলতে, দিনমজুর, গৃহভৃত্য, রিক্সা বা ভ্যান চালানো। আধুনিক সভ্যতার কোনো সুযোগ তাদের নেই, হয়তো আজীবন বঞ্চিত থাকবেও। আমি সেই সব শিশুদের দেখি যারা জন্মায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, অপুষ্টিতে, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় রোগে ভোগে মারাও যায়। যার জন্মের ও মৃত্যুর জন্য দায়ী তারা নয়, দায়ী তারা বাবা মা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র যাদের দায়িত্ব শিশুদের রক্ষা করা। অসহায়, আমার কষ্ট হয়। আবার রাগও হয় যখন ওদের পরিবারের সদস্যদের হাজার বোঝালেও বোঝেনা। কারণ যাকে বোঝাই সে হয় মাতাল, নয় নির্বোধ নয়, গোঁয়ার, নয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে আমার কথায় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি পর্যন্তও করে। হায়রে সভ্য সমাজ এবং তারই নিষ্ঠুর অবদান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় বসার আগে আর একবারই মাত্র বৌবাজারে বাসায় যেতে পেরেছিলাম তাও অল্প সময়ের জন্য। এর মধ্যে মানসদার সাথে যোগাযোগ হয়নি—না মানসদার চিঠি পেয়েছি না তাকে চিঠি লিখেছি। বৌদির কাছে তার খবর পেতাম। প্রোজেক্ট শেষের কাজের চাপ প্রচণ্ড। বিয়ের পর মানস ফিরে যাওয়ার পর

জ্যেঠামশায়ের শরীর খারাপ হয়েছিল, বিয়ের ধকল তো কম নয়। ডাক্তার দেখেছেন। বৌদি, শ্বশুর মশায়ের সাথে কথা বলে ডাক্তার ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করেছে, এখনো চলছে। জ্যেঠামশায়ের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ্য নয়। হার্টের অবস্থা খারাপ—পূর্ণ বিশ্রাম। বৌদি দুদিনেই সাবালিকা, সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সামলাচ্ছে। জ্যেঠামশায়ের শরীর আগের অপেক্ষা দুর্বল, বেশি কথা বলা বারণ। গলার স্বরও নিম্ন। খারাপ লাগলো। বৌদিকে আমার ঠিকানা ফোন নম্বর লিখে দিলাম, প্রয়োজন হলে যেন যোগাযোগ করে। জেঠিমা বার বার আসার জন্য বললেন। বুঝতে পারছি আসা প্রয়োজন, অথচ পরীক্ষার জন্য ঘন ঘন আসা সম্ভব হবে না।

বাড়ি ফিরে বাবার কাছে ওদের কথা বললাম। বিষণ্নতা ছেয়ে গেল বাবার চেহারায়। বৌদির কথা শুনে বাবা কি আমার জন্য কিছু ভাবলেন, না নিজের কথা জ্যেঠামশায়ের স্বাস্থ্যের সাথে তুলনা করলেন, বোঝা গেল না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শীতকালের সন্ধ্যা। এমনিতে দিন ছোটো। পাঁচটা বাজেনি অথচ সূর্য অস্ত গেছে নেমেছে দিনশেষের আঁধার। যদিও কলকাতা শহরে আঁধার টের পাওয়া যায়না। রাস্তায়, ঘরে, দোকানে দোকানে আলো জ্বলে, বিজ্ঞাপনের নিওন আলো কোথাও জ্বলে, নেভে আবার কোথাও স্থায়ীভাবে জ্বলে থাকে, চলমান যানবাহনের হেডলাইটের আলোয় আলোকিত রাজপথ। টেলিফোন পেলাম শ্রাবণী বৌদির—জ্যেঠামশায়ের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ, হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, অক্সিজেন চলছে। এমনিতে শরীর খারাপ ছিল, চিকিৎসা চলছিল, কিন্তু এত দ্রুত শরীরের এতটা অবনতির কথা কেউ ভাবেনি। বৌদির বাড়ি থেকে লোক এসে, অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। খুব চিন্তায় পড়লাম, প্রথমতঃ পরীক্ষা দ্বিতীয়তঃ নিশ্চয় ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে। কি করা যায়? এখনি যাওয়া অত্যন্ত জরুরী। বৌদির কথার সুরে সেই আবেদন ছিল অথচ বললেন, আজ আর দেখা করা যাবেনা। কিন্তু কোনো কিছুর জরুরি প্রয়োজন হলে? অবশেষে পাশে দাড়িয়ে থাকা বাবার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। টেলিফোনে আমার কথা বলা বাবা শুনেছে, পরামর্শ দিলেন এখন যেতে হবেনা, সকালে গেলেই হবে। অগত্যা বাবার পরামর্শ মেনে সে রাতটুকু গেলাম না ঠিকই কিন্তু মন পড়ে রইলো হাসপাতালে ভর্তি হওয়া জ্যেঠামশায়ের প্রতি।

পরের দিন সাতসকালে বৌবাজার হয়ে হাসপাতালে। বৌদির বাপের বাড়ির এক ভদ্রলোক রাতভোর হাসপাতালে ছিলেন। ডাক্তাররা বাড়ির লোকের রাত্রে হাসপাতালে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন, পেশেন্টের অবস্থা খারাপ। হাসপাতালের বেডের সাথে মিশে আছে শরীর, অক্সিজেন ও স্যালাইন দুটোই চলছে, গতকাল হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, নিস্পন্দ, চোখ বন্ধ, নাড়ির গতি অতি মৃদু, প্রায় বোঝা যায়না। মনে হল এ যাত্রাই তার শেষ যাত্রা এবং তারই প্রস্তুতি। এখনো মানসদাকে খবর দেওয়া হয়নি, আমি কারোর সাথে পরামর্শ না করেই সিটিও থেকে মানসদাকে টেলিগ্রাম করলাম, যদি সে বাবাকে শেষ দেখা দেখতে পায়। জ্যেঠামশায়ের অবস্থা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, মানসদার উদ্দেশ্যে টেলিগ্রাম করবার সময় চোখে জল এসে গিয়েছিল। হাসপাতালে ফিরলাম, বৌদি হাসপাতালের কেবিনে পৌঁছে গেছে, জেঠিমার শরীরের কথা ভেবে, তাকে

হাসপাতালে আনা হয়নি, আমার মনে হল জেঠিমাকে অন্ততঃ একবার দেখানো উচিৎ—জীবন ভর সাথী, তার শেষ যাত্রা দেখবেনা. আমি জেঠিমাকে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। দেখলাম জেঠিমা অনেক শক্ত, চোখে জল নেই, কথাবার্তায় প্রায় স্বাভাবিক। জেঠিমাকে পুনরায় হাসপাতাল থেকে বৌদিকে সাথে করে বাসায় পাঠিয়ে দিলাম। কিছু করার নেই, মাঝে মাঝে নার্সরা দেখে যাচ্ছে, ডাক্তার ভিজিট দিয়ে গেছেন, আমি অন্য একজনের সাথে বেডের পাশে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে বাড়ি ফিরে গেলাম।

টেলিগ্রাম পেয়েই মানসদা কলকাতায় ফিরেছে। কিন্তু জীবিত অবস্থায় বাবার দেখা পায়নি, রাত্রে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। কয়েকদিন থেকে মানসদা জ্যেঠামশায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে কর্মস্থলে ফিরে যায়। প্রোজেক্টের কাজ শেষ, মানসদা দিল্লি অফিসে ফিরে যায়। আমি পরীক্ষা দেবার সাথে সাথে জ্যেঠামশায়ের পরলৌকিক ক্রীয়াকর্মে যতটা পেরেছি মানসদার সাথে থেকেছি। জ্যেঠামশায়ের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া আমার বাবার মধ্যেও লক্ষ্য করলাম। বাবার সাথে জ্যেঠামশায়ের কোনো যোগাযোগ ছিলনা। আমার কাছ থেকে মাঝে মাঝে জ্যেঠামশায়ের কথা শুনতেন মাত্র, জানতেন জ্যেঠামশায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং সম্পর্ক, সে কারণে কিনা জানিনা, আমার মনে হয়েছিল বাবা যেন কিছুটা বিচলিত এবং চিন্তামগ্ন. যদিও ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

পরবর্তী অবস্থা বড় দ্রুত বদলে যায় এবং এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। সাদা সহজ মধ্যবিত্ত বাঙালি আর পাঁচটা পরিবারের মত মানসদা এবং তার পরিবারের সদস্যবৃন্দের জীবন প্রবাহ বয়ে চলে। আপাততঃ সামগ্রিক অবস্থা এবং কাজের গুরুত্বের কথা এবং মানসদার উপযোগিতা বিচার করে মানসদাকে দিল্লীর কেন্দ্রিয় দপ্তরে পোষ্টিং করে এবং দিল্লীর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়না। মানসদা দিল্লীতে বাড়িভাড়া নেয়। বৌবাজারের বাসায় তালাবন্ধ, জেঠিমাকে ও বৌদিকে নিয়ে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, স্ত্রী ও মাকে নিয়ে নতুন সংসার পাতে নতুন উদ্যমে। কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়, পিতৃশোকও নয়, জীবনের প্রয়োজনে সমস্ত আঘাত, সমস্ত ক্ষত ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়, লুপ্ত হয়। মানসদার ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি।

বন্ধ হয় আমার বৌবাজারে যাওয়া। চিরকালের জন্য আমি হারালাম একটি প্রিয় স্থান, হারালাম আমার নিজের মানুষ। ওরা চলে যাওয়াতে মনোকষ্ট হয়েছিল, জ্যেঠামশায় মারা যাওয়াতে যতটা নয় তার চেয়ে বেশি ওদের বিদায়ে। কিছু করার নেই। জীবনের শুরু থেকে শেষ--এরকম কত সাথী, বন্ধু, মাসিমা, জেঠিমা, দাদা বৌদি আসবে, কেউ রক্তের সম্পর্কে, আত্মীয়তার সম্পর্কে কিম্বা নেহাৎই পরিচিতি বা বন্ধুত্বের সম্পর্কে। কিন্তু চলার পথে চিরসাথী বলে কে বা থাকে! তবুও বাল্যবন্ধু, সম্পর্কে আমার মনে হয়, মনের আসনে স্থায়িত্ব অনেক দৃঢ় সে কারণে মানসদার সাথে আমার মানসিক সম্পর্ক আজো অক্ষুন্ন। আমাদের মধ্যে যোগাযোগ রয়ে যায় চিঠির মাধ্যমে। চিঠির অক্ষরের মধ্যে দিয়ে আমরা একে অপরের সাথে নিজেকে যুক্ত করে আনন্দ পাই। মাঝে মাঝে শ্রাবণী বৌদির কাঁচা হাতের লেখা নতুন মাত্রায় তৃপ্তি বিধান করে। পরবর্তীকালে মানসদার দিল্লীর ফ্ল্যাটে গেছি কয়েকবার—কার্য উপলক্ষে দিল্লী গেলে, ওদের ফ্ল্যাটে না গিয়ে থাকতে পারতামনা। পুনরায় যাতায়াত শুরু হয় মানসদা সল্টলেকে নিজস্ব ফ্ল্যাট বানিয়ে যখন বৌদিকে কলকাতায় পাঠায়। আমার জীবনে তখন রুচী এসে গেছে,

রোহিতও। বৌবাজারের তালা বন্ধ বাড়ী। কার্য উপলক্ষ্যে মানসদা কলকাতায় এলেও বৌবাজারের তালা খোলা হয়না, মানসদা উত্তর গাড়ায় অস্থায়ীভাবে দুচার দিনের জন্য ওঠে, থাকে, কাজকর্ম করে ফিরে যায়, আমার সাথে যোগাযোগের অভাবে বা আন্তরিকতায় ঘাটতি থাকার কারণে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়ে ওঠেনা। আসলে সম্পর্ক নিকট বা দূর যাই হৌক না কেন নির্ভর করে তার বন্ধন বা আকর্ষণ নির্ভর করে প্রাসঙ্গিকতার ওপর। কৈশোরের বা যৌবনের প্রাসঙ্গিকতা সময়ের সাথে সাথে, স্থানের ব্যবধান এবং পারিবারিক উপযোগিতার প্রভাবে আমাদের দুজনের সম্পর্কে অতীতের সেই নৈকট্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে অবশ্যই।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আমায় ডক্টরেট প্রদান করেছে। আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছে। কৈশোর থেকে জমে থাকা স্বপ্ন, বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন কাগজে কলমে প্রকাশ করতে শুরু করেছি। দেশে বিদেশের পত্র পত্রিকায় আমার প্রবন্ধাদি প্রকাশ হতে শুরু করাতে আমার উৎসাহ এবং দায়িত্ব বেড়ে গেছে কয়েক গুন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিদেশে প্রায়শঃই আমার যেতে হয়। প্রথমতঃ তথ্য অনুসন্ধানে; দ্বিতীয়তঃ আলোচন সভায়—বিষয় প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর কারণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন শিক্ষার অনগ্রসরতা, স্বাস্থ্য বিধির যথার্থ প্রয়োগের অভাব বা অতি সীমিত স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন কারণ, তথ্যাদি সহ বিশ্লেষণ এবং প্রতিকারের রূপরেখা। যেহেতু আর্থসামাজিক বিশ্লেষণে, বিশেষতঃ সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল আলোচনায় সামগ্রিক না হলেও আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়, সেই হেতু সমর্থনে ও বিরোধিতায় সে দেশের পত্র পত্রিকায় আমার লেখা নিয়ে সমালোচনা হয়, এবং সুখের বিষয় অল্প বয়সেই আমি খ্যাতিমান হয়ে উঠি। ডাক আসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিশ্ববিদ্যালয়, নানান বেসরকারি সমাজ সেবামূলক সংগঠন থেকে, আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞানের বিদগ্ধ মহলে আমার পরিচয় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে অক্সফোর্ড প্রেস থেকে আমার লেখার সংকলন প্রকাশিত হয় এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একাধিক বার মুদ্রণ হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সমাদৃত হওয়ার সাথে সাথে অর্থাগম ঘটতে থাকে।

রুচীর সাথে আমার পরিচয় ইত্যবসরে। আমার বাবা প্রয়াতঃ হয়েছেন, আমি একা, ডুবে থাকি আমার সাধনায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুবাদে রুচীর বাবা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, আমার সাথে সামান্য পরিচয় ছিল। পরিচয় নিবিড় হয় যখন আমার প্রথম সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয়েছে, কাগজের কৃপায় আমি ফেমাস হয়েছি এবং মাঝে মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য পেশ করতে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে। সেই সময় তিনি স্নেহভরে আমায় তার বসতবাড়িতে আমন্ত্রণ করেন এবং সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে হাজির হই। অত্যন্ত জ্ঞানি ও গুণীজন ছিলেন তিনি। বনেদি, উচ্চশিক্ষিত উত্তর কলকাতার রক্ষণশীল পরিবার। আগেকার দিনের পুরাতন বাড়ি, আসবাবপত্র এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি। ঘরে আগেকার দিনের লম্বা ঘেরা দালান, কালো মেহগিনির আসবাব, আলমারি, খাট, টেবিল, চেয়ার, বেতের বড় ইজিচেয়ার, উঁচু ছাদ। অধ্যাপক মহাশয়ের ঘরভর্তি পুরাতন পুঁথি থেকে অতি আধুনিক রচনা সম্ভার দেখা আমি শ্রদ্ধায় এবং বিস্ময়ে অভিভূত হই। আমার সঙ্কলন গ্রন্থটিও সেখানে স্থান পেয়েছে। তিনিই আমার সাথে রুচীর পরিচয়ে করিয়ে দেন, রুচী তখন কলেজে অধ্যাপনা শুরু

করেছে। হয়তো এ পরিচিতি পর্বের মধ্যে অধ্যাপক মহোদয়ের নির্দিষ্ট কোনো ইচ্ছার অব্যক্ত প্রকাশ থাকতে পারে অথবা প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে। চেহারায় যতটা না রুচীর আকর্ষণ ছিল, সেই পুরাতন কলকাতার উচ্চ শিক্ষিত অভিজাত পরিবেশে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্না সুন্দরী রুচী আমার মনে ততোধিক প্রভাব ফেলেছিল, এক কথায় ভাল লেগেছিল। সলাজ নব্য যুবতী রুচীর মুখেও ছিল তার পূর্ণ প্রতিফলন। রুচীর সলাজ কোমল দৃষ্টির সাথে আমার বিস্ময়জড়ানো অনুরাগমিশ্রিত দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল। সুশ্রী, সুন্দরী, উজ্বলবর্ণা, হালকা চেহারার রুচীর মুখে শিক্ষিকা সুলভ গম্ভীর অথচ মার্জিত কথাবার্তা আমার মনে রুচীর প্রতি সম্ভ্রমের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। আমরা দীর্ঘ সময় গল্প করেছি, আলোচনায় চপলতার স্থান ছিলনা, ছিল বিষয়ের গাম্ভীর্য্য এবং গভীরতা। পরবর্তী খুব কমদিনের মধ্যে পারিবারিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে রুচীর সাথে আমাদের উভয়ের ইচ্ছায় বিয়ে হয়। আমরা সুখে ছিলাম, উভয়ে উভয়ের প্রতি বিশ্বস্ততায় সশ্রদ্ধ ভালবাসায় অত্যন্ত আনন্দে বিবাহিত জীবন যাপন করেছি। আমি যেমন রুচীর বৃত্তিকে শ্রদ্ধা করতাম, রুচীও আমার কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতো, সত্যি কথা বলতে রুচী ছিল আমার কাজের একান্ত অনুরাগী। প্রাথমিক ভাবে বিয়ের আবেগ, মধুচন্দ্রিমা যাপন, একে অপরকে নিয়ে সদায় একান্ত মগ্ন থাকা ইত্যাদি ধীরে ধীরে প্রশমিত হওয়ার সাথে আমরা উভয়েই কাজের জগতে প্রত্যাবর্তন করি। তার অর্থ এই নয় যে দাম্পত্য জীবন পরিত্যাগ করে বরং দাম্পত্য জীবনের প্রাত্যহিকতার পাশে পাশে আমরা কাজে আত্মনিয়োগ করি উভয়ের স্বীকৃতি এবং সম্মতিতে।

ইতিমধ্যে একদিন মানসদা এসে হাজির। আমরা বিস্মিত হই মানসদার অপ্রত্যাশিত আগমনে তবুও আপ্যায়নের ত্রুটি ছিলনা। চা খেতে খেতে অত্যন্ত উৎসাহে বললে—

—সল্ট লেকে একটা প্লট পেলাম, কিনে ফেললাম। বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়, পশ্চিমবাংলায় থাকি অথচ আশ্রয় নেই বৌবাজারে থাকা যায়না—অস্বাস্থ্যকর। থাকতে গেলে আশ্রয় প্রয়োজন, পেলাম, কিনে ফেললাম, সময়মত যা করে হোক মাথা গোঁজবার জায়গা করে নেওয়া যাবে। কি বলো?

আমি তখন সাউথের একটা ফ্ল্যাটে থাকি। পারিবারিক আদি বাড়ি ত্যাগ করে আমাদের যৌথ ইচ্ছায় নতুন সাজানো সাদার্ন এভিনিউ-এর ফ্ল্যাট। নিজের ইচ্ছায় তিনটি রুমের বড় ফ্ল্যাট, সাউথ ফেসিং ব্যালকনি, বড় লিভিং প্লেস, সাজিয়েছে রুচিশীলা রুচী। আধুনিক আসবাব পত্র, আধুনিক কিচেন, স্নিগ্ধ ও শান্ত ঘরের রঙ এবং পর্দা। অকস্মাৎ প্রাচীনা রুচী, মডার্ন ফ্ল্যাটে এসে অন্তর থেকে স্নিগ্ধ আধুনিকতা বরণ করে। খোলামেলা ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে বসলে লেকের জল, সবুজ গাছ, অস্তগামী সূর্যের রঙে রাঙানো আকাশ দেখা যায়। দেখা যায় চাঁদের আলোয় কিম্বা আঁধার রাতের তারা ঝলমল আকাশ।

ব্যালকনিতে বসে কথা হচ্ছিল। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে, গাড়ি ছুটছে নিচের রাস্তা দিয়ে। মানসদাকে অনেকদিন পর দেখলাম, মনে হল মানসদার গায়ের রং কিছুটা ম্লান, এবং মোটা হয়েছে।

—তাই নাকি! খুব—খুব ভাল খবর। বৌদি কেমন আছে? আসেনি? তোমার ছেলে?

রুচী এসে পাশে বসে। রিমলেস্ চশমা চোখে। পরনে হালকা রঙের তাঁতের শাড়ী।

মানদামাসি টেবিলে রাখে মিষ্টির প্লেট, ভাজা কাজু। ঠাণ্ডা জলের গ্লাস। কিছু পরে মানদামাসি বিস্কুট ও চা দেয়। মিষ্টিতে কামড় দিতে দিতে কথা হয়, রুচী যোগ দিয়েছে। আমাদের বিয়েতে মানসদা যোগ দিতে না পারলেও পরবর্তী সময়ে একবার এসে রুচীর সাথে আলাপ করে গেছে। বৌদি পাশে ছিল। আমাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কের গল্প আমি রুচীর সাথে করেছি।

—চা খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—তোমাদের এ জায়গাটা বেশ সুন্দর। জানো দিল্লীতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও অফিসের কাছাকাছি একটা ভালো ফ্ল্যাট পাওয়া গেল না। ফাঁকা, হাওয়া বাতাস থাকবে. পরিবেশ প্রতিবেশী ভালো হবে—হল না।

—তোমার ফ্ল্যাটও খারাপ না। সি আর পার্কে থাকতে পারতে?

—পারতাম, প্রথম কথা অফিস থেকে অনেক দূর হতো, দ্বিতীয়তঃ খালি পাওয়া গেলে, তবে তো?

—মানব কত বড় হলো?

—বেশ বড় হয়ে গেছে, তেমনি দুষ্টু। দিন রাত্রি বক্ বক্ ওর সাথে যতক্ষণ জেগে থাকবে, কথা বলতে হবে নয় খেলতে হবে। তোমার বৌদি বেসামাল। আমি অফিস থেকে ফিরলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। ওর জন্যই তো লছমিকে রাখতে হয়েছে।

—এ ক'দিন তাহলে বৌদিকে বিরক্ত করবে?—একা একা সামলাবে।

—যা হয় করবে, লছমি আছে—নার্সারিতে ভর্তি করে দিয়েছি, অন্ততঃ চার ঘণ্টার নিষ্কৃতি। সেজন্যই তো শ্রাবণী আসতে পারলো না, স্কুল কামাই হবে।

আমার হাসি পায়। তিন বছর বয়স, কথা বলতে শিখেছে, নার্সারিতে সবে ভর্তি হয়েছে। কলকাতায় আসলে এক সপ্তাহ স্কুলে যেতে পারবেনা বলে বৌদি আসতে পারলেনা। বিনা কাজে নয়, একটা শুভ কাজে, তাদের বাসস্থানের জন্য জমি কেনা হবে. তাও সে পড়া কামায় হবে বলে আসতে পারেনা।

—তবুও বৌদিকে আনতে পারতে, কি এমন পড়া যে আসা যায়না। কতদিন বৌদিকে দেখিনি বলো তো।

—শ্রাবণী বৌদিকে আনতে পারতেন।

রুচী সমর্থন করে।

—মাত্র সাতদিনের ছুটি। যাতায়াত, কতটুকু সময় হাতে থাকতো? তবে শ্রাবণী আসলে অন্ততঃ ওর বাবা মার সাথে দেখা হয়ে যেত, উনাদেরও বয়স হয়েছে। শুনেছি ওনারা কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লী যাবেন—

তিনজনে কথায় কথায় সন্ধ্যা পার করলাম। দক্ষিণে খোলা ঝোলা বারান্দা বা ব্যালকনি। ছ'তলায় ফ্ল্যাট, যানবাহনের কোলাহল কম পৌঁছায়। লেক থেকে হাওয়া আসছে মাঝে মাঝে, মনোরম হাওয়া, সামনের আকাশে ইতস্ততঃ তারার দল। নিচে সাদার্ন এভিনিউ দিয়ে গাড়ি ছুটছে। ব্যস্ত রাস্তা হলেও অপেক্ষাকৃত হালকা ভিড়। মানুষজনের গায়ে গায়ে চলতে গেলে ধাক্কা লাগেনা। ফুটপাথ আছে, এখনো বেদখল হয়নি। তবে বেশিদিন ফাঁকা থাকবে বলে মনে হয়না। যে ভাবে সাবেকি বাড়িগুলো ভেঙে বহুতল বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে—এখানেও অচিরে ভিড় বেড়ে যাবে। মানসদা উত্তর পাড়ায় ফিরবে হাওড়া হয়ে। বৌবাজারের স্মৃতি বিজড়িত জায়গায় একদিন সে ঘুরে

এসেছে।

—ওখানে গেলে কষ্ট হয়। মা বাবার কথা মনে আসে। কান্না পায়। অন্ধকার, বিশ্রী, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে গন্ধ, কষ্ট হয়, থাকতে পারনি একবার চোখ বুলিয়েই বেরিয়ে পড়ি।

মানসদার দিল্লীর ফ্ল্যাটে মারা গেছেন জেঠিমা।

—স্বাভাবিক। দিল্লী কেমন লাগছে? কবছর হল?

রুচী জানতে চায়।

—দিল্লীতে কেমন লাগছে—বলা মুশকিল। ভালো-মন্দ বিবেচনা করার সময় কোথায়? চাকরি করতে হবে, থাকতে হবে, থাকছি। অফিস থেকে বাসায়, বাসায় থেকে বাজার—এই তো গন্তব্যস্থল। সামান্য পরিচিতি—অফিসের মুষ্টিমেয় কলিগদের সাথে। শ্রাবণীরও তদ্রুপ, বাসা এখন ছেলের স্কুল—তাও বাড়ির কাছে। কলকাতায় যত ভিড় আছে। যানজট আছে, দিল্লীতে ততটা নয়। তবুও আমি কলকাতার ছেলে। দিল্লীতে মন বসেনা। তবে একটা সুখবর বা খারাপ খবরও বলতে পারো, তাড়াতাড়ি দিল্লী ছাড়তে হবে।

—কেন?

—জম্মুতে একটা বড় প্রোজেক্ট শুরু হতে চলেছে। মনে হচ্ছে সেখানে যেতে হবে। সরকারি চাকরির এই একটা বড় অসুবিধা, পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয় প্রায়শঃই। একটা চেয়ারে বসে অন্ততঃ কিছুদিন স্থায়ীভাবে কাজ করবো, হয়না। এবার সিফ্‌ট আরো ঝামেলার, সব কিছু নিয়ে সিফ্‌ট হতে হবে, যদি সে রকম কোনো সুযোগ সুবিধা থাকে। মুশকিল হবে মানবের লেখাপড়া নিয়ে।

—আমি বাবা বেশ আছি, সংসারের দায়িত্ব রুচীর।

রুচীর কোন প্রতিক্রীয়া ছিলনা আমার হালকা মন্তব্যে। মনে হলে দায়িত্ব নিতে মানসিক ভাবে প্রস্তুত সে। কারণ সে জানে, যেহেতু আমি প্রায়শঃই এখানে সেখানে যাই, অতএব সাংসারিক দায়িত্ব পালনে রুচীর ভূমিকা মুখ্য। রুচী সন্তান সম্ভবা, এর মধ্যে সে স্থায়ীভাবে একজন আয়া নিয়োগ করার ব্যবস্থা করে রেখেছে। বর্তমানে দুজনের সংসার, রুচীর কলেজ আছে, স্থায়ী চাকরি। বেশি ক্লাস নিতে হয়না, গাড়িতে করে কলেজে যাতায়াত করে। বাড়িতে অত্যান্ত, বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীলা মাসি আছে, রুচীদের পুরানো লোক, বিয়ের পর রুচী ওকে নিজের কাছে রাখে। অধ্যাপক শ্বশুর মশায় যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে পরিচারিকা মহিলাকে রুচীর সংসারে স্থানান্তরণ করে। সংসারে তার কোনো দায় দায়িত্ব নেই, নিঃসন্তান অনাথ বিধবা, রুচীর জন্মের আগে থেকে ওদের সংসারের একজন স্থায়ী সদস্যা। রুচীর থেকে বেশ বড়, সেই সংসারের সম্পূর্ণ ভরসা। কথায় কথায় সময় পার হয়ে যায়, অপরাহ্নের কোলাহল স্তিমিত। গাছগুলো আঁধারে ঢেকে গেছে, কোথাও কোথাও পোষ্টের আলোয় বা গাড়ির হেড লাইটের আলো গাছের ডালে বা পাতায় লাগছে, হালকা হাওয়ায় ছোটো ছোটো শাখাপ্রশাখাগুলো দুলছে। নির্মল আকাশ তারায় ভরে গেছে। চাঁদ নেই, সম্ভবতঃ অমাবস্যা নিকটে। ভোরের দিকে চাঁদ ওঠে। চাঁদ দেখা হয়না। এককালে রুচী ও আমি রাতভর জেগে ভোরের চাঁদও দেখেছি—পশ্চিম আকাশে একফালি ম্লান চাঁদ। সে সময় বহুরাত জাগরনে কাটিয়েছি—কথায় গল্পে, হাসি ঠাট্টায় যৌবনের উচ্ছল উদ্দামতায়।

বিয়ের প্রথম বছর কলকাতার বাইরে কেটেছে অন্ততঃ তিনমাস, পূজার ছুটী, গরমের ছুটী, খৃস্টমাসের ছুটী—ঘুরতে ভালবাসে রুচী। তিন বছর হল, আমাদের বিয়ে হয়েছে, রুচী মা হতে চলেছে—জীবনের সে-উদ্দামতা এখন অনেকটা সংযত।

আর এক দফা মানদামাসির পরিবেশিত চা-পর্ব শেষ করে মানসদা ফিরে যায়—উত্তরপাড়ায় গঙ্গার ধারে শ্বশুর বাড়িতে. সেখানেই সে কয়েকদিন থাকবে। সল্টলেকে একটা প্লট কিনলো মানসদা। ভালো করেছে—ওর দরকার। শ্রাবণীবৌদি তার ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত। মানবকে দেখেছি বৌদির কোলে। সেও স্কুলে যাচ্ছে, সময় পার হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যে রুচী মা হবে—আমি বাবা। আমার বাবাও একদিন হঠাৎই স্ট্রোকে চলে গেলেন। বাড়ির সাথে আমার সম্পর্ক নেই। বৌদির চেহারাটা মনে আসছে—প্রতিমার মত দেখতে, ছোট্ট কপাল, বড় চোখ, পরিপাটি করে বাঁধা একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, সিঁথিতে সিন্দুর, সদা মৃদু হাসি লেগে থাকে ঠোঁটে। আস্তে আস্তে কথা বলে। মানসদার কথা শুনে মনে হল শ্রাবণীবৌদি পাকা গৃহিণী হয়ে গেছে, সংসার করছে, ছেলে মানুষ করছে। মানসদা দায়িত্ববান স্বামী ও জনক। জীবন এগিয়ে চলেছে অত্যন্ত স্বাভাবিক, সামাজিক ও পারিবারিক ছকে বাঁধা নিয়মে। আমি ও রুচী বসে থাকি।

—তোমার শরীর ঠিক আছে? নেক্সট্ চেক-আপের ডেট কবে? চেষ্টা করবো এবার তোমার সাথে থাকতে।

ম্লান আলো জ্বালানো। সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর আমরা এখানে বসলে উজ্বল আলো জ্বালাইনা। মানসদা ফিরে যেতেই মানদামাসি কম পাওয়ারের বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে, যে কারণে রুচী হাসলো কি-না দেখা না গেলেও বুঝলাম সে ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসির স্পর্শে উত্তর দিলে।

—কে তুমি? ডাক্তারকে দিয়ে চেক্ করাতে যাবো। তুমি পাশে থাকবে! কবে থেকেছো?

নিছক সত্য কথা। এ কথার পিঠে কোন জবাব হয়না, একমাত্র উপলব্ধি করা যায় বা হজম করা যায়। রুচীর অনুযোগ যথার্থ। চার সাড়ে চার মাস হতে চলল, আজ পর্যন্ত আমার স্ত্রী, রুচীর প্রথম সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে. জানি কোনো এক নার্সিং হোমের একজন প্রসূতি বিশেষজ্ঞের পরামর্শে বা তত্ত্বাবধানে রুচী আছে, সেখানে রুচী নিয়মিত যায়। চেক আপ করায়, এবং তার পরামর্শ মত চলে. তার সাথে একদিনও যেতে পারিনি। কারণ এই নয় যে আমি অনিচ্ছুক, যে কটি ডেটে রুচী চেক্-আপে গেছে, আমার কলকাতার বাইরে কোনো না কোন কর্মসূচি থেকে গেছে। রুচীর সাথে কখনো আমার শ্বাশুড়ি মা নয় মানদা মাসি যায়। যদিও সঠিক নয় তবুও নিরুপায়, আমার সিডিউলের সাথে রুচীর চেক্আপের সিডিউল ম্যাচ করেনি। তাই মনে মনে ঠিক করলাম, এবার নিশ্চয়ই রুচীর সাথে থাকবো, প্রয়োজন হলে প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করাবো।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, কন্‌সিভ্ করার পর সে বড় কষ্টে ছিল, খেতে পারতোনা—অরুচী, ভমিটিং টেন্‌ডেন্‌সি সাধারণতঃ যে সব সিম্‌টম্‌গুলো হয়ে থাকে, সে সময় ওর পাশে থাকার চেষ্টা করেছি তবুও মাঝে মাঝে ফেল করেছি। যা হোক সেই অসুবিধা সামলে নিয়েছে তবুও স্বামী হিসাবে ওর পাশে থাকা আমার কর্তব্য. আমি থাকবার চেষ্টা করবো। আসলে রুচীর নিজের অসুবিধা হলেও আমার কোনো কর্মসূচিতে সে বাধা দেয়না পরন্তু সে আমার কর্মসূচি মত আমায় চলতে পরামর্শ দেয়।

প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতা রুচীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

কিছু সময় পর রুচী উঠে যায়। আগামীকালের কলেজে ক্লাসের সামান্য প্রস্তুতি, তার ওপর পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, ছাত্রীদের জন্য কিছু নোট্স রেডি করতে হবে। আমিও টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে একটা জার্নাল খুলে বসি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত সমস্ত জার্নাল না হলেও ইংরাজিতে লেখা অনেক জার্নাল আমাকে নিতে হয়, তার মধ্যে সদ্য লণ্ডন থেকে প্রকাশিত একটা জার্নালের পাতা উল্টাই। বিশ্ব সংস্থা ইউ এন্ ও এই সামাজিক সমস্যা নিয়ে কি ভাবছে? বিভিন্ন দেশে তাদের কর্মসূচি কি? ডাক্তারি শাস্ত্রের চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতি, সমাজ বিজ্ঞানীদের আর্থসমাজিক অবস্থা পরিবর্তনে পরামর্শ সমূহ, রাষ্ট্র নায়কের ভাবনা সমূহ বা কর্মসূচী ইত্যাদি জানা অত্যন্ত জরুরী। প্রতিনিয়ত আলোচনা, পদক্ষেপ, শিশুমৃত্যুর প্রতিরোধের স্বার্থে অগ্রগতি ও প্রয়াস জানা প্রয়োজন, এর সাথে আছে আমাদের দেশের সরকারের ভূমিকা—প্রকৃতপক্ষে সরকারি তরফে উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব আছে, তবুও প্রতিনিয়ত এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মানুষকে যথার্থ সচেতন করতে পারলে কিছুটা উপকার হবে। যদিও সচেতনতাই একমাত্র প্রতিরোধের উপায় নয়—আছে অশিক্ষা, দাবিদ্র, চিকিৎসারও সুযোগের অভাব ইত্যাদি। তবুও স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে শিশু এবং প্রসূতিজনিত কারণে সন্তান সম্ভবা মায়ের মৃত্যু অনেকাংশে হ্রাস পাবে। সে কারণেই প্রতিনিয়ত কর্মসূচির মধ্যে থাকা জরুরী।

রাতের খাবারের সময় হলে ডাইনিং টেবিলে পাশাপাশি খাবার গ্রহণ করি। রুচীর বিশ্রাম প্রয়োজন, সে শুয়ে পড়ে, আমি অন্য ঘরে আলো জ্বেলে নিজের কাজ করি যতক্ষণ ঘুম না আসে। এই ভাবেই আমাদের দাম্পত্য জীবনে, আমরা উভয়েই আমাদের স্বাতন্ত্র রক্ষা করে এগিয়ে চলি, কোন বিরোধ নেই বরং অনেক বেশি সুশৃঙ্খল ও সুসংযত। শ্রাবণী বৌদি ও মানসদার জীবন যাত্রা ও রুচী ও আমার জীবন যাত্রার ধারা ভিন্ন কিন্তু উদ্দেশ্য এক।

রক্তে মাংসে গড়া মানুষের মৌলিক চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। স্নেহ ভালবাসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতি বস্তুতঃ সকল মানুষেরই এক তবুও ব্যক্তিসত্ত্বা, চিন্তাধারা, জীবনের ওপর ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এক নাও হতে পারে, গ্রহণযোগত্যা বা প্রতিক্রীয়া ভিন্ন ভিন্ন হতেই পারে। মানসদা ও শ্রাবণী বৌদির জীবন ধারা বা জীবনের লক্ষ্য বা স্বপ্নের সাথে রুচী ও আমার স্বপ্ন বা জীবনধারা এক হবে এমন কথা নেই। যেমন মানসে ও আমাতে পার্থক্য তেমনি রুচী ও শ্রাবণীবৌদির চিন্তার ও কর্মধারার এমনকি পারিবারিক জীবনেও অনেক ফারাক। হয়তো বা এটাই বৈচিত্র!

বছর পাঁচেক হলো মানসদা ও শ্রাবণী বৌদির বিয়ে হয়েছে। জ্যেঠামশায়, জেঠিমা আর নেই। ওদের জীবনে ওদের সন্তান মানব এসেছে, সেও স্কুলে লেখাপড়া শুরু করেছে, বলতে গেলে দুজনের পাঁচ বছরের সংসার জীবন। স্বামী ও স্ত্রী মানসিকতায়, চিন্তাধারায় দুটি ভিন্ন সত্ত্বা তবুও সামাজিক বন্ধনে একে অপরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং একে অপরে ব্যবহারিক জীবনে অভিন্ন এবং অবিচ্ছিন্ন।

একই পরিভাষায় রুচী ও আমি একাত্ম এবং অবিচ্ছিন্ন। প্রকৃতপক্ষে বিয়ের পর অন্ততঃ এক বছর দেহে ও মনে আমার অভিন্ন ছিলাম। প্রাক-বিবাহ আমাদের মত

বিনিময় একাত্মতা স্থাপনে সাহায্য করেছিল, যা শ্রাবণী বৌদিদের ক্ষেত্রে ছিল না। আমরা এক সাথে খেতাম, একসাথে একই সুরে একই কথা বলতাম, একই স্বপ্ন দেখতাম, আমরা একে অপরের আদর্শকে শ্রদ্ধা করতাম—এক প্রাণ, এক সত্ত্বা, এক সুখ, এক আনন্দ— দুজনেই ভাগ করে নয়, একত্রে ভোগ করতাম, আত্মহারা ছিলাম আমার। মনে হতো স্বর্গও বোধ হয় এমন সুখের নয়। মনের সুখে পাহাড়ে ঘুরেছি, শৈলাবৃত পর্বতে খেলেছি, হেসেছি, গড়িয়েছি, সাগর পারে লাল সূর্যের সোনালি সন্ধ্যায় অস্তগমন দেখেছি কাঁধে কাঁধ রেখে, সাগর স্নান করেছি সাগর জলে ঢেউ এর সাথে কোলাকুলি করে—মনে হত আমরা ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরের ওপর কারো অধিকার নেই; ঐ আকাশ শুধু আমাদের, ঐ সাগর তরঙ্গ আমাদের, সবুজের শোভায় বনমর্মর, পাখির ডাক শুধু আমাদের জন্য, নক্ষত্র খচিত রাতের আকাশ, শুভ্র চাঁদের আলোয় মোহময় রাত্রি, আমাদেরই জন্য—রুচী আমার, আমি আমার, দুজনে আমরা অভিন্ন। তবুও রুচীর স্বপ্ন রুচীর স্বপ্ন নয় সে স্বপ্ন আমারও, আমার স্বপ্ন রুচীর স্বপ্ন সে স্বপ্ন শুধু আমার নয়-- আমরা দুজনে স্বতন্ত্র স্বত্বা নিয়েও একাত্ম। এই পৃথিবীতে যবে থেকে পরিবার প্রথা সৃষ্টি হয়েছে - দুটি বা দুয়ের অধিক ভিন্ন সত্ত্বা একে অপরের পরিচয়ে পরিচিত হয়ে, একই শয্যায় শয়ন করে বছরের পর বছর অতিক্রম করে সংসার যাত্রা নির্বাহ করি।

যথাসময়ে রুচীর সন্তান হয়—রোহিত। রুচী রোহিতের মা ও আমি রোহিতের বাবা। রোহিতের ও আমাদের পরিচয় স্থায়ী ভাবে লেখা হয়ে গেল রাষ্ট্রীয় খাতায় যেটি অন্য জীবজগতে নেই, সুদূর অতীতে আমাদেরও ছিল না। মানসদার বদলির আদেশ হয়, মানসদা সপরিবারে, সাংসারিক সার্মগ্রি নিয়ে কাশ্মীরে চলে যায়। ক্যাম্প অফিস হলেও ক্যাম্পের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কোয়ার্টার। সাথে যায় আরো একজন সদস্য—লছমি। যার পরিচয় বেশি জানা নেই—না আমাদের না মানসদাদের। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণা যুবতী। দিল্লীতে মানসদার কোয়ার্টারের পরিচারিকা। বৌদির সাথে সাথে থাকতো, বৌদির হাতে হাতে কাজ করতো, মানবকে কোলে পিঠে নিয়ে আদর করতো, দেখাশোনা করতো, মানুষ করতে সাহায্য করতো। ওর বাবা ছিল মানসদাদের দিল্লী অফিসের দারোয়ান, যার জন্ম নেপালে, বিয়ে করেছিল নেপালেই, কিন্তু উদর পূরণ কারণে দিল্লীতে এসে সাহেব সুবাদের ফাই ফরমাস খাটতো। বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যকে মূলধন করে কোনো এক বড় সাহেবের দয়ায় দারোয়ানের স্থায়ী চাকরি। নেপালে দারিদ্রতা প্রকট, যে কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে নেপালিদের এই পেশায় দেখা যায়। সেই দারোয়ানের মেয়ে লছমি। যে এই গল্পের নায়িকা লাবণী কাম কিউটির মা, যার খবর কেউ জানে না। বেপাত্তা। মৃত না জীবিত তাও অজানা। যাক্ সে সবকথা পরে বলা যাবে। মানসদার সংসার আপাততঃ কাশ্মীরের ক্যাম্প অফিসে।

মানসদাও আমার মধ্যে যোগাযোগ স্বভাবতঃই কমে যাচ্ছে। সংসার ও অফিস নিয়ে ব্যস্ত, আমার অবস্থা তদ্রুপ না হলেও অবসর কমে গেছে। মাঝে মধ্যে দুটো একটা ফোন, কুশল বিনিময়, সামান্যতম খোঁজ খবর বা সংক্ষিপ্ত চিঠি, আপাততঃ যোগাযোগ বা সম্পর্ক। সময়ের সাথে বদলে যায় সবকিছু আচার আচরণ এমন কি পুরানো অভ্যাস, পুরানো সম্পর্ক ইত্যাদি। যে যার মত নিজের বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হয়। তবুও ভাল মানসদা কলকাতায় এলে আমার সাথে কিছু সময়ের জন্য হলেও দেখা করে যাবে, যেমন মাস তিনেক আগে জমি রেজিষ্ট্রি করার সময় এসে দেখা করে গেছে।

আমি রোহিতের জন্মের পর ফোন করে মানসদা ও বৌদিকে খবর দিলাম। হাসতে হাসতে রুচীকে দুজনে শুভেচ্ছা জানালো। রোহিত জন্মানোর আগেই রুচী তার ভাবি সন্তানের জন্য দুটি নাম পছন্দ করে রেখেছিল এক রোহিত অন্যটি বাসব, রুচীর আমার নামের অক্ষরগুলি নিয়ে, আবার যদি মেয়ে হতো, তার জন্যও দুটি নাম—অবশেষে আমার সম্মতিতে আমাদের সন্তানের নামকরণ হয় রোহিত। এই পৃথিবীতে আমাদের সন্তান পরিচিতি লাভ করল রোহিত বাসু নামে। শুরু হল এক দলারক্তমাংসে গড়া, নাক, চোখ, মুখ কান মাথাভর্তি চুল নিয়ে রোহিত নামে ভাবি এক মানবের পথ চলা। বড় আনন্দের দিন রুচীর ও আমার। আমি অন্ততঃ এই শুভসময়টায় থাকতে পেরে পুলক অনুভব করছি। একমাত্র আমার শাশুড়ি মা ছাড়া কেউ নেই এই সময়ে সঠিক ভাবে রুচীর পবিচর্য্যা করবে। তিনিই এসে নার্সিং হোম থেকে ফ্ল্যাট পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব পালন করলেন। পাশে মানদামাসি, আমাদের বিশ্বস্ত এবং একান্ত নির্ভরশীলা পরিচারিকা। আমি এক মাসের জন্য আমার সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে দিলাম। নার্সিং হোম থেকে মা ও সন্তানকে ডাক্তারের পরামর্শে বাড়িতে নিয়ে এলাম। ঘরে ফিরল রুচী তোয়ালে চাপা দেওয়া আমাদের সন্তান কোলে।

রোহিতকে নিয়ে শুরু হলো আমাদের জীবনের নতুন অধ্যায়। বিশেষ করে রুচীর জীবনে শুরু হল এক অন্য মানবিরূপ; মা। মা হিসাবে যে কোন নারীর ভূমিকা, তাঁর ত্যাগ, তার অবদান, তার প্রস্তুতি, সন্তানের জন্য আচার আচরণ এমনকি প্রাত্যহিক অভ্যাসের পরিবর্তন—এক অনন্য সাধানা। রুচী মগ্ন হলো তার রোহিতকে বড় করার অক্লান্ত সাধনায় রোহিতের জন্মের সাথে সাথে রুচীর যেন নবজন্ম হল। শরীরের গঠন থেকে মনেব গঠন পরিবর্তন শুরু হলো। প্রথম খাদ্যাভ্যাস বদলাতে হলো সন্তানের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে, যে খাবার মা খেলে সন্তানের শরীর খারাপ হয় সে খাবার নিষেধ, শিশুর ঘুমানো বা জেগে থাকাব সাথে বদলে গেল তার ঘুমের অভ্যাস, এ ছাড়াও দিনের বেশির ভাগ সময় শিশু সন্তানের জন্য ব্যয় করা, সযত্ন লালিত স্তন নিঃসৃত দুগ্ধ শিশুকে পান করিয়ে পরিতৃপ্ত হওয়া। এ এক অন্য রুচী, কলেজের অধ্যাপিকা গম্ভীর প্রকৃতির রুচীর সাথে, বসন্ত বাসুর হাত ধরে কোনো পাহাড়ি পথে বা সমুদ্র জলে উচ্ছলা নববধু রুচীর সাথে, রোহিত জননী রুচীর অনেক তফাৎ। রোহিতে রুচী মগ্ন রইলো সর্বক্ষণ। যদিও মানদা মাসির ভূমিকার তুলনা নেই।

কর্মজীবনে সে ফিরবে। এখনি কর্মজীবনের ইতি টানতে চায়না রুচী। একজন সমস্ত দিনের জন্য আয়া বন্দোবস্ত করা হল, যে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত শিশুর দেখা শুনা করবে। নির্দিষ্ট সময়ের ছুটির পরও আরো মাস দুয়েক পরে কলেজে যোগদান করলো রুচী। মাতৃত্বের আকর্ষণে কোনো রকমভাবে কলেজের ক্লাস চুকিয়ে বাড়ি ফিরে এসে রোহিতকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সেখানে আমার অস্তিত্ব ধীরে ধীরে গৌণ হয়ে যায়। যতক্ষণ রুচী বাড়িতে থাকে রোহিত রুচীর, অন্য কারোর নয় এমন কি, আমিও ইচ্ছা করলে রোহিতকে কোলে নিতে পারি না। আমিও রুচীর এ হেন আচরণে অসন্তুষ্ট ছিলাম না, বরং রুচীর এ রূপ আমার কাছে প্রিয় ছিল। যদিও রুচীর সামান্য সান্নিধ্যলাভ, ছোটখাটো আদর ভালবাসা, রোহিতকে আদর করার ইচ্ছা হতনা তা নয়। তবুও রুচীর কথা ভেবে নিজের ইচ্ছা দমন করতাম। রোহিত জন্মাবার পর রুচীর শরীরে যে ক্ষয় হয়েছিল, তা পূরণ হয়নি, এখনো সে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তার ওপর

কলেজে ক্লাস নেওয়া ও তার প্রস্তুতি, রোহিতের জন্য রাত্রে ঘুমের অসুবিধা, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, ইত্যাদির জন্য রুচীকে ক্লান্ত দেখাতো। যে কারণে রুচীর স্বাভাবিক অভ্যাসের পরিবর্তনে অস্বাভাবিকতা মনে হতো না। মনে মনে ভাবতাম, রোহিত বড় হলে, রুচীর শরীরের উন্নতি হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি রোহিত ও রুচীর জন্য সময় ব্যয় না করে বরং আরো মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে লাগলাম। আমার দ্বিতীয় বইটি মুদ্রিত হল, যার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে, তথ্য সংগ্রহ করা, তথ্যাদির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া, পাণ্ডুলিপি পাঠানো, প্রুফ দেখা, পরিবর্তন করা একা করেছি। বই যখন প্রকাশ হল রোহিতের বয়স দু বৎসর। রোহিত বড় হয়েছে, হাসছে, খেলছে, লাফাচ্ছে, কথা বলছে—এক সুন্দর সুস্থ শিশু। রুচীর শরীর আগের চেয়ে ভলো। বইটি প্রকাশ পাওয়ার পরই আর্ন্তজাতিক মহল থেকে দারুণ প্রশংসিত হয়, এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুদ্রণও শেষ হওয়ার পথে। বিভিন্ন সংস্থা থেকে আপ্যায়িত হলাম, পুরস্কৃত হলাম, খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। সম্মানের সাথে সাথে অর্থ প্রাপ্তি হল আশার অতিরিক্ত, রুচীও সম্মান জানালো, আনন্দিত হল। তার খুশি তার অভিব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পেলো। তবুও মাঝে মাঝে মনে হতো আমার স্বীকৃতিতে রুচীর খুশির সাথে মিশিয়ে আছে একজাতীয় হীনমন্যতা, যেন সে আমার কাছে ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে, জ্ঞানে গরিমায় আমি রুচীর তুলনায় অনেক বড়। যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কোনদিনই রুচীকে আমার ছোট মনে হয়না বরং রুচীকে আমার স্ত্রী হিসাবে প্রাপ্তিতে আমি গর্বিত। বরং আমি রুচীকে কাছে আরো কাছো, আরো নিবিড় করে ব্যাকুল ভাবে চাইতাম। কিন্তু না। আমার সে আশা অধরা রয়ে গেল। রুচী বদলে গেছে। রুচীকে আমি আর স্পর্শ করতে পারিনা, সে রোহিতের আমার কেউ নয়। এ যে কি ভীষণ পীড়াদায়ক, মানসিক যন্ত্রণা বোঝানো মুশকিল।

চোখের সামনে রোহিত বড় হতে থাকে, আমরা রোহিতের বড় হওয়া উপভোগ করি। বিশেষ করে আমি রুচীর অনুপস্থিতিতে। দোলনায় চিৎ হয়ে শুয়ে হাত পা নাড়া, মুখে এক ধরমের গ...গ...আওয়াজ করা, চোখের তারা অনির্দিষ্টের সন্ধানে ঘোরা, পাশে দাঁড়াতাম, আয়া মুচকি মুচকি সামনে দাঁড়িয়ে হাসতো, তারপর হামাগুড়ি দেওয়া, বসা, দাঁড়াবার চেষ্টা দেখতাম, ভালো লাগতো। দোলনা ছিল শোবার ঘরে, কলেজ যাওয়ার আগে পর্যন্ত রোহিতের সাথে রুচী কথা বলতো, যদিও শিশু রোহিত কি শুনতো, কি বুঝতো কেউই বলতে পারবে না। হয়তো রুচী বুঝতে পারতো। রুচীর এক মুখ হাসি—মায়ের মুখ—দেখে তৃপ্তি হতো নিশ্চয়।

মানসদা, শ্রাবণী বৌদি কাশ্মীর থেকে যোগাযোগ রাখে, খোঁজখবর নেয়। নতুন জায়গায় কাজের চাপ আছে। কোয়ার্টার পেয়েছে, কোয়ার্টারের বর্ণনা করে, আমি শুনে মনে মনে কোয়ার্টারের একটা চেহারা কল্পনা করে ওদের অবস্থা অনুভব করি। ওখানে যাওয়ার পর মানবের পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। কাছে পিঠে এমন কোন স্কুল নেই যে মানবকে ভর্তি করা যায়, আপাততঃ শ্রাবণী বৌদি তাকে বাড়িতে বসে পড়ায়। মানবের পড়ার কথা চিন্তা করে শ্রাবণী বৌদি অত্যন্ত টেনশানে আছে। তবুও তাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই।

প্রতিটি মানুষই কৈশোর উত্তীর্ণ হওয়ার সময় থেকে মনে মনে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে সে ইঞ্জিনীয়ার হবে, ডাক্তার হবে, পাইলট হবে, ড্রাইভার

হবে, ব্যবসায়ী হবে, জাহাজে চেপে বিদেশে যাবে, কিন্তু কর্মজীবনে যারা যেমন প্রবেশ করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা অনুভব করে বাস্তবের আর স্বপ্নের মধ্যে বিস্তর তফাৎ, বাধ্য হয়ে বাস্তবতার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, কিন্তু কৈশোরের স্বপ্ন লুপ্ত হয়না সুপ্ত রয়ে যায় তার অন্তরে। সন্তান সন্ততি জন্মানোর পর কৈশোরের যুবক যুবতি সন্তানের পিতা ও মাতা সেই স্বপ্নকে তার সন্তান সন্ততির মধ্যে দিয়ে চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়। মানসদা ও শ্রাবণী বৌদিও ব্যতিক্রম নয়। ইতিমধ্যে রুচীও রোহিতকে নিয়ে নিশ্চয়ই স্বপ্ন রচনা করতে শুরু করেছে, আমি দেখেছি রুচী যখন রোহিতকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, তার স্বপ্নের কথা উচ্চারণ করে, হাসিমুখে কামনা করে, কল্পনা করে। এটাই তো জীবনের বাস্তবতা, বেঁচে থাকার নিয়ন্ত্রক বা চাবিকাঠি। পরম আশ্চর্যের বিষয় মানুষের মনোভূমি; নিরন্তর সে জগতে অনাদি অনন্ত-বাস্তব-অবাস্তব স্বপ্ন সমূহ আনাগোনা করে। উন্মুক্ত সে জগতের দরজা সদাই। সেখানে বর্ণালী স্বপ্ন কল্পনার পিঠে চেপে ভেসে আসে, ভেসে বেড়ায় আপন খেয়ালে, আর মায়াবদ্ধ মানুষ স্বপ্ন রসদে সঞ্জীবিত হয়ে শত বাধা, শত কষ্টকে উপেক্ষা করে বেঁচে থাকে।

সূর্য ওঠে দিন শুরু হয় দিনান্তে রাত্রি নামে, আকাশে তারা ফোঁটে, চাঁদের কিরণে পৃথিবী স্নাত হয়, এক ফালি চাঁদ ধীরে ধীরে পূর্ণতা পায় পূর্ণিমায় আবার ধীরে ধীরে পূর্ণতা হ্রাস পেয়ে অমাবস্যায় চাঁদ মুখ লুকায় দৃষ্টির অন্তরালে—চলতে থাকে চক্রাবর্তন— দিন রাত্রি থেকে সপ্তাহ মাস বছর-পৃথিবীর বয়স বাড়ে মানুষের বয়স কমে। এই সৌরচক্রের প্রতিটি নিমেষে জন্ম নিচ্ছে জীবন-উদ্ভিদ, প্রাণী, মানব শিশু। সমস্ত জীবনের সৃষ্টির উৎস প্রকৃতি ও সৌরমণ্ডল। সৃষ্ট জীবনের মধ্যে প্রকৃতিই সৃষ্টি করছে জীব জগতের প্রজনন শক্তি ও প্রক্রিয়া, জীবনের ধারাবাহিকতা আজো অব্যাহত । এর মধ্যে ব্যতিক্রম, আংশিক বা পূর্ণ ব্যতিক্রম নেই যে তা নয়। উপযুক্ত পরিবেশে উদ্ভিদ যেমন সতেজ সজীব এবং ফলবতী আবার পরিবেশের বা উদ্ভিদের জন্ম বা বৃদ্ধির প্রয়োজনের তুলনায় পূর্তির অভাবের কারণে সে বৃক্ষের বৃদ্ধি নেই, নিস্তেজ হয়, সঠিক ফল ও ফুল দিতে পারে না। মানুষের ক্ষেত্রেও সৃষ্টির একই নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। সব শিশুই পৃথিবীতে সুস্থ্য স্বাস্থ্যের অধিকারি হয় না। জন্মসূত্রেই হয়তো কারোর চোখ, কারো মুখ, কারোর কান হাত পা ইত্যাদির ক্ষমতা থাকে না, জন্মায় অপাহিজ বা পঙ্গু হয়ে। এমন অনেক আছে যার কান আছে তবু সে বধির, চোখ আছে অন্ধ, জিভ আছে অথচ কথা বলার ক্ষমতা নেই, পা আছে অসমান বা বাঁকা। দুটি হাত আছে, হয়তো একটি কাজ করে না—

—এমনি প্রতিনিয়ত শত সহস্র অসুস্থ মানব শিশুর জন্ম হচ্ছে। তাদের জীবনের কথা, তাদের অসহায়ত্বের কথা, কারণ, প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন, সভ্য মানব সমাজ দাবি করে। প্রয়োজন দেশে দেশে আর্থ সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, সরকারি বেসরকারি স্তরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া নয়, আর্থিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করা, গবেষণার সাহায্যে চিকিৎসার উন্নতিসাধন যাতে জন্মানোর পূর্ব হতেই প্রকৃত অনুসন্ধানের সাহায্যে শিশুকে পর্যবেক্ষণ ও যথার্থ চিকিৎসা করা, এবং মাতার স্বাস্থ্য সন্তান জন্মদানের যথার্থ ক্ষমতার অধিকারিণী হওয়া অর্থাৎ সুষম খাদ্যাদি গ্রহণের মত আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো এবং শিশু জন্মানোর পরবর্তী পর্যায়ে যথাযথ চিকিৎসা ও খাদ্য দ্বারা তাকে সুস্থ মানুষ করে তোলা। মানব সম্পদ পৃথিবীর সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ।

আমি আমার এই সাধনায় ব্যস্ত থাকি। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক, সমাজ সেবক, চিকিৎসক, শিক্ষকের কাছে আমি তথ্য নিয়ে হাজির হই— যা আমার জীবনের স্বপ্ন ও কর্তব্য।

ইদানিং মাঝে মাঝে ক্লান্তি নামে। রুচীর কাছে তার আন্তরিকতা সহমর্মিতা, সামান্য উৎসাহ কামনা করি, পাই না। কষ্ট হয়। অবসাদ ধীরে ধীরে গ্রাস করছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

একটা রিপোর্টের ওপর চোখ বুলাচ্ছিলাম। সংবাদপত্রে প্রকাশিত, স্বভাবতঃ বিস্তারিত নয়, অত্যন্ত সংক্ষেপে কিছু তথ্য, রাষ্ট্রসংঘের প্রদত্ত তথ্য এবং উপসংহারে ভারতবর্ষের মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিয় ভূমিকার শুধু সামলোচনা করাই হয়নি উপরন্তু মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রয়াসকে এক প্রকার ব্যর্থ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে শিশু মৃত্যুর হারে লিঙ্গ বৈষম্যের করুণ অবস্থা, এক থেকে পাঁচ বছরের শিশু মৃত্যুর মধ্যে কন্যা সন্তানের মৃত্যুর হার পুত্র সন্তানের মৃত্যু হার অপেক্ষা অন্ততঃ পঞ্চাশ শতাংশ বেশি, অর্থাৎ পুত্র সন্তান অপেক্ষা কন্যা সন্তানের প্রতি অভিভাবকের অবহেলা বেশি। অর্থাৎ সামাজিক চেতনার অভাব, বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব, এক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে মানুষের চেতনার মান উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা নেই বললেই চলে। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে ভারতবর্ষ এখনো কত অনুন্নত।

এমন সময় বৌদির ফোন পেলাম। বৌদি সল্টলেকের বাড়ি থেকে ফোন করে রুচীর সাথে কথা বলছে। দুজনে প্রায়শঃই টেলিফোনে ছেলে মেয়ের গল্প করে, আজো সেই গল্প। টেলিফোনের শব্দে পড়ার একাগ্রতা ভেঙে গেল, কাগজ বন্ধ করলাম।

বৌদির ছেলে মেয়ে কলকাতায় আছে। ছেলে মানব এবং মেয়ে লাবণীকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। মানবের চেয়ে লাবণী কয়েক বছরের ছোটো। আগেই বলেছি মানসদা বদলি হয়ে দিল্লীর অফিস থেকে কাশ্মীরের একটা প্রোজেক্টের দায়িত্বে নিয়ে ক্যাম্প অফিসের ফ্ল্যাটে বৌদি ও মানবকে নিয়ে সংসার পেতেছে। ওদের সাথে দিল্লী থেকে পরিচারিকা লছমিও গেছে। মানবের লেখাপড়ার স্বার্থে মানসদা, অফিস থেকে ব্যঙ্ক লোন ইত্যাদি নিয়ে জমি কেনার অল্পদিনের মধ্যে বিধান নগরের ফ্ল্যাটটির কিছুটা অংশ বাসযোগ্য করে নেয়। এবং মানব ও লাবণীর সাথে বৌদিকে সল্টলেকে পাঠিয়ে দেয়। মানব প্রাইমারি সেক্সান কাশ্মীরে শেষ করে, লাবণীর পড়া শুরু করাতে হবে। কাশ্মীরে বদলি হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই মানসদা মানবকে ক্যাম্প থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়, সেখানেই মানব ফোর্থ স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত পড়ে। বৌদি মানবকে হষ্টেলে পাঠাতে নারাজ অথচ ভাল স্কুল না হলে ওর ভবিষ্যৎ ভাল হবে না, যে কারণে বাধ্য হয়েই মানসদাকে একা রেখে বৌদি ছেলে মেয়েকে বিধান নগরে নিয়ে এসে ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেয়। ছেলে মেয়ের দায়িত্ব মুলতঃ বৌদির, এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। দুজনেরই কষ্ট হবে, কষ্ট করেও ছেলেমেয়েকে বড় করতেই হবে। কাশ্মীরের প্রোজেক্ট বড় ছিল, তখনো সেখানকার কাজ শেষ হয়নি।

বৌদি সল্টলেকে আসার পর থেকে আমাদের মধ্যে পুরানো সম্পর্ক আগের অবস্থায় ফিরে না এলেও যোগাযোগ মোটামুটি বজায় আছে, যাতায়াতও হয় মাঝে মাঝে। বিশেষ করে মানসদা এলে আমাদের ফ্ল্যাটে আসবেই এবং সময় থাকলে আমরাও যাই। বালক

মানব এবং শিশু লাবণী বাবা মায়ের সাথে এসে রোহিতের সাথে খেলবে। একা রোহিত, ওরা এলে আনন্দিত হয়।

কাশ্মীরের প্রোজেক্ট শেষ হলে মানসদার দায়িত্ব পড়ে রাজস্থানের একটা পাওয়ার প্রোজেক্টে, বড় নয়, হয়তো দু তিন বছরেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। মানসদা দুমাস অন্তর ছুটিতে বাড়িতে আসে, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, বাড়ির কাজ দেখে কর্মস্থলে ফিরে যায়। এইভাবে বছর দুই রাজস্থানের প্রোজেক্ট শেষে হেড অফিসের বড় কর্তাদের অনুরোধ জানিয়ে পশ্চিমবাংলায় বদলি হয়ে কলকাতায় নিজের সংসারে ফিরে আসে। কিছুদিনের মধ্যেই মালবিকার জন্ম হয়। মালবিকা শ্রাবণী বৌদি এবং মানসদার দ্বিতীয় তথা শেষ সন্তান, যদিও সকলে জানে মালবিকা মানসদার তৃতীয় সন্তান, মালবিকা লাবণীর ছোট বোন মানবের অপেক্ষা বারো বছরের ছোট। দীর্ঘ ব্যবধানে শ্রাবণী বৌদির সন্তান, মালবিকা সর্বকনিষ্ঠ, স্বভাবতঃই আদুরে এবং বাবা মায়ের স্নেহ মালবিকার প্রতি নিশ্চয় অধিক।

দিন এগিয়ে চলে। মানব ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলার বাইরে চাকরি নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, লাবণীর খবর আমরা জানি, মানসদার সংসার হতে পরিত্যক্তা হয়ে আমাদের আশ্রয়ে, মালবিকা কলেজে ভর্তি হয়েছে, দু বছর হয়ে গেল মানসদা অবসর প্রাপ্ত, অসুস্থ শরীরে প্রায় গৃহবন্দী, বাড়ির বাইরে বেড়োন না বললেই চলে। মানবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানসদা ও শ্রাবণীবৌদি মানবের বিয়ে দিয়ে, মানবের স্ত্রীকে মানবের সাথে চাকরিস্থলে, বাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দেয়। বিয়ের আগে ও পরে মানবের নিজের সংসার জীবনে কোন উৎসাহ ছিলনা। আজো নেই। বাবা মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। বিয়ের পর থেকে সে আজো বাড়ি ফেরেনি, বিয়ে পাঁচ বছর হয়ে গেল, এই সব কারণেই শ্রাবণীবৌদি ও মানসদা অত্যন্ত মনোকষ্টে আছে। মনে মনে, দুটি জীবন, যারা তাদের অত্যন্ত প্রিয়, নিজের সন্তান মানব এবং সন্তানস্বরূপা লাবণী, তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের ফলে অকালেই তিল তিল করে নষ্ট হতে চলেছে, যাদের জন্য নিশ্চয় অপরাধ বোধ করেন, অনুতাপ করেন।

এইসব কারণে পৃথিবীর সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, অত্যন্ত অসহায়, দুঃখের জীবন যাপন করেন। আসলে সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি নির্ভর করে তার কাজ, তার সিদ্ধান্তের ওপর। স্নেহের চেয়ে মানসদার কাছে, জানিনা কেন সামাজিকতা বড় হলো, বড় হলো নিজের একগুঁয়েমি, নিজের ছেলে মানব বুদ্ধিমান, পূর্ণযুবক, স্বাবলম্বী, লাবণী সাবালিকা, নিজের স্ত্রী, যার সাথে ত্রিশ বছর একসাথে ঘর করছেন, কারোর মনের ইচ্ছার মূল্য মানসদা দেয়নি, ফলে একটি পরিবারের সমস্ত সদস্যের ওপর নেমে এসেছে দারুণ দুঃখ। শুধু দুঃখই নয় জীবনের চেহারাটায় উল্‌টে গেছে। হওয়ারই কথা, সুখের সংসার, হাসিতে উচ্ছল, আনন্দ মুখর—সেখানে শ্মশানের নির্জনতা, মানব ও লাবণী মানসদার মতে অন্যায় করেছিল, তাদেরকে সাজা দিয়ে নিজেই সাজা প্রাপ্ত হয়ে করুণ অবস্থায় বেঁচে আছেন। শরীর ভেঙে গেছে। মানসদার জন্য কষ্ট হয়, জীবন ভর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, দেশ দেশান্তরে চাকরির জন্য ছোটাছুটি করে শেষ জীবনে দুদিন সংসার করবেন, হলোনা। ব্যর্থ তিনি। বৌদির কোমরে হাঁটুতে ব্যথা, উঠতে বসতে কষ্ট হয়, তবুও ছোট মেয়ে মালবিকাকে বুকে করে কোনো রকমে বেঁচে আছেন।

মালবিকা মায়ের মত সুন্দরী না হলেও সুগঠনা ও স্বাস্থ্যবতী। যুবতি মালবিকা বন্ধু

বান্ধবীদের ঈর্ষার পাত্রী, যে কোনো যুবকের কামনার ও স্বপ্নের রাণী। ফলে সকলে যখন স্কার্ট ব্লাউজ পরে, মালবিকাকে বৌদি শাড়ি পরা ধরিয়েছিলেন। শ্রাবণী বৌদি এবং মানসদা ওকে নিয়ে গর্ব করতেন আবার মনে মনে মানবের কথা ভেবে ভয় করতেন— মালবিকাকে যেন না হারাতে হয়। সব সময় চেষ্টা করতেন চোখে চোখে রাখতে। যাতে তাদের এই সরল মেয়েটাকে কেউ বশ না করে বসে। মালবিকাকে যত না ভয় তত ভয় মালবিকার শারীরিক সৌন্দর্য্য অপরিণত মন ও বয়স। ঘরপোড়া গরু যেমন মেঘ দেখলে ভয় পায়, শ্রাবণী বৌদির মানসিক অবস্থা মালবিকাকে নিয়ে সেই অবস্থায় ছিল। কিন্তু যা ঘটবার তা ঘটবে। যৌবন, মন প্রাচীর তুলে আবদ্ধ করা যায়না।

যায়নি মালবিকার ক্ষেত্রেও। বরং মালবিকার আচরণ দুঃসাহসিক এবং প্রতিবাদ মুখর। মানবের মত মালবিকা পরাজিতা হতে রাজি নয়। সে তার লক্ষ্যে স্থির এবং লক্ষ্য পূরণের জন্য সে শুধুমাত্র কল্পনা প্রবণতা এবং আবেগের আশ্রয় নেয়নি বরং সে রীতিমত পরিকল্পনা কবে আপন লক্ষ্যপূরণে পদক্ষেপ রেখেছে এবং লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়েছে। কারণ সে জানে জীবন তার এবং জীবন এবং জীবন নির্বাহ পদ্ধতি সেই নিরুপণ করবে, তার স্বপ্ন পূরণে তাকেই সর্বতোভাবে সচেষ্ট হতে হবে। সে জানে মানবদা ও লাবণীদির পরিণতির কথা।

একদিন মালবিকা তার এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে কলেজ থেকে ফেরে। মালবিকা ও তার বন্ধু মালবিকার পড়ার ঘরে মালবিকার পড়া নিয়ে কথা বলে, আলোচনা করে দীর্ঘসময়। শ্রাবণী বৌদি সংশয় মিশ্রিত চোখে ওদের লক্ষ্য করে, গোপনে ওদের ধীরে ধীরে কথা, টুকরো হাসি শুনবার চেষ্টা করে। অবশেষে মানসিক অবসাদে টিভি খুলে শব্দ আস্তে করে শিশুদের অনুষ্ঠান দেখা শুরু করে। মানসদা বারান্দায় বসে সকালের বাসি কাগজ মুখের সামনে ধরে রাখে যেন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কাগজ পড়ছে। আসলে কাগজের আড়ালে সেও চিন্তাগ্রস্ত। সন্ধ্যা পার করে ছেলেটি বেড়িয়ে যায়। বৌদি লজ্জায় ছেলেটিকে এক বার ভালো করে দেখেও নি। মালবিকা ঘর থেকে বেরিয়ে মার কাছে আসে।

—ছেলেটি কে রে মালু?

—সুকান্ত দা, আমাদের কলেজে পড়ে। আমার সিনিয়ার। ওর কাছ থেকে বাংলার দু একটা জিনিষ বুঝিয়ে নিলাম। বাংলা অনার্সের ছাত্র এবার পার্ট 'টু' দেবে।

—কোথায় থাকে?

—তাতো জানিনা। কলেজে আলাপ। কিছু খাবার আছে? খিদে পেয়েছে।

যেদিন থেকে সুকান্তের সাথে আলাপ সেদিন থেকেই মালবিকার স্বপ্ন দেখা শুরু এবং সূত্রপাত। অবশ্য প্রথম আলাপের পূর্বে সুকান্ত সম্বন্ধে মালবিকার মনে একজাতিয় কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছিল, সুকান্ত একজন ছাত্র নেতা এবং সুবক্তা।

—যাও, জামা কাপড় ছাড়ো, হাতমুখ ধোও, রাত হয়েছে, রুটি করে দিচ্ছি একেবারে রাতের খাবার খেয়ে নেবে। এ সময় আর অন্য কিছু হবে না।

—সবে আটটা, এখনি রাতের খাবার? রুটি পরে খাবো। আপাততঃ কিছু দাও, খিদের পেটে জ্বালা করছে। কিছু খেয়ে, জামা কাপড় ছাড়বো, গা ধোবো।

—অসময়, এখন কি দিই বল্‌তো? বিস্কুট খাও, চা করছি।

—তোমার ফ্রিজে কিছু নেই?

—কয়েকটা মিষ্টি পড়ে আছে, খেতে পারো। দেবো?

—না! দরকার নেই। আমি গা ধুতে যাচ্ছি, তুমি রুটি করো।

হন্ হন্ করে মালবিকা চলে যায়। খিদে পেলে ও থাকতে পারে না, ছোট থেকে অভ্যাস। কি করবে শ্রাবণী বৌদি—তার শরীর যে আগের মত খাটতে পারে না, নইলে গ্যাস জ্বেলে সামান্য কিছু বানিয়ে দিতে কতক্ষণ। দুবেলা একটা দুটো রান্না, কষ্ট হয়, উপায় নেই করতে হয়। কপাল! এত বড় মেয়ে মায়ের কাজে সাহায্য করা—তা নয়, আবার তেজ! মালবিকা বাথরুমে ঢোকে। বৌদি গ্যাস জ্বেলে তরকারি গরম করতে দিয়ে রুটি বানায়, কটা তো রুটি, খেয়ে সে তার ঘরে ঢুকে যাবে, এরপর বৌদি বিছানায় বসে বসে টিভি দেখবে, ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পরবে। ঘুম তো ঠিক মত হয়না, রাতভর এ পাশ ওপাশ করে রাত কাবার করা। মানসদা ভোর বেলায় লাঠি হাতে হাঁটতে বেড়োয় একা একা, বৌদি পারে না, পায়ে ব্যথা, সব সময় ডান হাঁটু ফুলে থাকে। আর সারবে না, হাঁটুর জন্য মেঝেতে বসতে পারে না, টুলের ওপর বসে সবজি কাটতে হয়। রান্নার ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করে, খুন্তি নাড়তে পারে না কনুইয়ে ব্যথা হয়। হাতের বিশ্রাম দিতে দিতে কোনরকমে রান্না শেষ করে—না করে উপায় নেই শ্রাবণী বৌদির, কে করবে! তবুও কাজের বৌটি বিকালে আটা মেখে, কুটনো কেটে বাঁটনা বেঁটে দেয়। সকালে—সকাল সাতটার মধ্যে এসে যায়—কোন বারাসাত না মধ্যগ্রামে থেকে ট্রেনে চেপে এসে এ বাড়ি সে বাড়ি কাজ সেরে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরে। তবুও ভাল বৌটি নোংরা নয়, গায়ের জামা কাপড় মোটামুটি পরিষ্কার। একদিন কামায় করলে বাড়ি ঘর নোংরা হয়ে থাকে—কথা শোনে, দরকার হলে দোকান থেকে এটা ওটা কিনে এনে দেয়। বৌটি অনেক দিন আছে, মন আছে, মানুষের কষ্ট বোঝে। দুবেলা সামান্য রান্না তাও পারে না বৌদি এমনি শরীরের বেহাল অবস্থা। এই হচ্ছে মানসদাদের পারিবারিক অবস্থা।

যাইহোক! এর পর থেকে মাঝে মধ্যে সুকান্ত নামক যুবকটি আসতে থাকে, মালুর ঘরে বসে মালুকে পড়ায়, কথা বলে, গল্প হাসি ঠাট্টা তামাসা করে। মানসদা ও বৌদি অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহ্য করে—প্রথম বর্ষ শেষ করে কলেজে মালুর দ্বিতীয় বর্ষ হল। আর ঠিক সেই সময়ে এলো মানসদাদের জীবনের শেষ আঘাত। মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিল সে, তবুও বুড়ো বয়সে সেই আঘাতে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়লেন দুজনে। মানসদার শেষ আশা বা ভরসা, মানসের আজীবন লালিত রুচি বা সংস্কার এক লহমায় ভেঙে চূর্ণ করে দিল মালবিকা। মানসদা বাকরুদ্ধ, শ্রাবণী বৌদির অশ্রুধারা কিছুতেই বাধা মানলো না—অঝোর ধারে বইতে লাগল। নির্বাক নির্লিপ্ত মানসদা, সমস্তরকম চেতনা বা অনুভূতির উর্দ্ধে—পৃথিবীর কোন উত্থান-পতন, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা মানসদাকে স্পর্শ করতে পারলোনা। এত বড় অঘটন—যেন স্বাভাবিক! শ্রাবণীবৌদি বার বার মানসদার কাছে চোখের জলে আবেদন জানাচ্ছে মানসদার কাছে, যাতে সে কথা বলে—যে কোনো কথা, রাগ দুঃখ, সমবেদনা, আশীর্বাদ অভিশাপ—না, সে বলবে না, অনড়, অভিব্যক্তি হীন, স্তব্ধ মানসদা, যেন স্থবীর মানস দত্ত, বৃদ্ধ অকৃতকার্য্য। স্বপ্নচূর্ণ মানস দত্ত। সে স্থীর, সে কিছু ভাববেনা, কিছু বলবে না, সম্পূর্ণ পরাজিত, সে অশক্ত, তার কথা, তার স্বপ্নের কোন মূল্য নেই। এতকাল সে যা করেছে ভুল করেছে যার জন্য ছেলে হারিয়েছে, পুত্রবধূ হারিয়েছে, শেষ আশা ভরসা—মালু, সেও আজ বাবা মাকে

একা রেখে, তাদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। যাক্! সে ব্যর্থ, বাবা হিসাবে, সংসারের কর্তা হিসাবে। তার পক্ষে এমত অবস্থায় কিছু বলা সাজে না, জীবনভর সে ভুলের পর ভুল করে এসেছে, সে ভুলের ক্ষমা নেই, শাস্তি তাকে পেতেই হবে। সে একজন ইঞ্জিনীয়ার, প্রতিটি কাজেরই ফল থাকবেই—ভালো হোক কিম্বা মন্দ, নিশ্চয় সে ভুল করেছে। ভুগতে তো হবেই। মানবের ঘটনা তো বেশি দিনের নয়, নিজের মনের মত নিজের হাতে তাকে তিনি বড় করেছেন, অথচ তিনি জানতেন না মানব কি চায় কিসে সে খুশি, লাবণী পরের মেয়ে, সেও তো বাবা মাকে জানতো না, মানস আর শ্রাবণীই তো তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন—তাকেও চিনতে ভুল করেছে। শেষ পর্যন্ত তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। কি এমন জগৎ সংসার ভেসে যেতো কিম্বা তার মানসম্মান নষ্ট হয়ে যেতো, যদি মানবের সাথে লাবণীর বিয়ে হতো। তাদের চোখের সামনেই তো মানব ও লাবণী একে অপরকে ভালোবাসতে শুরু করেছে, এক অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে, সব জেনেও কেন তিনি মেনে নিতে পারলে না—লাবণীর বাবা মুসলমান বলে! লাবণী পরিচারিকার মেয়ে বলে! তবে তিনি লাবণীকে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে নিজেদের মত করে বড় করলেন কেন? বড় গুণী মেয়ে লাবণী। লাবণী আর মানব যখন ধীরে ধীরে একাত্ম হচ্ছে, প্রণয়াসক্ত হচ্ছে, দেখে শুনেও প্রথম থেকে বাধা দিলেন না কেন! বোঝালেন না কেন! যখন ওদের আর ফেরার পথ নেই, তখন কেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং অমানুষিক আচরণ করলেন তিনি! কি দোষ তার? সে বিধর্মী? সে অবৈধ সন্তান? সেজন্যেই কি লাবণীকে পুত্রবধূ হিসাবে মেনে নেওয়া যায়না? লাবণীর গায়ে কি তার ছাপ ছিল?

শেষ অবধি কি অন্যায়টা না করলেন লাবণীর সাথে! মানসদার মত বুদ্ধিমান এবং সংস্কৃতিবান, স্নেহপ্রবণ মানুষ লাবণীকে, পৃথিবীতে যার কেউ নেই, আশ্রিতা, অনাথিনী তাকে নিজের ঘর থেকে বিতারণ করলেন, ভাগ্যিস রুচী ও বসন্ত সেই সময় আশ্রয় দিয়েছিল, নইলে লাবণীর কি হতো? কোথায় ভেসে যেতো কে জানে! হয়তো নিরুপায় হয়ে শোকে দুঃখে আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হতো। কে জানে কেন সেদিনের লাবণীর মানসিক অবস্থার কথা, অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে তাকে বসন্তের ফ্ল্যাটে স্থান দিয়েছিল, নইলে হয়তো আজকের এ কাহিনী সৃষ্টি হতো না, বসন্ত তার হাত সৃজনশীলতা ফিরে পেতনা, লাবণীর জীবন আলেখ্য এভাবে রচিত হতো না। ইদানিং মানসদাদের সাথে যোগযোগ ছিন্ন। লাবণী এ বাড়িতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর আর কোনো যোগাযোগ রাখলে না। হয়তো আতঙ্কে, পাছে লাবণী নামে আপদটা ঘাড়ে চেপে বসে অথবা লজ্জায়। যদিও দত্ত পরিবারে যা কিছু সিদ্ধান্ত মানসদত্তই নিয়েছে, বৌদির ভূমিকা অত্যন্ত কম বা গৌণ বলা যায়। মানব অত্যন্ত সিরিয়াস এবং আপোষহীন মানুষ, লাবণীকে না পাওয়ার জন্য দায়ী বাবা মার সাথে, তার স্ত্রীর সাথে আজো সে আপোষ করেনি। সে জানে যা কিছু হয়েছে তার জন্য দায়ী তার বাবা, তার মা—দায়িত্ব পালন ছাড়া কিছু জানে না, সংসার—ছেলে মেয়ে তাদেরকে সেবা করা, স্নেহ করা, ভালবাসার জন্যই তার জন্ম, তার জন্য তার ইচ্ছার কথা স্বামীর কাছেও আজ অবধি সে প্রকাশ করেনি। সে যেন দেওয়ার জন্য সৃষ্টি, প্রতিদানে কোনো কিছু পাবার জন্য নয়। তার কোনো মতামত নেই। যা কিছু সিদ্ধান্ত মানস দত্তের। মানস দত্ত অকৃতকার্য্য ব্যর্থ, এ দায়ভার তার। সে কাঁদবেনা, প্রতিবাদ করবেনা, নিষেধ করবে না, মালবিকার সুখ

দুঃখের দায়িত্ব মালবিকার, সে সাবালিকা, সে যা করতে চায় করুক। ব্যালকনিতে কাগজ দিয়ে নিজেকে আড়াল করে সে বসে আছে, সে বসে থাকবে, এ মুখ কাউকে দেখাবার অধিকার তার নেই—সে হৃতসর্বস্য। শ্রাবণী বৌদি চা দেয়, চা জুড়িয়ে যায়! উত্তাপহীনতার মানস দত্ত আক্রান্ত সামান্য চায়ের উত্তাপে প্রতুলতা শূন্য।

—তুমি কি ওকে নিষেধ করবে না? কিছু বলবে না? বাধা দেবে না?—কোথায় যাচ্ছে জানতে চাইবে না?—সে তো তোমার মেয়ে। না কি অন্য কেউ?—কেউ না?

হাজার প্রশ্নেও নিরুত্তর, নীরব মানস দত্ত। কোনো কথার, কোনো উত্তর নেই আজ। মানস দত্ত কল্পনা করতে পারে না যে তার এক মাত্র মেয়ে, বিখ্যাত দত্ত বংশের সন্তান, তাদের কনিষ্ঠ এবং অত্যন্ত প্রিয় কন্যা, মালবিকা বাবা মায়ের বিনা অনুমতিতে অজানা আচেনা তার কোনো সহপাঠি বা কলেজের কোনো ছাত্রের সাথে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বা তাকে হয়তো বিয়ে করবে। বৃদ্ধ বাবা মায়ের প্রতি কোনো দায়িত্ব না থাক্ শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালবাসা এমন কি সামান্য সৌজন্য বোধ থাকবে না। পড়ে, তার অর্থ ছেলেটি বেকার। বাড়িঘর আছে কি-না—কোথায় বাড়ি? বাবা মা আছে কি-না? তারা কি এই বিয়েতে অনুমতি দেবে? পুত্রবধূ হিসাবে মেনে নেবে? মালবিকা স্বাধীন হয়ে গেছে? সাবালিকা হয়ে গেছে! কে জানে ছেলেটির কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে কি-না? থাকতেও তো পারে। কি হবে মালবিকার ভবিষ্যৎ? মানস দত্ত ভাবতে পারে না। ভাববেনা সে। কোনো ফল নেই। নিস্ফল ভাবনা। শুনেছে সে বিয়ে করেছে। জানানোর মত সৌজন্য বোধ নেই। স্পয়েলড্ গার্ল—যা ইচ্ছা করুক! যেখানে ইচ্ছা যায়-যাক!

সেই আদ্যিকালের মন নিয়ে বসে থাকে মানস দত্ত, সময়ের সাথে সাথে মানুষের মননের পরিবর্ত্তন করতে হয় বা সংস্কার করতে হয়, জানে না। মানস দত্তের কুড়ি বছর বয়স আর মালবিকার কুড়ি বছরের মধ্যে সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান, সে কারণেই তার এ আশঙ্কা, মালবিকা ভয়শূন্য দ্বিধামুক্ত। নতুন প্রজন্মের মেয়ে সে।

বৌদির গতরাতে শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মালবিকার কথা শুনতে শুনতে মাথা ঘুরে জ্ঞান হারায়, মনে পড়ে সে সব কথা। কি সহজ করে তার মেয়ে মালবিকা তার মায়ের কাছে অত্যন্ত কঠিন কথাগুলো বলে গেল।

—আমি বিয়ে করেছি মা।

—অ্যাঁ! কি বলছিস্ তুই!

—যা সত্যি, তাই বলছি। আমি সুকান্তকে বিয়ে করেছি। আজকেই রেজেষ্ট্রি হয়ে গেল।

—কে সে? কার সাথে? যে তোকে পড়াতো?

—হ্যাঁ মা।

— কি করে? তোর বাবাকে বলেছিস?

—তেমন কিছু করে না। এবার অর্নাস নিয়ে বি এ পাশ করলো। দু একটা টিউশানি করে।

—বাস!

—হ্যাঁ মা। জমি জমা আছে, ওর বাবা চাষ করে, গরু আছে মোষ আছে, হাঁস, মুরগি...

—বেশ করেছো! যা ভালো বুঝেছো করেছো! আমাকে বলার কোনো দরকার ছিল না।

—সে জন্যই তো আগে বলিনি—না তোমাকে না বাবাকে। জানি তো তোমরা মেনে নেবে না। দাদাকে তো দেখেছি। দাদার ভালবাসার মর্যাদা তোমরা দাওনি, তার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। দাদা বাড়ি আসে না, কোনদিন আসবে না, তাও যদি তার বিবাহিত জীবন সুখের হতো। আজ পর্যন্ত সে বৌদিকে ভালোবাসে না। আমার বিয়ের বেলায় ও একই জিনিস হতো, সুকান্তকে তোমরা মানতে পারো না। সে কারণে তোমাদের বলিনি। আমি মানতাম না, বাড়িতে অশান্তি হতো। সেই ভয়ে তোমাদের না জানিয়ে বিয়ে করে করলাম।

—বেশ করেছো।

এবার তোমাকে বলা মানেই তো বাবাকে বলা হলো। তাছাড়া, আমি কাল সকালেই চলে যাবো, শ্বশুরবাড়ি, বেশি দূর না। না বলে গেলে খোঁজাখুজি করবে। থানা পুলিশ করতে পারো, তাই জানালাম, সুকান্ত চাষার ঘরের ছেলে, চাষবাস ওদের পৈতৃক পেশা। ডায়মণ্ডহারবারে এক গ্রামে ওদের বাড়ি, জমি জমা। আমি গেছি। ওর বাবা নিজের হাতে জমি চাষ করে, সমুদ্রে জেলেদের সাথে দেশি নৌকা করে মাছ ধরতে যায়—একদম আনপড় চাষাভুষা পরিবার—ওর মা আছে, দাদা বৌদি আছে। সুকান্ত ছেলেটি ভালো, একদম অসৎ নয়, এতদিন ওকে দেখছি কোনোদিন বেচাল দেখিনি। ওকে আমি ভালবাসি মা, যদিও তোমাদের কাছে ভালোবাসার কোনো দাম নেই—তাই—

—থাক্ আর বলতে হবে না, আমার মাথা ঘুরছে।

জ্ঞান হারায় বৌদি। মালবিকা যখন এসব কথা বলছিল, হাজার হলেও মাতো, নীরবে বৌদির চোখের জল গড়িয়ে পড়ে তার কাপড় ভিজে যাচ্ছিল। দুর্বল শরীর, আর সহ্য করতে পারে না, মা হয়ে কত আর সইবে! অজ্ঞান হয়ে যায়। পাশেই ছিল মালবিকা। হক্‌চকিয়ে মাকে ধরে নইলে পড়ে যেতো। ভাবতে পারেনি মা সহ্য করতে পারবে না, ভুল হয়েছিল তার বুঝতে। ভেবেছিল দীর্ঘদিন দাদার আচরণে মায়ের সহ্য শক্তি বেড়ে গেছে, শক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু ভাবতে পারেনি তার উল্টোটা। মায়ের সহ্য করার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। মাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দেয়, চোখেমুখে জলের ছিটে দেয়, দুহাতে চোখ মুছিয়ে দেয়, নিজের চোখেও জল আসে, চোখ খুলেই আবার কাঁদতে শুরু করে বৌদি।

—এ কি করলি!...আমি কার কাছে যাবো?...কার কাছে থাকবো...

মালবিকা আব সহ্য করতে পারেনা। হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে ঢুকে যায়। বৌদি বসে বসে কাঁদে। মানসদা এ যাবৎ ব্যালকনিতে বসে ছিল। উঠে ঘরে ঢোকে, শ্রাবণীর পাশে বসে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় নিঃশব্দে। একটি কথাও সে বলে না—কথা বলতে ভুলে গেছে মানস দত্ত। পাশাপাশি দুটি বিছানায় দুজনে সমস্ত রাত প্রায় জেগে কাটিয়ে দেয়। মানস দত্ত মাঝে মাঝে স্ত্রী শ্রাবণীর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনে। শ্রাবণীর জন্য সত্যিকারের কষ্ট হয়। নির্দোষ মহিলা, আজীবন শুধু সংসারের জন্য খেটে খেটে কেটে গেল। পাওয়ার মধ্যে পেল শেষ বয়সে ছেলে মেয়ের বিরহে অনন্ত দুঃখ আর বুক ছাপিয়ে কান্নার স্রোত—গাল বেয়ে নেমে পরনের কাপড় ভিজে যায়। অনন্ত এ রাত, যেন শেষ না হয়—রাত পোহলেই মালবিকা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। কোনো বাধা সে মানবেনা। দুটি মাত্র সন্তান, বড় ছেলে, আজ কতদিন হয়ে গেল বাবা মায়ের ওপর অভিমানে বা মনের দুঃখে বাড়ি আসে না। নিশ্চয় তার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে লাবণীর সাথে বিয়ে না দিয়ে অন্য একটি মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছে, তার জন্য মানব প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছে, আজো পাচ্ছে ভবিষ্যতে সে এ কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে কিনা জানি না, যার জন্য দায়ী বাবা, কিন্তু তার মা, শ্রাবণীর কোনো দোষ ছিল না, সেই শ্রাবণী শাস্তি পাবে কেন! তবুও মালু ছিল, অন্ততঃ একজন, শ্রাবণীর কোল শূন্য ছিল না, সে মালবিকাও রাত পোহালেই, তার মাকে ছেড়ে চিরকালের জন্য শশুর বাড়ি চলে যাবে। মেয়েরা বড় হলে, বিয়ে হবে, বিয়ে হলে শশুর বাড়ি যাবে এটাই তো হয়, স্বাভাবিক, বাবা মা জেনে শুনেও মেয়ের বিয়ে দেয়, বিয়ে তো দিতেই হবে। শ্রাবণী শশুর বাড়ি যাচ্ছে—না বাজলো সানাই না হলো অনুষ্ঠান, না জানলো পরিবার পরিজন, বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন-এ কেমন যাওয়া! এ কেমন বিয়ে! এ কেমন তার বাবা মা! বাইরে থেকে সে যেটুকু শুনতে পেয়েছে কাছে পিঠে, কোলকাতায় নয়, ডায়মণ্ড হারবারের শেষ সীমান্তে, সমুদ্রের ধারে কোনো গ্রামে, ছেলেটির বাবা নিয়মিত নিজের হাতে চাষ করে, জাল নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরে। জানি না সে বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে কি-না, রাতে আলো জ্বলে কিনা, পাখা ঘোরে কিনা, টিভি, ফ্রিজ আছে কি-না। বারবার ফ্রিজ খুলে কিছু না কিছু খাবার তার চায়ই! কি বোকা, আবেগ সর্বস্ব মেয়ে মালবিকা—সে গণ্ডগ্রামে থাকবে কি করে!

কি জাত ওরা? নিশ্চয় কোনো নিম্নবর্ণের, যাদের আচার ব্যবহার জীবনধারার সাথে মালবিকার ব্যববারিক জীবনের কোন মিল নেই। কিভাবে বাঁচবে মালু? কষ্ট হবে না? কি আছে ছেলেটির মধ্যে? মানস দত্ত এ রকম হাজারো প্রশ্নে রাত ভর নিজেকে জর্জরিত করেছে।

সব ভুল। মস্ত ভুল। মানসের চিন্তায় ভুল! ঘটনার বিশ্লেষণ ভুল। মানুষ চিনতে ভুল। এমনিক নিজের সন্তানও তার কাছে অচেনা। প্রথম ভুল হলো মানবকে চিনতে না পারা, তার মানসিকতার পরিচয় অজ্ঞাত থাকা, তার ইচ্ছার মর্যাদা না দেওয়া। কিন্তু মালু—সেদিনের মেয়ে, স্কুল পার করে কলেজে সবে ভর্তি হয়েছে— পড়বে বড় হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে, ভাল ছেলে দেখে ধূমধাম করে বিয়ে হবে, মালু সুখে সংসার করবে। সেই মালু, মাত্র আঠারো, ঊনিশ বছরের মালু—এই ভাবে বিয়ে করে বসলো, ভাবা যায়! কালে কালে কি হচ্ছে? কি নির্বোধ মানস দত্ত! কি অবুঝ! কি অসহায়! অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে। এ কষ্ট কেউ বুঝবে না, কাউকে বোঝানো যাবে না। মুখ চোখ মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, গায়ে ঘাম হচ্ছে, বুক ধর্‌ফর্‌ করছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে মানস দত্ত কিছু বলবে না। তার বলার দিন শেষ।

সে আর কোনো কথা বলবে না। যার যা ইচ্ছা করুক যার যা ভাল লাগে করুক। তার কোন ইচ্ছা নেই, নেই কোনো কামনা-বাসনা। তার ইচ্ছার, আশা আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু ঘটেছে। সে একমাত্র প্রাণে বেঁচে আছে। তার একটি মাত্র ইচ্ছা পূরণ করতে গেছে দুটি নয় তিনটি জীবন, জীবন্মৃতের ন্যায় কোনোক্রমে বেঁচে আছে। তার মধ্যে একটি তার প্রিয়তম সন্তান, অন্য একজন সন্তান সম। সেই তো দায়ী! নিজের ইচ্ছা ওদের ওপর চাপিয়ে দিতে গিয়েই তো যত বিপত্তি। কিন্তু সে তো কারোর অমঙ্গল চায়নি। এ সব ভাবতে ভাবতেই দীর্ঘ রাত্রি ফুরিয়ে যায়। জানালা দিয়ে বাইরে ভোরের আলো দেখা যায়। বিধান নগরের বাসিন্দারা এখনো ভোরের আলো বা অস্তগামী সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত নয়। বিছানা ত্যাগ করে দমবন্ধ হতাশা নিয়ে। শরীরটাকে টেনে নিয়ে

ব্যালকনিতে বসে, এখনো খবরের কাগজ আসেনি, দু একটা পাখী ডাকতে শুরু করেছে—রজনী অবসান হলো বলে'—তার ঘোষণা। ক্লান্ত শরীর, বিছানা ছাড়তে কষ্ট হয়, তবুও মানস দত্ত বিছানা ছাড়ে—হাঁটতে বেড়োয়, আজ বেরোবে না। জীবনের কোনো কর্মসূচি নেই তার।

শ্রাবণী চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে, সব সাদা, চওড়া সিঁথি। কি রোগা শ্রাবণী। সেই শ্রাবণী-শোকে দুঃখে, জরা বার্দ্ধক্যে চেহারার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, কাউকে ওর পরিচয় না বলে দিলে চিনতে ভুল হতে পারে। এখনো ফ্রেমে বাঁধানো একটা বিয়ের ফটো আছে, ফটো দেখলে কে বলবে এই সেই শ্রাবণী। উত্তর পাড়ার প্রখ্যাত অধ্যাপকের মেয়ে, শিবপুরের মেধাবি ছাত্র মানস দত্তের স্ত্রী। চোখে মুখে কান্নার দাগ শুকোয়নি। লোকে বলে সন্তান বাবা মায়ের গর্ব, বাবা মার মুখ উজ্জ্বল করবে। হায়রে!

মালুর ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। একবার ইচ্ছা হল ওকে ডেকে তোলে, ওর সাথে দুটো কথা বলে, ওকে বলে তুই ছেড়ে চলে যাস্না। যে কদিন বাঁচি, তুই আমাদের সাথে থাক্না। মানব কোনোদিন আসবে না, তুই তো জানিস। তোর কাছে তো কোনো অপরাধ করিনি, তোর কোনো ইচ্ছায় বাধা দিইনি। আমার ধারণা ছিল না এমন একটা ঘটনা তুই ঘটিয়ে ফেলবি কি এমন তোর বয়স হয়েছে উনিশ-কুড়ি, কলেজে পড়িস্। কখন কিভাবে এমন হলো যে তুই বিয়ে করে ফেললি। এবং সিদ্ধান্ত নিলি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। কেনরে? কেন! কিন্তু পারলে না মানস দত্ত। সে বারান্দায় গিয়ে বসল। চোখ খুলে নয়, চোখ বন্ধ করে। কান্না তার আসে না, বড় শক্ত চরিত্রের মানুষ সে।

শ্রাবণী উঠেছে, শীর্ণ হাতে এক কাপ চা বাড়িয়ে দেয়, দরজার ফাঁক থেকে খবরের কাগজ এনে ছোট টেবিলে রাখে। আস্তে করে পাশে বসে বৌদি। জেগে উঠেছে বিধান নগর। খবর কাগজওয়ালারা বা হকার, দুধওয়ালা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ছুটছে। দু একজন প্রৌঢ় দিয়ে রাস্তা হাঁটছে—বেঁচে থাকার সখে। কেউ কেউ চলেছে মাদার ডায়েরি দুধের ডিপোর দিকে। দু একটা মিনি বাস—রিক্সা, ভ্যান ইত্যাদি রাস্তায় চলমান। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়েছে বৌদি—চোখে কান্নার দাগ নেই। শান্ত চেহারায় অসহায় আর্তি। অভিশপ্ত মা সে। নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করা ছাড়া তার অন্য কিছু করার নেই। ছেলে মেয়ে বড় হয়েছে, খাইয়েছেন, পড়িয়েছেন, যত্ন করে স্কুলে পাঠিয়েছেন—কাউকে কোনদিন বকুনি দেন নি। অন্য বাবা মায়েরা ছেলেমেয়ে অন্যায় করলে, বকে, ধমকায়, মারেও অনেকে—কিন্তু সে নয়। মানুষ করেছেন ঠিকই, শাষন করেন নি, শুধু ভালো বেসেছেন। সেই ছেলে মেয়ে মাকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা ইত্যাদি করবেনা, মায়ের প্রতি তাদের কোনো কর্তব্য থাকবেনা—এ কোন দিন এলো! ভাবতে পারেন না, মেনে নিতে পারেন না।

ঠিক সাড়ে সাতটায় মালবিকা ওঠে, ঘরের দরজা খোলে। নিজের দুএকটা পোষাক, বইপত্র টুকিটাকি সামান্য কয়েকটা জিনিষ ব্যাগে গোছানো হয়ে গেছে। বাথরুমে ঢোকে। বৌদি পাঁউরুটি সেঁকে, মাখন লাগিয়ে রেডি করে চায়ের জল চাপায়। সে তো মা, সন্তানের সুখ ও আরাম ছাড়া অন্য কিছু কাম্য হতে পারে না। কিছু না খেয়ে বাড়ির বাইরে যাবে কি করে! মালু না খেয়ে থাকতে পারে না—খিদে পাগল। চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। ভেবেছিলো আর কাঁদবেনা, কিন্তু চোখের জল যে বাধা মানে না। আজ

পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো কালে কোনো সন্তান মায়ের দুঃখ বোঝে না! বিদ্যাসাগর ক'জন হয়! মাতৃহৃদয়ের বেদনা শরীরের কোনো অংশ দগ্ধ হয়ে গেলে যে যন্ত্রণা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টদায়ক। এ বেদনা, এ ব্যথা একমাত্র মায়ের পক্ষেই অনুভব করা বা উপলব্ধি করা সম্ভব। মালু এখনো মা হয়নি, সে বুঝবে কি করে। যদি মা হতো, নিশ্চয় বুঝতে পারতো, এমন করে মাকে কষ্ট দিতে পারতো না। পারতো না বৃদ্ধ বাবা মাকে এভাবে কষ্ট দিয়ে একমাত্র নিজের সুখের অভিলাষে, বাড়ি থেকে চলে যেতে। মালুর কি মনে একটুও কষ্ট হচ্ছে না? মা-বাবার দুঃখে ওর কষ্ট হয়না? তবে সে কিসের সন্তান! যদি না বাবা মায়ের দুঃখে অনুতাপ হয়!

মাও জানে না গত রাত্রে মালুও একবিন্দু ঘুমোয়নি। মা বাবার মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে দেরি করে দরজা খুলে সটান বাথরুমে ঢুকে গেছে। মালুর কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে, শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে সম্পূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশে শহরের সুখ, বাবা মায়ের নির্ভরশীলতা, স্নেহের অবলম্বনকে পরিত্যাগ করে একমাত্র একটি ছেলের ভরসায় পালিয়ে যাচ্ছে, সামনে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াচ্ছে। বৃদ্ধ বাবা মায়ের জন্য তারও কম দুশ্চিন্তা নেই। তবুও সে যাবে—পাছে দাদার মত জীবনে তাকে পা রাখতে না হয়।

স্নান সেরে, পরিষ্কার হয়ে বেড়োয়, তাজা পবিত্র শরীর। আজ পর্যন্ত কোনো গ্লানি স্পর্শ করেনি তাকে। সবে উনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পরেছে। যত্নে লালিত সুন্দর স্বাস্থ্য, টলটল করছে যৌবন, একমাথা চুল, এখনো সিঁথিতে সিঁদুর স্পর্শ করেনি। মালুকে দেখে যে কেউ মুগ্ধ হবে। চেয়ে চেয়ে দেখে বৌদি, মেয়ের সৌন্দর্যে গর্ব অনুভব করে। মনে মনে আশীর্বাদ করে—মালু তুই যেখানেই থাকবি রাণী হয়ে থাকবি।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় মালবিকা। মা অপেক্ষা করে। ভেজানো চা গরম করতে দেয়। অপেক্ষা করে। কি অবুঝ মায়ের মন! মায়ের মন, ঘর থেকে মেয়ে বেরোলে চা দেবে। পাঁউরুটি দেবে। মেয়ে বেরোবে, যেখানেই যাক্ বাসিমুখে যায় কি করে। দীর্ঘসময় পার করে দরজা খোলে। ঘড়িতে সাড়ে আটটা। একখানা শাড়ী পরেছে লাল রঙের, নতুন না হলেও পাটভাঙা শাড়ী, ঘরের মেঝেতে একটা সুটকেশ, তাক থেকে নামিয়েছে—সাথে নেবে। টিপ্ করে মায়ের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে। বারান্দায় গিয়ে বাবাকেও। মা আশীর্বাদ করবে কি, থর্ থর্ করে ঠোঁট কাঁপছে, হুড় হুড় করে চোখে জলের ধারা। মালবিকা এরপর স্থির থাকে কি করে—দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কান্না, বাঁধা ভাঙা কান্না বললে কম বলা হবে, প্রকৃত অর্থে ও যথার্থ শব্দে দুজন; মা ও মেয়ের অশ্রুবর্ষণ বর্ণনা করা যায়না। শ্রোতাদের বলে ব্যাখ্যা করতে পারবো না। এ যেন অশ্রু ধারা নয় দুঃখ ধারা, চোখ হতে গণ্ড দেশ বেয়ে শাড়ীতে জমা হচ্ছে—হে পাঠক বা শ্রোতা আমার বোঝানোর অক্ষমতা আপনারা হৃদয় দিয়ে বুঝে নেবেন বা অনুভব করে নেবেন।

দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়, অত্যন্ত কষ্টে মা ও মেয়ে শারীরিক দিক থেকে আলাদা হয়। শ্রাবণী অনুভব করে, যেদিন মালু এ পৃথিবীতে এসেছিল এবং শ্রাবণী যে প্রসব বেদনা অনুভব করেছিল, আজকের মালবিকার শরীর শ্রাবণীর শরীর থেকে পৃথক হওয়ার বেদনা অনেক অনেক বেশি কষ্টদায়ক, অনেক কঠিন এ বেদনা। অন্যদিকে মানস ব্যালকনিতে কাগজ মুখে বসে—যার চোখে কান্না নেই, পড়ায় মন নেই—

কাগজের পাতাখোলা, দৃষ্টি ও মনন শক্তি দুটিই অকেজো। অশ্রুপাত সে করেনা।

---কোথায় যাবি মা। এভাবে কেউ যায়? কোন মা তার মেয়েকে এভাবে পাঠাতে পারে? আমি কি এতই নিষ্ঠুর। আমি কি এতই নিষ্ঠর রে—নতুন শাড়ী না, নতুন জামা না, হাত-কান-গলা খালি, কপালে টিপটাও পরিসনি—ওরা বলবে কি! বলছিস্ ওটা একটা গ্রাম—গ্রামের লোক নিন্দা করবে না?—তোর খারাপ লাগবে। এক কাজ কর আমার পুরানো যে গয়না আছে। তা থেকে দু এক গাছা অন্ততঃ পরে নে। খালি গায়ে এভাবে বেড়োতে হয় না।

—আমি তো অন্য পাঁচজনের মত বিয়ের কনে সেজে যাচ্ছি না। সামাজিক বিয়ে হলে লোকে বলতো।

---তবুও তোমার বিয়ে হয়েছে, সে বাড়ির বৌ হয়ে যাচ্ছো। সামনে না হলেও, সুযোগ মত তোমার এই বুড়ো বাবা মার নিন্দা করবে।

—ঠিক আছে, তুমি যা বলছ—মানছি। পাঁউরুটি দাও —খিদে পেয়েছে।

এক লহমায় মা দুঃখ ভুলে যায়। টেবিলে বসে মালু। পাঁউরুটি মিষ্টি প্লেটে সাজিয়ে দেয়, এক গ্লাস জল ওর নিজের গ্লাসে করে চা দেয়। মালবিকা খেতে থাকে। শ্রাবণী আলমারি খুলে গয়নার বাক্স ওর সামনে রাখে—কি হবে এ গয়না! কে পরবে! মালবিকা গয়নার বাক্স থেকে চুরি, হার, কানের দুল পরে। আয়নার সামনে নিজেকে দেখে। মা খুশি হয়।

ন'টার পর সুকান্ত আসে। সুকান্ত মণ্ডল, বাবার নাম সহদেব মণ্ডল। বাড়ি নামখানা পার হয়ে যেতে হয়। এ বছরে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছে। গতকাল কলকাতায় এক ম্যারেজ রেজিষ্টারের অফিসে গিয়ে মালবিকা এবং সুকান্ত বিয়ে করেছে। মালবিকার মত নয়, সুকান্ত তার বাড়ির লোকের সম্মতি নিয়েছে। সামাজিক পদ্ধতিতে সুকান্তদের বাড়িতে ওরা পুরোহিত ডেকে বিয়ে করবে—এটা সুকান্তের মায়ের ইচ্ছা। এতে মালবিকার অসম্মতি নেই—সে সম্পূর্ণভাবে সামাজিক মর্যাদা পাবে। গ্রামের বাড়ি, মাটির ঘর, টালির চাল। হাস আছে, মুরগি আছে, আছে গরু, ছাগল, লাঙল, মাছ ধরার জাল—যদিও সুকান্ত নিজে কোনোটির ব্যবহার জানে না। সুকান্ত একমাত্র যে ঐ গ্রাম থেকে কলেজে পাশ করেছে। সুকান্তের সম্মান শুধু পরিবারে নয় গ্রামটিতেও আলাদা।

মালবিকা চা শেষ করে। সুকান্ত বাইরে অপেক্ষা করছে। বৌদির ইচ্ছা ছিল, ছেলেটিকে ডাকে, ডেকে দুটো কথা বলে, বলে দুটো মিষ্টি খেতে, এক গ্লাস জল। সুকান্তকে বুঝিয়ে শ্রাবণীর কথা বলে—বলে ভালো করে দেখো বাবা, বড় আদুরে মেয়ে, ওর খাবার দিকে লক্ষ্য রেখো, ও বারে বারে এটা-ওঠা খায়। কিন্তু পারে না। প্রথমতঃ সাহস কুলায় না, দ্বিতীয়তঃ কি বলতে কি বলবে-বুঝতে পারে না। ডাকতে পারতো মালুর বাবা। সে ডাকবে না। অনঢ়। মালু সুকান্তকে আশীর্বাদ করতে পারতো! ওরা খুশি হতো! মানস কথা বলে না—বলবে না সে। মন দিয়ে কাগজ পড়ে—যেন কিছুই ঘটেনি।

মালবিকা ঘাড়ে ব্যাগ, হাতে সুট্‌কেশ নেয়। মায়ের পায়ে হাত রেখে দ্বিতীয়বার প্রাণাম করে, নির্বাক বাবাকে প্রণাম সেরে আস্তে আস্তে বলে—"আমি কোনো অন্যায় করিনি বাবা।" বাবা নীরব। মাকে বলে—"মা টেবিলের ওপর খাতায় আমাদের ঠিকানা

লিখে রেখেছি। তোমরা চিন্তা কোরো না, আমি ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ঠিক থাকবো। আমি প্রতি সপ্তাহে দুদিন না হলেও একদিন নিশ্চয় আসবো। তোমরা ভালো থেকো"।

ধীরে পায়ে গেট পার হয়ে ট্যাক্সিতে ওঠে। সুকান্ত বাইরে দাড়িয়ে ছিল। উঠে বসে মালবিকার পাশে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায় মালবিকা—চোখে জল। মায়ের চোখে জলে ঝাপসা, অনেক কষ্টে দেখতে পায় ট্যাক্সি ছেড়ে গেছে। শ্রাবণী ঠোঁট নাড়ে—আশীর্বাদ করে। মানস উঠে দাড়ায় দুহাত তুলে প্রার্থনা জানায়—ওরা সুখে থাকুক! সুখে থাকুক!! গলা দিয়ে স্বর বেরোবেনা—আশীর্বাদ হৃদয় থেকে।

শ্রাবনী ঘরে ঢুকে খাবার টেবিল থেকে মালবিকার কাপ প্লেটতুলে বেসিনে রাখে। সে তো মা!

মালবিকার টেবিলে খাতায় লেখা-সুকান্তের বাড়ির ঠিকানা। একটি সম্পূর্ণ বাক্য তার সাথে" সুকান্তকে ভালবাসি মা, ওরা ছোটো জাত, তোমরা রাজি হবে না জানি। আমি দাদার মত ভুল করতে চাইনা।"

—ইতি মালবিকা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সত্যিই তো। বসন্তের প্রস্তাব খারাপ নয়। দেখিনা চেষ্টা করে। মরাব ইচ্ছা হয়েছিল—মরতে পারিনি। বেঁচে আছি। যার দাক্ষিণ্যেই হৌক বা মানবতার খাতিরে হৌক। এই পৃথিবীর আলো, জল, বাতাস গ্রহণ করছি। প্রতিদিন সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, আলো দেয়, উত্তাপ দেয়, আমায় বঞ্চিত করেনা, বাতাস-উষ্ণ কিম্বা শীতল, প্রদূষণমুক্ত অথবা যুক্ত—আমি গ্রহণ করি, প্রতিবন্ধকতা অনুভব করিনা—এমনি জল, জঙ্গল-প্রকৃতির ওপর আমার অধিকার সকলের ন্যায় সমান। আমার অস্তিত্ব আপাততঃ সুস্থিত। সূর্যকে আবর্তনের মধ্যে দিন-রাত-মাস-বছর পার হচ্ছে, সময় বয়ে যাচ্ছে নয়—সময় গত হচ্ছে জীবন থেকে সবার মত আমারও। আমার শরীরে যৌবন মধ্য গগনে, মানুষের আয়ুর হিসাবে। প্রথম যৌবনের স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলি গত। একদা মনে হয়েছিল এ দিন বুঝি ফুরোবেনা। সত্য নয়। দিন গত হয়েছে এসেছে নতুন সকাল, স্মৃতি অমর। প্রথম যৌবনের শরীর ও মন—স্নিগ্ধ, কোমল ও রোমাঞ্চকর না থাকলেও তার দীপ্ত প্রকাশ আজো বিদ্যমান—যথার্থ সেবা শুশ্রুষা দ্বারা বসন্ত দেহকেই শুধু সতেজ রাখেনি, শরীর ও মনকেও প্রায় ক্ষতমুক্ত করেছে। বসন্তের শরীর ও মনের উত্তাপে আজো এ শরীব উত্তপ্ত হয় মন কামনাসক্ত হয়। শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অবর্ণনীয় মুর্ছনার সৃষ্টি হয়। বসন্ত একজন মানুষ একদা বসন্ত শরীর ও মনের উত্তাপ হারিয়ে অসময়ে বরফ শীতল ক্লিষ্ট জীবন যাপন করছিল। বসন্ত প্রতিভাবান। আদর্শবান। শারীরিক অবসন্নতায় বসন্তের প্রতিভার মৃত্যু ঘটছিল। হয়তো বসন্তের সান্নিধ্যে আমি ক্ষত মুক্ত, আঘাতজনিত ক্ষত মুক্ত হয়েছি, ও আমার সান্নিধ্য—সান্নিধ্যের মধ্যে দিয়ে, স্বাভাবিক উষ্ণতায় বসন্ত জীবনের শীতল মেরু হতে ধীরে ধীরে উষ্ণ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। বসন্ত স্বভাবতঃই বার বার সে কথা স্বীকার করে। করতে পারে। হয়তো হবেও। তবে, আমার তো সব কথাই মনে আছে—সেদিনে বসন্ত যদি তার মহৎ হৃদয় দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, শরীরের ও মনের উত্তাপে আমাকে সঞ্জীবিত না

করতো। তবে লাবনীর মৃত্যু ঘটতো, আজকের কিউটি সৃষ্টিই হতো না। বসন্তের সংরাগ হতে উদ্ভূত এই কিউটি, বসন্ত বলে সে নাকি আমারই সৃষ্টি, আমিই বসন্তকে পুনর্জীবন দান করেছি। দুটিই সত্য। উভয়ে উভয়ের অনুরাগের উষ্ণতায় সম্ভূত। অনুরাগ বা প্রণয় জীবনে চিরসত্য।

জানালা থেকে পর্দাটা সামান্য সরিয়ে চলন্ত ট্রেনে বসে দেখছি রাত ফুরিয়ে সকাল হচ্ছে। বেশ কাটলো কুমায়ুনে। কুমায়ুন পাহাড়ে যেমন ফুল ফোটে, সবুজ পাতায় হাওয়ার নাচন লাগে, কিউটির মনেও কি ফুল ফুটলো না! কিউটির মনের জমে থাকা বরফ গলে শীর্ণকায়া নতুন করে বাঁচার জীবন স্রোত সৃষ্টি করলো না!! জানালায় বসে বসে দিনের প্রথম আলো চোখে দেখছে সে। মনের ভাবনা অনন্ত নয় একান্ত তার নিজের, নিজেকে নিয়ে। কাঠগোদাম থেকে ট্রেনে ছেড়েছে, চলেছে উত্তর থেকে পুবের দিকে, পাহাড় থেকে সমতলে—শহর কলকাতায়। শীতল কামড়া, চলন্ত ট্রেনের মৃদু ঝাঁকুনি, যান্ত্রিক চলমান ট্রেনের আওয়াজ কিউ-এর মনে অসংবদ্ধ ও কখনো সংবদ্ধ ও ছন্দে মেলানো ভাবনার জল রঙে আঁকা ছবির আভাস। কিউ রোমাঞ্চিত, উল্লসিত, চিন্তিত, সর্বোপরি বিস্মিত। জীবন অদ্ভুত। অন্তহীন বৈচিত্রে ভরা। সম্পূর্ণ নতুন ভাবে বাঁচার, বাঁচার লক্ষ্যে শুরু করার বাসনা জাগছে। যাদের নিয়ে জীবনের পথ চলা শিখেছিল, শুরু করেছিল, তারা সকলেই যার যেমন আছে। মানব আছে, বিয়ে করেছে, সন্তান হয়েছে চাকরি করছে—সুখে হোক, দুঃখে হোক জীবন তার চলমান—স্তব্ধ হয়নি। মানস আঙ্কেল এবং তার স্ত্রী, আমার মা বলে যাকে জানি—ছেলে, ছেলের বৌ দূরে থাকলে কি হবে, বেঁচে আছে, মেয়ে মালবিকাকে নিয়ে ঘর সংসার করছে (তখনও মালবিকার বিয়ে হয়নি) মালবিকা কলেজে পড়ে, বন্ধু বান্ধবী নিয়ে হাসছে খেলছে—সুখে আছে। তার স্কুল ও কলেজের বান্ধবীরা নিজের সংসার, কাজকর্ম, নিয়ে চুটিয়ে পারিবারিক জীবন যাপন করছে তার মধ্যে অনেকে চাকরি করে। অনেকের সাথে যোগাযোগ সামান্য তবুও খবর পায় লাবনী। বসন্ত পাশেই—রুচীআন্টি ও রোহিতের সঙ্গে সম্পর্ক যেমনই হোক—লেখাপড়া, দেশবিদেশে ঘোরা, জীবন সাধনায় রত, বসন্ত উল্টোদিকের লোয়ার বার্থে শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে। রোহিত ও রুচীআন্টি আছে তাদের মতন করে—কিন্তু কেউ থেমে নেই। তবে কি অতীতের ঘটনার সব দায় কি তার! এই কষ্ট, বেদনায় জ্বলে পুড়ে মৃতবৎ বেঁচে থাকার জন্যই কি তার জন্ম? সে একা। কেন একা? কূল কিনারা পায়না। এত বড় সুন্দব পৃথিবী থেকে সামান্য সুখ, সামান্য সৌন্দর্য্য আহরণ করা যায়না? নিজেকে বোকা এবং বড় আহাম্মক মনে হয় তার। পৃথিবী অকৃপণ, বড় উদার—একটা চেষ্টা করলেই পৃথিবীর কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়া যায়—শুধু গরল নয় অমৃতও মেলে। কিউ-এর এক অভিনব এবং প্রথম আত্ম উপলব্ধি।

বসন্ত নির্ভরযোগ্য। নির্ভীক, বসন্ত নিশ্চয় পরিত্যাগ করবেনা। বঞ্চিত করবেনা, পলাতক হবেনা। কেউ না থাকলেও বসন্তকে পাশে পাবো।

কিউটির ঘুম ভেঙেছে অনেক আগে। ব্রাশ করা হয়ে গেছে। বসন্ত উঠে টয়লেটে গেল, ব্রাশ নিয়েছে। হাওড়াগামী ট্রেন চলেছে। লাইনের পাশের ক্ষেত, বাড়িঘর, গাছপালা সবুজ বনানী দ্রুত পশ্চাতে ধাবমান। এখানে পশ্চিমবাংলার মত লাইনের ধারে চালা বানিয়ে কোনো লোক বাস করতে দেখা যায় না। দূরে দূরে দু-একটা গ্রাম, আধা শহর, দালান, কাঁচা বাড়ি—গরু মোষ, পাকা রাস্তা ধরে চলন্ত ট্রাক নজরে আসছে।

চলন্ত ট্রেনে বসে বসে ঐসব দৃশ্য কিউ-এর দেখতে ভাল লাগে। সময় কেটে যায়। মনে হয়না জীবন রুদ্ধ। জীবনের গতি আছে, প্রাণ আছে—ট্রেনে চাপলে টের পাওয়া যায়।

বসন্ত টয়লেট থেকে ফিরেছে। বসে মুখ মুছে চুলে চিরুনি বুলোচ্ছে। কিউ ব্যাগ থেকে স্ন্যাক্সের প্যাকেট বের করে, চা নেয়। চা খেয়ে দুজনে আরাম করে বসে। অন্য বার্থে অনেকেই ঘুমোচ্ছে—অনেকেই জেগেছে। যারা ঘুমোচ্ছে, তাদের অনেকে সমস্ত যাত্রাপথ প্রায় ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। ব্যস্ত জীবনে ট্রেনের যাত্রাপথটুকু যেন তাদের প্রিয় বিশ্রামস্থল—কর্মস্থলে এমন বিশ্রামের অবসর জোটে না।

—ঘুম হয়েছে?

—মোটামুটি। তবে বাড়ির ঘুম গাড়িতে হয় নাকি?

উত্তর দেয় বসন্ত—হাসি মুখ। চশমার কাঁচ রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করছে বসন্ত। এবারে জার্নাল খুলবে। পাহাড়ে একমাসে কোনো কাজ হয়নি। কলকাতায় ফিরে দুজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে—যে কাজগুলো করতে করতে অসমাপ্ত রেখে এসেছে—সেগুলোকে সমাপ্ত করা, সবার আগে ওয়াশিংটন থেকে সে জার্নালটা বোরোয়, দীর্ঘদিন বসন্ত তার নিয়মিত লেখক, সে লেখাটা পাঠাতেই হবে। তথ্যগুলো যোগাড় হয়েছে, সেগুলিকে সাজিয়ে লিখে পাঠানো প্রথম কাজ। বসন্ত ভেবে রেখেছে—আর নয়, এটাই শেষ কাজ। ওদের চাহিদা যদিও থাকবে, বলতে হবে তার লেখার ওপর নির্ভর না করতে—লেখা হলে যখন যেমন পারে পাঠাবে। কিউ ম্যাটার রেডি হলে মেল করে দেবে। বসন্তের চেয়ে তার কাজ বেশি। মাঝে মাঝে কিউটি লিখে সাজিয়ে রেডি করে দেয়, বসন্ত এডিট্ করে মাত্র। জার্নাল হাতে নিয়ে চোখে চশমা গলিয়ে—

—তারপর—শ্রীমতি কিউটি দেবী, পৌঁছে তুমিও শুরু করে দাও। কি শুরু করবে স্থির করলে? আমার মনে হয় গান—তোমার রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করলে ভালই হবে। গলা ভালো—রবীন্দ্রনাথ তোমার প্রিয়—

—শুধু প্রিয় নয়—প্রিয়তম।

—বেশ তাই হলো, তুমি তাহলে তোমার প্রিয়তমের সাধনা শুরু করছো।

—পৌঁছাই। চিন্তা করতে হবে। এ বয়সে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সা-গা শুরু করলে লোকে ঢিল মারবে।

—একদম বাজে কথা। তুমি তোমার ফ্ল্যাটে গান গাইবে লোকের কি। লোকে ধরে নেবে কোনো বাচ্চা মেয়ে গান শিখছে।

—আমি বাচ্চা নই।

—তুমি বুড়ি, বুড়ি গান শিখছে, শিখতে পারেনা? শেখার বয়স আছে। কত বড় বড় শিল্পীরা রেওয়াজ করেনা?

ভ্রূকুটি করি। গাড়ি ছোটে, আমি জার্নাল খুলি। কিউটি অসম্মত নয়। দ্বিধা আছে, জড়তা আছে। কেটে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে। কিউটির মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। ভবিষ্যতের কথা ওর মাথায় ঢুকছে। সে ভাবতে শুরু করেছে, তারও ভবিষ্যৎ আছে, ভবিষ্যতের জন্য কোন একটা নেশা, কোনো বিষয় যাতে মগ্ন থাকা যাবে। অতীতের স্মৃতি ফিকে হয়ে আসছে। স্মৃতিকেই শুধু আশ্রয় করে জীবন চলেনা। স্মৃতি থাকবেই তা বলে জীবনের স্বাভাবিকতা বিসর্জিত হবে, হয়না; হয়তো ঘটনার তীব্রতা স্বাভাবিকতা ফিরে পেতে বিলম্ব ঘটায়, আবার সঠিক পরিস্থিতিতে অতিত দ্রুত পশ্চাতে

মুখ লুকায়। আমি জানি কিউ-এর অতীত ভয়াবহ—বাবা, মা আত্মীয় স্বজন কেউ নেই—সে একা। একমাত্র বর্তমানের সহায় বৃদ্ধ আমি—সংসার থাকলেও সংসার বিচ্ছিন্ন আমি, নিজের কাজে ডুবে থাকি—কিউটির একমাত্র নির্ভর যোগ্য ব্যক্তি। কিউ ছোট মেয়ের মত পর্দা সরিয়ে গাছপালা বাড়িঘর লোকালয় দেশ দেখছে। শাড়ী পরেছে কিউ। কিছুটা স্খলিত শাড়ী। সর্বাঙ্গে কিউটির যৌবন---লাবণ্য চিরস্থায়ী।

—ধরো, আমি ঠিক করলাম, গান শিখবো। গানের স্কুলে ভর্তি হয়ে গান শিখতে আরম্ভ করলাম। সেখানে ছোট ছেলে মেয়েরা গান শিখছে -কেউ সারেগা—কেউ আ-আ-আ গাইছে, কেউ বা আনন্দলো-কে গাইছে। আমি ওদের পাশে বসে ওদের মত গলা সাজি বা ওদের সাথে গলা মেলাতে আরম্ভ করি। আর কিছু না হৌক ছেলে মেয়েরা গান শেখা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে।

বেশ কিছু সময় চিন্তা করে কিউটি ওপরের কথাগুলি থেমে থেমে বলে হাসতে লাগলো। আমি জার্নাল থেকে মুখ তুলে কিউটিকে দেখলাম—কি ছেলেমানুষি চিন্তার প্রতিফলন—

—গান শিখতে হলে, তোমায় গানের স্কুলে যেতে হবে কেন?—তুমি বাড়িতে শিখবে।

—তার অর্থ হল—একজন গান শেখানোর মাষ্টার লাগবে, মাষ্টার ঠিক করতে হবে—

—ওটা কোনো সমস্যা নয়। খোঁজ করতে হবে—বাড়িতে এসে শিখিয়ে যাবে। বিগিনারদের জন্য সেটাই ভালো।

—বেশ। বাড়ি পৌঁছাই, তারপর দেখা যাবে।

কিউটি আবার বাইরে দৃশ্যে ডুবে গেল। গড়িয়ে চলেছে গাড়ি—স্টেশনে থামছে, আবার ছুটছে—ছুটছে থামছে কিউটির চিন্তার স্রোত। প্রথম রাত, দ্বিতীয় রাত পার করে গাড়ি এসে হাওড়ায় থামলো যথারীতি দুঘণ্টা বিলম্বে। সেখানে থেকে ট্যাক্সি নিয়ে কিউটির ফ্ল্যাটে কাম আমার দফ্‌তরে। পাহাড়ের শীতলতায় মাসাধিক কাল কাটিয়ে এবং দীর্ঘ সময় ট্রেন যাত্রার ধকলে ক্লান্ত। সজীব কিউটিও ম্লান, রাঙা চেহারায় হালকা কালিমার প্রলেপ। ডাক বাক্সে জমেছে অনেক চিঠি, রিপোর্ট, চেক্, ড্রাফ্‌ট, কয়েকটা বিদেশী জার্নাল ইত্যাদি। চণ্ডীকে দিয়ে আনিয়ে টেবিলে রাখলাম। খুলতে ইচ্ছা করছে না। আমি নিজে সচরাচর খুলিনা, কিউ সময় হলে খুলবে। কিউটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ফ্ল্যাট, যথাসম্ভব কিছুটা পরিষ্কার করে, বিছানা বালিসপত্র ঝেড়ে, চাদর বালিশের ওয়ার বদল করে, টেবিল চেয়ার পরিষ্কার করে, টেলিফোনের লাইন, কম্পিউটার চেক করে, ফোনে ওর জানা একটা রেষ্টুরেন্টে হালকা ব্রেকফাস্টের অর্ডার দেয়, আমাকে স্নানে পাঠিয়ে দিলে। ইদানীং দোকানে খবর দিলেই দোকান থেকে হোম ডেলিভারি দেয়। স্নান সেরে বেরোতেই দেখলাম ব্রেকফাস্ট হাজির সাথে ফ্লাস্কে চা। আমাকে ব্রেকফাস্ট চা খাইয়ে কিউ স্নানের ঘরে ঢোকে।

রুচীকে টেলিফোনে আমাদের পৌঁছানোর খবর দিলাম। ওদের খবরাখবর নিলাম। মনে হলো রুচী আনন্দে আছে। রোহিতের বিয়ে পাকা, শুধু আমার অপেক্ষা, আমার সম্মতি। যদিও ওরা জানে যে ওদের সম্মতিই আমার সম্মতি বা অনুমতি, আলাদাভাবে আমার সম্মতির কোনো প্রয়োজন নেই। তবুও, পাত্রীপক্ষ জানে রোহিতের বাবা আছে,

বাবা অভিভাবক। অভিভাবক, রোহিতের বাবা একজন বিদগ্ধ, প্রখ্যাত ব্যক্তি, তার উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজন। যতই সুনাম থাক, যতই তিনি ব্যস্ত হৌন, একমাত্র ছেলের বিয়েতে তার অনুপস্থিতি সামাজিকতার বিরুদ্ধে। সনাতন ধ্যান ধারণার বিপক্ষে। এছাড়া, যারা আত্মীয় হবে অর্থাৎ রোহিতের শশুর বাড়ির লোকেরা খারাপ ভাববে। পারিবারিক সদস্যবৃন্দের মধ্যে আমাদের সম্পর্ক যেমনই হৌক, রোহিতের শশুর বাড়ির লোকেরা যেন অন্য কিছু মনে না করে--কথায় কথায় রুচী সেটা বুঝিয়ে দেয়। মনে মনে ভাবি, আমি জানি বাবা, আমি জানি, আমরা সকলে সুখী পরিবারের সদস্য। কথা দিলাম, যত শীঘ্র সম্ভব আমি হায়দ্রাবাদে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি, এজেন্টকে ফোন করে টিকিট্ বুক করেছি।

এমন সময় কিউটির সাহায্যকারী কাম বয় কাম পিওন কাম কিউ-এর নেক্সট্ হ্যাণ্ড চণ্ডী এসে হাজির। কিউ বাইরে থেকে ফেরা, বেড়ানো বাসি জামা কাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে। ওর বেরোতে দেরি হবে।

চণ্ডীর বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। কিউটির ডান হাত, এসে ঘরদোরের কাজে হাত লাগালো। সে জানতো আজ আমাদের ফেরার তারিখ। স্নানের পর, ব্রেকফাস্ট সেরে অবসন্ন শরীর আরাম প্রত্যাশি ছিল; ঘুম পাচ্ছিল, চেয়ারে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে সিগ্রেট ধরালাম। চণ্ডীর বক্‌বকের চোটে চোখে বুঁজেও ঘুম এলোনা—ওর জমে থাকা কথা, নানান বিষয়ের ওপর-এর নিজের কথা, ফ্ল্যাট বাড়ির গত একমাসে ঘটে যাওয়া দুএকটা বিষয়, নিজের পরিবারে (স্ত্রীর) কথা, স্কুলে পড়তে যাওয়া ওর ছেলে মেয়েদের কথা, কলকাতার কথা—সিনেমা-বায়োস্কোপ ক্রিকেট, ফুটবল কিছুই বাদ নেই সেই কথায়—চণ্ডী হাতের কাজের সাথে মুখে অনর্গল কথা বলে বলে গেলেও আমার মাথায় একটিও ঢোকেনি, যদিও কানে শুনেছি কিছু কিছু। আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম, এজেন্টকে বলা আছে সপ্তাহ খানেক পরে টিকিটের ব্যবস্থা করতে, রুচীর সাথে কথা হয়ে গেছে, টিকিট পেলেই যাওয়ার ডেট জানিয়ে দেব। ইতিমধ্যে কিছু কাজ সারতেই হবে—লেখাটা পাঠানো, চেক ড্রাফটগুলো ব্যাঙ্কে পাঠানো, কিউই চণ্ডীকে দিয়ে করাবে, আর সব চেয়ে জরুরী কিউ সম্মত হয়েছে; একজন গানের মাস্টার অর্থাৎ সংগীত শিক্ষক ঠিক করা, এ ব্যাপারে চণ্ডী ব্যবস্থা করতে পারবে বলে মনে হয়।

বিকালে, একটু রোদের তাপ কমলে সাদার্ন এভিনিউয়ে যাওয়া দরকার সেখানে বৃদ্ধা মানদা মাসি একা থাকে, কর্মক্ষম, ধৈর্য্য আছে বলতে হবে। যাবেই বা কোথায়, এ পৃথিবীতে বর্তমানে নিজের বলতে কেউ নেই, বালবিধবা, গাঁয়ে বাবা মা ছিল মারা গেছে অনেকদিন, ভাই, ভাইবৌদের সাথে শ্বশুর বাড়ির দেওর ভাসুরের সাথে সম্পর্ক গড়েই ওঠেনি, প্রথমে রুচীর মার কাছে বিয়ের পর রুচীর ফ্ল্যাট ওর একমাত্র ঠিকানা। রুচী নেই, আমি থাকিনা, মানদা বুড়ি ঠিক আছে, দুটো রাঁধে বাড়ে ঘর দোর সাফ্ করে, থাকে। সন্ধ্যার পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ঘুরে আসবো, দেখি কিউ কি বলে। কিউ আপত্তি করবেনা, তবে ফিরে আসতে হবে—একমাস একসাথে থেকেছি, ফেরার পর প্রথম দু চার দিন একা থাকতে ওর অসুবিধা হওয়ার কথা—মানুষ বড্ড তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে যায়।

চণ্ডী কাজ করছে, কিউ স্নানে, আমি বিশ্রাম নিই, চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে, চণ্ডীর কথার বিরাম নেই। কিউ বাথ্ থেকে বেরিয়ে চণ্ডীকে বাজারে পাঠায়, নিত্য

প্রয়োজনীয় সামগ্রী—চা, চিনি, বিস্কুট, ডাল, সবজি, সাদা তেল, আলু, ডিম, কাঁচা সবজি সাথে টিফিন কেরিয়ার, ফেরার পথে আমাদের খাবার কিনে আনবে। খুব ভালো করেছে, দুরাত ট্রেন জার্নি করে ফিরে তিনজনের জন্য রান্না করা যায়না। আধো ঘুমে ছিলাম। ঘণ্টা দুয়েক পরে চণ্ডী ফিরলে কিউ ডেকে তুলে খাবার দেয়। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি— গভীর ঘুমে।

বিকালে কিউটি ডেকে তোলে। দুজনে চা পান করি, শরীর কিছুটা সতেজ। কিউটিকে সাথে নিয়ে সন্ধ্যার পর সাদার্ন এভিনিউয়ে যাই। কলিং বেলের শব্দে, দু তিনবার বাজানোর পর মানদা মাসির গলা শুনতে পাই—কে-কে—পরিচয় দিই। দরজা খোলে, ঘরে ঢুকি—বাবু! মেঝেতে রাখা আছে সেলায়ের সুঁচ সুতো, আসন সেলাই করছিলো। সেলাই করতে ভালবাসে। হাত খালি থাকলে আসন সেলাই, কাঁথা সেলাই, চাল ডাল মশলা ঝাড়াই বাছায়ের কাজ করে মানদামাসি। রুচীও আমার চেয়ে সম্ভবতঃ বড় হবে। বেঁটেখাটো, গোলমাল, মজবুত চেহারা। বাড়ির সব কাজ ঘরমোছা, বাসন পরিষ্কার করা, জামাকাপড় পরিষ্কার করা একা হাতে করে। রান্না করে। রোহিত তিনচার মাসের শিশু, রুচী কলেজে জয়েন করলে, শিশু রোহিতকে মানদামাসির জিম্মায় রেখে রুচী নিশ্চিন্তে কলেজ করেছে। আমি বাইরে, রুচী দীর্ঘদিন হায়দ্রাবাদে আছে, এত বড় ফ্ল্যাটে একা থাকে। এতদিন পর ফিরছি, বাড়িঘর টেবিল চেয়ার খাট বিছানাপত্র ঝক্‌ঝক্‌ করছে—কে বলবে এ বাড়ির লোকেরা দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। সামান্য প্রয়োজন, ফ্ল্যাটের নিচে থেকে নিজেই বাজার করে—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং দৃঢ়, কারোর ওপর নির্ভর করতে হয়না। একমাস পরে আমাদের দেখে খুব খুশি সাথে এক ঝাঁক অভিযোগ। মূলতঃ আমি বাড়িতে থাকিনা, রুচী বাড়ির কথা, ভুলে গেছে, সেও তো মানুষ—একা থাকে কি করে। সারাদিন বোবা হয়ে থাকা যায়? একার জন্য রান্না করতে ইচ্ছা করে? বরং কোনো আশ্রমে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া ভালো। রাতে ঘুম হয়না—এত বড় বাড়ি, ভয় করে, চোর ডাকাত বদমায়েস লোকের অভাব নেই। ছোটো রেডিওটা আছে তাই গান শোনে।

জানে বসন্ত, জানে লাবনী। কারণ দীর্ঘদিন কিউ এখানে বাস করেছে। মানদা মাসি চা কর, খাই।

—কি খাবে? রাত্তিরে, বাজার যা আছে করে দিই। ছোলার ডাল আছে, আলু আছে, আটা আছে।

—আজ থাকবোনা মাসি।

—তাহলে না এলেই হতো।

ঠিক অভিভাবিকার মত কথা।

—লাবনী একা থাকবে—

—কেন, লাবনী এখানে থাকবে।

—না মাসি, অনেক কাজ আছে, করবো, রোহিতের বিয়ে হবে, আমি রুচীর কাছে যাবো।

—রোহিতের বিয়ের কথা জানি, দিদি ফোনে বলেছে।

—কাল সকালে এসে, তোমার বাজার করে দেব। জামা কাপড়গুলো নিয়ে আসবো। কাচতে হবে। আজকে যাই

খুশি হয়না মানদা মাসি। তবুও যেতে হয়। বাড়িতে চণ্ডী আছে। ওকে বলে এসেছি ফিরে আসবো। কিউ-এর ফ্ল্যাটে ফিরি। আজ থেকেই কাজে হাত দেবো। কাজ তাড়া করে ফিরছে। এমন একটা সময় গেছে যখন কাজ ছিল, ছিলনা কাজ করার ইচ্ছা, ইচ্ছাশক্তির মৃত্যু ঘটেছিল, আলস্য ছিল মন জুড়ে। এই কিউটির স্পর্শে, যেন কিউটি যাদুতে মৃতপ্রায় ইচ্ছার পুনর্জীবন হয়। এখন মনে হচ্ছে সময় বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে—কাজ শেষ করা যাচ্ছেনা, গত একমাসে অনেক কাজ জমে গেছে, এর পর রোহিতের বিয়ের জন্য হায়দ্রাবাদে যেতে হবে, বয়স কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস করেছে, কাজের গতি হয়েছে শ্লথ। সেই বালক বয়সে যবে থেকে হাত পা চোখ মুখ কান, কর্মঠ হতে শুরু করেছে, সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেছে প্রতিটি অঙ্গের স্বাভাবিক কাজ কর্ম, বিরামবিহীন, যতক্ষণ না অকেজো হবে, কাজ করে যাব, যদিও তাদের ক্ষমতা হ্রাসের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আশৈশব লালিত আমার মননশক্তি, যা বিকশিত হয়েছিল, কিউটির সান্নিধ্যে সেই সৃজনশক্তি পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে—একটার পর একটা লেখা এসে যায় কলমের ডগায়। লেখায় মশগুল হয়ে থাকতাম, কাজের আনন্দে বিভোর থাকতাম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উৎসাহ পাই, সম্মান আসে, অর্থ আসে, আসে মানুষের চাহিদা—লিখতে হবে, আরো লিখতে পারি যদিও বর্তমানে বয়সের ভারে ক্লান্ত। কিউ এই প্রৌঢ় বসন্তকে বহন করে চলেছে, মনে হচ্ছে আবার যদি যৌবন ফিরে পেতাম, দেশ বিদেশে ছুটতে পারতাম। নিত্য নতুন তথ্যে লেখার ডালি সমৃদ্ধ করতে পারতাম, পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবন যাত্রার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে চলেছে নিয়ত, যে কারণে শিশু মৃত্যু, সন্তান সম্ভবা মায়ের প্রতি অবহেলা, বাঁচার তাগিদে নারীজীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে তার স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিগুলির ধীরে ধীরে মৃত্যু বা মনোরঞ্জনের পদ্ধতি গত পরিবর্তন, ইত্যাদি কারণে সমস্যা জটিলতর হচ্ছে—প্রয়োজন আরো সুসংবদ্ধ অধ্যয়ন, কিন্তু বয়সের ভারে পারিনা, তবুও যেটুকু করার মত আছে, করতে হবে, সময়ের অপচয় করলে চলবেনা, তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবনা। সময়ের পিঠে চেপে চলা শুরু, লাগাম আমার হাতে, সে লাগামে ঢিল দিতে রাজি নই। কাজের নেশায় সাংসারিক দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়েছে, পরিণতিতে রুচীর কাছ থেকে পেলাম প্রচণ্ড অবহেলা, অসহযোগিতা; শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে। রোহিতের জন্মের পর অবশ্য আমি সামান্য চেষ্টা করেছিলাম, রুচী গ্রহণ করেনি বরং বর্জন করেছে, আঘাত দিয়েছে, এমনকি আমি আমার সন্তানকে সামান্য ভালবাসা বা স্নেহ করার সুযোগ পর্যন্ত পাইনি। আঘাতের পর আঘাতে আমার মনের বৃত্তিগুলি শুকিয়ে যাচ্ছিল—বেঁচে ছিলাম মৃতবৎ—লেখা ভুলেছিলাম, স্বপ্ন ভুলেছিলাম, নিঃসঙ্গ দুর্বিসহ জীবন চলেছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে—ইত্যবসরে লাবনীর আবির্ভাব, ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ। অথচ রুচীর তো কোনো অভাব ছিলনা—সাদার্ন এভিনিউ-এর বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, উন্নত জীবনযাত্রা, কলেজের জন্য গাড়ি, সুন্দর শিশু সন্তান রোহিত, সুস্থ শরীর ও মন নিয়ে আমি বসন্ত, তার স্বামী, তবুও রুচীর এ জাতিয় নীরব ব্যবহার ছিল কঠোরতম। অথচ রুচী ও আমি অত্যন্ত কাছের, অত্যন্ত স্বার্থক ও সফল দাম্পত্য জীবন ছিল আমাদের—হঠাৎ কেন যে রুচীর এ জাতিয় ব্যবহারিক পরিবর্তন আমি আজো বুঝিনা। কারণ রুচী অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠ এবং দায়িত্ব সচেতন। আজো নিয়মিত সে আমার খোঁজ খবর রাখে, যথার্থ পত্নি সুলভ আচরণ। যাই হোক লাবনীর আগমন যেন এক

জাতিয় অলিখিত সংযোগ।

কিউটি আমাদের এ বসু পরিবারে অনাকাঙ্খিতা, আশ্রিতা হিসাবে এসেছে কয়েক বছর হয়ে গেল। প্রাথমিক ভাবে মনে হয়েছিল মানসদা ওর জন্য আমাদের আশ্রয়ে সাময়িক ভাবে রেখেছেন, পরে কোন একটা ব্যবস্থা করবেন। ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা ছিল, সে সম্পর্কেরও অবসান ঘটালেন। কিউ এ পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেল, বিশেষ করে আমাব জীবনে কিউ অপরিহার্যা। এবং অত্যন্ত কাছের জন। অত্যন্ত প্রিয়। সে কারণে আমারও কিউ এর প্রতি যথাসম্ভব দায়িত্ব পালন করা উচিৎ, সম্পর্ক অবশ্যই দায়িত্ব দাবী করে। রুচীর রোহিত আছে। আমার উপস্থিতি আছে, রোহিতের মা আছে, বাবা আছে, এবারে বিয়ে হবে. বিয়ে হলে জীবনসঙ্গিনী পাবে। আমাদের আশ্রিতা কিউ-এর তো কেউ নেই। এ পৃথিবীতে কিউ সম্পূর্ণ একা। একা কেউ বাঁচতে পারে? এমন কেউ আছে যে শুধু নিজে, নিজের মননশক্তি ও দেহশক্তি নিয়ে পৃথিবীতে থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বেঁচে আছে। বেদের যুগেও মুনি ও ঋষিদের শিষ্য ছিল, ঋষি পত্নি থাকতো, পালিতা কন্যা থাকতো। আশ্রিতা কিউ আমার ঋণ কৃতজ্ঞতাবশতঃ নিজেকে উজার করে পরিশোধ করছে। আমি যদি অকৃতজ্ঞের মত শুধু গ্রহণ করে যাই সেটা শুধু অনুচিত নয়, অমানবিকতাও হবে।

অবশ্য আমি দীর্ঘদিন ধরে কিউকে নানাভাবে নিজের পায়ে দাড়ানো, নতুন করে কোনো উপযুক্ত লোকের সাথে সম্পর্কস্থাপন, নিদেনপক্ষে বন্ধুত্ব, লেখাপড়া করা, চাকরির চেষ্টা করা—কিউ উৎসাহিত নয়, যার ফলে ওকে দাড় করানোর ইচ্ছা থাকলেও সফলকাম হইনি। অবশেষে কিউ গান শিখতে নিমরাজি হয়েছে—তাই শিখুক. অন্ততঃ বাকি জীবনটা কিছু একটা নিয়ে থাকতে পারবে। খেয়ে পরে বাঁচার মত অর্থসংস্থান, বাসস্থানের ব্যবস্থা আমি করেছি, আমি করেছি বলা ঠিক নয়, কারণ আমার লেখা থেকে যা আয়, সেই লেখার পেছনে পরিশ্রমের বেশির ভাগই তার, শুধু উৎসাহিত করাই নয়. তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে, সেটা সংযোজিত করা, যথাসম্ভব বিষয়বস্তুকে রূপ দেওয়া, পরিবেশন করার সম্পূর্ণ ভূমিকা কিউ-এর।

চণ্ডীকে দিয়ে খোঁজ খবর করাতে হবে—ফ্ল্যাটগুলিতে কোনো না কোনো বাচ্চা গান শেখে, চণ্ডী বাড়ির দারোয়ান পরিচারিকার মাধ্যমে খবর পেয়ে যাবে—তারপর কথা বলে গান শেখানো শুরু করা যাবে। কিউ-এর হবে, ওর গলায় মাঝে মাঝে যে সুর শোনা যায় তা রবীন্দ্রসংগীতের, রবীন্দ্রসংগীত কিউ-এর প্রিয়, খালি গলায় কিউ-এর গাওয়া গান ভাল লাগে। আমি নিজেও আমার পরিচিত মহলে খোঁজ নেবো।

এ সব পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরলাম—ঘড়িতে আটটা বাজে। কিউ গা হাত পা ধুয়ে রাতের পোষাক, সুতির হালকা পাজামা ওপরে টপ পরে নেয়। আমিও বদলে বাড়ির পোষাক পরে নিই, কিউ চণ্ডীকে রাতের খাবার রেডি করতে বলে, মেল খোলে—একমাসের ওপর জমে থাকা, ম্যাসেজ, রিপোর্ট দেখে নেয় কিউ। এর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় যেগুলি, যেমন বিলম্বের কারণে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে যেগুলো, সেগুলো বাদ দিয়ে, যেগুলো কাজের প্রিন্ট নেয়, প্রয়োজন মত ফাইলে সেভ করে। আমি বসে না থেকে অসমাপ্ত লেখাটায় মনসংযোগ করি, ধারাবাহিকতা পুনঃস্থাপন করতে সময় লাগবে। চেষ্টা করি, হয়না। রেখে দিই, অলস বসে থাকি। অনেক কাজ বাকি—কি

করবো, ইচ্ছা হচ্ছে না---এতো স্কুলের পড়া নয়, বই খুলে মুখস্থ করা—অত্যন্ত মনসংযোগ দিয়ে বার বার চিন্তা করে, ঘটনা সাজিয়ে, বার বার সেগুলো'কে মনের মত করে যুক্তি দিয়ে সাজিয়ে তবেই একটা প্রবন্ধ তৈরি হয়। ধৈর্য্য কমে গেছে, সেটাই বড় সমস্যা—লেখার ইতি টানতেই হবে। আবার পাহাড়ে ফিরে যেতে হবে, প্রকাশক সংস্থা গুলোকে নিজের অক্ষমতা কথার জানতে হবে। সত্যই বয়সের ভারে পরিশ্রান্ত সে।

চণ্ডী রান্না করছে, অনেকদিন পরে কলকাতায় চণ্ডীর হাতে তৈরি খাবার খাবো দুজনে। কিউটি মনে মনে ভাবে, দিগ্ বাহাদুরের কথা মনে হয়, কিচেন দিগ্‌বাহাদুরের কৌতূহলি দৃষ্টি, সাহাবদের জন্য যত্ন করে রান্নার প্রয়াস, কিউকে অনুসরণ করা, সহায়তা করা—দু রাত্রি আগেই কিচেনে কিউ ছিল পাশে দিগ্‌বাহাদুর। বেশ সুখে ছিল কিউ। বসন্তের সাথে দুজনে দুজনকে নিয়ে সুখদ টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলো মনে আসছে। বসন্ত টেবিলে বসে, লেখাবন্ধ করে চুপচাপ, নিশ্চয় লেখা নিয়ে ভাবছে, কিউটির ইচ্ছা করছে বসন্তকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে। না, নিজেকে শাসন করে কিউ, এটা কুমায়ুন পাহাড় নয়, কলকাতার ছোট ফ্ল্যাট, কিচেনে চণ্ডী আছে, ইচ্ছা দমন করে।

চণ্ডী রাতের খাবার তৈরি করে, টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে, কিউ-এর অনুমতি নিয়ে ফিরে যায়, দীর্ঘদিন পর সে বাড়িতে শোবে। ওদের অনুপস্থিতিতে কিউদের এই ফ্ল্যাটে চণ্ডীকে রাত্রিযাপন করতে হতো। চণ্ডী শিয়ালদা থেকে লোকাল ট্রেনে বাড়ি যাবে—ওর দেরি হয়ে গেছে। কিউ কম্পিউটার বন্ধ করে। আমি আগে থেকেই হাত গুটিয়ে বসে আছি—দীর্ঘদিন কাজ না করে অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। মনসংযোগ হচ্ছে না, হায়দ্রাবাদে যেতে হবে। মাথার মধ্যে সে চিন্তা আছে। কিউ টিভির সুইচ্ অন্ করলো---খবর হচ্ছে। কিউ পাশে বসলো। কুমায়ুনে টিভি ছিলনা, কাগজ পড়তাম না---সে কারণে টিভির বেশির ভাগ খবরই নতুন মনে হচ্ছে। দেশে বিদেশে প্রতি মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে অসংখ্য ঘটনা, উৎসাহ নিয়ে শুনবার চেষ্টা করলাম। কিউ পাশে বাসে, সামান্য দূরত্বে, স্পর্শ নেই ওর শরীরের তবুও ওর মনের স্পর্শ আমার মনে। ভুলে গেলাম চণ্ডীকে গান শেখানোর জন্য মাষ্টারের কথা বলতে। দুজনেই ক্লান্ত ছিলাম, বিশেষ করে আমি। অতএব রাত না বাড়িয়ে রাতের খাবার খেয়ে শোবার ঘরের বড় ডাবল বেডে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দিনলিপি লেখার মত লেখাগুলো হচ্ছে—স্বাভাবিক। অতি সাম্প্রতিক ঘটনা—সব কথাই প্রায় মনে আছে। অতি সাধারণ, টুকিটাকি কথা, দুটি মানুষের নিত্য জীবন-যাপনের ধারা বিররণী। সকালে গানের মাষ্টারের কথা বলতেই প্রাথমিক ভাবে হকচকিয়ে গেল চণ্ডী। দিদি গান শিখবে, অবিশ্বাস্য। পরে ওকে বুঝিয়ে বলতে, দারুণ উৎসাহিত হল এবং তৎক্ষণাৎ আসছি বলে বেড়িয়ে গেল। দীর্ঘদিন চণ্ডী এই ফ্ল্যাটে কাজ করছে, ওর সাথে সমগোত্রীয় যারা সকলের সাথে পরিচয়, নিশ্চয় সে ব্যবস্থা করতে পারবে। অন্যান্য ফ্ল্যাটে অনেক ছোট ছোট শিশুরা স্কুলে যায়, তাদের কেউ না কেউ গান শিখতে পারে। গেটের চৌকিদার, পরিচারক, পরিচারিকারা সকলেই চণ্ডীর পরিচিত। ওদের সাথে সে বিলম্ব না করে খবরটা নিতে বেড়িয়ে গেল, সে পারবে গানের মাষ্টার মশায়ের খোঁজ খবর যোগাড় করতে।

একমাস ছুটির পর ড্রাইভার এলো। গাড়ি গ্যারেজ থেকে বের করে, পরিষ্কার করে রেডি—বসন্ত বাসু কিউটিকে নিয়ে বেরোলো হারমোনিয়াম কিনতে। কিউ উৎসাহিত,

তার উৎসাহে ভাটা পড়তে দেবেনা বসন্ত, যা করণীয় তা এখনি করে নেওয়া উচিৎ, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটে। একমাস পর কলকাতার রাস্তায়—একই চেহারা, পরিবর্তন নেই, মানুষের ভিড়। যানজট রাস্তায়, কয়েকশো গজ দূরে ট্রাফিক সিগন্যাল, হকাররা ফুটপাথ দখল শেষ করে রাস্তাও দখল করে চলেছে, হাঁটতে ধাক্কা ধাক্কি, চলার গতি নেই, কারোর তাড়া থাকলেও সে দ্রুত চলতে পারবেনা, গাড়িতে ভিড়— নিত্য নৈমিত্তিক কলকাতার অভ্যাস। সেখানে, কুমায়ুন নিস্তব্ধ নির্জন, পথ ঘাট খালি, দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে বাড়ি—জনসংখ্যা অনেক কম, বেঁচে থাকার জন্য সেখানে এমন কষ্ট করতে হয়না, তুলনা করলে বাস করার জন্য কুমায়ুন স্বর্গ। অবশ্য কলকাতা প্রচণ্ড জীবন্ত। দোয়ার কিন্ থেকে হারমোনিয়াম কিনে বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আপাততঃ মাষ্টার মশায় ঠিক হলে গলা সাধা শুরু করুক— হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরে তবলা, তানপুরা প্রয়োজন মত কেনা যাবে।

কিউকে নামিয়ে সাদার্ন এভিনিউ। মানদামাসিকে কথা দিয়েছি, তারো কিছু প্রয়োজন আছে, টাকা পয়সা, ছোটো খাটো জিনিষপত্র। চণ্ডীকে সাথে নিয়েছি, ব্যবস্থা করে দুপুরটা ওখানে থেকে যাবো। বাজার করে দিয়ে চণ্ডীকে নিয়ে গাড়ি ফিরে গেল। আমি রয়ে গেলাম। দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফিরেছি, ঝক্‌ঝক্ তক্‌তকে বালিশ বিছানা, চেয়ার টেবিল, ব্যালকনি। সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে সংসার করে মানদামাসি, দুর্ভাগার নিজের সংসার কোনোদিন জোটেনি, না পেয়েছে স্বামীর ভালবাসা, সন্তান সুখ, না পেয়েছে স্বামীর ঘর—রুচীর ঘরই তার ঘর, রুচী নেই তো কি হয়েছে এটাই তো তার নিজের বাড়ি। বুড়ি মানদামাসিকে দেখলে মায়া হয়। পৃথিবীতে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো এক মহান দেশে, কতনা মানদামাসি আছে, তার কোনো সমীক্ষা হয়নি, দেখা যাবে এই সংখ্যাটি মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ। তবুও মানদামাসির নিরাপদ আশ্রয়, এবং পেটপুরে খাবার সংস্থান আছে, বেশির ভাগ মানদামাসিরা অনাথিনী—হয়তো বাড়িতে অসীম কষ্টে কারোর গলগ্রহ নয়তো কাশীতে আশ্রয়। হায়রে দুর্ভাগা দেশ।

পুরানো স্মৃতি বিজড়িত জায়গা, পরিচিত ঘর, আসবাবপত্র যেন অতি করুণা ভরা চোখে আমায় লক্ষ্য করছে। মানদামাসি কুটনো কেটে রান্না বসিয়েছে। আমি স্নান সেরে ব্যালকনিতে বসতে ইচ্ছা হচ্ছিল, বসা গেলনা, রোদ পড়েছে, ঘরে বসলাম পাখা চালিয়ে। এ বাড়িতে এলে বড় একা মনে হয়। মনে হয় কতদিন নিজেকে একা বহন করে চলেছি—কি অস্বাভাবিক এ জীবন। কিউ আছে, ঐ ফ্ল্যাটে দুজনে দুজনকে নিয়ে থাকি তাই নইলে কি হতো ভাবলে শিউরে উঠি, মনে হয় পাগল হয়ে যেতাম, নাহয় এমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যেতো, হয়তো নৃশংস হতে পারতো তার ফল। আসলে জীবন কতকগুলো মৌলিক অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়—তা শারীরিক হৌক বা মানসিক হৌক। সে অভ্যাসের পরিবর্তন জীবন সহ্য করতে পারেনা। রান্নার দেরি আছে, মানদা মাসি মিষ্টি ও জল দিয়ে গেল, খেলাম। বসার ঘরে বসে আছি—সেই সোফা, সেই টেবিল, সেই সোকেশে সাজানো দর্শনীয় সামগ্রী, রুচী নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে সাজিয়ে রেখেছে, কাশ্মীর থেকে সংগ্রহ করা গালিচা, দেওয়ালে যামিনী রায়ের আঁকা ছবি, রুচিসম্মত বসার ঘর। ঐ সোফায় মানসদা ও বৌদি এ বাড়িতে বেড়াতে এলে বসতো। ছোট লাবনী রোহিতের সাথে শৈশবে খেলা করতো। এই বাড়িতে রুচী ও আমি দীর্ঘদিন বাস করেছি। এখানেই খাওয়া বসা শোওয়া, লেখা, সুখ

দুঃখ, সমস্ত কিছুই এই বাড়িতে। আমার অফিস কাম দ্বিতীয় ফ্ল্যাটটির বয়স বেশি নয়। লাবনী আসার পর প্রথম দু-তিনবছর এই ফ্ল্যাটেই থাকতো। যে ঘরটা রোহিত থাকবে বলে স্থির ছিল, সেই ঘর আপাততঃ বন্ধ আছে, সেখানেই কিউ-এর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। রোহিত তখন বাইরে থাকে, বাড়ি ফিরলে মায়ের কাছে থাকতো।

এই ঘরেই আমাদের অর্থাৎ আমার প্রেমালাপ বা রসালাপ হতো, যদিও রাতের আলো আঁধারে ব্যালকনির আকর্ষণ ছিল সবার বেশি। রুচীর বেশির ভাগ গল্পের বিষয় বস্তু ছিল ওর কলেজ, ক্লাসের কোন ছাত্রীর কি আচরণ, কে মনযোগী কে অমনোযোগী, কোন মেয়েটি বেশি সাজতো, কোন কলিগের হাজব্যাণ্ড কেমন ইত্যাদি। মাঝে মাঝে ওর বাড়ির, ওর বাবার কথা মায়ের কথা, মানদামাসির বিয়ের গল্প ইত্যাদিও সে বলতো— আমি শুনতাম। আমিও বলতাম, দেশে দেশে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতাম, সেমিনারে দেশ বিদেশের নানান ভাষার, নানান সংস্কৃতির লোকেদের বিভিন্ন বৈশিষ্টের কথা, অভ্যর্থনা, থাকার জায়গা, বিলাসবহুল জীবন যাত্রা, পাশাপাশি অনুন্নত দেশের গরীব মানুষের অবর্ণনীয় কষ্টের কথা। বিদেশে কিম্বা দেশের বিভিন্ন সেমিনারে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে আমি সাধারণতঃ কনিষ্ঠ ছিলাম। কোথাও কোথাও সেমিনারের অবসর বিনোদনের প্রাক্কালে কখনো কখনো যে অকস্মাৎ কোনো রোমাঞ্চের আহ্বান আসেনি তা নয়, এসেছে, আমি কি ভাবে সেই সব মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত করে, স্বস্তি অনুভব করতাম, রুচীকে বলতাম। আসলে আমি ভারতীয় সংস্কারে অভ্যস্ত ছিলাম, নীতি বা নৈতিকতা বিরুদ্ধ কোনো কিছু করা আমার কল্পনার অতীত ছিল, এমনকি মদ্যপান পর্যন্ত যতটা সম্ভব পরিহার করতাম। রুচী ধৈর্য্য ধরে শুনতো, আশ্চর্য্য হতোনা, আমার ওপর তার অসীম আস্থা ছিল। শুনতে শুনতে আবেগে কখনো কখনো রুচী জড়িয়ে ধরতো। আমার প্রতি তার বিস্ময় এবং অগাধ ভালবাসা আমি অনুভব করতাম। সেই সব সুন্দরতম মুহূর্ত, সেই সব রোমাঞ্চে ভরা পরিবেশ, রুচীর উষ্ণ সান্নিধ্য সমূহ এবং সেই রুচীরই কঠোরতম, অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর আচরণ এই ফ্ল্যাটে ঢুকলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে, মনে হয় ঘটনাগুলো যেন এখনো জীবন্ত। সে কারণে রুচীর দীর্ঘদিন অনুপস্থিতি, কিউ-এর সাথে নতুনভাবে সম্পর্ক গড়ে ওঠা ইত্যাদি এই ফ্ল্যাটে এসে আমাকে অসহনীয় করে তোলে। মনে হয় এ যেন ভুতুড়ে ফ্ল্যাট, স্মৃতির প্রেতাত্মা সমূহ আমায় তাড়া করে, অস্থির করে তোলে, আমি দ্রুত এখান থেকে পালিয়ে যায়।

রুচী নেই। রোহিত নেই, স্মৃতিজর্জর শিশু রোহিতের শৈশব বর্তমান—কিন্তু তারা কেউ নেই। একমাত্র বৃদ্ধা মানদামাসি, অসহায়, অনাথ, একা যক্ষের ধনের মত পাহারা দিচ্ছে ফ্ল্যাটটিকে। এবং এই মানদামাসিই আমৃত্যু পাহারা দেবে। কিছুতেই এই পরিবেশ আমি সহ্য করতে পারিনা। কোনোরকমে দুপুর কাটিয়ে ফোন করে গাড়ি আনিয়ে আমি ফিরে যাই। প্রায় দমবন্ধ অবস্থা হতে মুক্তি।

কিউ বসে বসে টিভি দেখছিল, পিছনে চণ্ডীও দাড়িয়ে—পর্দায় দেখা যাচ্ছে জঙ্গলে একদল হাতি ছুটছে। কিউ-এর মেদ বিবর্জিত সুন্দর শরীর গতরাত্রে গভীর ঘুমিয়েছে, মনে হয় দিবানিদ্রাও হয়েছে কিছু আগে, এখনো কচি ও কোমল। বড় চোখে কিউ-এর দিকে তাকালাম, কিউ সামান্য হেসে নীরব জবাব দিল। এই কিউ-এর সাথে দৈহিক সম্পর্ক দৈহিক স্থাপিত হয়েছে সাদার্ন এভিনিউ এর ফ্ল্যাটে। সদ্য যুবতী, শোকে আচ্ছন্ন, কিউকে সান্ত্বনা দেওয়া তার মানসিক ব্যথা দূর করার প্রয়াসে মানসিক ভাবে তার মনের

কাছে পৌঁছানো এবং আমার প্রতি কিউ-এর আস্থা অর্জন ঐ ফ্ল্যাটেই। আমার প্রতি সেই সময় রুচীর নিষ্ঠুর আচরণ আমার জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে, লেখনি স্তব্ধ, আমি কিউকে স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে ব্যক্তিগত পরিচর্যার সাহায্যে সুস্থ করতে চেষ্টা করছি—আমি তাকে খাইয়ে দিই, ঘুম পাড়িয়ে দিই, অনেক সময় স্নান পর্যন্ত করিয়ে দিয়েছি, ওর গায়ে মাথা হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ালেই হতোনা, আমায় ওর পাশে শুয়ে বা বসে থাকতে হতো, না হলে ভয়ে কান্না জুড়ে দিতো কিউ। ঐ ফ্ল্যাটেই তো আমার জীবন নাটকের পরিবর্তনের সূত্রপাত।

চণ্ডী চা বসিয়েছে। কিউ আরো কাছে সরে এল। আমি পাশে থাকলেই সে খুশি। আমি বুঝি। আমি ওকে পাশে পেলে ভাল থাকি, কিউ বোঝে। আমাদের বোঝাপড়াই কোনো অভাব বা ঘাটতি নেই। চা করতে করতে চণ্ডী জানালো, গানের মাষ্টার মশায়ের খবর সে খুব তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করে দিতে পারবে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম, কথা বলে বুঝিয়ে, দরকার হয় বেশি টাকা দিয়ে কিউটির সংগীত শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবো।

চাও সামান্য স্ন্যাক্‌স খেলাম। চণ্ডী কিচেনে, রাতের রান্না করে সে বাড়ি ফিরবে। গত রাতে ফিরতে ওর বিলম্ব হয়েছিল।

কিউ কম্পিউটার চালু করে প্রথমেই দেখে নেয় কোনো নতুন খবর মেলে আছে কিনা। রোহিতের একটা মেল্। প্রিন্ট নিয়ে কিউ আমাকে এগিয়ে দিলো। আলো জ্বালিয়ে দেখে নিলাম। সংক্ষিপ্ত—মায়ের খবর, নিজের খবর, ওর বিবাহ সম্পর্কিত অগ্রগতি, অবশেষে আমি করে যাচ্ছি তার দিনক্ষন। আশা করছি দু-একদিনের মধ্যেই জানাতে পারবো। সেকেন্দ্রাবাদে একটা প্রোগ্রাম আছে, বেসরকারি সংস্থা, ওরা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত প্রচার অভিযান এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ করে। রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারের সাথে যোগাযোগ আছে। ওরা সরকারি এবং বেসরকারি অধিকারিক, ও নেতৃত্বস্থানীয় কিছু অধিবাসী যথা শিক্ষক, সমাজ সেবকদের নিয়ে একটা শিক্ষামূলক সভা বা সেমিনারের ব্যবস্থা করেছে। ওদের এক সংগঠক আমার পরিচিত, তামিল ভদ্রলোক, বারবার অনুরোধ করেছে। এক সাথে দুটি কাজই সারবো। দু'একদিনের মধ্যে ওরা ব্যবস্থা করে জানাবে। কিউকে বললাম, জানিয়ে দাও, দু তিনদিনের মধ্যেই জানাচ্ছি, ওরা যেন আমার জন্য অপেক্ষা না করে বিবাহ সংক্রান্ত কাজে এগোতে থাকে। আমি সময়মত পৌছে যাবো। মনে হচ্ছে, হায়দ্রাবাদে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে।

—তোমার ঐ লেখাটা রেডি করেছি কাল দেখে দিও।

—তুমিও শুরু করে দাও। একটা শুভদিন দেখে, আমি যাওয়ার আগে তোমার সংগীত শিক্ষার শুরু যেন দেখে যেতে পারি।

—তুমি আবার শুভদিন কবে শুরু করলে?

—তা নয়। তবে যে কোন শুভ কাজ শুভ মুহূর্তেই শুরু হয়—, যদিও সময়ের কোন শুভ বা অশুভ বলে কিছু নেই, তিথি নক্ষত্র—সব মানুষের মনগড়া বা কল্পনা। তবে আবহাওয়ার ভাল মন্দ আছে—ঝড় বৃষ্টি, তুফান, বন্যা যদিও প্রাকৃতিক, মানুষের ক্ষতি হয়, আবার স্নিগ্ধ শীতল, মনোরম পরিবেশ মানুষকে আরাম দেয়। যাক্ গে, চণ্ডী গেছে?

—মিনিট দশেক আগে গেল।

সন্ধ্যা পার হয়েছে রাত্রি নামছে, কমে আসছে মানুষ ও যন্ত্রের কোলাহল, দিবাক্লান্ত

শহরের গাছগুলো নিঃশ্বাস ছাড়ছে, আরামে দোলাচ্ছে শাখা সমূহ—সামান্য হাওয়া ঢুকছে জানালা দিয়ে। তুবও স্বস্তি নেই, প্যাচ্‌পেচে গরম, ঘামে ভিজেছে শরীর। বাথ্‌রুমে গেলাম, ঠাণ্ডা জলে নিজেকে ধুয়েমুছে নিলাম। কিউ কম্পিউটার বন্ধ করে হালকা আলো জ্বালিয়ে পাখা চালিয়ে বসেছে। একটা এসি শোবার ঘরে লাগিয়ে নেবো, নইলে কিউএর ঘুমোতে কষ্ট হবে।

দ্বিতীয় দিনে চণ্ডী একজন সংগীত শিক্ষক নিয়ে এসে হাজির করলো, অল্প বয়স ঠিক পেশাদার নয়। নিজে একজন ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা করে। সংগীতের প্রতি ওর আকর্ষণ আন্তরিক। দক্ষিণ শহরতলীতে বাড়ি। বাবা একজন স্কুল শিক্ষক। ছোটবেলা থেকে শখ গান বাজনা শেখার। প্রচেষ্টা আছে। স্বীয় চেষ্টায় একজন ওস্তাদের কাছে শেখে, তার খরচ দু'একটা গানের টিউশানি করে চালায়। এই ফ্ল্যাটে তার ছাত্রী আছে। একজনের বয়স আট বছর অপরজন এগারো। কিউটিকে দেখে প্রথমে ঘাবড়ে যায়। অবশেষে চণ্ডীর আশ্বাসে সে কিউটিকে শেখাতে রাজি হয়। নাম সনাতন দাস।

এই অ্যাপার্টমেন্টের অন্য ফ্ল্যাটের আট বছরের ছাত্রীকে শিখিয়ে সে কিউটিকে শেখাবে। আগামি রবিবার তার প্রথম পাঠ বা শিক্ষার শুরু। শ্রাবণ মাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান মাস। কিউ সংশয়াচ্ছন্ন তবুও খুশি।

প্রথম দিনে চণ্ডী মাষ্টার মশায়কে পৌঁছে দিয়ে বাজারে গেছে। তার আগে সেই বাচ্চা ছাত্রীটিকে শিখিয়ে এসেছে। নতুন হারমোনিয়াম সামনে রাখা। কিউ তার গুরুমহাশয়কে মিষ্টিমুখ করায়। সনাতন দাস হারমোনিয়ামের রিডগুলো চেনায়, কোন আঙুলে কোন রিডটা টিপতে হবে. বেলো কিভাবে টানতে হবে, কি ভাবে বসতে হবে, মুখ নিচু করে, জড়তা নিয়ে সে কিউকে বুঝিয়ে দেয়। একটি বারের জন্যও সনাতন কিউ-এর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারেনি। কিউ বরং অনেকটা সহজ। সে স্কুলে কলেজে অনেকের সাথে মিশেছে। মানুষের সাথে মিশতে পারে, অনেক সাবলীল। সে জানে তার গুরুমশায় ও ধীরে ধীরে সহজ হয়ে যাবে, লজ্জা কেটে যাবে।

এই ভাবেই শুরু সংগীত শিক্ষার। শুরু হল কিউ-এর জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত— বেঁচে থাকলে আনন্দে থাকা মনে হয় ভালো। কিউ এটা উপলব্ধি করেছে।

আমি সামান্য আড়াল থেকে কিউ-এর শুভ সূচনার সাক্ষী হলাম, তৃপ্ত হলাম।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

অতি পুরানো এবং বহু ব্যবহৃত কথা—জীবন বড়ই বিচিত্র। মানুষ স্বপ্নালু, স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। নতুন আশায় বুক বেঁধে স্বপ্ন দেখে যায়, জীবনকে ভালবাসে, মরণকে ভয় করে। মরতে কেউ চায়না। আশার জাল বোনে, সুখের আশা, আনন্দের আশা, বড় হবার আশা, বিদ্বান হওয়ার আশা, অর্থবান হওয়ার খ্যাতির আশা—আশার অন্ত নেই, সম্ভব হলে নক্ষত্র স্পর্শ করে লাফ দিয়ে সাগর পার করে। আশার ছলনে ভুলি/কি ফল লভিনু হায় কিম্বা ধন্য আশা কুহকিনী—অনেক কথাই আশা সম্বন্ধে কবি, সাহিত্যিক শিল্পী—এমনকি অতি সাধারণ মানুষ বলে আসছে চিরকাল। এই পৃথিবী যতদিন থাকবে, মানুষ নামক প্রাণীর যতদিন অস্তিত্ব থাকবে, আশা নামক মানুষের অনুভূতি বা স্বপ্ন থাকবে, কামনা থাকবে, বাসনা থাকবে, সুখ থাকবে, থাকবে দুঃখ, আনন্দের দোলায় মানুষ দুলবে, মানুষ স্বপ্নে মশগুল হবে, আবার বিপরীতে

দুঃখে কষ্ট পাবে, হু হু করে কাঁদবে—যেমন দিনের আলো আর রাতের আঁধার। আবার আনন্দ বা সুখ চিরকাল থাকেনা বা চিরস্থায়ী হয়না, দুঃখও যত গভীর হৌক যন্ত্রণা যতই কষ্টদায়ক হৌক, এক সময় দুঃখও ম্লান হয়ে যায়, মানুষ দুঃখকে অতিক্রম করে সুখের সন্ধানে লিপ্ত হয়। সেই একই নিয়মে কিউয়ের বেঁচে থাকার প্রেরণা জন্ম দিয়েছে নতুন আশার, কিউ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। বসন্তের দীর্ঘদিনের প্রয়াসে কিউ জীবন সমুদ্রে আনন্দে নুড়ি—খুঁজতে শুরু করেছে।

ফ্ল্যাটে কিউ একা। একা খারাপ লাগছে। দীর্ঘদিন তার সাথী বসন্ত, বাইরে একা সচরাচর যায়না। কিউ নিজেও বাধা দেয়। বসন্তের বয়স হয়েছে। বেশি ছোটাছুটি করা ঠিক নয়, পরিশ্রম সীমিত করা উচিৎ। শরীরের বিশ্রাম প্রয়োজন। বসন্ত নিজে মুখে প্রকাশ করেছে এবং কিউ-এর নিজেরও একা থাকতে খারাপ লাগে। বসন্ত গেছে হায়দ্রাবাদে। চণ্ডী নিয়মিত আসে, দিনে থাকে, কাজ কর্ম খাওয়া দাওয়া করে, রাতে বাড়ি ফিরে যায়। ওর ছেলে মেয়েরা বড়, বাড়িতে নিজের ঘরে না থাকলেও ওর পরিবারের অসুবিধা হয়না। প্রয়োজন হলে কলকাতায় সাহেবদের ফ্ল্যাটে ওকে থাকতে হবে—এটা চণ্ডীর চাকরির শর্ত। দীর্ঘদিন হল এই বাড়িতে চণ্ডী কাজ করছে, বিশ্বস্ত লোক, চাকর কাম বামুন কাম প্রহরী কাম ম্যানেজার। বসন্ত এক সাথে দুটি কাজ হাতে নিয়ে হায়দ্রাবাদে রওনা হয়ে গেছে, এক এবং অত্যন্ত জরুরী কাজ, রোহিতের বিয়ে, দুই বা দ্বিতীয় হচ্ছে, আলোচনা সভায় যোগদান করা। আলোচ্য বক্তব্য এখান থেকে রওনা হওয়ার আগে কিউ আর বসন্ত দুজনে মিলে বিষয়বস্তু তৈরি করে নিয়েছে। বসন্ত রোহিতের ফ্ল্যাটে উঠেছে, প্রয়োজন হলে আয়োজক সংস্থা বসন্তের থাকার ব্যবস্থা করতে পারতো—শহরের নামি দামি হোটেলে কিন্তু এক্ষেত্রে বসন্ত ওদের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কারণ রোহিত সেখানে আছে, রুচী আছে, রোহিতের বিয়ে সামাজিক কাজ। রোহিত, তার ছেলে একজন বিদ্বান এবং যশস্বী যুবক, বসন্ত নিজেও খ্যাতিমান এবং অনেক উঁচুস্তরের মানুষ, রুচী তার স্ত্রী একজন সম্মানিতা প্রাক্তন অধ্যাপিকা, তার নিজের এবং পরিবারের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা তার সামাজিক দায়বদ্ধতা। রোহিতের ফ্ল্যাট বড় সুসজ্জিত—থাকার কোনো অসুবিধা নেই। বরং দীর্ঘদিন পর পরিবারের সকল সদস্যের সাথে এক সাথে থাকার সুযোগ।

সনাতনের কাছে কিউ-এর গানের তালিম চলছে। কিউ অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে শেখার চেষ্টা করছে। সনাতন এবং কিউ-এর মধ্যে প্রাথমিক জড়তা অনেকাংশে কেটে গেছে। আজকে নিয়ে চারদিন অর্থাৎ চারটে রবিবার সনাতন গান শেখাচ্ছে, কিউ-এর শিক্ষা তিনসপ্তাহ পার হয়ে চতুর্থ সপ্তাহে পা রাখলো। হারমোনিয়ামের সাথে গলা, কিম্বা সাজার জন্য সা-রে-গার স্বরলিপি খাতায় সুন্দর করে লিখে, নিজে গেয়ে, কিউকে দিয়ে গাইয়ে অভ্যাস করায় সনাতন। কিউ সেগুলো প্রতিদিন নিয়মিত অভ্যাস করে, চোখ নিচু করে হারমোনিয়ামের রিডের দিকে লক্ষ্য রেখে রিডের ওপর আঙুলের চাপ দেয়, বাঁ হাতে বেলো টানে, গলা মেলায় সুরের সাথে। শেখার বিষয়ে কিউ অত্যন্ত মনযোগী এবং শিক্ষক সনাতন দাসের ভাষায় কিউ-এর উন্নতি হচ্ছে, কিউ হতোদ্যম হয়না বরং উৎসাহিত হয়। চণ্ডীও বলে দিদির ভাল হচ্ছে। যতক্ষণ সনাতন দাস থাকে চণ্ডী ফ্ল্যাটে থাকে, কাজের ফাঁকে, বা বসে বসে বিশ্রাম নেয়, মাঝে মাঝে কান পেতে শোনে। চা তৈরি করে, প্লেটে বিস্কুট, কাপে চা এবং গ্লাসে করে জল দেয়, সনাতন দাস খায়।

ছেলেটি ভাল—কিউ-এর চেয়ে বয়সে তরুণ। কিউকে দিদি বলে ডাকে। কিউ অবশ্য আপনি। আজ্ঞে, মাস্টার মশায় বলে সম্বোধন করে। গান শেখা শুরু করার পর থেকে কিউ কিছুটা ব্যস্ত, গান গাইতে সে ভালবাসে—সে ভালো আছে।

বসন্ত দুদিন তিনদিন পর পর কিউকে ফোন করে, নিজের খবর, সেমিনারের খবর, রোহিতের খবর দেয়, কিউ-এর খবর নেয়, গান শেখার অগ্রগতির খবর, চণ্ডীর খবর নেয়। ইতিমধ্যে একদিন হবু বেয়াই মশায়, তার মেয়েকে নিয়ে আলাপ করে গেছেন। শিক্ষিত আলাপি লোক, মার্জিত অমায়িক ব্যবহার। মেয়েটি অর্থাৎ প্রিয়ংবদা, হবু পুত্রবধূ খুব ভাল মেয়ে, মিষ্টি সুন্দর দেখতে, খুব সুন্দর, ধীরে ধীরে কথা বলে, বাংলা মোটামুটি বলতে পারলেও লিখতে পারে না। ওরা দীর্ঘদিনের প্রবাসি বাঙালি। বেয়াই মশায়ের সমস্ত জীবন অন্ধ্রপ্রদেশের ঐ শহরে, পেশায় উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার ছিলেন, বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত। রুচী ও রোহিতের নজর আছে বলতে হবে। বিয়ের দিনক্ষণ স্থান সব ঠিক হয়ে গেছে। আমার উপস্থিতিতে বিয়ে হবে। আমি বিয়ের কাজ মিটিয়ে ফিরে যাবো। খবরগুলো ধীরে ধীরে কিউকে পরিবেশন করি। কিউ শোনে। বিয়েতে কিউ-এর উপস্থিতির প্রয়োজন নেই, কিউ নিজেও চায় না। মোটামুটি দিন পনেরোর মধ্যে মধ্যে সব কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর ফিরব। রুচীর ইচ্ছা কলকাতায় একটা পার্টি দেওয়া, অবশ্য রোহিতের এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ নেই। এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

কিউ জানায়, সেও খুব একটা অসুবিধায় নেই। প্রথম কয়েক দিন একা একা মনে হচ্ছিল এখন অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। হারমোনিয়াম, তার নতুন সাথী, দিনের অনেকটা সময় হারমোনিয়াম নিয়ে কেটে যায়, ঘরের মধ্যে আলাপ করে, নিশ্চয় কেউ শুনতে পায়না। আসলে ফ্ল্যাট বাড়িগুলোতে কেউ কারো খোঁজ রাখেনা। দ্বিতীয়তঃ সে বসন্তের প্রথম জীবনের লেখাগুলো সংগ্রহ করে সংকলন করতে ব্যস্ত। বিষয় এবং তারিখ অনুসারে সাজানো, দেশ বিদেশের প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রকাশিত লেখাগুলো সংগ্রহ করা এবং তারজন্য যোগাযোগ করা—এ সব কাজগুলো সে করছে। লেখার মধ্যে যেগুলো আজকের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হয় "মার্ক" করে রাখে, বসন্ত ফিরলে এডিট্ করে ফাইন্যাল করে পাণ্ডুলিপি রূপাতে পাঠাবে মুদ্রণের জন্য। মাঝে মাঝে তার সংগৃহীত বই নামিয়ে পড়ে, দুদিন ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি গিয়ে বই নিয়ে এসেছে। এইভাবেই তার দিন চলে যায়।

তবুও কিউ-এর কুমায়ুন মনে আসে। কুমায়ুন ভোলার নয়। কুমায়ুন তার জীবনের ছক্ বদলে দিতে চলেছে। কুমায়ুনের মধুর স্মৃতি, সেই পাহাড় নির্জন পথ, সরল জীবন যাত্রা, দিগ্ বাহাদুরের বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম, খণ্ড খণ্ড ভাবে তার মনে আসে। যদিও তারা ক্যামেরা নিয়ে যায়নি, এবং কোনো ছবি তুলে রাখেনি তবুও তো কিউ-এর মনে পাহাড়ের সমস্ত ছবি টুকরো টুকরো ভাবে স্পষ্ট সাজানো আছে। সেই ছোট্ট কুকুর ছানা, ছোট ছোট পড়ুয়ার দল রাতের আঁধারে পাহাড়ের চেহারা, সেই বৃক্ষরাজি, বসন্তের হাতে হাত রেখে পাহাড়ের পথে পথে বেড়ানো, বসন্তের সাথে ঘনিষ্ট মুহূর্ত—শরীর মনে অফুরন্ত আনন্দ এবং অপরিসীম তৃপ্তি। যদিও মানব এখনো তার মনে জীবিত, তবুও মাঝে বসন্তের সাথে মানবকে স্মরণ করে তুলনা করে। মানুষ হিসাবে মানব অপেক্ষা বসন্ত অনেক বড়, বেশি উদার, অত্যন্ত নির্ভরশীল। বসন্তের নিজের সংসার আছে, স্ত্রী পুত্র আছে তবুও বসন্ত নির্ভরশীল, সংবেদন শীল, প্রাণবন্ত,

বসন্তের বয়স অতিবাস্তব তবুও এখনো সে সক্ষম পুরুষ। যে কোন মানুষ, সে স্ত্রী হৌক বা পুরুষ হৌক বসন্তের ওপর নির্ভর করতে পারে। সে যদি বসন্তকে একান্ত নিজের করে পেতো জীবনে তার সুস্থিতি আসতো, নারী জীবনের মৌলিক ইচ্ছাগুলো বসন্তের মধ্যে দিয়ে, বসন্তের সান্নিধ্যে, বসন্তের ভালবাসায় স্বার্থকতায় খুঁজে পেতো—এক টুকরো ঘর, একজন দরদি মানুষ, বন্ধু বল, স্বামী বল বা প্রেমিক বল, আর একটি বা দুটি সন্তান—বেশ হতো। এমনি ভাবনায় কিউ কাতর না হলেও, স্বপ্নে ডুবে থাকে অবসন্ন মুহূর্তে। কিউ-এর জীবন থেকে মানব ধীরে ধীরে অপসৃত প্রায়, অবলুপ্ত প্রায়। মানবের জন্য কষ্ট হয়, করুণা হয়। মানবের পৌরুষ নেই, মানব অতীত। কিউ-এর জীবন থেকে মানস আঙ্কেল, মা, যাদের সাথে তার জীবন শুরু, তারা অতীত, অস্পষ্ট সে সব ছবি—তার শৈশব, স্কুল জীবন, কলেজ জীবন, নাচ-গান বান্ধবী কেউ নেই।

অভিশপ্ত জন্ম তার জীবনের সুখ শান্তি, স্বপ্ন, ভালবাসা ছিনিয়ে নিয়েছে। সে বেঁচে আছে তার অতীতের দুঃস্বপ্নের শিঁকড় আঁকড়ে ধরে। তার অতীত, সে জানে কোনদিনই ফিরে আসবে না, কোনো দিন আসেও না, তবুও অন্তরের অন্তঃস্থলে বেঁচে থাকে অমরত্ব নিয়ে। বেঁচে আছে কিউটির হৃদয়েও।

কুমায়ুন, একটি পর্দা, একটা আচ্ছাদন, কুমায়ুন ও বসন্ত যেন কিউ-এর অতীতকে নতুন স্বপ্নে আচ্ছাদিত করতে চাইছে, কিউকে নির্দেশ দিচ্ছে, অনুরোধ করছে—তুমি ঐ পর্দার আড়ালে বা আচ্ছাদনের অন্তরালে যা আছে, তার দিকে আর ফিরে চেয়ো না, বরং এগিয়ে চলো। তোমার সামনে তোমার ভবিষ্যৎ, চেয়ে দেখো, চেষ্টা করো, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হতেও পারে। নতুন স্বপ্নের দিকে এগিয়ে চলো। জীবনে নতুন পাতার সঞ্চার হতেও পারে! কাটা গাছেও পাতা গজায়, মরা গাছে ফুল ফোটে, পাতা গজায়, শাখা প্রশাখার বিস্তার হয়, ফল ধরে—শুধু কথার কথা নয়, বাস্তব লব্ধ, অভিজ্ঞতা প্রসূত উক্তি, মিথ্যা হয় না। প্রয়োজন হলো সাধনা, কিউ সাধনা করো সফল হবে, আনন্দলক্ষ্যে তুমি পৌঁছাবেই। কিউ একা একা নিজের মনে, আপন খেয়ালে স্বপ্নের ইন্দ্রধনুস রচনা করে চলেছে।

আজ সকালেই বসন্ত টেলিফোন করেছিল। দূর থেকে, টেলিফোনে বসন্তের গলার স্বর শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করে কিউ। টেলিফোনের তার দিয়ে বসন্তের স্বর মধুবর্ষণ করে কর্ণকুহরে। অতি সাধারণ কথা—কোনো আবেগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই তবুও যেন মধুর শীতলতার স্পর্শ আছে। ঘুম পাড়ানি আমেজ আছে।

দুদিন ধরে বসন্ত সেমিনারে ব্যস্ত ছিল। শুধু নিজের বক্তব্য নয়, সে যায় শুনতে ও বিভিন্ন বক্তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা, উপলব্ধির কথা, পরিকল্পনার কথা বলে—বসন্ত শোনে, অভিজ্ঞতার পুঁজি বাড়ে। সঠিক চিত্র তুলে ধরা বসন্তের লেখার মূলধন।

কিউ নিজে আজ অনেক কথা বলেছে, কথা বলতে খাওয়া শোওয়া গান শেখা, চণ্ডীর গল্প সনাতনের গল্প ইত্যাদি। বলার মত কোনো কিছু ছিল না, তবুও বলেছে, আসলে বসন্তের সাথে কথা বলা, দীর্ঘসময় বসন্তকে কথায় কাছে পাওয়ার ইচ্ছা থেকেই কথা বলা। বেশ ক'দিন হল সে গেছে, তবুও মনে হয় যেন কতদিন বসন্ত নেই। বসন্তকে কাছে পাওয়ার অধীর প্রতীক্ষা। কথা বলে অন্ততঃ কিছুটা মানসিকতৃপ্ত কিউ।

সকাল থেকেই যে কারণে খুশি সে। গুন গুন করে সুর ভেজেছে, বার বার হারমোনিয়াম খুলেছে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেছে। বাথরুমে ঢুকে দীর্ঘতর সময়

নিয়ে স্নান করেছে। বাথরুমের আয়নার সামনে নিজেকে নগ্ন করে ঘুরে ফিরে মগ্ন হয়ে অবলোকন করেছে। মনে মনে হিসাব করেছে তার কত বয়স হল—দশ বছর হয়ে গেল কলেজ ছেড়েছে। বাংলায় অনার্স নিয়ে সে যখন পাশ করে বেড়োয়, তখন তার বয়স বাইশ বছর অর্থাৎ সে বত্রিশ বছরের মহিলা। যুবতী সে. যৌবন ঝলমল। শরীর, হাত. পা, কোমর বুক, মুখের চেহারায় যৌবনের দীপ্তি। যদিও প্রথম যৌবনে শরীরের বদল হয়েছে, নেই সে উদ্ধত, কচি কোমলতা হাতে পায়ে কোমড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে মেদ ও মাংস, সে পৃথুলা নয়. তন্বী নয়, সুগঠন, দুটি পা ভরাট, কোমড় স্ফিত. বক্ষ শিথিল কিছুটা অবনত, গাল ভরাট. চোখের দৃষ্টিতে চপলতা নেই আছে মদিরতা। কিউ একজন পরিণত সুন্দরী নারী।

সবে স্নান সেরে অত্যন্ত প্রফুল্ল অন্তরে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, কলিং বেলের শব্দ। চণ্ডী বাজারে গেছে, ফেরার পথে মিষ্টি কিনে ফিরবে. নিচে কারোর সাথে গল্প করবে—সাধারণতঃ ফিরতে দেরি হয়—এত তাড়াতাড়ি ফিরবে? হাউস কোট গায়ে ঝুলিয়ে দরজা খোলে—মাথার চুল ছড়ানো, শরীর বসন শূন্য। দেখে চমকে ওঠে চণ্ডী নয়, তার গানের গুরু, সনাতন দাস, আজ তার আসার দিন নয়। লজ্জা পায় সনাতন দাস, থতমত খেয়ে বলে—'আমি পরে আসছি'

—না-না বসুন সনাতনদা, আমি এক্ষুনি জামা কাপড় পরে রেডি হয়ে নিচ্ছি।

সনাতন দাস লিভিং রুমে সোফার ওপর পাখা খুলে বসে, পরনে পাজামা ও পাঞ্জাবি। কিউ শোবার ঘরে পোশাক পরে নেয়। খাটের ওপর হারমোনিয়াম নিয়ে বসতে যাবে, কলিং বেল. চণ্ডী ফিরেছে। চণ্ডীকে চা করতে বলে।

—কলেজের ছুটি। ভাবলাম কেমন উন্নতি হচ্ছে দেখে আসি। কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

অত্যন্ত বিনয় সহকারে কথা কয়টি বলে মাস্টার মশায়।

—না-না, তা কেন হবে।

গত রবিবারে দেওয়া স্বরলিপিগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গায় কিউ। মাথা নিচু করে শোনে সনাতন। এখনো তার জড়তা যায়নি।

চণ্ডী চা ও প্যাটিস দেয়। কিউ গান বন্ধ করে

—চা খেয়ে নাও সনাতনদা।

—খাবো। তুমি গাও না।

—গাইছি! তোমার চা খাওয়া হোক। তারপর গাইছি।

প্যাটিস ও চা খায় সনাতন। এখনো সে "মাস্টার" হয়ে ওঠেনি। গান শেখায় দুটি শিশুর পর তৃতীয় জন লাবণীদি। সনাতনের কাছে বয়সে বড় লাবণীদিকে শেখাতে অসুবিধা হচ্ছে। সে লাবণীদির সামনে বসতে লজ্জা পায়, মুখ তুলে চোখের দিকে দেখতে পারে না—যা কিছু শেখানো মাথা নিচু করে। চা খেয়ে আর দু'একবার অভ্যাস করিয়ে, খাতা ও হারমোনিয়ামে নতুন টাস্ক দিয়ে গেয়ে বুঝিয়ে মাস্টার মশায় চলে যায়। গেট বন্ধ করে চণ্ডী বলে।

—তোমার হবে দিদি, খুব ভালো হবে।

—নাও, তোমাকে পাকামি করতে হবে না। কিছু খাবার থাকলে দাও, ব্রেকফাস্ট হয়নি।

চণ্ডী দ্রুত কিচেনে ঢুকে ডিম টোস্ট করে টেবিলে রাখে। কিউ সস্ ঢেলে টোস্ট খেতে খেতে খবরের কাগজে চোখ বুলায়। নিত্য দিন একই খবর। রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীদের দেশের মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রতিশ্রুতি দান, দু চারটে উপদেশ, একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে কুৎসা, উগ্রপন্থী কিছু কার্যকলাপ, দুর্ঘটনার বিবরণ ইত্যাদি। এক ঘেঁয়েমি খবর পড়তে মন লাগে না। এক জায়গায় ছোট করে হায়দ্রাবাদের সেমিনারের খবর স্থান পেয়েছে, কারণ সেই সেমিনারে স্থানীয় এক মন্ত্রীর উপস্থিতি এবং দেশবাসীর প্রতি শিশুমৃত্যুর হারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সরকারের সমস্যা সমাধানে ভূমিকার বিস্তৃত বিবরণ। বসন্তের নাম উল্লেখ হয়েছে মাত্র।

ব্রেকফাস্ট শেষ হলে কম্পিউটার খোলে কিউ, চণ্ডীকে দেরী করে রান্নার নির্দেশ দেয়। কারণ ব্রেকফাস্ট খেতে দেরী হল। লাঞ্চ খেতেও দেরী করতে হবে। প্রথমেই মেল দেখে, কোনো চিঠি আছে কি-না। ইন্ বক্সে একটি মাত্র চিঠি এসেছে লণ্ডন থেকে—বসন্তের একটা আর্টিকেলের জন্য সম্পাদক মহাশয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সাম্মানিক হিসাবে বড় অঙ্কের টাকা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি। কুমায়ুনে যাবার আগে কিউ এই আর্টিকেলটা মেল্ করেছিল। উন্নত দেশে শিশু শ্রমিকদের দুর্দশার কাহিনী, সরকারি তথ্যের ওপর নির্ভর করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবং প্রতিকার হিসাবে কতগুলি কর্মসূচীর পরিকল্পনা। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব এর মূল কারণ, রাষ্ট্রীয় স্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত না করা যাচ্ছে এবং দায়িত্ব গ্রহণ না করা যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এ জাতিয় মানবিক সমস্যা দূর হবেনা। বসন্তকে জানিয়ে দেবে।

ক'দিন ধরে শরীর ঠিক যাচ্ছে না। কুমায়ুন থেকে ফিরেছে প্রায় দেড় মাস হল। বসন্ত গেছে তাও মাসখানেক হতে চলল, ইদানিং খুব দুঃশ্চিন্তায় আছে—এক জাতিয় টেনশান, ভয় আছে, অপবাদের আশঙ্কা আছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আছে, আবার কখনো কখনো কিছুটা তৃপ্তির আমেজও আছে। আবেগ জড়িত হয়ে যা ইচ্ছা করা যায়, কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হলে আবেগ মুহূর্তে উধাও হয়ে আতঙ্ক মনকে গ্রাস করে। কি করবে না করবে সে কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছে না। সে জানে না তার কি করা উচিৎ। কোথায় যাবে? কার সাথে পরামর্শ করবে? এ সময় বসন্তের দরকার ছিল। বসন্ত পাশে থাকলে সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে যায়। আপাততঃ বসন্ত অনেক দূরে, প্রচণ্ড ব্যস্ত, টেলিফোনে সব কথা বলা যায়না, বলা ঠিকও নয়। মাথায় সংশয়ের পোকা যা ভাবছে নাও হতে পারে। টেন্‌শানে অনেক সময় অনিয়মিত হয়, বলা যায়না হয়তো তার চিন্তা অর্থহীন এবং অনাবশ্যক। হয়তো দু-চার দিনের মধ্যে তার স্বাভাবিক পিরিয়ড হয়ে যাবে, টেনশান দূর। এসব কথা টেলিফোনে বসন্তকে বলা ঠিক নয়। অবশ্য তার অনুমান বা সংশয় সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ কুমায়ুনে সে তো কোন এক মুহূর্তে এমনি কিছু হৌক স্বপ্ন দেখেছিল, মাতৃত্বের বাসনা তার মনে উদয় হয়েছিল, মানব নয়, অন্য কেউ নয় বসন্তকে তার সন্তানের পিতার আসনে বসাতে চেয়েছিল। তাই বলে চাইলেই পাওয়া যাবে—এ কথা তো একবারও সুনিশ্চিত ভাবে ভাবেনি। তাহলে তো কিউ সংগীত শিক্ষা শুরু করতো না। কিউ জানে বসন্তকে সে তার সর্বস্ব উজার করে দেয় এবং বসন্তকে গ্রহণ করে প্রাণ ভরে। শুধু আজ নয় দীর্ঘদিন তাদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক বিদ্যমান কিন্তু কোন দিন হটকারি ছিল না সে। হঠাৎ কুমায়ুনে কি যে হল, মনে হলো সে মা হতে পারবে না কেন? সে তো কোনো অংশে কম নয়, বসন্ত হতে পারে রুচী

আন্টির স্বামী, রোহিতের বাবা কিন্তু বসন্তের সাথে তার সম্পর্ক কম কিসে! বসন্ত তার নয় কেন? বসন্ত তারই তো। সেই চিন্তা থেকেই কি এই পরিণতি। চিন্তিত কিউ, বিমর্ষ কিউ। পরামর্শ করার কেউ নেই। ডাক্তারের কাছে যেতে পারলে হতো। কোন ডাক্তার কিরকম ডাক্তার, কি বলবে ডাক্তার কে? বরং আরো কিছু দিন অপেক্ষা করা উচিৎ। বিধান নগরের মাকে—সেখানে সম্পর্ক মানবদার সাথে সাথে চুকে গেছে। হবে না। অসম্ভব! মানবদা, মানস আঙ্কেল, মা ও মালবিকা; কোন সম্পর্ক নেই ওদের সাথে। সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন।

সনাতন গান শিখিয়ে চলে গেছে। কিছু সময় আগেও মনে খুশির জোয়ার ছিল। গান শিখে, মেল দেখে ডাউন লোড করেছে, হঠাৎ আশঙ্কার কথা বা দুর্ভাবনা মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিউ বিমর্ষ। মানসিক দিক থেকে অস্থির।

টেলিফোন বাজছে। আলসেমি জড়ানো মনে মন্থর পায় টেলিফোন ধরে। টেলিফোনের রিং থেমে যায়, হ্যালো...হ্যালো বলে কিউ। অপর প্রান্ত থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। টেলিফোন রেখে দেয় কিউ। রং নাম্বার হবে। কিছু সময় পরে আবার টেলিফোনে রিং হয়। হ্যালো বলার পর সেই একই অবস্থা, অপর প্রান্ত নিরুত্তর, টেলিফোন খারাপ হয়ে গেল না তো। কিউ এবার নিজেই প্রশ্ন করে, মনে হচ্ছে লাইনে কেউ আছে। হ্যালো, কে বলছেন? কিছু বলার থাকলে বলুন। এটি ডঃ বসন্ত বাসুর বাড়ি। উনি বাড়িতে নেই। আমাকে বলতে পারেন। অপর প্রান্ত থেকে খুব আস্তে নারীকণ্ঠে উত্তর মেলে—হ্যালো—

—হ্যাঁ বলুন। কে বলছেন? এটি ডঃ বসন্ত বাসুর অফিস।

—কে লাবণীদি?

—হ্যাঁ, লাবণী বলছি, বলুন।

—আমি...আমি মালবিকা—মালু বলছি।

আশ্চর্য্য হয় লাবণী ওরফে কিউ। মালবিকা—মালু-দীর্ঘ দশ বারো বছর পর, অসম্ভব মনে রাখা ওর গলার স্বর, মনে করার চেষ্টা। আগের সেই মালু ফ্রক পরত, সাদা স্কার্ট ব্লাউজ পরে স্কুলে যেতো। ছোট মেয়ে। হঠাৎ ফোন করলো কেন? কোনো দুঃসংবাদ! সে সংবাদ লাবণীকে দেবে কেন? লাবণী তাদের কে? কেউ নয়। তবুও হতবাক অবস্থা কাটিয়ে বলে।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ আমি লাবণী বলছি। কে তুমি মালবিকা? কি বলছিলে বলো। কেমন আছো? তোমরা সব ভালো?—বসন্ত কাকু নেই। কোনো দরকার আছে?

—বলছি, বলছি। ভালো আছি। ভয় নেই, ঠিক আছি। বসন্ত কাকু নেই, ভালোই হয়েছে। তোমাকে চাই, তোমার সাথে কথা বলা যাবে।

—আমার সাথে?

পুনরায় আশ্চর্য্য হয় কিউ। মালবিকা, মানবের ছোট বোন, বয়সে অনেক ছোটো। মনে আছে ছোটবেলায় দিদি অর্থাৎ লাবণীকে হিংসা করতো সে। শৈশবে বোনে বোনে অল্প স্বল্প হিংসা, রাগ, ভালবাসা যেমন হয় আর কি। কথা বলতে চায়তো না। মা বারবার বললে দু একবার ডাকতো লাবণীদি বলে অন্য সময় মুখ ঘুরিয়ে থাকতো। লাবণী যেন ছোট মালবিকার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সেই মালবিকা কেন কথা বলতে চায়, কোনো দুসংবাদ নেই তো!

—ঠিক আছে। বলো—

—তুমি রাগ করেছো? করবেই তো। ভালো আছো লাবণীদি?

—ভালো। তুমি?

কেন বাবা গায়ে পড়ে এসব প্রশ্ন। তোমরা সকলে মিলে আমায় শাস্তি দিয়েছো, তবুও শাস্তি হয়নি, মনে মনে বলে কিউ। তবুও কথার পিঠে কথা বলতে হয়, টেলিফোন ছেড়ে দেওয়ার মত অসভ্যতা করতে সে জানেনা।

—খুব ভালো।

—বেশ।

—দাদা যা পারেনি, আমি তাই পেরেছি। দাদাটা বড় ভিতু আর ভাল মানুষ, ওর দ্বারা কিছু হবে না—বাবা মার মত ছিল না আমার বিয়েতে, তবুও আমি আমার পছন্দ মত বিয়ে করেছি।

—যাক্ ওসব কথা, আমি শুনতে চাই না।

—ঠিক বলেছো।

—আমি বলছি, দাদা যা পারেনি, আমি পেরেছি। আমি যাকে ভালোবেসেছি, তাকেই বিয়ে করেছি।

সুকান্তের সাথে কলেজে কিভাবে আলাপ, তারপর বাড়িতে সুকান্তের কাছে থেকে পড়া বোঝানোর সাথে সুকান্তের প্রেমে পড়া, কাউকে না জানিয়ে সুকান্তের সাথে বিয়ে করা এবং সুকান্তের বাড়িতে বৌ হয়ে যাওয়া, সুকান্তের বাড়ি ঘর, গ্রাম ইত্যাদির কথা বলে সে লাবণীকে। কেন বলে লাবণীকে, লাবণী জানে না। এ বলার কারণ কি? কেউ কি তাকে শিখিয়ে দিয়েছে?

—বেশ, এখন কেমন আছো?

—খুব ভালো, লাবণীদি। গ্রামের বাড়িতে সামান্য অসুবিধা হচ্ছে বটে, অভ্যাস হয়ে যাবে। শহর থেকে গ্রামে, বদ্ধ মাপা জীবন থেকে মুক্ত প্রান্তর, অসুবিধা হলেও ভালো আছি। অন্ততঃ যাকে ভালোবেসেছি, তাকে স্বামী হিসাবে পেয়েছি, সেখানেই সংসার পেতেছি—এও তো স্বপ্ন। কলের জল নেই, পাতকুয়া আছে, পাশে পুকুর আছে, পাতকুয়ার জল খাই, পাতকুয়ার জল তুলে চান্ করি, দরকার হলে পুকুরের জলেও চান করা যায়, অনেক মেয়ে বৌরা করে। পুকুরে ডুব দিতে ভয় করে, চেষ্টা করেছি, ভয় কেটে যাবে। আমাদের বাড়িতে হাঁস আছে, মুরগি আছে, ছাগল, গরু, শশুর মশায় লাঙল দিয়ে নিয়মিত চাষ আবাদ করে; সুকান্ত করে না বা পারে না, করলেও কোনো ক্ষতি ছিল না।

—তোমার দাদা জানে?

—বাবা মাকে বলেই তো এসেছি। দাদার সাথে কথা হয়নি, সে বেচারা নিজের ব্যথায় জর্জর, তার ওপর নতুন করে তাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি, বলো?

—বাড়ি যাও?

—যাই তো, প্রতি সপ্তাহে গিয়ে বাবা মাকে দেখে আসি, মাকে না দেখলে কষ্ট হয়। মায়ের বড় কষ্ট, মায়ের কেউ নেই না!

—কেন, মানস অঙ্কেল—

—কে বাবা, বাবা, নিজে দিন রাত্তির কাগজ নিয়ে বসে আছে, অভিব্যক্তিহীন

চেহারা। কষ্ট মা করেছে, করছে, সারা জীবন সংসার ঠেলেছে, শেষ বয়সে একটু আরাম, একটু সুখ—কপালে নেই। দিনরাত কান্না। বড় কষ্ট হয়—মারা যাবে যে কোনো দিন। মাকে না দেখে থাকতে পারি না, যাই---

—যাবে না কেন? নিশ্চয় যাবে, যাওয়া উচিৎ—

—মাকে দেখলে চিনতে পারবে না, ভীষণ রোগা হয়ে গেছে শোকে দুঃখে—

—সে জন্যই তো বলছি, যাবে, মাকে কষ্ট দিও না।

কি দরকার ছিল এসব কথা বলার। মালবিকার মা, মালবিকা বুঝবে, কিউ-এর তাকে বোঝানোর কি আছে! মনে মনে ভাবে, আবার কথার পিঠে কথায় কথায় নিজের মত জাহির করে।

—সন্তান মাকে ত্যাগ করতে পারে, মা সন্তানকে ত্যাগ করতে পারে না।

—বেশ কথা বলতে শিখেছো তো, তুমি ত্যাগ করলে কেন?

--আমি মোটেই ত্যাগ করিনি। বিয়ের পর কি বাবা মায়ের কাছে থাকা যায়? আমি থাকি কি করে বলো? আমি কথা দিয়েছি প্রতি সপ্তাহে দেখতে যাবো। যাই, সুকান্ত বাধা দেয়না। সুকান্ত সে জাতিয় ছেলে নয়।

—মাকে বলেছো, সুকান্ত ভাল ছেলে?

—বলেছি। মা শুনতে চায় না। আমার কথা ভেবে কেঁদে কূল কিনারা পায় না। বার বার বলি ভালো আছি, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, মা মানতে নারাজ। বিশ্বাস করে না, আমার গায়ে হাত বুলিয়ে পরখ করে, বলে আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি, আমার গায়ের রঙ কালো হয়ে যাচ্ছে। অথচ মোটেই নয়। আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে। ঘরের দুধ, ঘরের হাঁসের ডিম, ভেড়ির টাটকা মাছ, চিড়ে মুড়ি, দুবেলা ভাত— রোগা হওয়ার চান্সই নেই।

—খুব ভালো। ভালভাবে থেকো। সুখি হও!

—তুমি আশীর্বাদ করছো লাবণীদি!

—আমার মত মেয়েরা কি আশীর্বাদ করতে পারে! আমি কামনা করছি। আমি নিজেই তো অভিশপ্ত!

—ঐ রকম বাজে কথা বলবে না। অভিশাপ, অভিশপ্ত—এই সব বাজে কথা। হতে পারে তুমি কষ্টে আছো। কষ্ট মানেই অভিশাপ নয়। তবে দাদার কেন কষ্ট। দাদার তো সকলে আছে, বাবা মা বৌ, তবে দাদার এতো কষ্ট কেন? কিসের অভিশাপে?

—থাক্, ঐ সব কারণ জানার দরকার নেই। ঐ প্রসঙ্গ থাক্।

—ঠিক বলেছো লাবণীদি, ওটা ক্লোসড্ চ্যাপ্টার।

—ক্লোস্ড নয়, ডেড্।

—রাইট। এই জন্যই তো তোমাকে ফোনে যোগযোগ করলাম। আমি, আমার বাবা মাকে জানি, ওরা পুরাতন, সেকেলে লোক। ওদের মানসিকতা পুরানো কালের, আজকার চলে না। কবে কোন সেন রাজারা জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করেছিল, সৃষ্টি করেছিল মানুষে মানুষে বিভেদ আমি ঐ সব মানি না, জাত-বিচার করে মানুষকে ছোট বা বড় হিসাবে বিচার করা যায় না। মোট কথা ছোট জাত, বড় জাত আমি মানি না।

—যাক্ মালু, অনেকক্ষণ হয়ে গেল—

—ওমা, তোমার সাথে টেলিফোনে অনেক সময় বক্‌বক্ করে চলেছি। কি করবো বলো, এসব কথা তোমাকেই বললাম, কাউকে বলিনি। মনটা বলার জন্য ছট্‌ফট্

করছিল, তোমাকে ভুলিনি, প্রায়শঃই তোমার কথা মনে পড়ে, মনে হলো একমাত্র তোমাকে বলা যায়, তুমি অন্ততঃ বুঝবে। আমার কপাল ভালো, তোমাকে ফোনে পেয়ে গেলাম। মন খুলে কথা বলে বড় শান্তি পেলাম। মনে হলো, তুমি রাগ করোনি। তুমি রাগ করোনি তো লাবণীদি? খারাপ লাগলো?

—না।

মালবিকা টেলিফোন ছেড়ে দেয়। অন্য কোনো কথা বলেনি। এতক্ষণ মালবিকার কাহিনী শোনার পরও কিউ বুঝতে পারে না, মালু হঠাৎ তার সাথে কথা বললো কেন, কেন তার সাথে কথা বলার ইচ্ছা হলো মালবিকার? তবে কি মালবিকা এবং ওরা এখনো লাবণীকে ভুলে যায়নি, বরং মনে হচ্ছে তাদের স্মৃতিতে লাবণী আজো উজ্জ্বল। মালবিকা সুকান্ত নামে অন্য জাতের একটি ছেলেকে বিয়ে করেছে, ডেস্টিনেশান—কার যে কোথায় ডেস্টিনেশান হবে—আগে থেকে প্রেডিক্ট করা যায় না। গভীর প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে মনের কথাগুলো নির্গত হয়। ঘড়ি দেখে, প্রায় একঘণ্টা ফোনে মালু তার সাথে কথা বলেছে। আজ আর ছোটো নেই, সাবালিকা, বিবাহিতা, অন্য পরিবারের বৌ এত সময় কথা বলে গেল, বুঝতে পারে না। ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজে। চণ্ডীকে রান্না বসানোর নির্দেশ দেয়।

কম্পিউটার বন্ধ করে, লম্বা এক গ্লাস জল খায়, গলা শুকিয়ে গেছে। মাথার মধ্যে মালবিকা ঘুরছে। খবরের কাগজ খোলে, খবরের কাগজে মন লাগছে না। মালবিকার ফোন সেই অতীতের পাতাগুলো, যেগুলো আচ্ছাদনের আড়ালে লুকানো ছিলো, খুলে দিলো। যেগুলো খোলা নিষেধ, সে ঠিক করেছিল খুলবেনা। মনে পড়ছে মানস আঙ্কেল, মা এমন কি মানবকে নিয়ে সেই অতীত—শৈশব, কৈশোর, যৌবনে ঐ পরিবার, সেখানে, যে পরিবেশে সে বড় হয়েছে—সেই ছোটো মালবিকা—ফ্রক পরতো, স্কুলে যেতো— সে বিয়ে করেছে। সুকান্ত নামে পশ্চিমবাংলার দক্ষিণপ্রান্তে, সমুদ্রের ধারে এক অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলের সাথে মালবিকা বিয়ে করেছে, যার মা অর্থাৎ মালবিকার মা তখনকার দিনে বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার, এক অধ্যাপকের মেয়ে, যার বাবা ছিলেন তখনকার দিনে পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার, মেধাবী ছাত্র, সরকারি পদস্থ অফিসার ছিলেন, বর্তমানে মোটা টাকা মাসে মাসে পেন্‌শান পান, বিধাননগরে প্রাসাদ সমান আধুনিক অট্টালিকা।

কোথায় থেকে কি হয়, কে কিভাবে জীবনের রূপরেখা রচনা করে, রচনার ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি কিম্বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য ভুল মানুষকে কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়, বলা যায়না। এই যে আমি—আমার মানবদার সাথে বিয়ে হতে পারতো, সংসার হতে পারতো—সে সংসার সুখের হতো না দুঃখের হতো, বলা মুশকিল, কলকাতা ছাড়তে হতে পারতো, হতে পারতো বসন্ত বা রুচী আন্টির আশ্রয়ে এসে শুধু দুঃখকে সঙ্গে নিয়ে বেঁচে থাকতে হতো না, বসন্তের সান্নিধ্যে, বসন্তের ঐকান্তিকতায়, বসন্তের ভালোবাসায় নতুন করে আনন্দের বা কল্পনার বা স্বপ্নের দোলায় মন ভাসতোনা। এর ওপর শরীর নিয়ে সংশয়, নতুন এক সম্ভাবনায়, নতুন এক ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হতো না। জানি না অতীত মধুর ছিলো না ভবিষ্যৎ মধুর হবে। প্রেমিক হিসাবে বসন্ত অনেক অনেক গুণ বড় এবং নির্ভরশীল—এমনি হাজারো কথা! যার আগা নেই, গোঁড়া নেই—আবোল তাবোল, আকাশে ভেসে বেড়ানো চঞ্চলা মেঘের মত—নানা বর্ণের আশ্চর্য্য মেয়ে ঐ মালবিকা—কি করে এমন দুঃসাহসী হল সে? কিসের আশায়, কোন

স্বপ্নে সে উদ্বেল হয়ে নতুন এক জগতে প্রবেশ করার মত মনের জোর জোগাড় করতে পারলো! সেই ছোট মেয়ে, আদুরে মেয়ে, লাবণী যাকে জন্মের পর থেকে কোলে নিয়ে ঘুরতো। মনে আছে মা অনেক সময় শিশু মালবিকার কান্না থামাতে পারতেন না, হাতে কাজ,—মানস আঙ্কেলের অফিসের তাড়া, মানব স্কুলে যাবে—রান্না বান্না, মানবকে স্নান করানো, সাজানো, টিফিন করা, কৌটোয় ভরা, গুছিয়ে দেওয়া, সেই সময় শিশু মালবিকার দায়িত্ব নিতো এই লাবণীদি।

সেই মালু বড় হল, স্কুল শেষে কলেজ। কলেজে পড়তে পড়তে দক্ষিণ বাংলার সুকান্তের সাথে বিয়ে, স্বজাতি নয়, সমান স্ট্যাটাস্ নয়, জাতে নিচু, চাষার ছেলে, যে বাড়িতে হাঁস আছে, গরু আছে, ছাগল আছে, যার শশুর নিজের হাতে চাষ করে, সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়—ভাবা যায়? সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আর মালুই বা লাবণীকে ফোন করলো কেন?

—গর্বে না সংশয়ে? না হটকারিতার জন্য ভবিষ্যতের আশঙ্কায় না আফ্‌শোষে না মানসিক সান্ত্বনা পাওয়ার ইচ্ছায় না সত্যই নিজের উৎসাহে লাবণীকে উৎসাহিত করার প্রয়াসে—বুঝতে পারে না কিউ।

চুপচাপ বসে আছে কিউ। চণ্ডী কিচেনে। কিউ-এর মনে ঝড়। ফেলে আসা মানস আঙ্কেলের বিধান নগরের বাড়ি আর সেই বাড়ির চরিত্র সমূহ। মনে পড়ছে সেই বিদায় মুহূর্তের কথা। কি করুন সে যাত্রা, অবর্ণনীয় দুঃখের পরিবেশ—যে বাড়িতে, যাদের আশ্রয়ে তিনমাসের শিশু, পরিত্যক্ত শিশু পিতামাতার আশ্রয়ে পালিত হয়েছিল, নির্দোষ যুবতী, আশৈশব লালিত স্বপ্ন, যৌবনের প্রণয় বিহ্বল বাসনা বিসর্জন দিয়ে বিতাড়িত হতে হয়েছে, তাদের দ্বারা যারা তাকে ভালবেসেছে, স্নেহ দিয়েছে, স্নেহ বণ্টনে কার্পণ্য করেনি, তারাই সেদিন অনিশ্চিতের মুখে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে—সেদিনই সে স্থির করেছিল, এই পরিবারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক সে রাখবে না, ভাববেনা ওদের কারো কথা, কোনো কথা। কিন্তু পারেনি। আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ তার অন্তরকে অনুশাসনে আবদ্ধ করতে পেরেছে?—সেও পারেনি। অতীত বারে বারে এসে তার বর্তমানকে আঘাত করেছে, আক্রমণ করেছে, বিষাক্ত করেছে, সে হাঁসতে ভুলে গেছে। একমাত্র কান্না ছিল তার চিরসাথী। ক্ষত বিক্ষত লাবণী আজো অতীতের কথা ভেবে তীব্র কষ্ট অনুভব করে। বেশ ছিল সে, মালবিকার ফোন তার মনের ভারসাম্যকে আঘাত করে, আলোড়ন সৃষ্টি করলো। তার জমে থাকা বরফশীতল অতীত গলতে শুরু করেছে। প্রবাহিত হচ্ছে হৃদয়ে, যে শীতলতায় উপশম নেই বরং দাহ আছে। জ্বালা আছে—এ যেন সেই বিষাক্ত ভেষজ, যার স্পর্শে জ্বলুনি আছে, কিউ জ্বলছে, রক্তাক্ত হচ্ছে তার অন্তরলোক।

মনে পড়ছে মানবদার সাথে সুন্দরতম মুহূর্তগুলি, আজো যা রোমাঞ্চ জাগায়, মানস আঙ্কেল কি অমানুষ!—কি আজে বাজে ভাবছে সে মানস আঙ্কেল অমানুষ, মানবদা কাপুরুষ বা পুরুষত্বহীন। ছিঃ এসব ভাবতে নেই, সে তো অমানুষ নয়—সে তো কুশিক্ষা পায়নি। বরং তার জন্মদাতারা তার এই অবস্থার জন্য দায়ী, তাদের অন্যায়, তাদের দায়ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে কিউ দিতে চায়না। কে জানে সে অদেখা জন্মদাতারা পৃথিবীতে আছে কি-না, না পরলোক গমন করেছেন। তারা যদি জীবিত থাকেও, তারা জানে না তাদের সন্তান লাবণী খাতুন, যাকে বসন্ত কিউটি বলে কাছে

টেনে নিয়েছে। কি অদ্ভুত এ জীবন—পশুর মত, যেমন পশুরা বড় হলে জানতে পারে না কে তার জন্মদাতা বা জন্মদাত্রী। স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করার মত সাহস তার ছিল না বলেই সে আজো বেঁচে আছে। কিউ তাই নতুন করে স্বপ্ন দেখছে। এক বুক দুঃখ নিয়েই সে স্বপ্ন দেখছে, আবার এর মধ্যে অজানা আশঙ্কা, এবং খুশির দোলায় কিউ দোদুল্যমান। মেয়ে সে—জানে না, হয়তো মেয়ে বলে তার এ বিধিলিপি।

সাথে সাথে মায়ের, অর্থাৎ মালবিকার মায়ের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার কথা শুনে খারাপ লাগছে। মনে হয় কি অসহায় তিনি, যিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ, যার সুন্দর শিক্ষিত স্বামী আছে, উজ্জ্বল ছেলে আছে, সুন্দরী মেয়ে, সোনার সংসার—একে একে তার আপনজনেরা দূরে সরে গেল বুক ভরা অভিমান নিয়ে, তারা যে সুখে আছে তা নয়, তারা সুখে নেই, কাঁদাচ্ছে বৃদ্ধা মাকে তার ছেলেমেয়ে। কি অসহায়, বেদনাময় অবস্থা।

না, আর না। সে এসব ভাববে না। সে অন্য কিছু ভাববে। উঠে পড়ে। পাঁয়চারি করে। রান্না হয়ে গেছে। টেবিলে খাবার দেয় চণ্ডী। বেসিনে হাত ধুয়ে খাবে, ফোন বাজে, ফোন ধরে—এবার বসন্তের ফোন। রোহিতের বিয়ে বুধবার, অর্থাৎ দুদিন পর। ওর শশুর মশায়ের ফ্ল্যাটেই হবে—ওর শশুর মশায় ব্যবস্থা করেছে। বসন্তরা থাকবে. রোহিতের অফিসের এবং বাইরের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আসবে, রোহিতের শশুর বাড়ির আত্মীয় পরিজন। রেজিষ্টার আসবে—বাড়িতেই ম্যারেজ রেজেষ্ট্রি হবে।

জনা পঞ্চাশ লোক হবে। রিসেপ্‌শান হবে এক তিনতারা হোটেলে। কিউ কি প্লেনে আসতে পারবে? রোহিতের ইচ্ছা। রোহিত চায় তার দিদিও তার বিয়েতে থাকুক, সে ভেবেছিলো, তার মা বা আমি তোমাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছি। পরে যখন জানতে পারে যে আমরা সে ব্যবস্থা করিনি তখন আমায় তোমাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে বললো।

রোহিতের বিয়ে হচ্ছে সে জানে, রোহিতের বিয়েতে যাওয়ার মনে মনে আশা ছিল, আবার নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে সে আশা ত্যাগ করেছিল। এখন বসন্ত জানতে চাইছে, সে যেতে পারবে কি-না, রোহিত চায়. তার দিদির উপস্থিতি, রোহিত চাইবেই সে জানে, রুচী আন্টি নাও চাইতে পারে। শরীর ভাল নেই, মাথা ঘুরছে, পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে। কি হবে না হবে জানে না—যায় কি করে? বসন্তকে না বলে দেয়। আর বেশি কথা হয় না। বড্ড ব্যস্ত বসন্ত। কিউ কি দুশ্চিন্তায় ভুগছে বসন্ত জানে না। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে কিউ বড় উদ্বিগ্ন। রোহিতের আন্তরিকতায় সে মুগ্ধ, কিন্তু নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে লজ্জিত ও দুঃখিত।

খাবার টেবিলে বসে, চণ্ডী অপেক্ষা করছে। ভাবনা চিন্তা যাই থাক, নিত্যকর্মগুলো থেমে থাকে না। রোহিত তার কিউদিদিকে আজো মনে রেখেছে!

সপ্তদশ অধ্যায়

রাত্রে ঘুম হচ্ছে না ঠিক মত। ক'দিন ধরে চলছে একই অবস্থা। তন্দ্রাচ্ছন্ন মত, গভীর ঘুম হচ্ছে না। মাথার মধ্যে চিন্তার দাপাদাপি। সমস্ত দিনমান তো আছেই রাতেও নিস্তার নেই। শরীর খারাপ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে একমাস, পরের ডেটেও কোন লক্ষণ নেই। ধীরে ধীরে মনের কোণে যে বাসনার সৃষ্টি হলো তা আদি এবং অকৃত্রিম,

প্রাকৃতিক ধর্ম, চারা থেকে যখন বড় হয়, গাছের ফুল ফোটে, মৌমাছি আসে, প্রজাপতি উড়ে উড়ে মধু খায়, পরাগ মিলন হয়, গাছ ভরে ফল আসে গাছের আনন্দে। লাবণী প্রকৃতি, ইচ্ছা তার অতি প্রাকৃতিক।

যে বাসনা বা ইচ্ছা তার কোনোদিন ছিলনা, কুমায়ুনের অনুকূল পরিবেশ, নতুন ভাবে আত্মোপলব্ধি করার ফল স্বরূপ কিউ-এর বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা এবং নারীত্বের সেই আদিম বাসনা অর্থাৎ মাতৃত্বের ইচ্ছা বা বাসনা তার মধ্যে আবির্ভাব হল, সেই বাসনার বিরুদ্ধে চলার এতদিনের প্রয়াস হঠাৎ নিস্ফল হয়ে গেল, মা হওয়ার ইচ্ছার কাছে দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে সমর্পণ করলো কিউ। শুধু সমর্পণ করা নয় সে যেন ইচ্ছা পূরণের দ্বারা প্রচণ্ড তৃপ্ত হল। আযৌবন তৃষ্ণার্ত কিউটির তৃষ্ণা নিবারণে হল অবর্ণনীয়, অনাস্বাদিত তৃপ্তি, প্রতিটি রোমকূপে জাগলো শিহরণ, প্রতিটি তন্ত্রীতে জাগালো সংগীতমুখর মূর্ছনা, মনে হল যেন এতকাল কিউ তার এই একমাত্র বাসনার পূরণের জন্য অপেক্ষা করছিল, হৃদয় ও শরীর এক সাথে গেয়ে উঠল—স্বার্থক জনম মম।

এটাই তো বাস্তব, চিরন্তন সত্য, ইচ্ছার মৃত্যু নেই, কামনা অন্তহীন, স্মৃতি চঞ্চলা, স্মৃতি যতই কঠোর হৌক, দুঃখজর্জর হৌক, নতুন সুখের স্পর্শে, স্মৃতি মুখ লুকায়, কিউ চঞ্চলা হল, আনন্দে বিহ্বল হলো। কুমায়ুনের সবুজে ঢাকা পাহাড়, পাহাড়ি প্রকৃতির ন্যায় সরল মানব কুল, পাহাড়ে পুষ্পরাজি এবং তার সুবাস কিউয়ের হৃদয়ের দুঃখ আবরিত করলো, শুরু হল কিউয়ের অন্তরের নাচের সাথে আনন্দের গান, স্বপ্ন ডানা মেলে শুরু করলো আকাশে পাড়ি দিতে।

—আকাশ-বাতাস-সৃষ্টির ওপারে। সদা সতর্ক কিউ স্বেচ্ছায় আচানক বিস্মৃত হল সতর্কতা, কিউ-এর এ স্বপ্ন ধীরে ধীরে পূর্ণতা প্রাপ্ত পূর্ণ চন্দ্র নয়, এ যেন কালো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পূর্ণ চন্দ্র, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় উড়ে যাওয়া মেঘের আড়াল থেকে আবির্ভূত হওয়া পূর্ণ চন্দ্র এবং তার প্রকাশে চমকিত মুগ্ধ প্রকৃতি। সে নেশা করলো প্রাণ ভরে, মদিরায় চুর হল সে চুর করলো বসন্তকে, মস্তিষ্ক থেকে সেই মদিরতা ধীরে ধীরে গ্রাস করলো পূর্ণযৌবনা কিউ এবং প্রায় বৃদ্ধ বসন্তের শরীরকে।—তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্ বাদ্য বাজলো সেই রাত্রে। শরীরে শরীরে মনে মনে কোষ হতে কোষে ছড়িয়ে পড়ল আনন্দের শিহরণ, শরীরের উত্তাপে উত্তপ্ত অবগাহনে পরম তৃপ্ত হল দুটি হৃদয়, তৃপ্ত হল অতৃপ্ত কিউ-এর আত্মা। এর পর হতে কিউ-এর অন্তরে এক অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছিল। কুমায়ুনের বাকী দিনগুলিতে কিউ দুঃখে নয় সুখের ভেলায় অবিরাম হেসে হেসে ভেসে বেড়িয়েছে।

এতদিনের বসন্তের সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে কিউ ফিরে পেয়েছে তার নারীসুলভ স্বাভাবিকতা। বাঁচবার পূর্ণ ইচ্ছার কুঁড়ি ধরেছে কুমায়ুনে। সেই ইচ্ছাকুঁড়ি থেকেই তো কলকাতায় ফিরে হারমোনিয়াম নিয়ে গান শেখার শুরু, তার থেকে বয়সে তরুণ গানের শিক্ষক সনাতন দাসের কাছে। সামনে বসে গলা সাধা, সময় পেলে গলা সাধা, হাঁটতে হাঁটতে চঞ্চলা পায়ে গলা সাধা—এ কোন্ কিউ, একি সেই স্বপ্ন কুঁড়ির বিকশিত হওয়ার উন্মুখ প্রয়াস! আবার কখনো উদ্বেগ। সে কি চায়? কি তার বর্তমান আর কিই বা ভবিষ্যৎ? মনে সংশয়, সে যদি মা হয়, যদি তার সন্তান হয় তার ভবিষ্যৎ কি? তার পরিচয় কি হবে? এ সংসারে মায়ের পরিচয়ে শিশুর পরিচয় স্বীকৃত নয়। যে আসবে,

তাকে মানুষ করবে কি করে? সে তো নিজে পরনির্ভরশীলা, অধিকারহীন, পরগাছার মত বসন্তের গলায় ঝুলে আছে, জানে না বসন্তের কাছে তার অস্তিত্ব কাঁটার মত কিনা! সে দিশহীনা। অজানা পথে যাত্রা শুরুর প্রথম পদক্ষেপ এবং অস্বাভাবিক।

বসন্তের সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন এই প্রথম নয়। দীর্ঘদিন ধরে উভয়ের মধ্যে মানসিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রথম দিকে, কিউ যখন অত্যন্ত শোকার্ত, মানস আঙ্কেলদের ব্যবহারে প্রচণ্ড মর্মাহত, বেঁচে থাকার ইচ্ছা যখন অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল, লাবণীকে যখন বসন্ত এবং রুচী আন্টির আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করলো এবং রুচী আন্টি এবং বসন্ত আঙ্কেল তখন যৌথভাবে আমার মানসিক ভারসাম্যহীনতা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়, ধীরে ধীরে আমার চোখের জল শুকোলেও মনের জ্বালা দূর হয়নি। রুচী আন্টি, তার কলেজ, রোহিতের পড়াশুনা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত, তার অবসর কোথায়! রুচী আন্টি কলেজে যেতো, রোহিত বাইরে পড়ে, ফ্ল্যাটে মানদা মাসি বসন্ত আঙ্কেল ও আমি। আমার অশ্রুবর্ষণ রুদ্ধ হলেও, আমি স্নান করতাম না, ভুলে যেতাম, স্নান করতে চাইতাম না। খাওয়া হতো না, খেতে ইচ্ছা করতো না, বসন্ত আঙ্কেল মানসিক ভাবে নিজেও ক্লিষ্ট, তার লেখা বন্ধ, বাইরের কোনো অনুষ্ঠানে যেতে চায়না, সে অন্ধকার দিনগুলোতে একমাত্র বসন্ত আঙ্কেলই যথার্থভাবে আমার পাশে দাঁড়ায়, নিজে হাতে খাওয়ানো, বাইশ, তেইশ বছরের এক সুন্দরী যুবতীকে স্নান করানো। গায়ে হাতে বুলিয়ে ঘুম পাড়ানো, পাশে বসে বই পড়ে, কাগজ পড়ে গল্প ও খবর শোনানো ইত্যাদি অত্যন্ত দরদি মন নিয়ে আর মানসিক কষ্ট লাঘব করতে এবং সুস্থ করে তোলার জন্য তার অবদান তুলনাহীন। আমি শুয়ে আছি, চোখে ঘুম নেই, রাত বেড়েছে, রুচী আন্টি ঘুমিয়েছে নিজের বিছানায়, রাস্তার যান চলাচল গেছে থেমে, মধ্য রাত অতিক্রান্ত, বসন্ত কখনো বসে কখনো পাশে শুয়ে আমার মাথার চুলে আঙুল বুলাচ্ছে, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, কপালে গালে পিঠে,—একজন মানুষ যে এমন নিষ্কাম ব্যবহার করতে পারে দিনের পর দিন, অকল্পনীয়। কিন্তু শরীর, তার একটা নিজস্ব ধর্ম আছে, সে কেন মানবে দীর্ঘদিন ধর্মবিরুদ্ধ এমত আচরণ। আমি অবাক হয়ে যেতাম, বসন্তের এ জাতিয় আচরণে একসময় আমার কষ্ট হতে শুরু করলো, লজ্জা পেতাম, কৃতজ্ঞতায় বসন্তের হাত আমার উষ্ণ শরীরে চেপে ধরতাম, তার প্রতি কৃতজ্ঞতায়, তার আঙুল আমার কোমল ঠোঁটের সাথে, বসন্ত বাধা দিতোনা, বসন্ত উৎসাহিত বোধ করতো না, বসন্ত তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে দিচ্ছে, তোয়ালে বোলাচ্ছে, পিঠে, বুকে আমার নগ্ন হাতে পায়ে, তোয়ালের স্পর্শে আমি উত্তেজিত হতাম, বসন্ত নিরুদ্বেগ। তারপর জানি না কোন মুহূর্তে বসন্তের স্পর্শ পাওয়ার ইচ্ছায় আমার ঘুম পেলেও জেগে থাকতাম, স্নান করার ইচ্ছা হলেও করতাম না, ভান করে বসে থাকতাম, বসন্ত উপলব্ধি করে, চেষ্টা করতো আমায় স্পর্শ না করতে, আমি অস্থির হতাম—এই ভাবে কবে যে আমরা উভয়ে শারীরিক ভাবে একে অপরে উষ্ণ হতে উষ্ণতর হতে শুরু করলাম, সে আর মনে নেই। তার পর মাসের পর মাস. বছরের পর বছর কেটে গেছে, শারীরিক দিক থেকে বসন্ত ও আমি অবিচ্ছিন্ন, ও তৃপ্ত। আমাদের কারোর বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ নেই।

রুচী আন্টি এবং বসন্ত আঙ্কেলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বসন্তের আচরণ ছিল প্রকৃত অর্থে কাকার মত এবং রুচী আন্টির প্রকৃত আন্টির মত, মায়ের মত, এবং উভয়ের স্নেহে

আমি আপন পর ভুলে গেছি। তাদের আচরণে আমি আমার জীবনের শান্তি সামান্য হলেও খুঁজে পেয়েছি। অথচ আমি কে? অসহ্য যন্ত্রণা কাতর আমার পালক পিতার এক বন্ধুর আশ্রিতা, অনাথ বাইশ বছরের অবিবাহিতা যুবতী। যার কোনো পরিচিতি নেই। পৃথিবীতে আত্মীয় বন্ধু স্বজন বলতে যার কেউ নেই, যার বাবা মা বিয়ের আগে, অবৈধ মিলনে জাত সন্তানকে পরিত্যাগ করে পলাতক, একমাত্র আশ্রয়দাতা যার আচরণে তাকে বহিষ্কার করেছে, বিতাড়িত করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি নির্দোষ জেনেও, কারণ আমার সংস্পর্শে তার সন্তানের ক্ষতি হবে, বংশের অপমান হবে এই ভয়ে। হয়তো সে দায়ী নয়, দায়ী তার রূপ। সে যদি রূপসী হয়, সে দোষ কি তার? আমি আমার রূপ দিয়ে তার সন্তান মানবকে প্রলোভন সত্ত্বেও বিপথে চালিত করিনি। বরং অত্যন্ত সংযমের সাথে মানবের শারীরিক আগ্রাসন থেকে নিজেকে রক্ষা করেছি এবং মানবকে, তার অন্যায় আকাঙ্খাকে বাধা দিয়েছি। এরজন্য লাবণীকে প্রচণ্ড কষ্ট করতে হয়েছে। মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো লাবণী মানবকে, এই পৃথিবীতে তার আপনার বলতে কেউ ছিল না, একমাত্র মানবই ছিল তার, স্বপ্ন, তার আশা এবং ভরসা, প্রথম যৌবনের আগুনের মত উত্তপ্ত কামনাকে অপরিসম ধৈর্য্যে দমিত করেছে, আত্মসমর্পণ করেনি মানবের কাছে, মানব তখন উন্মাদ, শারীরিক ভাবে লাবণীকে পাওয়ার জন্য মানব অস্থির লাবণী প্রতিহত করেছে, সংযম সহকারে, যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে মানবকে এবং নিজেকে অমলিন রেখেছে, অথচ লাবণী, সেও তো মানুষ, তার মধ্যে উষ্ণ রক্ত স্রোত প্রবাহিত, প্রথম যৌবনে সেই কৌতূহলী শারীরিক ক্ষুধা লাবণীরও ছিল, তবুও সে বঞ্চিত করেছে নিজেকে, অনৈতিক আকাঙ্খার শিকার হয়নি। এক মুহূর্তের জন্য লাবণীকে চোখের আড়ালে চায়তো না মানব। মানবের মধ্যে কামনা ছিল কিন্তু কোনো সময়েই তার আকর্ষণে পাশবিকতা ছিল না, ইচ্ছা করলে মানব কি লাবণীকে পাওয়ার জন্য আরো সাহসি হতে পারতো? পারতো তার প্রেয়সীকে পাওয়ার জন্য সামান্য বল প্রয়োগ, না, কোনদিনও নয়, অত্যন্ত ভীত প্রকৃতির বা চারিত্রিক উৎকর্ষতার প্রতীক ছিল মানব দত্ত। মানব লাবণীকে ভালবাসতো, তার অন্তরের আকুতি নিবেদন করেছে অত্যন্ত সযত্নে এবং গভীর ঐকান্তিকতায়, লাবণী ভালবাসতো, আজো ভালবাসে তবে কোনো সময়েই লাবণীর ভালোবাসা গণ্ডি বা সীমরেখা অতিক্রম করতে দেয়নি। যে কারণে তাদের ভালোবাসা ছিল নিষ্পাপ, কলুষমুক্ত। এখনো বেশ মনে আছে মানব আর তার ভালোবাসার প্রকাশ ছিল মানে-অভিমানে, হাসি-কান্নায়, শূন্যতা-পূর্ণতায়, এক নৈস্বর্গিক অবস্থার মধ্যে বিচরণ করতো দুজনে। যদিও তাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল তথাকথিত সামাজিক পরিমণ্ডলে অবৈধ, অসামাজিক এবং অনভিপ্রেত তবুও সে মানবকে তার অন্তরের শ্রদ্ধায়, আন্তরিকতায়, বন্ধুত্ব এবং নারীত্বের সুললিত মাধুর্য্যে মিশিয়ে ভালবাসতো। যার বর্ণনা করা প্রকৃতই কঠিন এবং একমাত্র তারাই অনুভব করবে, উপলব্ধি করবে যারা এ জাতিয় ভালবাসার স্বাদ পেয়েছে। সেই স্বর্গীয় ভালবাসা লাবণীকে আশ্রয়চ্যুত করেছে। দেবদূতের মত মানব এসেছিল তার জীবনে। সুখের হাতছানি দিয়ে সে চলে গেছে, লাবণীকে নিক্ষেপ করেছে অনন্ত দুঃখের সাগরে।

মানুষ বড় অসহায়। একদিন যে-শিশু জন্ম গ্রহণ করে, সময়ে বড় হয়, শিশু জানে না কোথায় সে জন্মেছে, কোন সমাজে, কোন পরিবেশে, কারণ শিশু, জন্ম প্রসঙ্গে শিশুর কোনো ভূমিকা নেই। কোনো কালে কোনো শিশুরই কোনো ভূমিকা ছিল না।

ভবিষ্যতেও থাকবে না। সেই শিশু যতদিন পর্যন্ত সাবালক বা সাবালিকা না হচ্ছে, স্বাবলম্বী না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত, তার অতীতের বা সেই শিশুর কোন দায়িত্ব থাকে কি? থাকে না। লাবণীর ক্ষেত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। লাবণী মানবকে হারালো কারণ সে সংবংশে জাত নয়, সে যদি উচ্চ কুলোদ্ভূত হতো, তাহলে মানস আঙ্কেল নিশ্চয় লাবণীকে পুত্রবধূ হিসাবে বরণ করে নিতেন। লাবণী শিক্ষিতা, মার্জিত রুচি সম্পন্না, লাবণী সুন্দরী, আকর্ষণীয়া, মানব লাবণীকে ভালোবাসে, লাবণী মানবকে ভালোবাসলো, তার দোষ কি লাবণীর? লাবণীকে দোষী বলা যায়? আজ যার সাথে মানস আঙ্কেল মানবদার বিয়ে দিয়েছে সে কি লাবণী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর? তবুও যদি মানবদা তার স্ত্রীকে নিয়ে সুখে সংসার করতে পারতো, কথা ছিল। দাম্পত্যজীবনে মানব অসুখী। সে তার প্রিয়তমাকে হারানোর বেদনা ভুলতে পারেনি।

গল্ফ গ্রীনের বসন্তের ফ্ল্যাটে একা লাবণী, অসহায়, চিন্তায় ডুবে আছে। সে অতীতকে ভুলতে চায়, অতীত তাকে ভুলতে চায়না। সুযোগ পেলেই অতীত তাকে আলিঙ্গন করে, লাবণী যত সঙ্কল্পই করুক সে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বেঁচে থাকবে— পারে না। অতিত আচ্ছন্ন করে বর্তমানকে প্রভাবিত করে ভবিষ্যৎকে।

এই মুহূর্তে সে ভাবছে, সে যদি সত্যসত্যই মা হয়, কি হবে তার ভবিষ্যৎ যে সন্তানই আসুক ছেলে অথবা মেয়ে, সে ও তো তারই মত একই সমস্যায় ভুগবে। এখানেই তার অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্তমান ও ভবিষ্যতকে বিড়ম্বিত করছে। এই অবস্থায় সে কি করবে? ভাবি সন্তানের পরিচয় কি হবে? এদেশে মাতৃ পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় হয়না। পিতৃ পরিচয়ে সন্তানের পরিচয়। এমতাবস্থায় কে তাকে পরামর্শ দেবে? কে তার শুভাকাঙ্খী? তার ইচ্ছা সে মা হতে চায়, আদিম নারীর ইচ্ছা, স্ত্রী জাতিয়া জীবের ইচ্ছা, সুন্দরভাবে বাঁচার ইচ্ছা অন্যায় নয়, এবং তার এ ইচ্ছাকে লাবণী হত্যা করতে চায় না। যে গাছে ফুল ফোটেনা, ফল ধরে না, সে গাছ আগাছারই সামিল। সে গাছ উপড়ে ফেলতে হয়, তবে কি লাবণী আগাছা, অবাঞ্ছিত, আগাছা—আগাছার বেঁচে থাকার অর্থ হয় না।

এ এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা—দোদুল্যমানতা। বসন্তকে চায়। একমাত্র বসন্ত পারে এর সঠিক পরামর্শ দিয়ে কিউকে চিন্তামুক্ত করতে। বসন্ত তার আশা ভরসা, তার বন্ধু, তার ভালোবাসা, তার অভিভাবক, বসন্তই পারে তার জীবনের এ-ক্রশ রোডে, সঠিক রাস্তার নির্দেশ দিতে, প্রয়োজনে হাত ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে সাহায্য করতে, সাথী হতে। বসন্তের জন্য বসন্তকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্খায় কিউ ব্যকুল হতে ব্যকুলতর হয়ে উঠেছে, ধৈর্য্যের বাধাভাঙা অপেক্ষা এ যেন। দিবাশেষ, রাত্রী, সময় এগিয়ে যায়, অস্থির কিউ, টিভি খোলে, ছবি দেখে গান শুনে যদি চিন্তার হাত থেকে মুক্তি ঘটে, কখনো হারমোনিয়াম নিয়ে বসে, হারমোনিয়াম কিউ-এর নতুন সাথী— কোনো কিছুতে মন বসে না। অবশেষে, সকল আঁধারের আলোর স্ফুরণ, একান্ত ভরসার, নির্ভরযোগ্য আশ্রয় ঠাকুরের কবিতা—কবিতার বই আশ্রয় করে, যতক্ষণ না চোখজুড়ে ঘুম আসে।

ঘুমিয়ে যদি শান্তি পেতো, নিস্তার মিলতো চিন্তার হাত থেকে তবে তো কিউ বেঁচে যেতো, সে হয়না, কারণ ঘুম ভাল মত হয়না যে। কখনো কখনো আধো ঘুমের মাঝে তার অদেখা, কল্পনায় গড়া মা এসে হাজির হয়, চিনতে পারে না, চেনার চেষ্টা করে,

পরিশেষে অচেনা মায়ের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, পাতলা ঘুম ভেঙে যায়, মা হারিয়ে যায়, দেখা যায় না। আবার তন্দ্রা---সে দেখে, যে একজন শিশু হাসছে, খেলছে, কথা বলছে, তৃপ্তির হাসি শিশু ও মায়ের মুখে—হাসতে হাসতে ঘুম ভেঙে যায়, ঘামে ভিজে যায়, মুখ, হালকা আবরণের আড়ালে তাজা শরীর, হাত দিয়ে অনুভব করে—এই স্থানে হয়তো তার শিশু সন্তান বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘর্মাক্ত শরীরে বিছানা ছাড়ে, জল খায়, টয়লেটে যায়, মুখে, গলায় জল দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে, ভোরের আলো, ভোরের কলরব সে শুনতে পায়না। নতুন দিন শুরু হয়ে যায়। কিউ-এর ঘুম ভাঙে।

তবুও ঘুম জড়ানো চোখ, শরীরে আলসেমি। চণ্ডীর ঘুম ভেঙেছে অনেক আগে। দিদিমণিকে সে ডাকেনি। ঘর দোর পরিষ্কার করা, ধোওয়া মোছা---প্রাত্যাহিক কাজ করছিল সে। কিউ বেডরুমের দরজা খুলতেই চণ্ডী এগিয়ে এসে কিউ-এর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু চোখে প্রশ্ন করে।

—শরীর ভালো আছে তো দিদি?

—হ্যাঁ। ঠিক আছে।

এক মুখ বিরক্তি নিয়ে চোখ কুঁচকে উত্তর দেয় কিউ। সদ্য ঘুম ভাঙা বাসি মুখ, অগোছালো চেহারা ক্লান্তি জর্জর শরীর---ভালো ঘুম হয়নি রাত্রে, বেশ কিছুদিন ধরে হচ্ছে না। তার পর মাথা মুণ্ডুহীন আবোল তাবোল স্বপ্ন বার বার ঘুম তাড়িয়েছে, মাথায় অজস্র চিন্তা, মাথা ভার, প্রকাশ তার চেহারায়,—একি তার শারীরিক পরিবর্তনের সূচনা! সব কিছু মিলিয়ে কিউটির চলায়, আচরণে কি কোন ইঙ্গিত বা সূচনা বহন করছে! সেই কারণেই কি চণ্ডীর চোখের নজর কিউটির চেহারার প্রতি! হতেই পারে, অভিজ্ঞ, বয়স্ক লোক চণ্ডী, তার স্ত্রীর অনেকগুলি সন্তান প্রসব করতে দেখছে সে। দীর্ঘদিন দিদিমণিকে দেখছে, স্বভাবতঃই চণ্ডীর সন্দেহ এবং প্রশ্ন। দিদিকে দেখার দায়িত্ব চণ্ডীর।

যতদিন থেকে কিউটি সাদার্ন এভিনিউ-এর ফ্ল্যাট ত্যাগ করে গল্ফ্ গ্রীনে বসন্তের অফিস কাম লাইব্রেরী কাম ফ্ল্যাট সিফ্‌ট করেছে, চণ্ডীও এই বাড়ির কাজে বহাল হয়েছে। তিনতলায় মাঝারি সাইজের ফ্ল্যাটেই বসন্তের অফিস কাম লাইব্রেরী। কিউ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম সেক্রেটারি। লাইব্রেরী ছাড়া, বেডরুম, ডাইনিং, কিচেন, দুটি টয়লেট কাম বাথ, লিভিং রুম—উচ্চ মধ্যবিত্তদের জন্য নির্মিত ফ্যামিলি অ্যাপার্টমেণ্ট। আটতলা বাড়ি, মোট বত্রিশটি ফ্ল্যাট আছে এই অ্যাপার্টমেন্টে। বসন্তের লিভিং রুমের সামনে একটুকরো ব্যালকনি। ব্যালকনিতে দুটি বেঞ্চ পাতা আছে, বেঞ্চের ওপরে কিউটি টবে বসিয়েছে পাতাবাহার, ক্যাকটাস্, বেলফুল এবং একটা বনসাই। কিউটি গাছগুলোয় যত্ন করে, জল দেয়, বাজার থেকে সার চণ্ডীকে দিয়ে কিনিয়ে আনিয়ে দেয়, আঙুলের সাহায্যে পুরানো পাতা ছড়িয়ে দেয়, কখনো, কখনো কচি পাতায় হাতের আঙুল স্পর্শ করে। কয়েকটা টবের এই গাছগুলো তার প্রিয়।

ব্যালকনির গ্রীলে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে কিছু সময় দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকজনের যাতায়াত আনমনে দেখতে থাকে কিউ। ব্রাশ করে। বাথে ঢুকে প্রতিদিনের প্রাতঃ স্নানের কথা ভুলে যায়। অথচ প্রতিদিন ঘুম ভাঙার পর কিউ স্নান সেরে চা খায়, এবং চা পানের সাথে খবরের কাগজে চোখ বুলায়। কিউ-এর চা পান হলে চণ্ডী চা খেতে যায়।

প্রাত্যহিক কাজে ভুল হয়না, এই প্রথম সকাল, কিউ ভুলে গেল তার প্রাত্যহিক প্রাতঃকালের প্রথম কাজ।

নিচের রাস্তা দিয়ে ব্যস্ত মানুষ আসছে যাচ্ছে—বাজার-ঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস আদালত—সকলের কাজের তাড়া, সময় বড় তাড়াতাড়ি গড়িয়ে চলেছে। সে কারণে প্রায় প্রত্যেকেই যায়, বিশেষ করে শহরে, তাদের কাজের রুটিন অনুযায়ী। নির্দিষ্ট সময় ধরে করে ফেলতে চায়, অন্ততঃ রাস্তার চলমান মানুষের ব্যস্ততা দেখে কিউ-এর মনে হয়; কিউ-এরও কাজ অধিক না হলেও নির্ঘণ্ট অনুসারে সে করে, অথচ বিনা কারণে আজ সে ফেল করলো। নিচের ব্যস্ত মানুষদের সকলে না হলেও কেউ না কেউ ফেল করে না কি? নিশ্চয় করে। কিউও করেছে। অথচ কিউ-এর রুটিনের কোনো প্রয়োজন নেই, রুটিন মেনে সে খুব একটা চলেও না। কি হবে তার রুটিনে? কোন কাজে লাগবে? সময়ের যাঁতাকলে নিজেকে বন্দি করে। কিউ-এর জন্য চণ্ডীর চা খাওয়া হয়নি, এটা ঠিক নয়। এমনি ভুল তার! যেমন সে এই সাত সকালে রাস্তায় কুকুর, খবরের কাগজওয়ালা ছুটছে, দেখছে, অথচ কিউকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কি দেখছো? কিউ জবাব দিতে পারবে না, সে রাস্তার দিকে চোখ খুলে চেয়ে আছে, অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না—চোখের সাথে, মনের সাথে স্নায়ুতন্ত্রের যোগাযোগ ঠিক মত হচ্ছে না।

কিউ রাস্তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, সামনে, আশেপাশে দেখার চেষ্টা করে—পাশের খোলা জানালায় সেই ছেলেটি, যে জানালায় থাকলে, কিউকে ব্যালকনিতে দেখলে পড়া ভুলে কিউয়ের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বাচ্চা ছেলে, স্কুলে পড়ে। কিউ ওকে ছোটবেলা থেকে দেখছে, নীলরঙের হাফ্ প্যান্ট, সাদা সার্টের সাথে গলায় নীল টাই বেঁধে স্কুলে যেতো। এখনো স্কুলেই পড়ে, সম্ভবতঃ দ্বাদশ শ্রেণীতে, হাফ্ প্যান্টের বদলে পরনে ফুল প্যান্ট, সবে গোঁফ দাড়ি গজাতে শুরু করেছে। পড়ার টেবিলে একা, কিউকে দেখে পড়া বন্ধ করে ওর দিদির বয়সী বয়োজ্যেষ্ঠা কিউকে দেখছে দুচোখ বড় করে। এমন কি রাতের বেলায় কিউ যখন রাস্তার স্বল্প আলোয় ব্যালকনিতে কিউ রাতের পোষাকে, তারা দেখে, আকাশ দেখে বা অন্য কোন দূরের ফ্ল্যাটে বাড়ি, ঐ ছেলেটি দুচোখ ভরে কিউকে দেখে আনন্দ পায়, বলতে গেলে কিউ-এর নারী শরীর শুধু চোখ দিয়ে উপভোগ করে। মাধ্যমিক পাশ করেছে যৌবন এসেছে শরীরে ও মনে, নারীদেহ সম্বন্ধে কৌতূহল ওর হৃদয় জুড়ে—এক অনাস্বাদিত শারীরিক কল্পনা ওর মনে বাঁসা বাঁধতে শুরু করেছে—বয়স এখানে কোন বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়নি তার চোখে, এতো শুধু চোখের দেখা! হৌক না তার চেয়ে বয়সে বড়, তবুও নারী শরীর, নারী শরীরের প্রতি এই বয়সী যুবকের কৌতূহল অত্যন্ত স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, কিউ স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী, অটুট এবং দেখার মত শরীরের গঠন—বিশেষ করে সাত সকালে রাতের পোষাকে। কিউ লক্ষ্য করেছে, কিউ এর সাথে চোখাচোখি হলে লজ্জায় মুখ নিচু করে পড়ায় মন দেওয়ার ভান করে। কিউ ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি জাগিয়ে চোখ ঘুড়িয়ে নেয়। এই বালকটির চাউনির সাথে কিউ-এর দীর্ঘ দিনের পরিচয়।

সামনের ফ্ল্যাটে ধাক্কা খেয়ে হারিয়ে গেছে আকাশ। আকাশ দেখতে গেলে ব্যালকনি থেকে বাইরে মাথা বাড়িয়ে ওপরের দিকে দেখতে হয়, ঘাড়ে ব্যথা হয়—বেশি সময় চেয়ে থাকা যায় না। ঘরে থেকে দিদিকে লক্ষ্য করে চণ্ডী। অস্বাভাবিক, অলস কিউ দিদির এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে চণ্ডী অবাক হয়, অনুযোগের সুরে দিদিকে মনে

করিয়ে দেয়।

—দিদি, চা বসাবো?

—চা? তাইতো! ওমা, তোমারও চা খাওয়া হয়নি। ছি! ছি! চা বসাও, আমি মুখ ধুচ্ছি। পরে স্নান করবো।

দ্রুত বাথরুমে থেকে মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে, ঘাড়ে গলায় জল দিয়ে মুছে টেবিলে বসে কিউ, চণ্ডী চা দেয়, টোস্ট দেয়, দেয় খবরের কাগজ। মুখে কোনো স্বাদ নেই, খেতে ইচ্ছা করছে না চা, না টোস্ট। কোনো রকমে টোস্টে দু এক কামড় আর চায়ে কয়েক চুমুক—বাকিটা যেমন ছিল তেমনি রইলো. অর্থাৎ অর্দ্ধভুক্ত।

—চায়ে চিনি দেবো দিদি? মিষ্টি হয়নি?

—না।

—তবে খাচ্ছো না কেন? তোমার শরীর খারাপ?

—না।

—বাজারে যেতে হবে?

—তুমি জানবে। ফ্রিজ খুলে দেখো। কি নেই, মাছ? না সবজি? যদি আনতে হয়, যাও, নিয়ে এসো।

—একবারে যেতে হবে—মসুর ডাল, আটা—

—যখন যাবে বোলো, টাকা দেব।

চণ্ডী কাজে যায়। কিউ কাগজ দেখে। শুধু অভ্যাসবশতঃ পাতা উল্টায়। হেড্‌লাইন গুলোতে চোখ বুলাতে বুলাতে কোনো খবর সম্বন্ধে কৌতূহল হলে, ভেতরের খবরগুলো পড়ে নেয়। সে একই খবরের পুনরাবৃত্তি, কোন নেতা, কোন মন্ত্রী, দেশের দশের জন্য কি বলল কি আশার বাণী শোনালো, খেলার খবর, কোথায় বধূ নির্যাতন, বালিকা ধর্ষণ কিম্বা সন্ত্রাসবাদীদের গুলি চালিয়ে বা বোম বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিধন—সামান্য খবর এবং পাতার অধিকাংশ জায়গা জুড়ে বিজ্ঞাপন। কিউ বিজ্ঞাপন পড়তে ভালবাসে।

ঘরের কাজ শেষ করে, বাজারের থলি নিয়ে বেরিয়ে যায় চণ্ডী। কিউ লাইব্রেরীতে ঢোকে। কম্‌পিউটার খোলে। রোহিত ও তার বৌয়ের ছবি ও তার সাথে দিদির কাছে আবেদন তারা বিয়ে করেছে দিদির আশীর্বাদ চায়। মেল এসেছে রোহিতের কাছ থেকে। কিউ দীর্ঘ সময় ওদের দুজনের ছবি দেখে, বাঃ বেশ সুন্দর মানিয়েছে। কিউ তৎক্ষণাৎ ওদের দুজনের জন্য শুভেচ্ছা এবং ওদের চিরসুখ কামনা করে বার্তার উত্তর পাঠায়। কিউয়ের অপেক্ষা রোহিত এক-দু বছরের ছোট। রোহিত নিজে কিউদিকে আমন্ত্রণ করেছিল। কিউ যেতে পারেনি বলে রোহিতের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে। দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান বেশি না হলেও রোহিত কিউকে চিরদিন দিদির মত শ্রদ্ধা করে। ওদের দুজনের মধ্যে একদা মধুর সম্পর্ক ছিল—ভাই বোনের মত, রোহিত মনের দিক থেকে উদার। রোহিতের মেল্ পাওয়ার পর কিউ-এর মনে রোহিতের কাছ হতে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। যেদিন রোহিত জানবে, তার দিদি সন্তান সম্ভবা, এবং তার দিদির গর্ভের সন্তান, তার বাবা বসন্তের ঔরসে জন্ম, অর্থাৎ তার দিদির সন্তান হলো তার ভাই। সেদিন কি রোহিত তার দিদিকে ক্ষমা করবে?—না, মন খারাপ হয়ে যায়, রোহিতের মেল পেয়ে যত খুশি, আবার গর্ভস্থ সন্তান নিয়ে সংশয় এবং ফল হিসাবে তার প্রতি রোহিতের

ঘৃণার আশঙ্কা।

মেল্ পাঠিয়ে চুপচাপ বসে থাকে কিউ। এখন তার করণীয় কি?—খুব অন্যায় কাজ সে করেছে। হঠাৎ মাথার মধ্যে ইচ্ছার পোকা ঢুকলো, বেশ তো ছিল। শারীরিক তৃষ্ণা দীর্ঘদিন বসন্ত মিটিয়ে আসছে, বয়স হয়েছে বসন্তের, তবুও কিউ অতৃপ্ত ছিল না। নারী হিসাবে তার সংযম, সাবধানতার অভাব কোন দিনই ছিল না। কারণ সে জানতো যে সে একজন অবিবাহিতা। কুমায়ুনে হঠাৎই যেন তোর চিন্তার গতি পরিবর্তন হলো, মনের মধ্যে মা হওয়ার তার বাসনার জন্ম নিলো এবং সে ইচ্ছা করেই বসন্তের সন্তানের মা হতে চাইলো। এবং এই সিদ্ধান্ত তার, একান্ত তারই, বসন্তের অজানা। অথচ ইদানিং তার মনে অন্য ভীতি, তার সিদ্ধান্ত সঠিক না বেঠিক, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় কিউ অত্যন্ত ব্যাকুল। সে ভাবেনি যে তার মাতৃত্বের বাসনা পূরণ এমন যন্ত্রণাদায়ক হবে। বসন্ত ফিরলে তবে সে স্বস্তি পাবে, নতুবা নয়।

অস্থির মনে কখনো খবরের কাগজ, কখনো কম্পিউটার নিয়ে বসন্তের অসমাপ্ত কাজ নিয়ে সময় কাটাতে চায়, কিন্তু কিছুতেই মন বসছে না, অবশেষে সেল্ফ্ ঘেঁটে ঠাকুরের বই, অনাশ্রিতার শেষ আশ্রয় খুলে বসে। অস্থির চিত্ত, অবসন্ন শরীর—এমত অবস্থায় যদি ঠাকুরের কাছ হতে যদি কোনো সান্ত্বনা বা পরামর্শ পাওয়া যায় এই আশায়, এমন কোনো সমাধান কি তার লেখায় আছে, যার মা হিন্দু বাবা মুসলমান, যদিও শোনা কথা, সত্য মিথ্যা জানে না, যার জন্ম সামাজিক পরিভাষায় অনৈতিক এবং অবৈধ, যে মানুষ হয়েছে এক হিন্দু পরিবারে; আশ্রিতার মত নয় সন্তান স্নেহে, আবার সেই স্থান হতে নির্বাসিত হতে হয়েছে—বর্তমানে যার কাছে সে আশ্রিতা পিতৃতুল্য, সে তার বর্তমান প্রেমিক—যিনি বর্ণে হিন্দু। কিন্তু কোনো ধর্মের প্রতি তার অনুরাগ লক্ষ্য করেনি। পূজা অর্চনা কোনদিন কিছু করেন না। যার ঘরে কোনো দেবদেবীর ফটো এমনকি দেব-দেবীর ছবি আঁকা কোনো ক্যালেণ্ডারও নেই, কোনোদিন প্রণাম করা, ঠাকুর দেবতার নাম ইত্যাদি শোনেনি বা দেখেনি যবে থেকে এই আশ্রয়ে আছে। যার শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালবাসা মানুষের প্রতি। সেই বসন্ত।

পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের, যে কোন সমাজের, যে কোনো জাতির শিশুর অকাল মৃত্যুতে যার হৃদয় ব্যথিত হয়, সেই বসন্তই পারবে তাকে পরামর্শ দিতে, ভরসা দিতে, আশ্রয় দিতে এই বিক্ষুব্ধ মুহূর্তে। বসন্ত নেই, হায়দ্রাবাদে গেছে, মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য, কিউ একা, বড় একাকিত্ব অনুভব করছে।

একা থাকতে কষ্ট হয়। কি করতে পারে সে। সে যে একাই এই পৃথিবীতে! বসন্ত, তার নিজের কাজে প্রায়শঃই বাইরে যায়, যেতে হয় দেশে ও বিদেশে, সে সময় একাই থাকে, চণ্ডী থাকে, নিরাপত্তার, খাওয়া দাওয়ার অভাব নেই। মনোরঞ্জন খবরের কাগজ, টিভি, কম্পিউটারে কাজ এবং মাঝে মাঝে লাইব্রেরী, সময় থেমে থাকে না, কেটে যায়। একা থাকাতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু এবারে তার একাকিত্ব কিউকে তীব্র পীড়া দিচ্ছে। একা জীবন কাটানো যায় না—তা যে চরম সত্য, কিউ মর্মে মর্মে সে কথা অনুভব করছে। বসন্তের অনুপস্থিতি তীব্র ভাবে উপলব্ধি করছে, অভিজ্ঞতা হচ্ছে—সত্য নির্মম এবং মাঝে মাঝে অতি কঠোরও।

একদা, কৈশোরে মনে হয়েছিল জীবন যেন গোলাপ বিছানো শয্যা, রঙিন সেই সব দিনগুলো, নিজেকে প্রজাপতির মত মনে হতো। কৈশোর সমাপ্ত হতে না হতেই নিষ্ঠুরতা

হাজির হলো তার স্বরূপে, হঠাৎ যেন কেউ, তাকে গরম পাঁকের মধ্যে নিক্ষেপ করলো। মনে হয়েছিল সেই পঙ্কেই তার মৃত্যু হবে, বসন্তের স্নেহের ফোয়ারায় ধীরে ধীরে অপসৃত হলো পাঁক, দুর্গন্ধ দূর হলো। শরীর ও মন সুস্থ এবং সজীব হলো, শক্ত ডানায় সাধ জাগলো ওড়ার, নীল আকাশে ওড়ার। মনে মনে সে বসন্তকে ধন্যবাদ জানায়। বলে 'বসন্ত আমি তোমার কাছে চির কৃতজ্ঞ, তোমার ঋণ অপরিশোধ্য, তোমার কাছে আমি সব কিছু এমনকি নিজেকে নিবেদন করেও ঋণ শোধ করতে পারবো না!

শিশু লাবণীর ত্রাণকর্তা, রক্ষাকর্তা মানস আঙ্কেল, পালন কর্তাও ছিলেন তিনি। কিন্তু বসন্ত সৃষ্টিকর্তা। এই মুহূর্তে তোমাকে কাছে পেতে চাই, বসন্ত! নিজের মনে বসন্তের সাথে আলাপরতা কিউ। দেওয়ালে ব্যাটারি চালিত ঘড়ি এগিয়ে চলেছে নিঃশব্দে, যদিও পেণ্ডুলাম দুলছে সময়ের ছন্দে, ঘড়ি মুখর হয় ছোট কাঁটাটি যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্পর্শ করে, ডাকে মিষ্টি সুরে ঘড়ি থেকে পাখীর ডাক শোনা যায়—পাখীর নাম কিউ জানে না।

খাটের ওপর হারমোনিয়াম, চণ্ডী রেখে গেছে, দিদি গান গাইবে। ইচ্ছা করছে না। বীথিকার পাতা খোলে। সকালটাই যেন অনিচ্ছার মরুভূমি। মনে আসছে, পাশের জানালায় সদ্য যুবকটির কথা। হাসি পায়, কিউকে দেখে যুবকটি। মানুষের কামনা, বাসনা, সৌন্দর্য্য পিপাসা বয়সের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। থাকে কি?—কে কখন, কোন সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, আবিষ্ট হয়, মনের আনন্দ খুঁজে পায় কে জানে! হাসি পায়। সে কি আর আগের মত সুন্দর আছে। সে যখন কলেজে পড়তো বা স্কুলের শেষ দিনগুলোতে—কত চেনা অচেনা যুবক, মধ্যবয়সী এমনকি প্রৌঢ়দেরও তার উদ্দেশ্যে মিষ্টি মন্তব্য শুনতে পেতো, কারো মন্তব্যে সে কান দিত না, নিজের গন্তব্যস্থলে স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকতো, তবে তার মুখের রঙ বদলাতো কি-না, সে জানতো না। সে জানতো উত্তর পেলেই ওরা পেয়ে বসবে। ঐ সদ্য যুবকটি কিউকে দেখে যদি তৃপ্ত হয়, হৌক না, তার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। তার যদি পড়ার ক্ষতি হয়, হবে। আবার নাও হতে পারে—মনের আনন্দ প্রয়োজন।

বীথিকার পাতা খুলে কবিতা পড়তে শুরু করেছে, বেল্ বাজে। চণ্ডী ফিরেছে। দরজা খোলে।

—টক্ দই নিয়ে এলাম দিদি, লেবুও এনেছি, তোমার শরীর ভালো নেই। কিছু খাচ্ছো না। পাতি লেবুর সরবৎ করে দেবো?—দই দিয়ে ভাত খাবে, ভালো হজম হবে। খাবারের রুচি আসবে।

—আচ্ছা।

—গান গাওনি?

—না, ভালো লাগছে না।

—দাদাকে ফোন করো—কথা বলো—মন ভালো হয়ে যাবে।

—তোমার মাথা!

—সত্যি বলছি। করে দেখো।

—পরে করবো, দাদা এখন কাজ করছে, ব্যস্ত আছে। গত রাতে রোহিতের বিয়ে হলো।

—রোহিত দাদাভায়ের বিয়ে।

—হ্যাঁ।

—বাঃ তুমি গেলে না?

—হঠাৎ হয়ে গেল যে, যাবো কি করে!

—খুব ভালো খবর। রোহিতদাকে কতদিন দেখিনি।

রোহিত প্রসঙ্গ শেষ হলে চণ্ডী কিছু সময়ের জন্য কিউ দিদিকে দেখে নিজের কাজে চলে যায়। কিউ মন দেয় কবিতায়—কবিতা যদি তার অশান্ত মন শান্ত করতে পারে, তাকে সহায়তা করে, তাকে পরামর্শ দিতে পারে কিম্বা সর্বোপরি কোন পথ দেখাতে পারে, এই আশায়। জীবনের এই ক্রশরোডে একজন প্রকৃত নির্দেশকের প্রয়োজন।

কবিতা পড়ে বার বার একটি লাইন নিয়ে আবৃত্তি করে, অনুধাবন করে, রসাস্বাদন করে, একটি কবিতার পর দ্বিতীয় কবিতাটি পাঠ করতেই অনেক সময় পার হয়ে যায়। ঠাকুরের কবিতা গড় গড় করে পড়ে গেলে হয় না, পরতে যত না সময় লাগে, মর্মবস্তু উদ্ধার করতে লাগে অনেক বেশি। এইভাবে ঠাকুরের কবিতার প্রতি আসক্তি কিউ-এর দীর্ঘদিনের। এবং অনেক কবিতার মর্মবস্তু কিউ-এর হৃদয়ে গেঁথে আছে। অতি সাধারণ বিষয়বস্তু লেখনীর স্পর্শে কি অসাধারণ, কবি যেন গাঁয়ের কৃষক বধূর, শিশুর অন্তরের কথাও মর্মচোখে দেখতে পেতেন, শুধু দেখেই নয়, বিশ্লেষণ করেন মর্মবস্তু—কি অসাধারণ ক্ষমতা—একজন মানুষের হতে পারে। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বর্ণনা নয় তার নান্দনিক এবং সত্যরূপ প্রতিটি কবিতায় লিপিবদ্ধ—অসীম সৃষ্টি। কবি কখনো বিদ্রোহী, প্রেমিক, কবি সাধক, সমাজসংস্কারক সর্বোপরি কবি দার্শনিক—যার পরিমাপ করা যায়না। কবিতা যত না পড়ে কবিতার পংক্তিগুলি নিয়ে ভাবে বেশি, কোনো কোনো পংক্তি বা সম্পূর্ণ কবিতাটি একাধিক পড়েও আশ মেটে না। কবিতার সাথে নিজের জীবনে প্রবেশ করে, নিজের মনের কথা কবিতার শব্দ সমূহের মধ্যে সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে। নিজের কথা, নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে কিউ কষ্ট অনুভব করে। পৃথিবীতে অন্য কোন মানুষের যেন এমন দুরবস্থা না হয়! চোখের পাতা ভিজে যায়। গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে, কোন বাধাই মানতে চায়না। এ তার প্রাপ্য! চোখের জল তার একমাত্র সম্বল, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্য। দীর্ঘদিন পরে একা বসে কিউ নিজের দুঃখে কাঁদছে, এত আনন্দ মুখর স্বপ্নে মশগুল তবুও কান্না কোনো নিষেধ মানে না। মানুষের চোখের জল শুধু দুঃখেই নিঃসরিত হয়না, সুখেও হয়। মানবদাকে হারানোর কাতর বেদনায় কিউ-এর চোখের জল বাধা মানতো না একদা—একমাত্র, দুমাস, ছমাস, একবছর, তার পরও সে কেঁদেছে। দুঃখে কাতর হয় আজো, তবু অশ্রুবর্ষণ হতো না যেন চিরকালের জন্য তার চোখ শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল, কিউ জানতো না যে মরুভূমির নিচেও করুণার স্নিগ্ধ ধারা আজো বিদ্যামান। না কি চোখের জল জমে বরফ হয়েছিল, বর্তমানের ঘটনার উষ্ণতা সেই জমা বরফ গলে চোখ বেয়ে নামছে নীরবে।

বই রাখে কিউ। হাঁটু মুড়ে বিছানায় বসে অনন্ত ভাবনায় হারিয়ে যায়, বালিসে মাথা রাখে, রাত জাগা ঘুম নামে অসময়ে। চোখের জল বিভাজিত হয় না। কিউ-এর চোখের জল তার নিজস্ব। হৃদয়ের ক্ষত যদি গভীর হয়, তার দহন তীব্র দহন, চোখের জল গড়াবে, গায়ের কাপড় ভিজবে, মাথার বালিশ, তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কোথায়! কিউ ব্যতিক্রম নয়।

চণ্ডী দুবার ঘুরে গেছে। দুপুরে কি রান্না হবে দিদিকে জিজ্ঞাসা না করে রান্না বসাবে কি করে। সকাল থেকেই দিদি বড়ই অন্যমনস্ক, ব্রেকফাস্ট, চা বা অন্য কিছুই খায়নি। শরীর খারাপ কি-না জানতে চেয়েছিল, তার উত্তর সে ঠিক মত পায়নি। দাদাবাবু বাইরে যাবার পর থেকেই কিউ দিদি ভালো নেই। ঘড়িতে বারোটা বাজে, চণ্ডী নিরুপায়, কিউ দিকে ডাকতে হয়। চণ্ডীর ডাকে ঘুম জড়ানো চোখে কিউ তার দিকে তাকায়, বিছানায় উঠে বসে, চোখ রগড়ে।

—কি চণ্ডী?

—কি রান্না করবো দিদি? ডাল রাঁধব? মাছ আছে।—না আলু পটল দিয়ে বড় করে মাছের ঝোল? আলু ভাতে দেবো?

—তোমার যা মন চায় করো।

—তুমি না বললে, হয়?

—বলছি তো, যা হয় করো। ডাল না করলে ও চলবে। খাওয়া তো দুজনার।

চণ্ডী মাথা নেড়ে চলে যায়। কিউ বিছানা থেকে নেমে এক গ্লাস জল খায়। মাথার চুল ঠিক করে, মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ, ঘাড় পরিষ্কার করে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। দুপুর বেলা, ঝক্‌ঝকে উত্তপ্ত রোদ, রাস্তায় যাতায়াত করার লোক সংখ্যা কম। বাইরে তাকানো যায় না। চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। তবুও চোখ ছোটো করে অন্যমনস্ক ভাবে বাইরে তাকায়। কিছুটা ঘুম হয়েছে, শরীরটা হালকা মনে হচ্ছে। মন শান্ত। বসার ঘরে খবরের কাগজ নিয়ে বসে। ঘড়ির কাটা এগিয়ে যায় সময়ের সাথে। অনিচ্ছায় ক্ষুধা হীনতায় খাওয়ার চেষ্টা, বই পড়া, কম্‌পিউটারে কাজ করা, দিন ফুরোয় রাত নামে, কিউ-এর জীবন থেকে একটা করে দিন কমে যায়।

সন্ধ্যার কিছু পরে মালবিকার ফোন আসে। মাঝে মাঝে ফোন করছে। টিভিতে বাংলা সিরিয়াল দেখছিলো। টেলিফোনে খবর পায়, মালবিকার স্বামী, সুকান্ত মণ্ডল গ্রামে একটা স্কুলে চাকরি পেয়েছে, খুব খুশি। কিউ অভিনন্দন জানায়, মালবিকা তিন চার দিন মায়ের কাছে যেতে পারেনি, সে কারণে তার মন খারাপ। টেলিফোনে খবর নিয়েছে। মানবকেও মালবিকা তার নিজের বিয়ের খবর দিয়েছে, তবে সে ব্যাপারে তার দাদা ভালো মন্দ কিছু বলেনি। নিজের ব্যথায় সে জর্জর, বোনের বিয়ের ব্যাপারে বাবা মাকে অস্বীকার করে তার বোনের সিদ্ধান্তে বিয়ে—সে বিষয়ে মানবের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। প্রায় ছ'মাস হতে চললে মালবিকার বৌদি অর্থাৎ মানবদার স্ত্রী, তার কোলের ছেলে নিয়ে বাবামায়ের কাছে চলে এসেছে, এখনো ফেরেনি। দাদা সেখানে একা আছে। বিবাহিত পুরুষ, যার স্ত্রী আছে, একমাত্র সন্তান আছে, দূরে থাকে, দাদা একা—ভাল না। জানে না এভাবে কতদিন চলবে। সমস্ত ব্যাপারটা, মালবিকা ছোট বোন, সেও মর্মাহত। ইত্যাদি। সাধারণ দু চারটে কথা বলে মালবিকা টেলিফোন ছেড়ে দেয়। লাবণীকে ছোট করে পরামর্শ দেয়, তুমিও কিছু একটা করো, লাবণীদি।

কি করবে লাবণী? কিছু করতে চাওয়া বা করা কি খুব সহজ! তার জীবন থেকে সে সুযোগ বা সেই সময় অতিক্রম করে গেছে। একবার সুযোগ নষ্ট হলে, সে সুযোগ না গ্রহণ করলে অন্য কোনো সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু সময় অতীত হয়ে গেলে, সে সময় হারিয়ে যায়, আর ফেরে না!

যে সিরিয়ালটা দেখছিলো, তার সময় ফুরিয়ে গেছে। নাম দেখাচ্ছে, চ্যানেল বদলায়,

মিউজিক চ্যানেল্। গান হচ্ছে, সাথে নাচ, নাচছে নায়ক, নায়িকা অনেক সাথী নিয়ে, নানা ভঙ্গিমায়, নানা পোষাকে— দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য নাচের পোষাক বদলাচ্ছে। দ্রুততাল, দ্রুত ছন্দ, দলবদ্ধভাবে শারীরিক কসরৎ চলেছে একের পর এক। ভাল লাগছে না—সময় কাটছে, আর কি। উদ্দেশ্যহীন বেকার সময়—একমাত্র প্রতীক্ষা কবে বসন্ত ফিরবে।

শরীরের সাথে সাথে মনেও এক ঘেঁয়েমি চেপে বসছে। কোনো কাজে উৎসাহ পাচ্ছে না উৎসাহ নেই। কুমায়ুন থেকে ফিরে যে উৎসাহ নিয়ে কাজে হাত দিয়েছিল বসন্ত যাবার পর থেকেই কাজের উৎসাহে ঘাটতি চলছে। বসন্তের উৎসাহ না থাকলেও কিউ-এর উৎসাহে বসন্ত কাজ করে, এবং বসন্তকে উৎসাহিত করে বসন্তের কাজে কিউ আনন্দ পায়, কাজ করে কিউও সাথে সাথে। বসন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি, তার প্রেরণার উৎস কিউটি—বসন্ত বলে। কিউ-এর শুনতে খারাপ লাগে না। বসন্তের কাজে মনুষ্য সমাজ উপকৃত হয়। মনুষ্য সমাজ বসন্তের কাছে থেকে অনেক কিছু আশা করে—কিউ-এর প্রেরণায় পৃথিবীর যদি উপকার হয়, তাতেই কিউটি সন্তুষ্ট, এবং তার স্বার্থকতা। বসন্তের প্রতি সে কৃতজ্ঞ, সে ঋণী, অন্ততঃ বসন্তের অশেষ ঋণের সামান্য শোধ হলেই সে তৃপ্ত। এটাই তার ব্রত।

চণ্ডী নেই। বেরিয়েছে, মনে হয় বাড়ি গেছে, বলছিল একবার। সপ্তাহে অন্ততঃ দুদিন বাড়ি যায়, সকলকে দেখে আবার ফিরে আসে। কিউকে ফ্ল্যাটে একা একা রাতে থাকতে হয় না। তবুও ছেলে মেয়ে বৌকে একবার চোখের দেখা না দেখলে চলে।

বসন্ত থাকলে প্রতি রাতেই বাড়ি ফেরে, সকালে বাড়ি থেকে ফিরে আসে। আজো ঠিক আসবে।

ফোন বাজে। বেলা গড়িয়ে গেছে। বসন্তের গলা। ধরে প্রাণ আসে। সুখবর। হায়দ্রাবাদে এ যাত্রায় তার কাজ শেষ। টিকিট বুক হয়ে গেছে, ফিরছে, রুচী আন্টি ফিরছে। রোহিত এবং তার স্ত্রী হনিমুনে পনের দিনের ইউরোপ ট্যুরে যাচ্ছে, বসন্তের ফেরারে খবরে আনন্দিত, শিহরিত, কিন্তু রুচী আন্টি ফেরার খবরে আতঙ্কিত। তার সন্দেহ যদি সত্য হয় এবং সত্যই যদি সে সন্তান সম্ভবা হয়, রুচী আন্টি কি বলবে! আতঙ্কে মুখের রঙ সাদা হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে কাঁপতে কাঁপতে দুহাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়ে।

কিছু পরে, বেল্ বাজে, দরজা খোলে অলস পায়ে, চণ্ডী ফিরেছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

হায়দ্রাবাদ এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছিল বসন্ত, প্লেন রাইট টাইমে ছাড়বে, দমদমে পৌঁছাতে সাড়ে নটা বেজে যাবে, রুচী সাদার্ন এভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে উঠবে। ঘন্টা খানেক আগে রোহিতের প্লেন, বৌমা ও রোহিতকে নিয়ে ছেড়ে গেছে, মিড নাইটে বোম্বে থেকে এয়ার ফ্রান্সের ফ্লাইটে প্যারিসের পথে উড়বে। ওদের যাত্রা শুভ হৌক মনে মনে কামনা করে কিউটি। কিউ যেন আজকরে রাতটা কষ্ট করুক, কাল সকালে আসবে এবং এখানে লাঞ্চ করবে। স্বাভাবিক, রুচী আন্টি আর বসন্ত ফিরছে এক সাথে, বসন্ত সাদার্ন এভিনিউয়ের ফ্ল্যাট ছেড়ে এখানে আসে কি করে! তাছাড়া রুচী আন্টি কলকাতায় থাকলে প্রতি রাতে বসন্ত এই ফ্ল্যাটে থাকেও না।

রাত সাড়ে নটা বাজে। টিভিতে একটা হিন্দি সিনেমা হচ্ছিল, খুলে বসেছিল কিউ। একটু দূরে ছোট টুলের ওপর বসে চণ্ডী অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে দেখছে। সিনেমা দেখার খুব সখ চণ্ডীর, যে কোনো ছবি হলেই হলো। হিন্দি বেশি ফেভারিট। ওর বাড়িতে টিভি নেই। দীর্ঘদিনের ওর বৌয়ের দাবি, বাড়িতে একটা টিভি হলে, ঘরে বসে দেখতে পারে।—সে দাবি চণ্ডী মেটাতে পারেনি, মনে আফশোষ আছে। চার-চারটে ছেলে মেয়ে, কোনোটাও এখনো সে রকম রোজগার করে না। তার একার রোজগারে দু'বেলা দুটো ভাত জোটে। বড় ছেলে পাড়ার সাইকেল সারানোর দোকানে কাজ শিখছে—তেমন কোনো রোজগার নয়, তবুও মায়ের হাতে কোনো কোনো সপ্তাহে দশ বিশটা টাকা দেয়, সে টাকায় ওর মায়ের ছেলে মেয়েদের জন্য আলুটা পটলটা, কোনো কোনোদিন সস্তায় মাছ কিনে ছেলে মেয়ের পাতে দেওয়া সম্ভব হয়। ছোটো ছেলে পাড়ার স্কুলে পড়তে যায়, পড়ার জন্য পয়সা লাগে না, এক মেয়েকে স্কুলে দিয়েছিল, সে স্কুলে যায়না, পড়ায় মন নেই, ঠিক মত বাড়ি পেলে, ঘর মোছা, বাসন মাজার কাজ করবে। ছোট মেয়ে হাঁটতে শিখেছে। অত্যন্ত অভাবের সংসার। রিফিউজি হয়ে ভারতে এসেছিল, সরকার এক ফালি জমি দিয়েছিল, করগেট কেনার টাকা, সে টাকায় ছ্যাঁচার ঘর, সেই ঘরটাকে মাঝে মাঝে সারাই করে চালিয়ে নিচ্ছে। তখন সংসার ছোটো ছিল, চলে যেতো, এখন সংসার বেড়েছে, আয় বাড়েনি। বড় ছেলেটা কাজ শিখলে পয়সা কড়ি বাড়লে, চালিয়ে নেবে, নইলে দেনা করতে হবে, চণ্ডীর ইচ্ছা ছিল মোটর ড্রাইভিং শেখাবে, দাদার গাড়ি চালাতে পারতো। কিন্তু ড্রাইভিং শেখাতে টাকা লাগবে, একসাথে অনেকগুলো টাকা, যোগাড় করবে কি ভাবে? ছেলেও শিখতে চায়। ছেলেটা বেয়ারা নয়, বাবা মায়ের কথা শোনে।

রাত বাড়ছে। সিনেমা শেষ হতে বেশি দেরি নেই। দিনে তরাকারি বানিয়ে রেখেছে। আটা মেখে কয়েকটা রুটি করে, তরকারি গরম করে কিউ দিদিকে দেবে, নিজে খাবে দিদির খাওয়া হয়ে গেলে। দিদি বললে দাদা কলকাতায় পৌঁছে গেছে। কাল সকালেই দাদা এ বাড়িতে এসে যাবে। এতদিন মন মরা হয়ে আছে দিদি, চণ্ডীর কষ্ট হয়। একা একা থাকে, এতটা বয়স হলো, বিয়ে থা হয়নি। বড় বড় লোকেদের ব্যাপার! সে যাই হৌক, দাদা এসে গেলেই, দিদির মন খারাপ দূর হয়ে মুখে হাসি ফুটবে। এই বাড়িতে একা দিদির সাথে তাকে থাকতে হয়, সেই দিদি যদি মন খারাপ করে বসে থাকে, কার ভালো লাগে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় সে জিজ্ঞাসা করে— কিন্তু করতে পারে না। বাড়ির একজন চাকর মাত্র, তারা মালিক লোক—এসব কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। বেশি খারাপ লাগলে নিচের দারোয়ানের কাছে গিয়ে দুদণ্ড বসে, গল্প করে, বিড়ি খায়। দারোয়ানটির বাড়ি নদীয়া জেলার বর্ডারের কোন একটা গ্রামে। চণ্ডীর মত আরো দুতিন জন আছে, যারা একত্র হলে, একথা সে কথা, নিজেদের কথার সাথে এ ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাটের কথা হয়, সিনেমার গল্প হয়, ক্রিকেটের গল্প হয়, কোন ম্যাচে কে সেঞ্চুরি করেছে, ওরা ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে। ওরা অনেক দিন চণ্ডীর কাছে দিদির কথা জানতে চেয়েছে—দিদি কে; কোথায় বাড়ি, বুড়ো বাবুর সাথে 'থাকে' কি-না, কেন বিয়ে করেনি, না বিধবা ইত্যাদি—চণ্ডী জানে না, উত্তর দিতে পারে না, বলে জানি না। সত্য কথা। চণ্ডী এসব জানবে কি করে! বাবুরা কি ঘরের কথা বলে? বলে না। না কি বাবুদের এসব জিজ্ঞাসা করা যায়। চণ্ডী

এতো বোকা না।

মন দিয়ে সিনেমা দেখছে চণ্ডী। দারুন জম জমাট ছবি, যেমন নাচ তেমনি মার পিট-হিট্ বই, হিট্ হিট্ সব গান গুলো। তারই মাঝে মাঝে চণ্ডীর দিদি, বাবুদের ও নিজের বাড়ির বৌ ছেলেমেয়ের কথা মনে আসছে। কিউ বসে, টিভিতে ছবি চলছে, কিন্তু কি গল্প, কেমন গল্প সে জানে না কারণ টিভির পর্দায় মাঝে মাঝে চোখের নজর পড়লেও মন বসেনি। তার মন—রুচী আন্টি এতক্ষণ ফিরেছে, বসন্তও ফিরেছে—একটা ফোন করতে পারতো—শুধু সংবাদ—আমরা নিরাপদে পৌঁছে গেছি। দুশ্চিন্তা হয় না, তবুও মন খুঁত খুঁত করে। সে জানে, বসন্ত নিশ্চয় ফিরেছে, তবুও মন সম্পূর্ণ শান্ত এবং খুশিতে ভরপুর নয়। ইতিপূর্বে, বসন্তের ট্যুর থেকে ফেরার খবরেই মনের সুর বদলে যেতো, গুন্ গুন্ করে হৃদয় আপনা থেকেই গেয়ে উঠতো খুশির ছন্দে। একাকিত্বের বেদনা অপসৃত হতো, শূন্য মন ফিরে পেতো পূর্ণতা। বসন্তের উপস্থিতি মনে আনন্দ বন্যা কূলছাপানো নদীর প্লাবনের ন্যায়, উপচে পড়তো হৃদয় ছাপিয়ে, ভেসে যেতো সমস্ত বিষাদ। আদরে আদরে কাছে পাওয়া বসন্তকে ভরিয়ে দিয়েও নিঃশেষ হতো না। কিউ জানে দীর্ঘদিন পর বসন্ত হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরে এসেছে, আগামী কাল সকালেই সে কিউয়ের কাছে আসবে তবুও মনে সেই উচ্ছ্বাস নেই, বরং আনন্দ ও অজানা আশঙ্কায় মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

আনন্দ হচ্ছে না, ঠিক, তা নয়। একা থাকতে হবে না। কত কথা জমে আছে, যে কথাগুলো বলার জন্য সে দীর্ঘ প্রতিক্ষায় আছে, ফোনে কথা হয়েছে, ইচ্ছা হলেও সে বলেনি, জমিয়ে রেখেছে, সংগোপনে রাখা সেই আশঙ্কা মিশ্রিত সুখবর, তার ইচ্ছার ফসল, স্বপ্নের ফসল, যা তার সন্দেহ, তার শরীরে ধীরে ধীরে রূপ পেতে চলেছে, বসন্ত ফিরলে তাকে বলে সে মুক্তি পাবে, তৃপ্তি পাবে, ভরসা পাবে, মুক্তির আনন্দে সে যে উদ্বেল নয়, তা নয়। বসন্তের ফিরে আসার খবরে উচ্ছ্বসিত হলেও বসন্তের কাছে কিভাবে উপস্থাপিত করবে সে ভেবে পাচ্ছে না। সে জানে না বসন্ত কিউ-এর খবর কি ভাবে নেবে। সংশয়, ভীতি ও আনন্দের মিশ্র চিন্তায় সে অস্থির। এ এক অদ্ভুত, অভূতপূর্ব মানসিক দ্বন্দ্ব। সে না পারছে হাঁসতে, না পারছে কাঁদতে। মুক্তির আনন্দ. ইচ্ছা পূরণের আনন্দ সাথে অজানা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতে টানা পোড়েনে কিউ চিন্তিত, বিষণ্ণ।

ফোন বাজে। দ্রুত ফোন ধরে। না, বসন্তের কল্ নয়। ফোন করেছে ডায়মণ্ডহারবার থেকে মালবিকা। নিরস মালবিকার শশুর বাড়ির কথা শুনতে হয়। তবুও কিছু সময়ের জন্য নিষ্কৃতি।

—জানো লাবণীদি, আজ আমি না—বালতিতে জল নিয়ে তাতে গরুর গোবর গুলে ঘর মোছা শেখা শুরু করলাম। মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে—বেশি পারিনি। চেষ্টা করে দেখলাম—করতে পারবো। যদিও সুকান্ত নিষেধ করেছে। আমি ঠিক করেছি, করবো। গ্রামের বৌ আমি, শহুরে হয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। হয়? কি বলো?

—ঠিক।

—আমি ঠিক করেছি?

—ঠিক।

মনের জোর আছে মালবিকার। সাহসি মেয়ে সে। সুখি হবে।

—ছ'টা গরু আছে। দুটো গাই দুধ দেয়। বালতি করে আমার শাশুড়ি দুধ দোয়। আমার গরুর কাছে যেতে ভয় করে—কাছে যাই না।

—না যাওয়া ভালো। যদি সিং দিয়ে গুতিয়ে দেয়, গুতোলে রক্ষা নেই।

—শান্ত গরু। গুতোয় না। তবুও ভয় করে।

—কাছে যেয়োনা। দূরে থাকবে।

—জানো, লাবণীদি, বৌদি এসেছে। দাদার ছেলেকে নিয়ে বৌদি সণ্টলেকে ওর মায়ের কাছে আছে অনেকদিন।

—ভালোই তো।

—ভালো মন্দ জানি না। ছ'মাস হলো দাদার ছেলের বয়স। তারো তিনচার মাস আগে বৌদি বাঙ্গালোর থেকে চলে এসেছে বাবা মায়ের কাছে। এখনো বৌদি তার বাবা মার কাছে, দাদার শশুর বাড়িতে।

—ভালোই তো। বাচ্চা বড় হৌক যাবে। একা একা বাঙ্গালোরে সংসার করা, বাচ্চা মানুষ করা সহজ নয়—

—তাই বলে নিজের ছেলের ছ'মাস বয়স হলো, দাদা একবারের জন্যও দেখতে আসবে না? বৌদি ফিরে যাবে না?

—আসবে, সময় পায়নি হয়তো, সময় পেলে ঠিক আসবে।

—না গো। ওদের মধ্যে নিশ্চয় কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে। খুব সিরিয়াস্।

—যাঃ, তা হয় নাকি।

—দাদা ও বৌদির সম্পর্ক কোনদিনই নর্মাল নয়।

—ঠিক না।

—নিশ্চয়ই ঠিক না। আগে যা হবার হয়েছে, কিন্তু বিয়ের পর সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিৎ, সেখানে কোনো শূন্যতা থাকা ঠিক না। বড় ছেলের বয়স পাঁচ বছর এটি দ্বিতীয়।

—তুমি তো অনেক কিছু শিখে ফেলছো!

—শিখতে হবে না? ছোটবেলা থেকেই তো আশেপাশের, বাড়ির এবং অন্যান্য পরিবারের লোকজনকে দেখছি, বই পড়ছি—তাতে আমার বিশ্বাস, বিয়ের পর স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক শুধু মধুর নয়, বিশ্বস্ত হওয়া প্রয়োজন। দুজনের সম্পর্ক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকা উচিৎ, সেখানে গোপনীয়তা সম্পর্ককে দুর্বল করে। তুমি দেখো—সুকান্ত আর আমার সম্পর্কে কোনোদিন ফাটল ধরবে না। বা ফাটল হতে দেবো না।

—সুকান্ত, তোমার বরের নাম বুঝি? আমার মনে থাকে না।

—হ্যাঁ, সুকান্ত মণ্ডল। নামে কি আসে যায় বলো?—আসলে দেখতে হবে লোকটি কেমন।

—সে কি, সুকান্ত তো খুব সুন্দর নাম, বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, তোমার সুকান্তও কি কবিতা লেখে? না বিপ্লব করে?

—কিচ্ছুই করে না। কলেজে পড়ার সময় ইউনিয়ন করতো—এই সবে প্রাইমারি স্কুলে মাষ্টারির চাকরি পেল। আমি ওতেই খুশি, আমার ওর চাকরির ব্যাপরে কোন আফ্শোষ নেই।

—আমি জানি তো, তুমি খুব ভালো মেয়ে।

—ভালো মন্দ জানি না। তোমাদের, আমাদের, আমাদের বাড়ির, দাদা বৌদির যা অবস্থা, যা দেখছি, আমার ভালো লাগে না। তাছাড়াও নতুন কিছু করার, নতুন কিছু শেখার, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আমার ভালো লাগে, সত্যি বলছি। ছোটো থেকে গ্রামের গল্প শুনে, বইয়ে পড়ে গ্রাম সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল, সুযোগ পেলাম, গ্রামের ছেলেকে বিয়ে করে ফেললাম। গ্রামের জীবন—এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা।

—ভালো লাগছে?

—চেষ্টা করছি। ভাল লাগবে। ঢেকিতে ধান ভানা, চাষের জমিতে কাজ করে, গরু ছাগল পালন করা।

—চাষের জমিতে কাজ?

—হ্যাঁ, গ্রামের মেয়েরা করে তো। আমি চেষ্টা করবো, পাববো কিনা জানি না। যদিও আমার শশুর বাড়িরা কোনো মেয়ে জমিতে কাজ করে না, হয়তো আমাকেও করতে দেবে না।

—না করাই ভালো, গ্রামের সব মেয়েরা তো কৃষিকাজ করে না।

—দেখি। অবশ্য আমি এখনি চাষের কাজে যাচ্ছি না, তবে গৃহস্থালি কাজ, যেমন ধান ভানা, গম পেষা, ডাল ভাঙা, ঘর মোছা, গোয়ালে কাজ করা, গরুর দুধ দোওয়া—শেখা যাবে। পুকুর জলে স্নান—

—তুমি তো বড় ইন্টারেস্টিং মালবিকা, মোষ্ট্ রোমান্টিক্—

—যে পরিবেশ বেছে নিয়েছি, সেই পরিবেশ থেকেই তো জীবনের সুখ পেতে হবে।

—তুমি সুখী হবে।

—আশীর্বাদ করো।

—নিশ্চয় করছি। রাত হোলো, এবার ছাড়ি।

—হ্যাঁ। ছাড়ছি।

মালবিকার সাথে কথা শেষ করে সোফায় বসে কিউ। হাঁ করে টিভি গিলছে চণ্ডী। ঘড়ির দিকে তার খেয়াল নেই।

—চণ্ডী।

—যাই দিদি। উঠছি। তোমার খাবার করে দিচ্ছি। আর পাঁচ-মি-নি-ট...

সিনেমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত টিভির সামনে থেকে চণ্ডীকে সরানো যাবে না। সিনেমা শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। শেষটুকু দেখে উঠবে। দেখুক, দেখতে ভালোবাসে। টিভি খুললেও টিভির দিকে তার মন নেই। সদ্য টেলিফোনে মালবিকার সাথে বার্তালাপ তার মনে পরিষ্কার ভাবে বিচরণ করছে। এই সেই মালবিকা, মালু, তার সামনে জন্মেছে, তার কোলে বড় হয়েছে। কোন বাড়ির মেয়ে! কোথায় বিয়ে হলো! কল্পনায় মালবিকার শশুর বাড়ির ছবি মনের মধ্যে আন্দাজ করার চেষ্টা করে কিউ। গ্রামেব বাড়ি, ধুলো, বর্ষায় কাদা, গরু, মোষ, ছাগল, বারান্দায় মুরগি চরছে, কেঁচো পোকা মাকড়, তার মধ্যে বিধান নগরে সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে বড় হওয়া মালু গৃহবধু। তাঁতের বা ছাপা মোটা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ঝাঁটা দিয়ে উঠোনে ঝাড়ু দিচ্ছে কিম্বা ঢেকিতে পা দিয়ে চাপ দিয়ে ধান ভানছে। ভাবা যায়না। অদ্ভুত জীবন। সংসার বড় বৈচিত্রময়। কোথাকার মানুষ কোথায় চলে যায়, কে কিসে সুখ পায়, বা কিসের সুখে মানুষ বেঁচে থাকে, কার মনের কোণে কি ধরণের বাসনা লুকিয়ে থাকে—বোঝা দায়। সেই ছোট, ফ্রক পরা মালবিকাকে

দেখেছে কিউ, তার পর বহুবছর কেটে গেছে তাকে দেখেনি। তবুও কল্পনায় গ্রামের বধূ বেশে শহরে মালবিকাকে সে দেখতে পাচ্ছে—কপালে বড় সিঁদুরে শহুরে ফোঁটা। সীমন্তে চওড়া লাল সিঁদুর পায়ে আলতা পরা গ্রামের বধূ মালবিকার সাথে কুমায়ুন পাহাড়ের পাহাড়ি বধূর কোনো তফাৎ নেই। দুজনের সুখ দুঃখ নিত্য জীবন এক অনুভূতি জড়ানো। বিস্ময়।

এ সকল কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে নিজের জীবনে হাজির হয়, খেয়াল করে না কিউ। অজান্তে চোখের পাতা ভিজে ওঠে। সোফা ছেড়ে খোলা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়, মাথার ওপর টুকরো আকাশ, আকাশে দূরে দূরে তারা সমূহ—আকাশের রঙ কালো, মাঝে মাঝে মিট্‌মিট জ্বলছে অনুজ্জ্বল তারাদল। চাঁদ নেই। শুক্লপক্ষ না কৃষ্ণপক্ষ জানে না। চোখের জল লুকোতে বারান্দায়, চিন্তার সূত্র ছিন্ন, চোখের বাষ্পরাজি উধাও। ভালো না। হঠাৎ হঠাৎ চোখের জল আসা ঠিক না। অনেক চোখের জল ফেলেছে সে, আর নয়। তবুও অন্যের কথা ভাবতে ভাবতে বারে বারে নিজের কষ্টের কথা কেন যে এসে চোখের সামনে ভিড় করে জানে না, সাথে সাথে চোখের জল। শুধু চোখেই নয়, সমস্ত শরীর মন একসাথে কান্না জুড়ে দেয়।

মানবদার সন্তান হওয়ার পর তার বৌ অর্থাৎ বৌদি মানবদার কাছে, বাঙ্গালোরে ফিরে যায়নি। সে তার বাবা মায়ের কাছে অর্থাৎ মানবদার শশুর বাড়িতে আছে। মানবদা এখনো তার দ্বিতীয়, তার ছেলেকে দেখতে আসেনি। মানবদা ও তার স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। এসব জানতো না কিউ। কি করেই বা জানবে! ঐ বাড়ির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে দীর্ঘদিন। মালবিকা বললে তাই জানতে পারলো সে। যদিও এসব খবর কোনদিন জানতে চায়না কিউ। যে কথাগুলো বলে মালবিকা তার অতীতকে জীবন্ত করছে, সে অতীতকে কিউ মোটেই জানতে চায়না। মানবদা ভালো নেই, মানবদা কষ্টে আছে, কিউ তার কি করবে? অহেতুক তাকে কষ্ট দেওয়া। এবারে মালবিকা ওদের কথা বললে, নিষেধ করবে কিউ। বলবে, তোমার কথা বলতে চাও বলো, কিন্তু অন্য কথা নয়...

সিনেমা শেষ হয়েছে। চণ্ডী উঠে গেছে। কিউ ফিরে এসেছে সোফায়। গত দুদিনে সে একবারের জন্যও হারমোনিয়ামে হাত দেয়নি। উৎসাহে গান শেখা শুরু করেছিল, খারাপ লাগতো না। প্রাথমিক জড়তা কেটে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। হারিমোনিয়ামের সুরে নিজের গলা মেলাতে শুরু করেছিল। কিন্তু বিগত দুদিন, মানসিক বিষণ্ণতার কারণে কিছুতেই নিজেকে হারমোনিয়ামের কাছে নিয়ে যেতে পারেনি। বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ে কোনো কিছু ভালো লাগে না। দিনের প্রথম স্নিগ্ধ আলোর পরশে যেমন সৃষ্টি তার সৃজনশীলতায় মুখর হয় সেই আলোর, বড় অভাব তার অন্তরে। অন্ধকার—বিষাদে পূর্ণ, শান্তি নেই, বিরক্তি সমস্ত কিছুতে। মনসংযোগের অভাবে গান শেখার ইচ্ছা গত দুদিন বান্‌চাল্ হয়ে গেছে। না পেরেছে গান শিখতে, না ভালো লাগছে খবরের কাগজ পড়তে না খেতে, বসতে, শুতে। এমনকি মালবিকার বক্‌বকানি শুনতে প্রচণ্ড খারাপ লাগছিল। তবুও মালবিকার সব কথা শুনেছে। নতুন কথা, নতুন জীবনের ভাষার কথা। কিউ জানে না কেন মালবিকা দীর্ঘদিন পর তার সাথে নতুন করে ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া দিতে চাইছে। লাবণীদির সাথে তার গল্প করার কি আছে! তার কি বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত লোকের অভাব? তবে কি কারণে? সে যেচে, ফোন করে তার কথা, তাদের কথা বলে।

তবে কি মালবিকা তার কাজের জন্য কারোর সমর্থন খুঁজছে?—সেই সংশয়। নাকি, তার কথা শোনার জন্য একমাত্র লাবণীদিই শ্রোতা? নাকি লাবণীদির প্রতি সহানুভূতিশীলতা থেকে, লাবণীর প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে লাবণীকে সে সমবেদনা জানাচ্ছে? যে অন্যায়, যে অপরাধ তরা বাবা, মা, দাদা করেছে, মালবিকা কি তাদের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে? সে কি চায় লাবণীদির সাথে কথা বলে, তার পরিবারের দোষ কিছুটা লঘু করতে পারবে?—সম্ভাব্য কারণ হিসাবে কিউ উপরি উক্ত বিষয়গুলো মাঝে মাঝে না হলেও মালবিকা ফোন করার পর পরই চিন্তা করে। অথচ এই মালবিকা শৈশবে লাবণীকে কম হিংসা করতো? অথচ লাবণীই প্রধানতঃ কোলে পিঠে করে বড় করেছে মালবিকাকে। শিশু মালবিকার সে কথা আজ নিশ্চয় বধূ মালবিকার মনে নেই। পেরিয়ে আসা শৈশব। মালবিকার বর্তমান আচরণ কিউ-এর কাছে রহস্যময়। মনের মধ্যে হাজারো চিন্তার এক অস্বাভাবিক জটলা।

টেবিলে রাতের খাবার দেয় চণ্ডী। খাবার ইচ্ছা নেই তবুও খাবারের সামনে বসতে হয় নইলে চণ্ডী অসন্তোষ প্রকাশ করবে, ও খেতে চাইবে না। অগত্যা কিউ টেবিলে বসে, সামান্য কিছু খাবার চেষ্টা করে, বাকি অভুক্ত পড়ে থাকে। চণ্ডী টেবিল পরিষ্কার করে, প্লেট বেসিনে রেখে নিজের খাবার খেতে যায়। কিউ বেডরুমের দরজা বন্ধ করে, হালকা আলোর বাতি জ্বালে, সম্পূর্ণ বস্ত্রমুক্ত হয়, বাথরুমে ঢুকে গায়ে জল ঢালবে, নইলে ঘুম হবে না মোটেই। সামনের বড় আয়নায়, হালকা আলোয় অস্পষ্ট নিজের নগ্ন অবয়বের পূর্ণ প্রতিফলন। না, দৈহিক কোনো পরিবর্তন নয়। মেদমুক্ত সুঠাম সুন্দর তনু; ইষৎ-অবনত পরিণত পুষ্ট স্তন যুগল, সুডোল হাত ও নির্লোম পদযুগল, ক্ষীণ কোমর, স্ফীত নিতম্ব—সেই একই অপরিবর্তনীয়। এই সেই শরীর; মন্দির, যেখানে জন্ম নিতে চলেছে নতুন জীবন। না এখনো তার অবস্থান স্পষ্ট নয়। হালকা আলোয় নিজেকে নিজে দেখে সে, নিজের সৌন্দর্য্যে নিজেই খুশি, আনন্দের গড়্গড়্ শব্দ গলার মধ্যে। কোমল আঙুলে স্পর্শ করে অনুভূতিপ্রবণ স্থানগুলো, আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করে, সামান্য স্পর্শেই মৃদু শিহরণ এবং উত্থান প্রবণতা। কিছুদিনের মধ্যেই স্তনযুগলে মাতৃদুগ্ধ সঞ্চয় হতে শুরু করবে। মনে মনে কল্পনা করে আনন্দ পায়, তার শিশু তার কোলে শুয়ে মাতৃস্তন চোষণ করছে, দুধে ভরে যাচ্ছে শিশুর ছোট মুখ। ধন্য আশা! রোমকূপগুলো বিদ্রোহী হয়ে উঠছে, শরীরে মৃদু কম্পন—এক মদিরাশক্ত অনুভূতি। মানুষের শরীর মন বিধাতার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। একেই তবে দেহমন্দির বলে! বোঝে না কিউ তবুও অনুভব করে—বর্ণনা করতে পারে না। অবসন্ন শরীর ও মন হঠাৎই মানসিক যাদুস্পর্শে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। সেই জোয়ার ফিরে এসেছে শরীরে ও মনে—যে জোয়ার ভাসিয়ে নিয়ে যায়, দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। লাভক্ষতির হিসাব মানে না, জোয়ারের স্রোতে টালমাটাল কিউ, রাত বাড়ছে। বাড়ুক না! কিউ-এর তাতে কি! মায়াবি আলোয় নগ্ন কিউ-এর শরীরে হুঁশ নেই, নিজের নগ্ন শরীর উপভোগ করছে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায়।

স্বপ্ন! কিসের স্বপ্ন! জীবনের! কিউ-এর জীবনের! না যে আসতে চলেছে তার জীবনের! যার অস্তিত্ব এখনো অজানা, শুধু কল্পনায়, তার জন্য কি কিউ স্বপ্নাবিষ্ট! পাখার গতি বাড়ায়, টেবিল ফ্যান চালিয়ে দেয় পূর্ণ বেগে, স্বপ্নাতুর, আনন্দমুখর কিউ-এর চুল এলোমেলো, কোমল আঙুলের মৃদুস্পর্শে স্তনবৃন্ত জাগ্রত। শরীর রোমাঞ্চিত-মদালসা দেহবল্লরী। অতিক্রান্ত হয়ে যায় বেশ কতগুলো মুহূর্ত, ধীরে ধীরে মন স্থির হয়,

শান্ত হয় ভাবাবেগ, শরীরে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। কিউ বাথরুমে গিয়ে মগের পর মগ গায়ে জল ঢালে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, রাতের হালকা পোষাকে গা গলিয়ে বিছানায় এলিয়ে দেয় নিজেকে।

শরৎকাল অতিক্রান্ত। হেমন্তের আমেজ প্রকৃতিতে। ভোরের দিকে কলকাতা শহরেও সামান্য হলেও শিশির পাত হয়, কোনো কোনিদিন ব্যালকনির রেলিং-এ শিশিরের স্পর্শ পাওয়া যায়। বালিসে মাথা রেখে ঘুমোতে চেষ্টা করে কিউ। ঘুম আসে না—শুধু বালিশে মাথা রেখে-এপাশ, ওপাশ। বসন্ত কাল আসবে—-নিশ্চয় সকালেই। অনেকদিনের প্রতিক্ষার পর বসন্তকে কাছে পাবে। মনে পড়ে কুমায়ুনের সেই মাতাল করা রাতের কথা। প্রবল এক বাসনা চরিতার্থ করার মানসে কিউ অত্যাধিক পরিমাণে মদ্যপান করিয়ে বসন্তকে মাতাল করে কিউ। নিজেও পান করে অসংযতভাবে। সংযমের সমস্ত প্রতিরোধ হটিয়ে, প্রায় বৃদ্ধ বসন্তের শরীরে উদগ্র কামনা সৃষ্টি করে কিউ মনপ্রাণ দিয়ে মাতৃত্ব কামনা করে বসন্তকে গ্রহণ করে তার সম্পূর্ণ নারীত্ব দিয়ে। বসন্ত একজন হৃদয়বান পুরুষ, মহান, অনুভূতিপ্রবণ, কিউ কামনা জর্জরিত নারী; প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে যুগে যুগে সৃজনশীল সৃষ্টি ক্রিয়া চঞ্চল। তার ফসলেই কিউ-এর নারী জীবনের স্বার্থকতা, জীবনের সত্য এবং নিশ্চিত অর্থ। বিছানায় শুয়ে সেই রাত্রির কথা মনে ভেবে কিউ রোমাঞ্চিত হয়, সুখ পায়। সেদিনের সুখানুভূতি আমরণ সজীব থাকবে। বসন্তের কাছে সে কথা নিবেদন করার জন্য কিউ-এর ঐ প্রতীক্ষা দীর্ঘতর মনে হয়।

কিন্তু কিউ এর এ হৃদয় নিসৃত অনুভূতি বসন্তের কাছে কিভাবে উপস্থাপন করবে, সে চিন্তায় তার অন্তর আকুল। কিভাবে গ্রহণ করবে বসন্ত, কি হবে প্রতিক্রিয়া? কিউ জানে না। যদি বসন্ত বিরূপ হয়! যদি অখুশি হয়? বসন্ত যদি কিউকে পরিত্যাগ করতে চায়? —কি করবে সে? কোথায় যাবে? আত্মহনন ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই। আত্মহনন অর্থাৎ, এই পৃথিবীর সকলের সবকিছু ত্যাগ করে, সকলের চোখের আড়ালে চিরতরে চলে যাওয়া—পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না। কারোর কোনো কিছু আটকে থাকবে না। দুঃখ যদি কারো হয়, তাও সাময়িক। একমাত্র যে যাবে, সেই হারাবে সব—আলো, জল, আকাশ, বাতাস, ফুল, ফল, জীবন। অথচ জীবন কি সুন্দর! কি মনোরম!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানে না, ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়। চণ্ডী ও আজ ডেকে তোলেনি। অলস পায়ে খাট থেকে নেমে পর্দা সরায়, বাইরে ব্যস্ত শহর, সকালের কোলকাতা। বাথরুমে ঢুকে পড়ে, ব্রাশ করে, স্নান করে—প্রাতঃস্নান দীর্ঘদিনের অভ্যাস। গায়ে সাবান বুলিয়ে স্নান করছে কিউ, শাওয়ার খোলা, ঝির ঝির করে জল পড়ছে কোমল শরীরে, গত রাতের সুখানুভূতি এখনো বিদ্যমান, আঃ কি আরাম! সে হেসে ওঠে নিঃশব্দে। ঝির্ ঝির্ করে শাওয়ারের জল, মনে খুশির রোমন্থন, হৃদয় আপনা থেকেই গেয়ে ওঠে, গলায় সুরের গুনগুনানি—"হৃদয়ের এ কূল ও কূল-দুকূল ভেসে যায়...। জলের শব্দ হারিয়ে যায় কিউ-এর গানের সুরে। মনের আনন্দে স্নান সেরে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

কিউ প্রস্তুত। বসন্ত আসছে। ওয়ার্ডোব খোলে। সালোয়ার নয়, বাড়িতে পরার ছোট প্যান্ট নয়৭ বাড়িতে পরার জামা বা হাউসকোর্ট নয়। বেছে বেছে একটা সুন্দর শাড়ী, রঙ মেলানো ব্লাউজ বের করে সে। আজ শাড়ী পরবে। উৎসব বা কোন উপলক্ষ্য

ব্যতিত সচরাচর শাড়ী পরে না কিউ। শাড়ী পরে অস্বস্তি লাগে, বারে বারে গা থেকে শাড়ী খসে পড়ে। কিন্তু স্নান করার সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে আজ বাংলার গৃহবধূর মত শাড়ী পরবে। শাড়ী পরে, কানে দুল কপালে লাল টিপ পরে আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরে ঘুরে দেখে। কেমন লাগছে নিজেকে?—মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করে। তাকে একজন ভারতীয় নারী বা ভারতীয় সন্তানের মায়ের মত মনে হচ্ছে? ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি, চোখে অপার বিস্ময় লেগে রয়েছে তার মুখমণ্ডলে। দরজা খুলে বাইরে বেরোয়। ব্যস্ত চণ্ডী। বেলা হয়ে গেছে।

—চা ঢালবো দিদি?

বিস্ময় ও আনন্দে প্রশ্ন চণ্ডীর। দিদির খুশিতে সে খুশি। চণ্ডী বড় সরল।

—হ্যাঁ।

খবরের কাগজ খুলে টেবিলে বসে কিউ। টেবিলে রাখা এক গ্লাস খাবার জল, ঢক্ ঢক্ করে জল পান করে। হেডলাইনগুলোতে চোখ বোলোয়, বিস্কুটের টিন খুলে বিস্কুট নেয়। বসন্ত সকাল সকাল আসলে পারতো! ফিরেছে কাল রাতে। রাতভর বিশ্রাম নিয়েছে। কিছু আগে আসলে দুজনে এক সাথে চা পান করতে পারতো। রুচী আন্টি আছে বলেই হয়তো আসতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু বসন্ত দীর্ঘদিন রুচী আন্টির সাথে এক টেবিলে চা পান করে না। হতে পারে ওরা দুজনে টেবিলে বসে গল্প করছে, কাগজ দেখছে। চা খাচ্ছে। হয়তো হায়দ্রাবাদ তাদের দুজনের মধ্যে সেই জাতিয় আণ্ডর স্ট্যাণ্ডিং হয়ে গেছে। হতেই পারে। এতে অস্বাভাবিকতা নেই। ওরা তো প্রকৃতই স্বামী-স্ত্রী। রোহিত ওদের দুজনের সন্তান। দাম্পত্য কলহ বা সম্পর্কের অবনতি দীর্ঘস্থায়ী কেন হবে? যদিও সে আশা ক্ষীণ। কারণ রুচী আন্টির যা মানসিকতা বসন্তের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা দুর্বল। মানসিকতা এবং ব্যক্তিত্বের সংঘাত, দুজনে দুজনের আলাদা জগতে বিচরণ করে। কিউটি বসন্তের সংসারে স্থানান্তরিত হওয়ার বহু পূর্ব হতেই ওরা দুজন স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব স্ব স্ব জীবন ধারায় বিশ্বাসী এবং অভ্যস্ত। সেখানে কোনো আপোষ নেই। রুচী আন্টি বুদ্ধিমতী এবং স্ত্রী হিসাবে বসন্তের ভালো চায়, সে কারণেই হয়তো বসন্তকে কিউয়ের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। রোহিতকে নিয়ে স্বামী স্ত্রীর সংসার। যে সংসারে কিউ অনেক দিন থেকেছে, তার মনে পড়ে না যে কোনোদিন ওরা স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি বসে কথা বলা, গল্প করা এমনকি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অথচ ওদের মধ্যে কোনো তর্ক-বিতর্ক বাদানুবাদের ঘটনা কিউ লক্ষ্য করেনি। বসন্তের সংসারে আশ্রিতা কিউ, নিজের শত দুঃখের মধ্যেও সে অনুভব করতো-এ এক অদ্ভুত, অস্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন, যে জীবনের সাথে মানস আঙ্কেলদের দাম্পত্য জীবনের মিল নেই, সম্পূর্ণ বিপরীত। বসন্তের সাহচর্যে মানসিকতায়। শুশ্রূষায় সে সুস্থ হয়ে উঠেছে, অন্তর্জ্বালা লাঘব হয়েছে, সাথে সাথে বসন্তের প্রতি তার অন্তরে জন্ম নিয়েছে সমবেদনার। মানুষ যন্ত্র নয়, হৃদয় গ্রহণই করে না, প্রতিদানেও প্রস্তুত হয়। কিউ বসন্তের সমব্যথী হয় কারণ বসন্ত বড় একা, রুচী আন্টির রোহিত আছে, বসন্তের কেউ নেই, বসন্ত প্রতিভাবান, মানবদরদি। এর পরে নতুন ফ্ল্যাটে কিউ এর স্থানান্তর বসন্তের কাজের সহযোগী, বসন্তের সাথী, সাদার্ন এভিনিউয়ের ফ্ল্যাটের সাথে তার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়ে যায়। তাও পাঁচ ছ-বছর তো হবেই।

রুচী আন্টির সাথে বসন্তের দাম্পত্য সম্পর্ক শুধু আক্ষরিক অর্থেই বিদ্যমান ছিল।

পরিবারের বাইরে থেকে কারোর পক্ষেই তাদের দুজনের সম্পর্কে যে তীব্র ব্যবধান, বোঝা অসম্ভব। বরং অনেকের কাছে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে উভয়ে স্বার্থক দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করে, রুচী আন্টি আদর্শ স্ত্রী এবং বসন্ত একজন আদর্শ স্বামী। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু তার বিপরীত। স্ত্রী হিসাবে স্বামীর শরীর স্বাস্থ্যের খবর রাখায় যদি আদর্শ স্ত্রীর সংজ্ঞা হয়, তাহলে নিশ্চয় রুচী আন্টি স্বার্থক এবং আদর্শ স্ত্রী, প্রকৃত অর্থে বসন্ত স্বামী হিসাবে তার স্ত্রী, রুচী আন্টির কাছ থেকে বঞ্চিত ছিল পূর্ণভাবে—মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে তো বটেই এমন কি নিজের সন্তান রোহিতের ওপরও বসন্তের কোন অধিকার ছিল না কোন দিনই। যদিও কুমায়ুনে থাকা কালে বসন্ত রুচী আন্টির ফোন পেয়েছে, খবর পেয়েছে রোহিতের, রোহিতের বিয়ের এবং বসন্তের শারীরিক কুশলতা বিনিময় হয়েছে অনেকটা কেতাবি ঢঙে, সেখানে প্রাণের স্পর্শ এবং আন্তরিকতার অভাব অত্যন্ত প্রকট। যেমন রোহিতের বিয়েতে বসন্তের মতামত ও উপস্থিতি শুধুমাত্র সামাজিকতা বজায় রাখার জন্যই। কারণ বসন্ত রোহিতের বাবা এবং রুচী আন্টির স্বামী প্রথাগতভাবে। হয়তো বা রোহিতের ইচ্ছায় রুচী আন্টি বসন্তকে রোহিতের বিয়ে উপলক্ষ্যে বসন্তের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার কথা টেলিফোনের মাধ্যমে জানিয়েছে। রোহিত হয়তো চাইতো তার বিয়েতে তার বাবা বসন্তের পূর্ণ অংশ গ্রহণ, এমন কি তার মতামতের প্রয়োজন আছে। বসন্ত অবশ্য রোহিতের বিয়েতে মা ও ছেলের সিদ্ধান্তকে শুধু পূর্ণ সমর্থনই জানায়নি বরং সেই সিদ্ধান্তকে স্বার্থক রূপ দিতে হায়দ্রাবাদে গিয়ে বিয়েতে বাবা হিসাবে পূর্ণ মর্যাদায় বিয়ে সম্পন্ন করে ফিরে এসেছে। যে ভূমিকা বসন্তের নতুন নয় চিরদিনের। বসন্ত প্রতিবাদ করতে জানে না বরং নিরবে রুচী এবং রোহিতের কোন সিদ্ধান্তকে সে বাধা দেয়নি। শত কষ্টেও তা মেনে নিয়েছে।

চণ্ডী চা দেয়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিউকে লক্ষ্য করে।

—আজ তোমাকে খুব ভালো দেখতে লাগছে দিদি। তুমি শাড়ী পড়লে খুব ভালো লাগে।

—তোমার মাথা।

—না দিদি, সত্যি বলছি, তোমাকে দারুন দেখাচ্ছে।

—খুব হয়েছে, যাও চা খেয়ে নাও, বাজারে যেতে হবে।

বসন্ত লাঞ্চ করবে। লাঞ্চের মেনুতে কি কি থাকবে, মনে মনে ঠিক করে ফেলে কিউ। বসন্ত আসছে, লাঞ্চ করবে, ব্রেকফাস্টও করতে পারে—কিউ সব কিছু রেডি রাখবে, বাজার থেকে দই আনবে, মিষ্টি আনাবে। চা খাওয়ার পর বাজারে যাবে চণ্ডী। চা খেয়েই কিউ বাজারের লিস্ট করে চণ্ডীকে বুঝিয়ে দেবে। স্নান করার পরই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কিউ খুশি-খুশির হাসি হৃদয় জুড়ে, বসন্ত আসবে—কিউ সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

বসন্ত, কিউ জানে তার সাথে বসন্তের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

কিন্তু এই সম্পর্ক, বসন্ত আর কিউ-এর মধ্যে, কি সেই সম্পর্ক? কিসের সম্পর্ক? সামাজিক পরিভাষায় এই সম্পর্কের কি নাম? কি তার সামাজিক মূল্য?—জানে না কিউ। কিউ শুধু জানে বসন্ত আর সে অভিন্ন হৃদয়। সেটাই কি সব? —নিশ্চয়। সেটাই সব। দুটি হৃদয় যখন একে অপরকে সম্পূর্ণভাবে চায়, সে সম্পর্কের অভিধানিক বা পরিভাষাগত ভাবে যে নামই দেওয়া হৌক—সেই সম্পর্ক পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম সম্পর্ক। বসন্ত একজন সুস্থ পুরুষ, মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে, কিউ একজন

নারী, সেও সম্পূর্ণ সুস্থ, একে অপরকে মনে প্রাণে ভালোবাসে, বয়সের ব্যবধান, সামাজিক বা নৈতিক ব্যবধান যাই থাকুক, সে সম্পর্ক অত্যন্ত মূল্যবান। নারী ও পুরুষের সম্পর্ক, স্বামী স্ত্রী, বাবা মেয়ে বা ভাইবোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কেন থাকবে? হলই বা বয়সের হিসাবে বসন্ত কিউ-এর পিতৃতুল্য। কিউ-এর আশ্রয়দাতা, অসময়ের একান্ত আপন. দুঃখের সাথী. বসন্তের মনের প্রতিটি তন্ত্রীতে কিউ-এর উপস্থিতি, কিউ এর শরীর ও মনের শূন্যতা একমাত্র বসন্ত পূর্ণ করে, বসন্ত কিউ-এর আশা, ভরসা বন্ধু ও একান্ত এবং একমাত্র আপন। এর চেয়ে অন্য কোনো সম্পর্ক বড় হতে পারে?— পারে না। তবুও কিউ কখনো কখনো এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ব্যাকুল হয়। প্রশ্ন করে নিজেকে— বসন্ত তার কে?

অহেতুক প্রশ্ন! বসন্ত ছিল না, বসন্ত ফিরেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সে এসে হাজির হবে। তার আসতে দেরী হচ্ছে দেখে মন উদ্বিগ্ন—তবুও কি বসন্তেরর সাথে তার সম্পর্কের উত্তর পরিষ্কার নয়। নৈতিকতা বা সামাজিকতাই কি সব! সমাজ কি আলাদা কোনো বস্তু? সমাজ তো মানুষ নিয়ে—মানুষদের সমাজ। সমাজের নীতি বা নিয়ম মানুষ তৈরি করেছে। সময়ের সাথে সাথে তা বদলেওছে। মানুষের স্বার্থে। ব্যক্তি মানুষ তারই অংশ। আদিতে যখন পরিবারের জন্ম হয়নি, পৃথিবীর সকল পুরুষের নারীর ওপর এবং সকল নারীর সকল পুরুষের ওপর অধিকার ছিল। একদা নারী তার প্রিয় পুরুষ বা স্বামী নির্বাচন করতো, পুরুষ নয়। গন্ধর্ব মতে বিবাহ সিদ্ধ ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে নীতি বা সামাজিক পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের বা সমাজের প্রয়োজনেই। এখনো অনেক পুরুষের একাধিক স্ত্রী বর্তমান, এখনো সেবাদাসী আছে। নীতি কখনোই অপরিবর্তনীয় নয়। পরিবর্তন হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের বিন্যাস বদলাবে। পরিবার প্রথা চালু হওয়ার সাথে সাথে পরিবারের সংজ্ঞা, পরিবারের পরিধি, পারিবারিক জীবনে একে অপরের সাথে সম্পর্কের নামাকরণ পরিবর্তনশীল। নৈতিক সংস্কার পরিবর্তন এক স্থায়ী প্রক্রিয়া। এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক নীতি বর্তমান। দেশ ও কালের নিরিখে সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হয়। সেক্ষেত্রে কিউ-এর মনে বসন্তের সাথে তাব সম্পর্কের প্রশ্ন আসবে কেন? সেই পুরতান ধ্যানধারণা। তাই যদি হয়, তবে রুচী আন্টির সাথে বসন্তের কি সম্পর্ক? স্বামী স্ত্রীর পরিচিতিই কি স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্কের শেষ এবং একমাত্র কথা? তাই কখনো হতে পারে বা হওয়া উচিৎ?

বসন্ত যদি রুচী আন্টির কাছ হতে বঞ্চিত হয়ে নিঃস্ব হৃদয়ে কিউটির কাছে এসে শান্তি চায়, ভালবাসা চায়, কিউ একজন নারী হয়ে, যদিও বসন্তের বিবাহিত স্ত্রী নয়, তাকে ভালবাসতে পারে না? তার বন্ধু হতে পারে না? আর কিউ যদি অনুরূপ ভাবে একজন নারী হিসাবে বসন্ত পুরুষের কাছ থেকে প্রেম ভালবাসা আশা ভরসা কামনা করে সেটা কিসের অন্যায়? কোনো অন্যায় নেই—"ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে...

জীবন ক্ষণস্থায়ী। চাওয়া পাওয়ার মধ্যে তফাৎ অনেক। অপূর্ণতার অন্তরের কান্নায় আচ্ছন্ন মানবসমাজ। সেখানে আনন্দের বদলে নিরানন্দ কামনা করা অজ্ঞতার লক্ষণ। বসন্তে কিউ প্রীত। কিউ বসন্তে প্রীত— সেখানে পতি বা পিতৃত্ব, সামাজিক রীতি নীতি বা বিধি নিষেধ বড় কথা নয়। বড কথা সুখ, তৃপ্তি. শান্তি, সুন্দরের উপাসনা।

শুধু তাই নয়। কিউ এবং বসন্ত, উভয়েই কখনো নিজের সুখের বিনিময়ে একে অপরকে আঘাত দেয়নি, কষ্ট দেয়নি। বরং একে অপরের প্রতি সমর্পিত প্রাণ-মন, একে অপরকে শ্রদ্ধা করে, একে অপরের উৎকর্ষ বর্দ্ধনে সহায়তা করে। যেমন বসন্ত একদা রুচীর আচরণে বিষাদ গ্রস্ত হয়ে আপন সৃজনশীলতা হারাতে বসেছিল, সংসার যার জীবনে অমানিশার অন্ধকারে গ্রাস করেছিল, কিউ-এর সংস্পর্শে, কিউ-এর নারীহৃদয়ের কোমল অনুভূতিশীল স্পর্শে, কিউ-এর অক্লান্ত সহযোগিতায়, পরিশ্রমে বসন্তের জীবনের অন্ধকার দূর হয়ে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়। জীবন আলোয় ফিরে এসেছে। পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়েছে বসন্ত সৃজনশীলতা ফিরে পেয়েছে। আজ বসন্ত স্বার্থক, একজন মহান সমাজসেবি। সমস্ত পৃথিবী বসন্তের প্রতিভা স্বীকার করেছে, নানা সম্মানে ভূষিত সে। ঠিক একই আচরণ বসন্তের কিউ-এর প্রতি, জীবনবিতৃষ্ণ, বঞ্চিত কিউয়ের বাঁচবার শক্তি পুনরুদ্ধার হয়েছে। বাঁচবার ইচ্ছা ফিরে পেয়েছে কিউ।

তবুও কিউ-এর মনে অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্ন, বসন্তের সাথে তার 'কি সম্পর্ক?' কিসের সম্পর্ক?'' সংস্কার, সেই পুরাতান চিন্তার ধারাবাহিকতা।

চা পর্ব শেষ করে চণ্ডী এসে কিউ-এর সামনে দাঁড়ায়। হাতে ব্যাগ। কিউ বাজারের ফর্দ চণ্ডীকে দিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে বাজারে পাঠায়।

দরজা বন্ধ করে কিউ অস্থির পদে ঘরে পায়চারি করে। বড্ড দেরি করছে বসন্ত, এখনো দেখা নেই। পাশের জানালার যুবকটি পড়ায় মন সংযোগ করেছে।

বড় অস্থির মন। বসন্তের প্রতিক্ষায় অধীর আগ্রহ। কিউ মা হবে। বসন্তের ভ্রূণ কিউ-এর গর্ভে সযত্নে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার উপস্থিতি বসন্তের অজানা। বসন্ত রোহিতের বাবা। সদ্য রোহিতের বিয়ে হল, হনিমুনে বিদেশে গেছে। কিউ অন্তরে ওদের সুখ কামনা করে—ওরা সুখী হৌক! তার গর্ভে বসন্তের সন্তান, যদিও নিঃসন্দেহ তবুও নিশ্চিত নয়। শারীরিক প্রতিক্রিয়া তার সন্দেহকে সত্য বলে মনে হয়। বসন্ত এলে প্রথম কাজ হবে পরীক্ষার সাহায্যে সত্য নিরুপণ করা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ। কিউয়ের চঞ্চলতার কারণ এই তথ্যটি বসন্তের সামনে সে কিভাবে উপস্থাপিত করবে, কিভাবে বলবে যে বসন্ত আমি তোমার সন্তানের মা হতে চলেছি। কোন অধিকারে? কি হবে বসন্তের প্রতিক্রিয়া। চিন্তার জটলা, সংশয়ের দোলা, খুশির অনুভূতি এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় কিউ জেরবার।

কলিং বেল বাজতেই চমকে ওঠে কিউ। হাসি মুখে দরজা খোলে। না-বসন্ত নয়। সঙ্গে সঙ্গে মুখের চেহারা বদলে যায়। বিরক্তি সহকারে কেব্‌ল টিভির পয়সা পেমেন্ট করে। দরজা বন্ধ করে। পাখার নিচে বসে। শাড়ীর ভাঁজ ঠিক করে—যেন তাব সম্মুখে কেউ বসে আছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে বসন্ত আসে। দরজা খুলে দেয় কিউ। নিঃশব্দ আহ্বান। শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুত গতি। মুখে সলজ্জ হাসি, মাথা নিচু করে বসন্তের পিছে পিছে দরজা বন্ধ করে বসন্তের পাশে সোফায় বসে কিউ। কিউ দুটি হাত দিয়ে বসন্তের একটি হাত ধরে রয়েছে, নিজের আঙুলগুলো নিজেই অনাবশ্যক নাড়াচাড়া করছে। বসন্ত লক্ষ্য করে কিউকে, বসন্তকে লক্ষ্য করছে কিউ।

—তুমি কেমন আছো কিউ?

—যেমন দেখছো।—ভালো আছি।

—না-না, ঠিক বলছোনা। তোমায় চেহারা, তোমার আচরণ সে কথা বলছে না। মনে হচ্ছে তুমি ক্লান্ত, কোনো অসুখ—

—না-না। অসুখ করলে তোমায় বলতাম না? নিশ্চয় জানতে পারতে। কাল রাত্রে ভালো ঘুমিয়েছি। চা বসাই? চণ্ডীকে বাজারে পাঠিয়েছি। এসে যাবে। ব্রেকফাস্ট করবে?

—না করলেও চলে। তবে চা লাগবে।

—ব্রেকফাস্টও লাগবে। আগে ব্রেকফাস্ট পরে চা খাবে না আগে চা বসাবো।

—ব্যস্ত হবার দরকার নেই। চণ্ডী ফিরুক, তার পর হবে। তুমি বোসো-না?

—বসছি, চা বসাই।

বসন্তকে কেমন গম্ভীর গম্ভীর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে মাত্র কদিনেই বসন্তের বয়স বেড়ে গেছে। বসন্ত সত্যিই বুড়ো হয়েছে। চেহারায় যথার্থ ভাঁটার টান। নাকি হায়দ্রাবাদে বেশি পরিশ্রম করেছিল, ঠিক মত যত্ন নেয়নি বলে বসন্তকে বৃদ্ধ, বয়স্ক বলে মনে হচ্ছে? না কি তারা দুজনে এক সাথে থাকতো বলে বসন্তকে বয়স্ক বলে মনে হতোনা। এখন যেমন দেখছে, এটাই কি বসন্তের প্রকৃত চেহারা। বসন্তের বয়স হয়েছে সঠিক। তবে যা বয়স তাতে আজকাল কোনো মানুষকে বৃদ্ধ বলা চলেনা—চোষট্টি-পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এখন মানুষ বুড়ো হয়না। বসন্ত নিশ্চয় বৃদ্ধ নয়। তার চোখের ভুল।

চায়ের জল বসাবার ফাঁকে কিউ মনে মনে বসন্তকে নিয়ে আলোচনা করে নেয়। বসন্ত সম্বন্ধে কিউয়ের একান্ত নিজস্ব অনুধাবন। চায়ের জল গ্যাস জ্বেলে বসায়, চিনি দেয়, জল গরম হলে চা জলে দিয়ে ঢাকা দেবে। হৃৎপিণ্ডের গতি এখনো অস্বাভাবিক। কেন? উচ্ছ্বাস? সংশয়?—না কি অনেক কথা, অনেক কামনা, অনেক না বলা ঘটনা একই সাথে নির্গমনের পথ খুঁজছে?—হৃদয়ের অস্বাভাবিক গতি কি সে কারণেই? চায়ের জল বসানো সামান্য কাজ, এই কাজটুকুও কিউ সুষ্ঠভাবে করতে পারছেনা। তার হাত ঠিকমত কাজ করছেনা, জল ফুটে ফুটে কমে গেছে, আবার জল দেয় চা-পাত্রে জল ফোটে। চা ঢালে, চা-পাত্র ঢাকা দেয়, গ্যাস কমিয়ে দুধ বসিয়ে, সোফায় ফিরে আসে।

—নতুন পোষাকে তোমাকে ভালো দেখাচ্ছে। বাঙালি মেয়েদের মত এত সুন্দর ভাবে শাড়ী পরতে অন্য প্রদেশের মেয়েরা জানেনা। তুমি বেশ সুন্দর শাড়ী পরতে পারো, কোথায় শিখলে?

—এ তোমার চোখের ভুল।

মৃদু হেসে প্রতিবাদ করে কিউ।

—বাঙালি মেয়েরা শাড়ী পরলে যেমন সুন্দর দেখায়, লাবণ্যবতী দেখায়, অন্য প্রদেশেব মেয়েদের তুলনামূলক ভাবে শাড়ীপরা অবস্থায় তেমন সুন্দর মনে হয়না।

—এ তোমার বাঙালিপ্রীতি। তা আমি কি বাঙালি?—না থাক্। তোমার চেহারা খারাপ হয়েছে মনে হচ্ছে। সামান্য ক'দিনেই তুমি বুড়ো হয়ে গেছো বা হায়দ্রাবাদ থেকে বুড়ো হয়ে ফিরলে।

—হবে না! ষাট পেরিয়েছি কয়েক বছর হয়ে গেলো। এ ছাড়াও হায়দ্রাবাদে কয়েকদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে। যদিও রোহিতের বিয়েতে আমাকে বিশেষ কোনো কাজ করতে হয়নি। রোহিত খুব কাজের ছেলে, সমস্ত কাজ অত্যন্ত পরিকল্পিত

ভাবে হয়েছে, কোথাও কোনো ত্রুটি ছিলনা, আমি ওদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম মাত্র। রুচী ছিল রোহিতের মূল পরামর্শদাতা। মা ও ছেলে মিলে দুজনে বিয়ের সমস্ত কাজ অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে করেছে। তবুও বিয়ে বাড়ির ব্যস্ততা, ভীড় এসব আর পারিনা। ক্লান্ত হয়ে যাই।

—সাংসারিক ব্যাপারে তুমি কোনোদিন কোনো কাজ করেছো? জানিনা। আমি অত্যন্ত করতে দেখিনি।

বসন্ত মৃদু হেসে কিউ-এর কথার স্বীকৃতি জানায়। সত্য কথা। সংসারের সব দায়িত্ব রুচী একা পালন করেছে। রুচীকে তার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া যায়। তবে একথা সত্য, যদিও সে তার লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকতো তবুও সংসারের কোনো কাজ সে করতে চাইতো না একথা সর্বৈব সত্য নয়। রুচীর সাথে পরামর্শ করা বা রোহিতের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আলোচনা করা, সাহায্য করা, উৎসাহিত করার ইচ্ছা তার বরাবরই ছিলো, কিন্তু রুচী কোনো সুযোগ দেয়নি। বরং সব কিছু থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল বসুবাড়ির একজন অতিথি।

কিউ চা ঢেলে নিয়ে আসে। বসন্তকে দেয়, নিজে নেয় আধ কাপ। টিপয়ের ওপর চা রেখে বসন্তের সামনে বসে।

—জল দেবো।

—না। বোসো চুপচাপ্।

—আচ্ছা।

হালকা অথচ মিষ্টি সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে কিউটি থেকে। কিউটি পাশে বসতেই বসন্তের নাকে গন্ধটা প্রবেশ করল। ভীষণ ভাল লাগছে। বোঝা যাচ্ছে না, কোনো পারফিউমের গন্ধ কিনা। পারফিউম খুব একটা ব্যবহার করেনা কিউ। নাও হতে পারে। হতে পারে কিউ-এর শরীরের গন্ধ। সে অনেকদিন পর ফিরেছে। হয়তো অতি পরিচিত গন্ধ তার নাকে নতুন সুগন্ধী বলে মনে হচ্ছে। বসন্ত নিশ্চিত নয় এই সুগন্ধ কিসের? তবুও সুন্দর, মিষ্টি গন্ধ নাক দিয়ে প্রবেশ করে হৃদয় স্পর্শ করছে। কিউকে ক্লান্ত দেখালেও সে অপরূপা। রোহিতের বৌও বেশ সুন্দর, অল্প বয়স, চোখ মুখের গড়ন ভালো ফর্সা, সার্প চেহারা, বাবা অধ্যাপক,—মার্জিত, রুচীশীলা। ব্যবহার অত্যন্ত সাবলিল, হাস্যোজ্বল, কোনো জড়তা নেই। বেশ ভালো হয়েছে।

তার তুলনায় কিউ অনেক বড়, বলতে গেলে মধ্য যৌবনা, মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত, অত্যন্ত করুণ কিউ-এর জীবন, তবুও কিউ-এর সুঠাম গঠন, দুধে আলতায় গোলা রঙ, মাখনের মত কোমল ত্বক, ছন্দোময় চলন—কারো সাথে তুলনা করা যায়না, বা এক কথায় অতুলনীয়া। কিউ-এর চেহারা গর্ব করে গল্প বলার মত। মনে মনে প্রশংসা বা তারিফ করে বসন্ত। কিউ চা-এর সাথে বিস্কুটের কৌটো এবং না বললেও এক বোতল জল রাখে। নিজের কাপ হালকা ভাবে ঠোঁটে ছোঁয়ায়। বেল বাজে।

দরজা খোলে কিউ। বাজার করে ঘর্মাক্ত শরীরে হাত ব্যাগ নিয়ে মধ্যবয়সি চণ্ডী। অপুষ্ট চেহারা। এ বাড়িতে যোগ দেওয়ার আগে ভীষণ রোগা ছিল, এখনো রোগা তবুও আগের চেয়ে কিছুটা ভালো, গালে না কামানো দাড়ি, পরনে কমদামি ধুতি, গায়ে বসন্তের বাতিল হওয়া জামা। সোফায় বসন্তকে দেখে, মুখে এক মুখ খুশির হাসি, বিনয়ী পদক্ষেপ, কিচেনে ঢুকে বাজার নামায়। এর পর সোজা হাত দুটি জোড়া করে বিনয়ে

আপ্লুত হয়ে বসন্তের সামনে দাড়ায়।

—চণ্ডী, কেমন আছো?

—ভালো, ভালো—খুব ভালো দাদাবাবু, সব আপনাদের দয়াই—

—বাড়ির খবর?

—ভালো। একমাত্র দুঃখ—একটা টিভি চায়—

—কি বাজার করলে?

—মাছ, দই, মিষ্টি, সবজি—সব—দিদি যা যা বলেছে, মিলিয়ে মিলিয়ে এনেছি।

—তোমার চা আছে। ছেঁকে নাও।

—নেবো, দিদিমনি, নেবো। এতদিন পর দাদাবাবু এলেন, দুটো কথা বলি।

—বলো।

চা পান শেষ হলো। চণ্ডী কাপ ডিশ নামিয়ে নিয়ে কিচেনে ঢোকে। চা খাবে বাজার সাজাবে। আজ দিদির নির্দেশ ছাড়া কোনো রান্না হবেনা। বসন্ত কাগজ টেনে নেয়। দীর্ঘদিন কোলকাতার খবরের কাগজ পড়া হয়নি। ডাকে যা আছে, কিউ নিশ্চয় সাজিয়ে রেখেছে, রেসপন্সও নিশ্চয় করেছে পরে দেখলেই হবে। ডাকের প্রতি তার উৎসাহ কমে আসছে। অনেক কাজ করেছে। আর পারেনা, কষ্ট হয়, মাঝে মাঝে চিন্তার ধারাবাহিকতা ব্যহত হয়। কোনো কিছু চিন্তা করতে করতে অন্য কথা এসে পড়ে। আবার নতুন করে ভাবতে হয়। স্মৃতিশক্তিও কমে গেছে—আগের মত কোনো তথ্যই স্মৃতির সংগ্রহশালায় জমা থাকেনা, যে কারণে লিখে রাখতে হয়, বার বার দেখে সেগুলো ব্যবহার করা যায়। বুঝতে পারে এবার ছুটি নেবার সময় হয়েছে।

কিউ অন্যমনস্ক। মনের মধ্যে অনেক কথার তোলপাড়, বলা যাচ্ছেনা—কখন বলবে? চোখ তুলে বার বার লক্ষ্য করছে বসন্তকে। সত্যিই বসন্তের বয়স হয়েছে।

—তুমি জামা কাপড় বদলে নিতে পারতে। আরাম পেতে—

—হবে।

—ব্রেকফাস্ট রেডি করি।

—হবে। বোসো না! সবে তো চা খেলাম। পরে করলেও হবে—

—বেশ। কটা বাজে বলো তো? লাঞ্চ করবে—রুচী আন্টি কেমন আছে? আমার কথা বলে?

—গান শেখা কেমন চলছে?

—চলছে। আবার চলছেওনা। এই বয়সে ওসব হয়।

—নিশ্চয় হবে। শেখার কোনো বয়স আছে? আমি যদি ঐ বয়সেও নতুন কাজে হাত দিই।

—তুমি ব্যতিক্রম। তুমি তো নতুন করে শুরু করোনি। কাজ করতে করতে হাত গুটিয়ে নিয়ে চুপচাপ বসেছিলে, শুধু আলসেমি ছিল বলা চলে বা কাজ করতে চাওনা, এরকম একটা মানসিকতা তোমায় কাজ করতে দিচ্ছিলনা। তোমার ইচ্ছায় ঘাটতি পড়ে ছিল বলা যেতে পারে, সেই অনিচ্ছুক মন আবার বদল হয়ে, অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রয়াসী হয়েছো, বলা যেতে পারে।

—আমার কোন প্রয়াস বা ইচ্ছা ছিলনা, যা হয়েছে তার জন্য তুমি দায়ী, তোমার চেষ্টা—

—একদম সত্য নয়। তুমি করেছো বা করছো তোমার কাজ—তোমার লেখা, তোমার গবেষণা, তোমার রিপোর্ট—এটুকু বলতে পারি, আমি সহযোগিতা করেছি, তোমার তথ্য লেখা ইত্যাদি সাজিয়ে দেওয়া, বা গুছিয়ে দিয়েছি, বড়জোর তোমার দু চারটে চিঠি প্রিন্ট করে দিয়েছি, বলা যায়। তুমি যাকেই এ কাজের দায়িত্ব দিতে সেই করতে পারতো।

—পারতো না। সম্ভব নয়। তোমার প্রেরণা, তোমার উৎসাহ, না থাকলে ঐ বয়সে আমি কোনো কাজ করতে পারতামনা। পরিশ্রম করার মত শক্তি বা মানসিকতা ছিলনা।

—তোমার মেলগুলো দেখবে?

—না। তুমি দেখেছো তো, ওতেই হবে।

—ঠিক আছে। চণ্ডী, এই চণ্ডী—

চণ্ডীকে ডাকে কিউ।

—দিদিমনি—

—পেঁয়াজ কাটো। ডিম ফাটাও, ডিম টোস্ট করবো।

—চণ্ডী করতে পারবে।

—পারুক। আজ আমি করি। কাজ না করে করে কাজ করার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

—যাও। যা ইচ্ছা করো। কথা বলছিলাম— .

—কথা বলতে বলতে কাজ হবে—ব্রেকফাস্ট করে, আবার কথা বলা যাবে। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

কিউটি কিচেন যায়। ভাবি—এই হলো কিউটি, কারো সাথে কিউ-এর তুলনা করা যায়না। কে জানে কোথায় থেকে এমন গৃহিণীপনা শিখলো! রুচীও তো একজন নারী, রুচী তার স্ত্রী, তার সহধর্মিণী, যার সাথে সে দীর্ঘদিন ঘর করেছে, সহবাস করেছে, তার মধ্যে এ জাতিয় গৃহিণীপনা, বা আন্তরিকতা কোনোদিন ছিলনা। গতকাল রুচীও যে একই ফ্লাইটে ফিরেছে, একই ট্যাক্সি করে একই ফ্ল্যাটে, তার পর যে যার মত খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের নিজের বিছানায় শয্যা নিয়েছে, কি শীতল! কি চরম উদাসীনতা। অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন আর কষ্ট হয়না। অথচ রুচী এমন ছিল না। রুচীর মানসিকতার, বা আচরণের পরিবর্তন অত্যন্ত অস্বাভাবিক। রুচীর আচরণ, রুচী ও তার ভালবাসা, যৌবনের শারীরিক উত্তেজনা এখনো মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাই। শুধু রুচীর নয়, তারই কি পরিবর্তন হয়েছে! বিদেশে গিয়ে বা বাড়ির বাইরে কোথাও গেলে মন টিকতো না, ছটফট করতো, চেষ্টা করতে যতো তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য। দেশে হৌক, বিদেশে হৌক, রুচী চোখের আড়াল হলেই ঘন ঘন ফোন করতে হতো। হয় রুচী ফোন করতো নয়তো সে নিজে। সেই আমি, বসন্ত, রুচী এতদিন, মাসের পর মাস হায়দ্রাবাদে রোহিতের কাছে ছিল, একবারও ইচ্ছা হয়নি ফোন করার, রুচী দূরে থাকার জন্য তার কোনো কষ্ট হয়না, কোন অভাব অনুভব করেনি। না রুচী না সে অর্থাৎ আমি। রুচী ফোন করতো কারণ ছিল রোহিতের বিয়ে এবং তার দায়বদ্ধতার কথা ভেবে অর্থাৎ সে স্ত্রী এবং আমি তার স্বামী। কিছুটা দায়বদ্ধতা, আত্মীয়তা নয়।

অথচ এই সেই রুচী, যার কলেজ ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়তো আমাকে নিয়ে ভ্রমণে কখনো সাগর তটে, কখনো বা শৈলশহরে, এবং প্রতিটি ভ্রমণেই ছিল হনিমুনের আনন্দ,

উল্লাস, উত্তেজনা, কি প্রাণের স্পন্দন ছিল রুচীর। হঠাৎ হারিয়ে গেল। রোহিত তাদের সন্তান, রোহিতের জন্মের পর থেকেই। ধীরে ধীরে তার জীবন থেকে রুচী সরে গেল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আক্ষরিক অর্থে না হলেও ব্যবহারিক জীবনে। যেহেতু তারা স্বামী স্ত্রী, রোহিত তাদের সন্তান, সমাজ আছে, সোসাইটি আছে—এক সাথে থাকতে হয়, নইলে নিন্দা হবে, সমালোচনা হবে, মানসম্মানে আঘাত লাগবে, সে কারণে একই সংসারে এক সাথে থাকার অভিনয় করে যেতে হচ্ছে জীবন ভর। জীবনের মধুর সম্পর্কগুলো হারিয়ে গেছে স্বামী স্ত্রী ভালবাসা শূন্য মরুর ন্যায়জীবন, অসহ এবং জীবন্মৃতের ন্যায় শুধু বেঁচে থাকা। উৎসাহ নেই, ইচ্ছা নেই, স্বপ্ন নেই—মরণ নেই, তাই বেঁচে আছি।

এমনই এক সাংসারিক বা পারিবারিক ও মানসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে কিউ এল এক সমুদ্র দুঃখ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে—এখন কিচেনে ডিম-টোষ্ট বানাচ্ছে। গত রাতে এক সাথে ফিরেছে রুচী একই ফ্ল্যাটে থেকেছে—দুটি মানুষ, স্বামী ও স্ত্রী, দুজনের মধ্যে যেন কোন সম্পর্ক নেই, মনে হবে যেন কোনো পরিচয় নেই। আসলে মানুষের কাছে অন্য কোনো মানুষের আকর্ষণ প্রয়োজনের তাগিদে। কিউ-কিউ? তার কি তাগিদ? কিসের তাগিদ? কিসের তাগিদে এই আন্তরিকতা, এই সমবেদনা?

—তোমার ব্রেকফাস্ট। টেবিলে রেখেছি। বসে খেতে শুরু করো, আমি আসছি।

অদ্ভুত মানুষের জীবন। অনন্ত রহস্যে ভরা। ঠিক, এই বাড়িতে এলে, কিউ পাশে থাকলে মন কল্পনা প্রবণ হয়ে ওঠে। অন্য কোথাও এমন হয়না। এতদিন হায়দ্রাবাদে ছিলাম, সেখানে কাজ ছিল, রোহিতের বিয়ে ছাড়াও অন্য কাজ ছিল, তার জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত থাকতে হয়নি। অবসর ছিল, কিন্তু কল্পনা বা কোনো বিশেষ কিছু চিন্তা, এমনকি নিজেকে নিয়েও কোনো ভাবনা চিন্তা একবারের জন্য মনে হয়নি। কাজে অকাজে, ব্যস্ততা, নির্জনতায় সময় পার হয়ে গেছে, ভালো মন্দ বিচার করার কথা মাথায় আসেনি। গতরাতে আগের ফ্ল্যাটে ছিলাম—রুচী ও আমার আলাদা শোবার ঘরে—সেখানেও কল্পনা একবারের জন্যও উঁকি দেয়নি। আজ এই সকালে এখানে এসে বসতেই জীবন রহস্যের কথা মনে আসে। মনে আসে সংসার সমাজ দুঃখ দুর্দশা, মা, শিশু সবার কথা। এ যেন বাড়ি নয়, দক্ষিণের বাতাস, ঝাপটা মেরে মনের দরজা খুলে দেয়, কল্পনা ডানা মেলে হাওয়ায় ভাসতে শুরু করে। জানিনা কেন—এই বয়সে, হাত পা মস্তিষ্ক যখন অকেজো হতে চলেছে—এলমেলো ভাবনার দাপট বেড়ে গেছে বড্ড বেশি! শুধু কিউ পাশে থাকলে—ওর আচরণ ওর কথা বলা, ওরা সৌন্দর্য্য মনকে বাঙ্ময় করে তোলে। যেমন এখন মনে হচ্ছে জীবন রহস্যময়। এতকাল মনে হতোনা। ছোট থেকে সারা জীবন লেখাপড়া নিয়ে থাকতাম, বিয়ের পর স্বপ্ন, কয়েকদিন রুচীকে নিয়ে মাতলাম, তারপর কিছুদিনের পর মন জড় প্রাপ্ত হল, এর পর কিউ এল কিউতে, কাজ নিয়ে পৌঁছে গেলাম জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে। এতকাল নিজের জীবনের কথা মনে পড়েনি। ইদানিং বার বার নিজেকে নিয়ে নিজের অপরিসীম কৌতূহল, মানুষকে জানার ইচ্ছা বা মানুষের কথা ভাবতে ভালো লাগছে। শিশু থেকে পূর্ণ মানুষ—কৈশোর, যৌবন প্রৌঢ়ত্ব অবশেষে বার্দ্ধক্য। তবে কি বার্দ্ধক্য জীবনে মনের শৈশব ফিরিয়ে আনে! হঠাৎ হঠাৎ দার্শনিক ভাবনা মনের মধ্যে উদয় হয়। এতকাল হতোনা। শিশু মৃত্যু, অসুস্থ শিশুর জন্ম, পঙ্গুত্ব নিয়ে অসীম কষ্টে থাকা, এমনকি অনেক পঙ্গু মানুষ মৃত্যুর দিকে চেয়ে থাকে, কবে সেই মৃত্যু আসবে, অবসান হবে কষ্টের। শিশু জননীর

ভগ্ন স্বাস্থ্য, সুস্থ সন্তান প্রসব করতে অক্ষম মাতা ইত্যাদি কথা নিয়ে জীবন শেষ হয়ে গেল, নিজেকে নিয়ে ভাবিনি এতদিন। যদিও হঠাৎ ভাবনার কোন মূল্য নেই, কিন্তু ভাবনা কি কারো নিয়ন্ত্রণে?—নয়।

অথচ যে শিশু জন্মালো, সুস্থ হৌক, অসুস্থ হৌক, অপুষ্ট হৌক কিম্বা পুষ্ট ও স্বাভাবিক হৌক, সেই শিশুর জন্মগ্রহণ এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়ে একজন পরিণত মানুষ হওয়া অবধি সেই শিশুর ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে নগণ্য। অথচ শিশুর জন্মগ্রহণে বাবা ও মায়ের ভূমিকা স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মে। কিন্তু শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য চায় স্বাভাবিক পরিবেশ, সুসম আহার, যথার্থ চিকিৎসা। শতকরা কত শিশুর ভাগ্যে তা জোটে? সুস্থ শিশুর জন্ম হলেও অর্থনৈতিক কারণে শিশু না পায় পরিমিত খাদ্য, না পায় চিকিৎসা, না পায় পোষাক, না পায় যথার্থ পরিচর্যা। শিশু, ভবিষ্যৎ মানব সম্পদ, শিশু ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক, ক'জন রাষ্ট্রনায়ক সে কথা মনে করে? কোন রাষ্ট্রে? রাষ্ট্রিয় তত্ত্বাবধানে শিশু সম্পদকে উন্নত করার পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা আছে। জলসম্পদ রক্ষা করা বনসম্পদ রক্ষা করা, খনিজ সম্পদ রক্ষা করা, ব্যবহার করা ইত্যাদি বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রয়োজনে অধিকাংশ রাষ্ট্রই যত্নবান, অথচ মানব সম্পদ রক্ষা বা উন্নততর করা আজ অবধি কোন ব্যবস্থা নেই। হায়রে মানব সমাজ! এমন মানব জমিন রইলো পতিত, তাকে আজো যথার্থভাবে ফলানো গেলোনা!

অথচ প্রগতি অব্যাহত। সংখ্যাতত্ত্ববিদগণ প্রগতির তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারে সর্ব্বদায় লিপ্ত। সুস্থ শিশু পরিবেশের কারণে অসুস্থ হয়, অন্ধ হয়, কঠিন রোগাক্রান্ত হয়। মানব সমাজ জেনে বুঝেও অবুঝ। জাপানে বোমা বর্ষণের পরও মানুষ শিক্ষা নেয়নি। আজো মানুষ অস্ত্র নির্মাণে যে পরিমাণ ব্যয় করে, তার বহু শতাংশ কম পরিমাণ অর্থ মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যবহার করে। কেন? কেন? এ প্রশ্ন কি মানুষ করবেনা? বিজ্ঞানের উন্নতিতে মানুষের উন্নতি হয়েছে হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ দিয়েছে। মানুষ পৃথিবী মণ্ডল অতিক্রম করে পাড়ি জমিয়েছে ভূমণ্ডলে তবুও সেই আদিম যুগ হতে মানবশিশুর প্রতি মানব সমাজের অবহেলার ধারা অব্যাহত। যদি প্রগতি ও প্রযুক্তির সামান্য অংশ তাবৎ বিশ্বের শিশু সমাজের জন্য ব্যয়িত হতো, পৃথিবী ভয়ঙ্কর না হয়ে, আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে সুন্দরতর হতে পারতো। বিশ্বায়ন বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রয়োগ না হয়ে মানব শিশু ও মানব সমাজের স্বার্থে ব্যবহার হলে পৃথিবীর অবস্থা কেমন হতো একবার মানুষ ভেবে দেখবেনা!

বসন্তের এতকালের প্রয়াস তো শুধুমাত্র পৃথিবী জুড়ে এই সদিচ্ছা প্রচার করার কাজে। নিজেকে নিয়ে বা নিজের জীবনকে নিয়ে কোনদিন ভাবেনি। ভাবতে শুরু করলে মনে হয় কতনা ফাঁক রয়ে গেছে এ জীবনে, যা অপূরণীয়। ব্যবহারিক জীবনে তার প্রাপ্তি একটা বড় শূন্য। বরফের অধিক শীতল সম্পর্ক তার স্ত্রী রুচীর সাথে। নিজের বাড়ি যেখানে মানুষ শত কষ্টের পর শান্তি পায়, সেই বাড়ি বা ফ্লাটে তার কাছে দুঃসহ কেন এমন হবে? কি তার কারণ? কিসের তার অভাব? কার দোষ?—তার না রুচীর? যাক্‌গে, আজকে এ প্রশ্ন করে কি হবে? কি লাভ! তবুও এই মেয়েটি, এই কিউটি এসে তাকে উদ্ধার করেছে, নিশ্চয় শান্তি দিয়েছে—কিউ তার জীবনে পরম প্রাপ্তি। কিউ না থাকলে কবে, কোথায় হারিয়ে যেতাম জানি না, কেউ জানতো না, চিনতো না বসন্তকে, কিউ-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

কিউ ফিরে আসে সন্তর্পণে। তার এক হাতে প্লেট। বসি টেবিলে পাশাপাশি। চণ্ডী চা করবে, পাতা ভিজিয়ে রেখে কাপে চিনি ও দুধ দেওয়া আছে। মুচ্ মুচে ডিম টোস্টে কামড় দিই। ডিম টোস্ট আমার প্রিয় খাবার। কোন খাবার, কি প্রিপারেশানে করলে আমার খেতে ভালো লাগে বা কোনটি আমার পছন্দ, দশ বারো বছর এক সাথে থাকার ফলে কিউ জানে। প্রতিটি নারী তার প্রিয় পুরুষের পছন্দ অপছন্দ জানে কিনা জানিনা, তবু নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, আমার পছন্দের তালিকা কিউয়ের অজানা নয়। এক সময় রুচীও জানতো। কিন্তু রুচী কোনদিন আমার প্রিয় বস্তু বা বিষয়ের বা প্রিয় খাদ্যের বা প্রিয় পোষাকের প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছে বলে, আমার মনে পড়েনা। যদি করে থাকে তাও মানদামাসিকে দিয়ে করিয়েছে, নিজে হাতে নয়। কারণ রুচী সাংসারিক প্রতিটি কাজে সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীলা ছিল। অথচ সাধারণভাবে প্রতিটিপুরুষ তার সহধর্মিণীর কাছ হতে এই সামান্যতম মনসংযোগটুকু আশা করে। আবার প্রতিটি নারীও তার স্বামীর কাছে থেকে অনুরূপ আশা করে।

এতকাল এসব কথা মনে হয়নি। কিন্তু হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরেই কিউ-এর আচরণ আমায় অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য করছে। মনে হচ্ছে রুচী যথার্থই আমায় বঞ্চনা করেছে। কিউ বয়সে কত ছোটো, বলতে গেলে রোহিতের সমবয়সি। আমার ও কিউ-এর বয়সে অনেক তফাৎ, তবুও সে তার নারীসত্তা দিয়ে আমার ভাল লাগা না লাগা উপলব্ধি করে, অনুভব করে এবং প্রকৃত নারীসুলভ আন্তরিকতায় আমার ইচ্ছা পূরণে সচেষ্ট হয়। কিউ-এর সকালের পোষাক, স্বহস্তে ডিম টোস্ট করা এবং পাশাপাশি বসে একান্ত আপনার হয়ে সেবার মানসিকতা তার প্রকৃত উদাহরণ। বেশ বোঝা যায় আমি খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছি তাতে কিউ প্রীত এবং তৃপ্ত। কিউ-এর চোখমুখের আচরণ সেটাই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে। কিউ টোস্ট খায় অল্প, আমি পুরোটা খেয়ে নিই। পাচকের হাতের রান্নার খাবার খেয়েছি এতদিন, অত্যন্ত দামি প্লেট ছিল, ভাল লাগলেও মন ভরতো না।

—তুমি খেলেনা?

—খেয়েছি।

—এটুকু?

—দিদিমনি আজকাল কিছুই খেতে চায়না। ডাক্তার দেখাতে বললেও, ডাক্তার দেখাতে যাবেনা। না খেলে শরীর ঠিক থাকে!

চণ্ডী যোগ করে। চায়ের কাপ বাড়িয়ে দেয়। চা দিয়ে গরম বাষ্প উঠছে। সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। স্পেসাল দার্জিলিং চা।

—চণ্ডী!

মৃদু ধমক লাগায় কিউ। চা পর্ব শেষ করে, সিগ্রেট ধরায় বারান্দায় দাড়িয়ে। ব্যস্ত কলকাতা। দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে জীবনধারা তার সাথে কলকাতার আচরণ। শৈশবে দেখা কলকাতার সাথে পঞ্চাশ বছর পরের কলকাতার তফাৎ অনেক। বর্তমানে কলকাতার ব্যস্ততার সাথে পঞ্চাশ বছর আগের ব্যস্ততার ঢের তফাৎ। এই কলকাতায় জন্ম। বাবা, তারও বাবার বাস ছিল সাবেকি কলকাতায়। আমারও সমস্ত জীবন কলকাতাতেই কাটলো। হয়তো এটাই শেষ পুরুষ। রোহিতের কথা ঠিক এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। কারণ রোহিত চাকরিতে অনেক উন্নতি করবে, যেখানে চাকরি করবে হয়তো

সেখানেই শিকড় গাড়বে। পুরানো কলকাতায় সে বাড়ির সাথে বাড়ি লাগানো, সামনে সঙ্কীর্ণ গলি, রাস্তায় টিম্‌টিমে বিজলি বাতি, উঁচু কল সামান্য তফাতে তফাতে, সময় ধরে কর্পোরেশানের কলে জল, লোকে লাইন করে বালতি, কলসি বসিয়ে জল ধরতো, বালতির শব্দ শুনতে পাওয়া যেতো, আবার অনেক সময় কলের ট্যাপ খোলা, জল পড়তো ছড়্‌ছড়্‌ করে যতক্ষণ জল থাকতো। ক্লান্ত কাকের দল কলের মাথায় বসে জল খেতো। আর ছিল গঙ্গা জলের কল—রাস্তা ধোঁওয়ার জন্য সূর্য্য ওঠার আগে গঙ্গার কলে পাইপ লাগিয়ে রাস্তা ধুতো কর্পোরেশানের লোক। ছিল গলির মোড়ে মোড়ে ময়লা ফেলার জায়গা বা ডাস্টবিন্, যদিও কোনো নির্দিষ্ট ভ্যাট বা পাত্র থাকতো না, লোকেরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কুটনো, নষ্ট খাবার, ছেড়া জুতো জামা, নোংরা কাগজপত্র ফেলে দিত। কর্পোরেশানের লোহার ঠেলা গাড়ি লোহার চাকার দিনভর ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ করে এসে বাঁশের কাঠির ঝাড়ু দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করে গাড়িতে করে নিয়ে যেতো। তখনো বাঙালি বিধবারা কেউ কেউ গঙ্গায় স্নান সেরে খালিপায়ে হেঁটে যে যার বাসায় ফিরতো। তখনো ফ্ল্যাট বা বাড়ি শব্দের প্রয়োগ কলকাতায় ছিলনা, ছিল বাসা। এখনো পুরানো কলকাতায় এবং উত্তর মধ্য এবা দক্ষিণ কলকাতায় এর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, সেইসব বাড়ি, সঙ্কীর্ণ রাস্তা আজো আছে, তবে ভিড় বেড়েছে এবং আগের মত আর জল দিয়ে রাস্তা ধোওয়া হয়না, বাতিগুলোয় আধুনিকতার স্পর্শ পেয়েছে অনেক জায়গায়।

যাই হোক, যেখানেই যাইনা কেন, কলকাতায় এলেই মন ভাল হয়ে যায়, শান্তি পাই, আরাম বোধ করি! বিদেশে সুন্দর সুন্দর রাস্তা, অতি আধুনিক বাড়ি গাড়ি, বিশাল ঐশ্বর্যে ভরা হোটেল, উন্নত জীবন যাত্রা, এক কথায় জীবনকে ভোগ করার অঢেল উপাদান এবং যথেচ্ছ সুযোগ, উপভোগ অন্ততঃ কিছুটা করিনি তা নয়, তবুও মন বসতো না। কয়েকদিন সেই আরামে থাকার পরেই ফেরার জন্য মন ছট্‌ফট্‌ করতো। এই বিষয়ে আমাকে হোমসিক বলা যেতে পারে। বাড়ির আকর্ষণ বিশেষ না থাকলেও কলাকাতার আকর্ষণ আমায় টানতো। কিউটি আমার সাথে বহু জায়গায় গেছে। এবারে, হায়দ্রাবাদে আমার সাথে ছিলনা। নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছিল, যদিও বেশির ভাগ সময় রোহিতের ফ্ল্যাটে থাকতে হয়েছিল। তবুও কিউ-এর অভাব প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছিলাম। কিউ নির্ভর হয়ে পড়েছি। বয়সের ভার তার জন্য কিছুটা দায়ী। শরীরের শক্তির সাথে মনের জোরের সম্পর্ক আছে, অস্বীকার করা যায়না।

কিছু সময় পর কিউ ব্যলকনিতে আসে। আমার সিগ্রেট ফুরিয়ে এসেছে।

—রোদ লাগবে এখানে, ঘরে গিয়ে বোসো।

—যাচ্ছি।

—রোহিতের বিয়ে কেমন হোল, বলো।

—শাড়ী পরে তোমায় সুন্দর দেখাচ্ছে।

—রেগুলার শাড়ী পরিনা বলে তোমার এরকম মনে হচ্ছে। তোমায় বুড়োটে দেখাচ্ছে।

—বাঃ দেখাবেনা। আমি বুড়ো হয়েছি। আমার ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। এতদিন বাবা ছিলাম এবার শ্বশুর হলাম।

ম্লান হেসে কিউ মাথা দুলিয়ে সহমত জানালো। দুচার কথায় রোহিতের বিয়ের বর্ণনা

করলাম। গা ঘেঁষে দাড়িয়ে কিউ ধৈর্য্য ধরে শুনলো, মাঝে মাঝে ছোট প্রশ্ন অর্থাৎ কৌতূহল মিটিয়েছে। দেখছি কিউ এর চোখের মিশ্র প্রতিক্রিয়া—কখনো হতাশার কখনো আনন্দের। রোহিতকে ভালবাসতো কিউ। সমবয়সী, কিউ বোঝে রোহিতের তার প্রতি সমবেদনার কথা। রোহিতের বিয়েতে সে খুশি। ওরা প্যারিসে হনিমুনে গেছে শুনে কিউ পুলকিত। কিউ শুনতে শুনতে কিচেনে যায়। আজকের রান্না ও নিজে হাতে করলে খুশি হতো। সেটা না পারলেও ওকে বার বার যেতে হবে। চণ্ডীকে নির্দেশ দেওয়া, পরীক্ষা করতেই হবে। বড় ভালো মেয়ে কিউটি। ওর জন্য কিছু করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু কি করবো? ও যে অনঢ়। কিউ-এর আর্থিক নিরাপত্তার অভাব নেই। আমার লেখার অনেক টাকা ওর নামে জমা আছে, বই-এর সত্ত্ব ওর নামে। এই ফ্ল্যাটের মালিকানা আমার অবর্তমানে ওর হবে। কিউ জানেনা—মানস কিউ-এর নামে টাকা জমা রেখেছে। তার কাগজ আমার কাছে আছে, সুদে আসলে তার পরিমাণও কম নয়। তবুও কিউ-এর নিরাপত্তা কিউ এক একাকিত্ব আমার অবর্তমানে, কিউ বাঁচবে কি নিয়ে এ প্রশ্ন আমায় বিব্রত করে।

কিউ চণ্ডীকে পরামর্শ দিয়ে ফিরে আসে।

—তুমি বড় ব্যস্ত হচ্ছো কিউ।

—কোন ব্যস্ততা নেই। যা করার চণ্ডী করবে। আমি ওকে আইটেমগুলো বুঝিয়ে এলাম।

—বেশি কিছু করবে না।

—না। ঠিক আছে।

—তোমার গান শোনা হলো না।

—গান? এখনি গান কোথায়? হারমোনিয়ামের রিডের দিকে তাকিয়ে আঙুল চালিয়ে সারেগা-এখনো তাই চলছে।

—সেটাই গেয়ে শোনাও।

—এই দুপুরবেলায়? এখন হয় নাকি! যখন গাইবো, শুনবে।

—তোমার শিক্ষক কেমন শেখাচ্ছে?

—ছোট ছেলে—এখনো লজ্জা কাটেনি। এত বড় ছাত্রী—

—তোমার কি বুড়ো শিক্ষক পছন্দ!

—তার মানে?

—তুমি বলছো ছোট ছেলে, তাই বুড়ো একজন—

হালকা রসিকতা—কিউ প্রথমে বুঝতে পারেনি, আমার দিকে তাকিয়ে আমার মুখের হাসি দেখে বুঝতে পেরে হেসে, কিছু বলতে গিয়ে থেমে আমার হাতে হাত রেখে মৃদু চাপ দেয়। আমি ওকে দেখি—পূর্ণ নির্ভরশীলতা, সমর্পিতা কিউ। মাঝে মাঝে ইদানিং অস্বস্তি বোধ করি। মনে হয় আমি ঠিক করছিনা। কিউয়ের সারল্য, বিশ্বস্ততা আমার অসহায়তা আমায় কষ্ট দেয়।

—তোমার পোষাক বদলে নাও।

—কেন, আমায় খারাপ লাগছে? নায়ক নায়ক মনে হচ্ছেনা?

—না। বাড়ির পোষাক পরে নাও, আরাম লাগবে।

—তথাস্তু।

পোষাক বদলে ঘরে বসি। কিউ কিচেনে চণ্ডীর কাছে গেছে। আমি ঘরে বসে আরাম করে কাগজ দেখতে শুরু করি। মাঝে মাঝে ঘরের আসবাব পত্র, বইয়ের আলমারি, কিউ এর কম্পিউটারের দিকে তাকাই। সুন্দর করে সাজানো কিউ-এর সংসার। এটা লাইব্রেরী কাম আমার দফ্‌তর। অপরটি বেডরুম। পর্দা ঝোলানো ঘর, সাজানো গোছানো খাট, আলমারি, ওয়ারডোর, বড় আয়না লাগানা ড্রেসিং টেবিল। ঘরে ঢুকলেই কিউয়ের শরীরের মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগবেই। ঘরটি সামান্য অন্ধকার। পাশেই একটা বড় অ্যাপার্টমেণ্ট হয়েছে, আগে জানালা দিয়ে আলো আসতো, রাতের আকাশ দেখা যেতো, এখন আকাশ ঢেকে গেছে। কিউ ফিরে আসে। হাত মুছছে তবুও হাতে জল লেগে রয়েছে।

—বসন্ত, আজকাল একা খারাপ লাগে। মন খারাপ হয়ে যায় সেই সময়ে কি করলে মন ভালো হবে, বলে দাও তো।

—বই পড়বে। গান গাইবে। টিভি দেখবে। সিনেমা যাবে। লাইব্রেরি যাবে।

—তুমি কি করো?

—আমার কথা? আমার কথা আলাদা। আমি অসামাজিক মানুষ। মন খারাপ হয়না। হলে, খারাপ মন নিয়ে একা একা চুপচাপ বসে থাকি।

—তুমি অসামাজিক কে বললে?

—অনেকে বলে।

—বলতে দাও। বরং আমি অসামাজিক, সমাজ থেকে আলাদা, বিচ্ছিন্ন, একক লোক। সমাজ বলতে তুমি, বন্ধু বলতে তুমি, প্রিয় বলতে তুমি, আর?

সামান্য থেমে আবার বলতে শুরু করে—

—সম্পর্ক বলতে একমাত্র তুমি, তোমার সাথে। আপন বলো, পর বলো, আত্মীয় বলো, তুমিই আমার সব। তোমার নামের সাথে আমার নাম তুমি যোগ না করলেও, আমি নিজেকে তোমার সাথে জুড়ে নিয়েছি।

—বেশ করেছো, ভালো করেছো। না হলে আমি কোথায় হারিয়ে যেতাম, কে জানে!

—তুমি বড় বেশি বেশি করে বলো। তুমি মহৎ তাই—

—সত্যকে স্বীকার করার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব নেই। তোমার অবদান আমি ছোটো করে দেখাতে পারিনা। আমি এত বড় অকৃতজ্ঞ নই।

—থাক্ থাক্-থাক্। হয়েছে, আর বলতে হবেনা। কাগজ পড়ো, আমি কাজ করি।

—আবার চললে?

—আসছি। এক্ষুণি এসে যাবো। জাস্ট—

যেমন দ্রুত গেছে, তেমনি দ্রুত ফিরে আসে। মুখে তৃপ্তির হাসি।

—মালবিকাকে জানো?

—মালবিকা? সে কে?

—মানসকাকুর মেয়ে।

—হ্যাঁ। কি হল তার? এতদিন পর হঠাৎ মানসদার মেয়ে? তাকে কোথায় পেলে? না স্বপ্ন দেখলে?

—ঠিক বলেছো। মনে ছিলনা। একদিন ফোন করে নিজের পরিচয় দেওয়াতে

চিনতে পারলাম। আমি তো ওর ফোন পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম। সাত আট বছর বয়স ছিল তখন ওর। দীর্ঘদিন পর মনে পড়ে? যাই হৌক খবর দেওয়ার জন্যই ফোন করেছিল।

—দুঃসংবাদ?

—না না। শুভ সংবাদ। সে বিয়ে করেছে। লাভ্‌ম্যারেজ—সেই খবরটাই দিল।

মানসদার মেয়ে। মানব জন্মানোর দীর্ঘদিন পর মানসদার একটি মেয়ে হয়েছিল। মানসদা ও বৌদি তাদের মেয়ের অন্নপ্রাশনে আমাদের নেমন্তন্ন করেছিল. যেতে পারিনি—বিদেশে ছিলাম। সেই মেয়ে এত বড় হয়ে গেল।

—তার বিয়ের বয়স হয়েছে?

—নিশ্চয় হয়েছে। বয়স না হলে বিয়ে করলো কি করে? ডায়মণ্ড হারবারের কাছে কোনো একটা গ্রামের ছেলে, জমিজমা আছে, চাষবাস করে, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি নিয়ে নাকি তার সংসার।

—তাই নাকি? ওয়াণ্ডার!

—অবশ্যই। সাহস আছে। কলেজে পড়ছিল। পড়তে পড়তে ভাবভালবাসা, তারপর বাবা মায়ের অমতে নিজেরা বিয়ে করেছে। এখন শ্বশুর বাড়ি। পুকুরে স্নান করে। বর্তমানে গরুর দুধ দোওয়া শেখার চেষ্টা করছে। ওর কথায় নিজে হাতে গরুর দুধ দুইবে, ঢেঁকিতে ধান ভানবে।

—দারুন। নিশ্চয় থ্রিলিং। সল্টলেকের মানসদার মেয়ে গরুর দুধ দুইবে। ঢেঁকিতে ধান ভানবে! এবার ফোন করলে, আমায় দেবে, আমি কথা বলবো। দারুন ইন্টারেষ্টিং। জানতে হবে সে কেমন এন্‌জয় করছে?—পুকুরে স্নান, মুরগি পালে মানসদার মেয়ে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—বাস্তব এবং সত্য ঘটনা। একটুও মিথ্যা নয়।

—দিদি মাছের ঝালটা দেখবে?

চণ্ডী ডাকে, কিউ 'আসছি' বলে চলে যায়।

মানসদা! সেই আদর্শবাদী ইঞ্জিনীয়ার। ব্রিলিয়্যান্ট ছাত্র। এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে যার অত্যন্ত সুখের সংসার হওয়ার কথা ছিল। ছেলে বাঙ্গালোরে, যা খবর, ছেলে মানব বাড়ি ফেরেনা। বাবা মায়ের সাথে তার কোনো সম্পর্ক সম্ভবতঃ নেই। আদরের ছোট মেয়ে, কিউ-এর মুখ থেকে যা শুনছি, সেও বাবা মাকে ত্যাগ করেছে। জানিনা কেন মানসদা ছেলে মেয়ের সাথে মানিয়ে চলতে পারলোনা। সময়ের সাথে সাথে সমাজ বদলায়, সাথে সাথে ব্যক্তিকেও বদলাতে হয়। নইলে বিপদ। মানসদা ও বৌদি নিশ্চয় প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে।

ঘেমে নেয়ে মুখ মুছতে মুছতে ফেরে কিউ।

—পাখার নিচে বোসো। ঘাম শুকিয়ে যাবে।

—ঠিক আছে।

—বোসো।

কিউ পাশে বসে। আমি ওকে লক্ষ্য করি, লক্ষ্য করি, সত্যিই শরীর খারাপ হয়েছে কিনা। আমার নজরে ওর স্বাস্থ্যের কোনো অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সেই সুঠাম তনু, ভারি নিতম্ব, উর্দ্ধাঙ্গের সাবলিল গড়ন, আগের মতই সমান আকর্ষণীয়া, তবে

চোখে মুখে কিছুটা ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট।

—আমার অনুপস্থিতিতে তোমার শরীর খারাপ হয়নি তো!

—হলে, তোমায় নিশ্চয় জানাতাম।

—তোমায় দুর্বল দেখাচ্ছে।

—হতে পারে। তোমায় চিন্তা করতে হবেনা। তোমার সেমিনার কেমন হলো?

—ভালো। আলোচনা শুধু চার দেওয়ালের মধ্যে, কিম্বা সরকারি ফাইলের মধ্যেই কর্মসূচী বা আলোচ্য বিষয়কে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবেনা। বস্তুতঃ সেটাই বারবার ঘটছে। শিশু মৃত্যু একটি সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা. দু একটা বেসরকারি সংগঠন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং অনুদানের ওপর নির্ভর করে শিশু মৃত্যু, শিশুর অপুষ্টি, প্রসূতির মৃত্যুর যে ভয়াবহ সঙ্কট দূর করা যাবেনা। চাই রাজনৈতিক সমাধান। ইদানিং ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দ্ধারণ করা এবং কন্যা শিশু হত্যা করা হচ্ছে। কি দুঃখজনক অবস্থা!

—তোমার মিশন তা হলে ব্যর্থ বলো।

—তা বলতে পারো। সাফল্য বলতে সচেতনতা কিছুটা বেড়েছে বলা যেতে পারে। আজীবন এতো কষ্ট করলাম, ফল সামান্যই। দুঃখ হয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। ভাবছি এবার ছেড়ে দেবো। তাছাড়া শক্তিতে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

—হবে। হতাশা নয়। অপেক্ষা করতে হবে। মানুষ সতেচন হচ্ছে, হবে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ কিউ দ্রুত বাথরুমে ঢুকে যায়। কিছু সময় পর ঘাড়ে মুখে জল দিয়ে ফিরে আসে।

—কি হল?

—বমি পাচ্ছিল।

—ডাক্তার কল করবো।

—না, এখন ঠিক আছে। ঠিক হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে কিউ মাতৃত্ব সম্পর্কিত বই জোগাড় করে পড়েছে। গর্ভধারণের প্রথম অবস্থায়, অরুচি, বমি বমি ভাব, এসব লক্ষণ দেখা গেলেও কিছুদিন পর এই অবস্থাটা থাকেনা। তবুও একবার চেক্ করিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ দরকার। বসন্ত ফিরছে, আর অসুবিধা হবেনা। বসন্তকে সাথে নিয়ে চেক্ করিয়ে নেবে, মনে মনে ভেবে নেয় কিউ।

—বোসো। দাড়িয়ে রইলে কেন?

কিউ বসে। ওকে লক্ষ্য করি। ওকে সুস্থ বলে মনে হচ্ছেনা।

—তোমার রান্নার কত দেরী? চণ্ডী ঠিক মত কাজ করতো না শরীর খারাপ বলে দিনরাত আড্ডা দিয়ে বেড়াতো।

কোনো উত্তর দেয়না কিউ। আমি লক্ষ্য করি ওর শারীরিক অস্বস্তি। শুধু শারীরিক অস্বস্তিই নয়, নানান চিন্তায়, নানান প্রশ্নে সে অস্থির। এমনিতে কিউ-এর অন্য কোনো অসুবিধা হয়না। খাবারে অরুচি, মাঝে মাঝে গা গুলিয়ে ওঠে, বমি বমি ভাব হয়, তখন কষ্ট হয়। কি করবে? ভেবে কূল কিনারা পায়না। বসন্তকে আজই বলতে হবে। এভাবে মনের মধ্যে পুষে গুমরে গুমরে কষ্ট পাওয়ার অর্থ হয়না। প্রশ্ন আসে, বসন্ত কি ভাবে গ্রহণ করবে। কারণ কুমায়ুনে হঠাৎ পরিকল্পনার কথা বসন্ত জানেনা। বসন্তকে বলা হয়নি। বসন্ত নিশ্চয় চমকে উঠবে। আতঙ্ক গ্রস্ত হবে। বসন্ত দায়িত্ব অস্বীকার না করলেও দায়ভার বহন করতে চাইবে? কে চায়! বসন্তের এত মানসম্মান সংসার সমাজ, হানি

হবেনা? বসন্ত কি সেই ক্ষতি মেনে নিতে চাইবে? কে জানে? হয়তো বসন্ত আমার ইচ্ছার কথা বিবেচনা করে আমার সন্তান ধারনে সম্মতি প্রদান করল, তারপর? যে শিশু জন্মাবে, ছেলে হৌক বা মেয়ে, কি হবে তার পরিচয়? সে অবিবাহিতা, বসন্ত তার সন্তানের জন্মদাতা হতে পারে, কিন্তু পিতৃত্বের পরিচয় দেওয়ার ক্ষমতা বসন্তের নেই বা বসন্তকে পিতা হিসাবে ঘোষণা করার কোনো আইনানুগ অধিকার তার নেই। তথাপি যে শিশু জন্মগ্রহণ করবে, তাকে পালন করা, মানুষ করা, কে করবে? বসন্ত? কেন করবে? বসন্ত কি কোনদিন কোনো সন্তান পালন করেছে? কিন্তু সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন, কি হবে তার পরিচয়? এ দেশে মায়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় হয়না। বসন্তকে সকাল বেলায় দেখার পর থেকেই তার মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড়। কিউ-এর অস্বস্তি, অসুস্থতা বেড়ে যায়।

--তুমি বিশ্রাম নাও কিউ। তুমি ক্লান্ত। আমার মনে হচ্ছে তুমি চিন্তা করছো। কিসের তোমার চিন্তা। যদি কিছু বলার থাকে আমায় বলো। তোমার এই মনমরা ভাব আমার ভালো লাগেনা।

—তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?

—না।

—গান শুনবে?

—না। কে গাইবে?

—ক্যাসেট বাজাবো।

—না।

পাশে বসা কিউ-এর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিই। ওর আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করি। সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতায় কিউ আত্মসমর্পণ করে। কিউ-এর করুণ চেহারা আমার হাতের স্পর্শে কিছুটা সান্ত্বনা অনুভব করে। উৎসাহিত হয়, সামান্য হাসি ওর ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে। কিউ-এর চেহারা বদলে যেতে থাকে—স্নেহার্দ্র মোহময়ী সৌন্দর্য ফুটে ওঠে সমস্ত অবয়বে। কিউ অপলক চোখে আমার দিকে চেয়ে, ধীরে ধীরে চোখের পাতা বন্ধ করে। সিঁদুর রাঙা কমলার মত ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে। কি অসম্ভব সক্রিয়, প্রাণবন্ত হয় মানুষের ঠোঁট, না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না। জানি আমার কাছে কিউ-এর এই মুহূর্তে প্রত্যাশা।

অসহায় রমণী এই কিউটি। বড় অসহায়। পৃথিবীতে আত্মীয় বন্ধু, কেউ নেই। সুস্থ মানুষ, সুস্থ মন, স্বাভাবিক প্রকৃতি। একজন সুস্থ সবলা স্বাভাবিক নারীর সখ-আহ্লাদ, প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ-ভক্তি সঞ্চিত আছে ওর অন্তরে। সে ভালবাসতে চায়, সুখ চায়, আরাম চায়, সাশ্রয় চায়। অথচ এ যাবৎ তার কতটুকু বা পেয়েছে! পরিচয়হীনা, প্রথম যৌবনের নিবিড় ভালবাসা হতে বঞ্চিতা, পৃথিবীর চোখে এক অবাঞ্ছিতা নারী। রূপে রসে গন্ধে ভরপুর। ইচ্ছা করছে ওকে আরো আদর করি। আর কাছে, বুকের মধ্যে টেনে নিই। সে যে একা—একথা মিথ্যা, একথা যেন সে নিশ্চিত ভাবে মনে করে।

নির্বাক বসে আছি। মন কথা বলে চলেছে নিজের মনে। শ্বাস-প্রশ্বাস পতন ব্যতিত সমস্ত অঙ্গ নিশ্চল এবং আবিষ্ট। আমি জানি কিউ তার হৃদয় দিয়ে আমার হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করছে। যেখানে দৈহিক কামনা কিউ এবং আমার, উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। দৈহিক মিলন নয় এ শুধু অন্তরের পূর্ণ মিলন। সময় বয়ে গেছে অত্যন্ত

স্বাভাবিক নিয়মে। লাঞ্চের সময় হয়েছে।

—খাবার রেডি করবো দিদি।

—হ্যাঁ করো।

কিউ ওঠে। বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে ডাইনিংয়ে এগিয়ে যায়। কুমায়ুনের উদ্দাম কিউটির সাথে আজকের ফ্ল্যাটের কিউটির কোনো মিল নেই। ফোন বাজে। রোহিত ফোন করেছে। প্যারিস থেকে। ওরা ভালো আছে। মায়ের সাথে কথা হয়েছে। ওরা প্যারিস উপভোগ করছে। ওদের উৎসাহিত করলাম।

সন্ধ্যায় মালবিকা ফোন করেছিল। কিউ কথা বলেছে লম্বা। কিউকে ইশারায় বললাম, মালবিকা যেন তার স্বামীকে নিয়ে এ বাড়িতে আসে, কিউ নিমন্ত্রণ করলো। বলছে শুনলাম, আমি ওদের সাথে আলাপ করতে ইচ্ছুক।

চণ্ডী রাতের খাবার রেডি করে ঘরে ফিরে গেছে। আগামি কাল সকালে আসবে। সমস্ত সন্ধ্যা টিভি দেখা, গান শোনা, মাঝে মাঝে আমার কাজের প্রোগ্রেস দেখা, আলোচনা করা ইত্যাদি করতে কেটে যায়। রাত্রে কিউ অত্যন্ত কষ্টে, সামান্য খাবার খায়—আজ ডাক্তার দেখানো হলোনা। কাল নিশ্চয় ব্যবস্থা করবো।

রাতের পোষাকে হালকা আলোয় সোফায় বসি। ঘুম আসতে দেরি আছে।

বিংশতিতম অধ্যায়

নার্সিংহোম থেকে ফিরলাম।

হায়দ্রাবাদ থেকে ফেরার আটমাস পর লাবণীর একটি সুন্দর কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম। যদিও ভাল ডাক্তার শহরের ভালো নার্সিং হোম, প্রথম থেকে নিয়মিত শরীর পরীক্ষা এবং ডাক্তারের পরামর্শমত অত্যন্ত নিয়মিত জীবন যাপন করেছে। কোন অভিজ্ঞ মহিলা না থাকলেও চণ্ডী ও আমি অত্যন্ত যত্নবান ছিলাম। কিউ-এর কোন অসুবিধা হতে দিইনি। আজ, কিছুক্ষণ আগে একটি সন্তান প্রসব করেছে। কিউ-এর মেয়ে হয়েছে। কিউ মা হয়েছে। অবিবাহিতা কিউ সন্তানের জননী এবং পিতৃ পরিচয় সেই শিশুর না থাকলেও আমি তার জন্মদাতা। শিশুর নামকরণ হয়নি। নাম এখনো রাখা হয়নি। শিশুর নাম, না ভেবেছে কিউ, না ভেবেছি আমি। যদিও একেবারে ভাবিনি বলাটা সঠিক হবেনা কিউ সন্তান প্রসব করবে একথা সাড়ে আটমাস আগেই জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু কিউ ও আমি আলোচনা করে কোন নাম নির্দিষ্ট করতে পারিনি। নার্সিং হোম থেকে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে শিশুর নাম, শিশুর মায়ের নাম, বাবার নাম, জন্ম তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হয়। যদিও সব নবজাতকের নাম, নার্স ডাক্তার এবং আয়ারা "বেবি" বলে উল্লেখ করে, যতক্ষণ না শিশুর বাবা মা শিশুর নামকরণ করে। কোনো শিশুই জন্ম মুহূর্তে নিজের নামকরণ নিজে করে জন্মায়না। যেমন কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ খৃষ্টান, কেউ বৈদ্য বা সাঁওতাল, শবর হয়ে জন্মায়না। শিশু জন্মায় পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে, জন্ম মুহূর্তে সব শিশুই বেবি, জন্ম রেজিষ্টারে শিশুর নাম বেবি বা অন্য কোনো নাম লিখে পিতার নাম লেখার সাথে সাথেই সেই শিশুর জাত, কুল, শ্রেণী, ধর্ম ইত্যাদি নির্দ্ধারিত হয়ে যায়। অর্থাৎ সিলমোহর পেল এই পৃথিবীতে ঐ শিশুর জন্মের প্রথম পাতা। ভিতরের পাতার বিষয় বস্তু বাতিত

প্রথম পাতায় লেখা সেই পরিচিতি সে-শিশু মানব বহন করবে আমৃত্যু হয়ে বংশাদি পরম্পরায়, তার পরিবর্তন হয়না।

অতঃপর ডিসচার্জ সার্টিফিকেট লেখক বাবুটি সদ্য প্রসূত সন্তানের নাম জানতে চাইলে কিউ আর আমি দুজনে মুখচাওয়া-চাওয়ি করেছি, নাম ঠিক করতে পারিনি—বেবির কি নাম হবে? বেবির কি নাম লিখবো? বেবির কি নাম হবে?....দুজনে বার বার বেবির,—বেবির কি নাম রাখা হবে?—কি নাম? শুধু বেবি?....বেবি। মায়ের নাম, কিউ বা কিউটি নয়, ওর যা প্রকৃত নাম, অর্থাৎ লাবণী, বা পূর্ণ নাম শ্রীমতি লাবণী খান এবং বাবার নাম শ্রীবসন্ত বসু লেখা হয়েছে। অর্থাৎ যে শিশু কন্যাটি জন্মগ্রহণ করেছে, সে পরিচিত হল, নাম বেবি, মা, শ্রীমতি লাবণী খান এবং বাবা শ্রীবসন্ত বসু।

আমার সন্তান বেবি। কিউ বলেছিল নামকরণ করতে, সাত কাজে এবং নানান চিন্তার সাথে এক নুতন চিন্তা যোগ হওয়াতে কিউ-এর সন্তান হলে—ছেলে হৌক বা মেয়ে হৌক তার জন্মের আগেই দুটি নাম ঠিক করে রাখতে হবে, যে দায়িত্ব কিউ আমায় অর্পণ করেছিল, যে দায়িত্ব পালন করতে পারলাম না, আমি ব্যর্থ হলাম। প্রথম দায়িত্ব পালনেই আমি অকৃতকার্য্য হলাম। যদিও কিউকে বার বার বলেছিলাম, তোমার সন্তান তোমার স্বপ্নের শিশু, তার নাম পছন্দ তোমারই করা দরকার. এও বলেছিলাম, যেহেতু তোমার বাংলা শব্দের ওপর, বাংলা ভাষার ওপর বেশি দখল আছে, তুমি নামকরণ করলে সুন্দর হবে, ও শোনেনি, শেষ পর্যন্ত যেহেতু শিশুটি আমাদের দুজনের সেহেতু দুজনে ওর নাম স্থির করব—তাও হয়ে ওঠেনি। যা হোক ঠিক হল পরে আবার খুঁজবো। এবং দুজনে এক সাথে। কিউ আর আমি, এতদিন কিউ ভাবছে, কিউ করেছে, আমি করছি, আমি ভাবছি বলতাম—এখন থেকে সেটি হবেনা। যদিও গত কয়েকমাস যাবৎ একক বা স্বতন্ত্রভাবে কেনো কিছু না করে আমরা যৌথভাবে সমস্ত ভাবনা চিন্তা, কাজ-কর্ম সম্পাদন করেছি। অতএব বেবির. এই একবিংশ শতাব্দীর সদ্য জন্ম গ্রহণ করা কুমারী লাবণী খানের মেয়েকে আমি, সে এবং পৃথিবীর লোক কি নামে ডাকবে সেই নামটি লাবণী এবং আমি এ যাবৎ স্থির করতে পারিনি, আগামী দিনে ভেবে চিন্তে স্থির করবো ঠিকই তবুও হে পাঠককুল এবং শ্রোতৃবৃন্দ, যারা এত সময় ধৈর্য্য সহকারে আমার গল্প শুনছেন, কেউ হাসছেন, কেউ মন্দ বা ভালো মন্তব্য করছেন, কেউ সমর্থন করছেন, কেউ বা বাহবা দিচ্ছেন, তাদের সকলের কাছে আমার আশা—শিশুটির একটি সুন্দর নাম, তা দু অক্ষরে হৌক, তিন বা চার অক্ষরেই হৌক ঠিক করে দিন তাহলে আমি অন্ততঃ নাম খোঁজার দায় থেকে মুক্ত হবো! শুধু নাম হলেই হবে, পদবী বাদ দিলেই বা কি ক্ষতি? নাম লিখতে কম সময় লাগবে, বলতে কম সময় লাগবে, কম কাগজ খরচ হবে, কম কালি খরচ হবে, দিন দিন জনসংখ্যা বাড়ছে, নামের সংখ্যাও বাড়ছে, পদবী বাদ দিলে সময়, কালি কাগজ ইত্যাদির সাশ্রয় হবে, মন্দ আইডিয়া না: তাছাড়া পদবী থাকলে কী যত গণ্ডগোল. পদবী উড়িয়ে দিলে মন্দ হয়না। ঐ তো অনেক গায়ক নায়ক নায়িকা, আরো অনেক খেলোয়াড়দের আমরা শুধু মাত্র নাম দিয়ে চিনি. পদবির প্রয়োজন হয়না, বেবির ক্ষেত্রেও অসুবিধা হবেনা। কি বলেন?

সবই তো আমাদের সৃষ্টি। মানুষ যুগে যুগে নিজের তৈরি শৃঙ্খলে নিজে বাঁধা থাকে, অহরহ মৃত্যুর থাবা গ্রাস করে তবুও মানুষ সে শৃঙ্খল ছিড়বেনা। এটাই আমাদের এ সভ্য জগতের বড় ট্রাজেডি। মানুষের পরিচয় হওয়া উচিৎ মনুষ্যত্বে, নামে, ধর্মে বা বর্ণে নয়।

হায়দ্রাবাদ থেকে রোহিতের বিয়ের পর, রোহিত হনিমুনে প্যারিসের পথে প্লেনে চাপলো, স্ত্রীকে নিয়ে, রুচী ও আমি কলকাতায় ফিরলাম, তারপর কিউকে নিয়ে কয়েকদিনের ব্যস্ততা এবং কিউ-এর ডাক্তার নার্সিং হোম ইত্যাদি ব্যবস্থা করে, ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নিয়ে চণ্ডীর ওপর কিউটির দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এক সপ্তাহের জন্য আমাকে আমেরিকা যেতে হয়েছিল, ইউনেস্কোর তরফ থেকে আমার কাজের স্বীকৃতিতে পুরস্কার গ্রহণ করতে। তার সাথে টাকার পরিমাণ কম নয়। টাকার প্রয়োজন আমার বিশেষ নেই, রোহিত আমার টাকার পরোয়া করেনা, তার উপার্জন মোটা, রুচীর সঞ্চয় আছে, পেনশন্ পায়, সাদার্ন এভিনিউয়ের ফ্ল্যাট তার নামে, সে কারণে প্রাপ্ত টাকা কিউ-এর খাতায় জমা করে দিয়েছি। যদিও প্রয়োজন না হলেও রুচী ও রোহিতের সাথে আলোচনা করেই করেছি। কিউটির টাকার প্রয়োজন উভয়েই সে কথা স্বীকার করে। এই বিগত কটি মাসে আমার লেখার কাজ একটুও এগোয়নি, কারণ কিউকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে—কিউটির তো আপনজন কেউ নেই।

বিগত এই কটি মাসের ঘটনা, জানি আপনারা অনুমান করেছেন, বা কল্পনা করে একটা রূপরেখা তৈরি করে ফেলেছেন, তবুও আরো কয়েকটি কথা না বলতে পারলে "না-বলা" থেকে যাবে, সেই কারণে আর সামান্য ধৈর্য্য ধরুন আমি বলি। বলতে ইচ্ছা করছে আমি কিউয়ের প্রসবযন্ত্রণা কাতর চোখে হাসির ঝলক দেখেছি, প্রসবান্তে দেখেছি তার খুশির হাসি, নির্মল, পরিতৃপ্ত হাসি, আমি নতুন ভাবনায় ভারাক্রান্ত থাকলেও সত্যি বলছি আমি তৃপ্ত কারণ আমি অন্ততঃ কিউকে প্রকৃতই খুশি ও তৃপ্ত দেখলাম। যাক্ যে কথা বলছিলাম, অতি সাধারণ কথা, যন্ত্রণার কথা, সুখের কথা, সুখ ও দুঃখ মেশানো অনুভূতির কথা। জীব মাত্রেই অনুভূতি প্রবণ। মানুষের অনুভূতি তীব্র এবং সংবেদন শীল। গতানুগতিকতার বাইরে কোন ঘটনা ঘটলে। কোনো কিছু প্রাপ্তি বা কোনো কিছু অপ্রত্যাশিত বিলুপ্তি ঘটলে আনন্দ বা দুঃখ হয়, আঘাত পেলে যন্ত্রণা আবার আরাম পেলে সুখ হয়। খুব স্বাভাবিক। কারো কারো কাছে কখনো অধিক প্রাপ্তি সন্তুষ্টি বিধান করেনা আবার অনেকে স্বল্প প্রাপ্তিতেই অতীব খুশি হয়। সব কিছুই পৃথক পৃথক মানুষের কাছে পৃথক পরিবেশের কারণে পৃথক পৃথক অনুভূতির সৃষ্টি করে। একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। অভ্যাসের প্রভাব আছে মানুষের প্রকৃতির ওপর। একদা মানুষ বস্ত্রের ব্যবহার জানতোনা। মানুষ বেঁচে ছিল। বর্তমানে বস্ত্রহীন মানুষ ভাবতেই পারেনা, অভ্যাসের পরিণতি। কেউ কেউ খড়ের চালায় সামান্য কাঁথায় গভীর নিদ্রায় সুখ পায় আবার কেউ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে উত্তম শয্যায় ঘুমোতে পারেনা, ঘুমের জন্য ছট্‌ফট্ করে। কৌপিন সম্বল করে এখনো কিছু মানুষ শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অতিবাহিত করে, নিরোগ শরীরে—অভ্যাস।

আমরা অভ্যস্ত প্রথাগত কিছু সম্পর্ক, রীতিনীতি, সামাজিক আচার আচরণের মধ্যে, তার বাইরে কিছু হলেই বা ব্যতিক্রম কিছু ঘটলেই বিপদ, সমালোচনা, সমাজের চোখে অপরাধ, এমনকি শাস্তি।

যাই হৌক, এ তাবৎ কাহিনীর ব্যাখ্যা জীবন সন্ধিৎসুরা কিম্বা সমাজ রসিকরা করবেন। বার্দ্ধক্য আমার শরীর ও মনে হাজির বেশ বুঝতে পারছি, তাই এই ব্যস্ত পার্কের নির্জন একটা বেঞ্চে বসে প্রতিদিন কিছু না কিছু বকে চলেছি, শ্রোতা থাকুক বা না থাকুক। ইতিমধ্যে অনেকেই ফিরে গেছে, মানুষ বড়ই ব্যস্ত, নতুন এবং তরুণ মুখ

আশপাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে, কেউ কেউ সামনে আসন নিয়েছে, বলা থামেনি। কারণ কিছু কথা এখনো বলা বাকি আছে, কিছু কথার ধারাবাহিকতা হারিয়েছে। অতএব বলি।

সেই রাত্রে চণ্ডী রাতের খাবার রেডি করে, টেবিলে সাজিয়ে ফিরে গেছে বারাসতের কাছে নিজের বাড়ি--বাড়িতে বৌও ছেলেমেয়ে আছে। আমি কলকাতায় না থাকলে চণ্ডী এই ফ্ল্যাটে রাতে থাকে, অন্যথা সে কাজ সেরে প্রতি রাতে বাড়ি ফিরে যায়। আমি হায়দ্রাবাদ থেকে ফেরার পর প্রতিরাতের মত আজও সে ফিরে গেছে। চণ্ডীর বৌ-এর জন্য আমি একটা সিল্কের শাড়ী এনেছিলাম, সেটাও হাতে করে অত্যন্ত খুশি মুখে সে গেছে। সাধারণতঃ আমি কোনোদিনই দোকান বাজার করিনা। কিন্তু হায়দ্রাবাদে সেই সময় একটা বস্ত্রশিল্পের এগ্‌জিবিশন চলছিল—নানা রকমের হস্তশিল্প সামগ্রীর সাথে শাড়ীও ছিল। আমার সাথী অল্প বয়সি একজন তামিল ছেলে, নম্র এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, সে বললে, একটা নিন্‌না স্যার মেমসাহেবের জন্য কিছু! ও জানতনা যে আমার স্ত্রী এই শহরেই আছে, কলকাতায় নয়, এবং আমার পছন্দের ওপর কোনোদিনই যার ভরসা ছিলনা। সে কারণে রুচীর জন্য কেনাকাটা আমি করিনা। এমন গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ীটা দেখে চণ্ডীর বৌর কথা মনে এল—বেচারা ভাল খেতে পায়না, পরতে পায় না—কিনে ফেললাম। সেই সবুজ রঙের শাড়ীটা খুশিতে ডগমগ হয়ে চণ্ডী তার বৌয়ের জন্য নিয়ে গেছে।

কিউ শাড়ী বদলে স্লিপিং গাউন পরে সোফায় আমার পাশে বসল। চিন্তাক্লিষ্ট গম্ভীর মুখ। নিস্তরঙ্গ শরীর, কোন আহ্বান নেই, নেই খুশির উচ্ছ্বাস, পরিবর্তিত কিউ। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে, পাহাড় থেকে ফেরার পর হায়দ্রাবাদ ছয় কি সাত সপ্তাহ হবে, কিউ-এর এ জাতিয় পরিবর্তন বোধগম্য হচ্ছেনা। কি চিন্তা করছে কিউ? ওর কি শরীরে কোনো কষ্ট হচ্ছে? আগামীকাল অবশ্যই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো। ধীরে ধীরে ওকে কাছে টানি। কিউ-এর শরীরে কোন উত্তাপ নেই, চোখ মুখ শান্ত, না ঠোঁটের কোনো পরিবর্তন নেই। কি এমন আঘাত পেলো সে? না কি পুরানো কথাগুলো আবার ফিরে এসেছে? আজকাল মালবিকা প্রায়শঃই ফোন করে, সে কি কিছু বলেছে?

—কি হলো কিউ, কিউটি! তোমার শরীর কি খুব খারাপ? তোমার কোথায় কষ্ট হচ্ছে বলো। এতদিন বলোনি কেন? ডাক্তার কল করতে পারতে—

অনেকগুলো কথা, অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে করে ফেলেছি। আসলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, কিউ-এর নির্বাক, অস্বস্তিকর অবস্থা আমায় অস্থির করে তুলেছে। অনেক সযত্নে দীর্ঘদিনের প্রয়াসে মানসিক ভাবে অসুস্থ কিউকে সুস্থ করে তুলেছি। আবার যদি কোনো অঘটনে তার মানসিক স্বাস্থের অবনতি হয়, সেই শঙ্কায় আমি অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত, অথচ কিউ কিছু বলে না। যদি শরীর খারাপ হয় চিকিৎসা করালে ঠিক হয়ে যাবে।— 'অপরদিকে কিউ এতদিন অপেক্ষা করছে, বসন্তের কাছে, একমাত্র বসন্তের কাছেই বলা যায়, তার লুকিয়ে রাখা গোপন কথাটি বলবে। কিন্তু সেই কথাটি কিভাবে বলা হবে স্থির করতে পারছেনা। আবার আশঙ্কাও আছে কথাটি শোনার পর বসন্ত যদি খারাপ ভাবে নেয়, বসন্ত যদি রেগে যায়, বসন্ত যদি ত্যাগ করে, তখন সে কি করবে? কোথায় যাবে? কে আছে তার?

—বোসো। বলবো। সময় হৌক।

না কিউ-এর কথায় কোনো অসহিষ্ণুতা বা অস্থিরতা নেই, অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং

চেনা স্বর। যদিও আচরণ এখনো অপরিচিতার ন্যায়। সামনে টিভি চলছে। সংক্ষিপ্ত আকারে রাষ্ট্রসংঘের একটা রিপোর্ট—আর্থসামাজিক সমীক্ষার তুলনামূলক একটা রিপোর্ট বা তথ্য। ভারতবর্ষের অবস্থা করুণতম। কি শিশুমৃত্যু, দারীদ্র, চিকিৎসার অভাব, কি শিক্ষা—সমস্ত ব্যাপারগুলোতেই পরিসংখ্যান মতে ভারতের স্থান তলদেশে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের অবস্থা ভারতের অপেক্ষা ভালো। চ্যানেল চেঞ্জ করি। বিদেশি চ্যানেল। ওরা নতুন কথা বলেনি। সারা জীবন এ কাজই করে আসছি। অজানা কিছু ঐ রিপোর্ট বা খবরে নেই। খবর করতে হয় তাই খবর। রিপোর্ট ফাইলেই আবদ্ধ থাকবে, কাজ হবেনা, আবার রিপোর্ট তৈরি হবে—রিপোর্টের ফাইলের পাহাড় জমছে, জমবে।

—আমার মনে হচ্ছে, আমার ভয় করছে বলতে, বসন্ত একটা অন্যায় হয়ে গেছে।

হকচকিয়ে উঠি। কিউকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখি। কিউ অন্যায় করেছে? কি অন্যায় করেছে? যার জন্য তার এই আচরণ? গম্ভীর? কি এমন গুরুতর অন্যায়? কি সে করতে পারে? না, কিছু ভুল খাবার বা ওষুধ খেয়েছে যার জন্য শরীর খারাপ?—হতে পারেনা। কিউ-এর চোখে মুখে অন্যায়ের কোনো চিহ্ন নেই। সে অন্যায় করতে পারেনা। তবে চিন্তার রেখা কেন? ওর চেহারায়? শরীরে ওর কিসের কষ্ট?

—তোমার শরীর খারাপ? কাল ডাক্তার কল্ করবো?

—বলছি তো অন্যায় হয়ে গেছে, অপরাধ হয়েছে।

—বেশ করেছো। আবার অন্যায় করো। সব অন্যায় তোমার মাপ। এখন বলো, শরীরে কি কষ্ট হচ্ছে?

—ডাক্তার না দেখালে বলতে পারছি না। খাবারে অরুচি বমি বমি ভাব—

—জন্ডিস হতে পারে। কলকাতার কলের জল সম্পূর্ণ দূষণ মুক্ত নয়। পাইপ লাইনের ঠিক মত মেনটেনেন্স হয়না, লিকেজ থাকে। ইউরিনের কালার ঠিক আছে? দেখি চোখের রঙ?

—রাতে ঠিক মত বোঝা যায়না।—না, হলুদ নয়। হাতের তালু—লাল। ঠিক বুঝতে পারলামনা। কাল সকালে ডাঃ ঘোষকে কল্ দেবো—এসে দেখে যাবে।

—ঠিক আছে। তবে আমি নিশ্চিত জন্ডিস না।

—জন্ডিস নয়, কি করে জানলে? লিভারে সামান্য ইনফেক্শান হতে পারে—

—না।

—তবে কি।

—আমি জানিনা।

হায়রে ডঃ বসন্ত বাসু! মেয়েদের খাবারে অরুচি? বমি বমি ভাব শুধু কি জন্ডিস হলে হয়! বুঝতে পারেনা। অনভিজ্ঞ ডঃ বসন্ত বাসু—রুচীর স্বামী, রোহিত হওয়ার পূর্ব অবস্থা তার স্বামীকে কোনোদিন বুঝতেই দেয়নি। তাকে ডাঃ ঘোষ এসে পরীক্ষা না করলে বোঝার সাধ্য নেই।

নীরব কিউ। কোনো কথা বলেনা। চিন্তা করে—কিসের চিন্তা? হাসি পর্যন্ত নেই। কিউ মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে—কি ভাবে বসন্তের কাছে পেশ করবে তার স্বপ্নের কথা—সে যে বড় লজ্জার। কিউ-এর চোখে জল নেই—সে হাসছেনা। কিউ—

বন্ধনমুক্ত মেদহীন, লাবণ্যে ভরপুর শরীর হালকা স্লিপিং গাউনে ঢাকা—বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট দৃষ্ট, না কোনো পরিবর্তন নয়, কোনো ঘাটতি নেই। সমস্ত শরীব জুড়ে জড়তা—নিস্পন্দ। আমার ভালো লাগছেনা। ইচ্ছা করছে ওকে জড়িয়ে ধরি, ওকে আদর করি, চুম্বন দিই—ঐ শরীরের জড়তা কেটে যাক, মনের শক্তি বৃদ্ধি হোক, যদিও মন চাইলেও, এ বৃদ্ধ শরীর অপরাগ, তাই মনের ইচ্ছা মনেই থাক—কিউ কিছু বলুক—

—মনে হচ্ছে আমি কান্‌সিভ্ করেছি, এগুলো তার সিমটম্—

আর্তি মাখানো চোখে আমার দিকে তাকায় কিউ। দুটি চোখে উদগ্রীব জিজ্ঞাসা। আমার সম্মতির অপেক্ষা। আমি কিউ-এর চোখে ক্ষণিকের জন্য চোখ রাখি। চেষ্টা করি সে চোখের ভাষা বুঝতে। কিউ-এর চোখের লেখা পড়তে চেষ্টা করি—কি আছে সে চোখে লেখা। এটি কি দুর্ঘটনা? না কি অভিপ্রেত? না কি প্রশ্ন? না কি আমার কাছে তার একান্ত কামনা। আমার হৃদপিণ্ডের গতি হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। আমি নিরুত্তর। বুদ্ধিমতি কিউ, উঠে বাথরুমে ঢোকে। আমায় সুযোগ দেয় যাতে আমি একান্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারি, যাতে আমি চিন্তা করে মতামত জানাতে পারি। কিউ কন্‌সিভড অর্থাৎ মা হতে চলেছে। অদূর অতীতের ঘটনা, টুকরো টুকরো সংলাপ, অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো মনের কোণে ভেসে ওঠে। আমি ওকে উৎসাহিত করেছি, উৎসাহিত করেছি দুঃখের পথ পরিহার করে সুখের রাস্তা খোঁজ করতে। নতুন করে জীবনের যাত্রাপথের সন্ধান করতে বলেছি বার বার—পুরোপুরি অনিচ্ছা সত্বেও নতুন জীবন সাথী বেছে নেওয়ার জন্য বলেছি অনেকবার। কিউ জানতো সে কথার অসারতা। আমিও বিশ্বাস করতাম কিউ কখনোই আর অন্য পুরুষের অনুরক্তা হবেনা। হবেনা আমি নিশ্চিত। কিন্তু কিউ-এর সন্তান হবে, কিউ মা হবে, এবং সেই সন্তানের জন্মদাতা আমি ডঃ বসন্ত বাসু, রুচীর স্বামী, রোহিতের বাবা, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। অথচ তাই হতে চলেছে। নিশ্চিত, কারণ কিউ হঠকারিতায় কোনো কাজ করার মত মেয়ে নেই। মনে পড়ছে কুমায়ুনের সেই রাত্রির উদ্দাম কামনার পিছনে নিখুঁত পরিকল্পনা এবং অনন্ত চাহিদার কথা। আসলে নারী মাত্রেই মা হতে চাইবেই—অকৃত্রিম বাসনা।

কিন্তু এর পর?—কি হবে? কি করব? কিউ সত্যই চায়? যদি সে পুণর্বিবেচনা করে তার সিদ্ধান্ত বদল করে, কোন অসুবিধা নেই, ডাক্তারের পরামর্শে অনায়াসে টারমিনেট করা যাবে। আমি নিশ্চিত কিউ তা চাইবেনা, যদিনা আমি অসহযোগিতা করি। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে। অভূতপূর্ব, অচিন্তনীয় এক প্রশ্নের সম্মুখীন এ বৃদ্ধ। রুচীকে আমি জানি, আমি জানি কি হবে তার প্রতিক্রিয়া। যেমনই হোক আমি যে তার স্বামী, ব্যবহারিক জীবনে কিউয়ের সাথে আমার সম্পর্কের কথা সে নিশ্চয় জানে, তবুও কি কিউ-এর সন্তানের বাবা হিসাবে আমাকে স্বামী হিসাবে রুচী মেনে নিতে পারবে?—অসম্ভব। নিরবে প্রত্যাখ্যান করলেও সহ্য করা যেতে পারে, কিন্তু চরম যদি কিছু করে বসে—পূর্ণ বিচ্ছেদ?—ভাবতে পারছিনা। রোহিত দূরে থাকে আমার সম্বন্ধে তার এক বিরূপ ধারণার তৈরি হবে—কিউ আমার আশ্রিতা একথা রোহিত জানে, কিউ আর আমার মধ্যে দৈহিক সম্পর্কের কথা—সে বোধ হয় জানেনা এবং বিশ্বাস করেনা। কিন্তু এর পর?—

সমাজকে নিয়ে আমি ভাবিনা। যাক্, এবার যাকে নিয়ে আমার ভাবনা, সেই কিউ

কি ভাবছে, সে কি চায়, সেটাই হবে আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র যুক্তি বা প্রশ্ন। কিউ সত্যই কি চায়? সে কি পূর্বাপর ভেবেছে? সে কি জানে সে একজন সামাজিক পরিচয় বিহিন সন্তানের জন্ম দিতে চলেছে, এবং সেই সন্তানের জননী হবে সে, যার নিজের কোনো পরিচিতি নেই? অবিবাহিত নারীর সন্তান, শুধু মায়ের পরিচয়ে তার পরিচয় মেনে নেবেনা সমাজ। সমাজ কি জানবে এক অনাথিনী মাতৃপিতৃ পরিচয়হীনা অবিবাহিতা ভারতীয় নারী মা? মানবেনা। মানসদার মত একজন শিক্ষিত উদার মানুষ, সর্বগুণসম্পন্না লাবণীকে পুত্রবধূ হিসাবে মেনে নিতে পারলোনা। অত্যন্ত স্নেহ করতো যে লাবণীকে অবশেষে নিজের সন্তানের কথা ভেবে আশ্রয় চ্যুত করলো, যে মানসদা এই পরিত্যক্তা শিশুটিকে সন্তানস্নেহে মানুষ করেছে লেখাপড়া শিখিয়েছে পুত্র মানব যাকে ভালোবাসতো, সে মানসদা লাবণীকে পুত্রবধূ হিসাবে স্বীকার করতে পারলো না, সমাজের চোখে ভালোবাসা মূল্যহীন হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন, আমি কি করবো? আমি কখনোই এ বিষয়ে কিউ-এর মতের বিরুদ্ধে যেতে পারবোনা। কারণ যা কিছুই ঘটে থাকুক সে ঘটনার জন্য আমরা যৌথভাবে দায়ী। সে কাজের দায় কিউ-এর একার নয়। অতএব ফল ভোগ একা কিউ করবে, কোনো যুক্তিই তার সমর্থন করেনা। এবং সিদ্ধান্ত আমরা যৌথভাবেই নেবো। কিউ-এর বিনা অনুমতিতে আমি কিছুই করতে পারিনা এবং করবোনা। কিউ একজন নারী, সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী নয় জেনেও যদি তার সাথে স্ত্রীর অনুরূপ শারীরিক আচরণ করতে পারি, তবে কিউকে ও তার সন্তানকে মর্যাদা দেবোনা কেন?—নিশ্চয় দেবো। কিউ সম্পর্কে আমার স্ত্রী নয়, আমার বান্ধবি নয়, আমার রক্ষিতা নয়। কিউ এর সাথে আমার সম্পর্ক সম্পূর্ণ মানবিক, সম্পূর্ণ আত্মীক, সম্পূর্ণ হার্দিক—কিউ আমার মৃত মনের সঞ্জীবন করেছে এবং বিকশিত করেছে। কিউ আমার জীবনে এক অসামান্যা নারী, যার হৃদয় জুড়ে ভালোবাসার সমুদ্র, সে ভালবাসার উষ্ণতা ব্যতিত এ বসন্ত অক্ষম। বসন্তের অর্থাৎ আমার যা কিছু সবই তার অবদান। কিউয়ের নারীত্বের পরশে বসন্ত শুধু জীবনীশক্তিই ফিরে পায়নি, ফিরে পেয়েছে তার সৃজনিশক্তি, নতুন উন্মাদনায়, কিউ-এর ঐকান্তিক সহায়তায় উৎসাহে আমি আমার কাজে পুনরায় ব্রতী হয়েছি। আজো আমি যা কিছু কিউ-এর প্রেরণার কারণেই করতে পারি। কিউ-এর আত্মবলিদান কামনাশূন্য। ভালোবাসায় তার অসীম বিশ্বাস, ভালোবেসে নিজেকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, বিনিময়ে গ্রহণে অপরাগ। কিউ যদি একান্ত বেঁচে থাকার তাগিদে একটা সন্তান আশা করে, তার অধিকার। এবং তার মধ্যে বাসনার উন্মেষ সে তো আমারই প্রচেষ্টার—আমি চেয়েছিলাম কিউ অন্ততঃ একটি অবলম্বন বেছে নিক্। নয়তো বাঁচবে কি করে? আমার অনুপস্থিতিতে সে যে এ বিশ্বে একা। এখন সে যদি একটা সন্তান কামনা করে, যা নারীমাত্রেরই একান্ত কাম্য আমি কি বিরূপ হতে পারি? বঞ্চিত করতে পারি? পারিনা!! কিউ-এর দৈহিক তৃপ্তি সে তো আমারই অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তির স্বার্থে। একজন অসহায়, আশ্রিতা, অনাঘ্রাতা, বিরহ ব্যথায় জর্জরিতা এবং প্রবঞ্চিতা আমার আশ্রয়ে এসে লাবণীর মধ্য রমনীবাসনা সে তো আমারই স্বভাবজ বাসনার কারণে। আমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, একজন সচেতন স্বামী এবং সন্তানের জনক হয়ে রুচীর কাছ হতে প্রত্যাখাত হয়ে কিউকে আমিই তো শারীরিক ভাবে উত্তেজিত করে তুলেছি এবং উভয়ে উভয়ের রমণইচ্ছা পূরণ করেছি, দূর্বার, উভয়ে উভয়কে ভোগ করেছি, তৃপ্ত হয়েছি কানায় কানায়। সে কিউ-

এর যদি সন্তান হয়, কিউ যদি মা হতে চায়, আমি বাধা দেবোনা বরং তার ইচ্ছাপূরণে পূর্ণ সহযোগ দেবো। আমি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করবো কিউ-এর গর্ভের সন্তান আমাদের সন্তান, ঐ সন্তানের দায়ভার আমাদের, ঐ সন্তানকে এবং সন্তানজননীকে পরিচর্য্যা করা আমার নৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক দায়িত্ব। বসন্ত বাসু মানসদত্তের মত স্বার্থপর দায়িত্বহীন নয়। আমি সিদ্ধান্ত করলাম। কিউ-এর সুখেই আমার সুখ।

চোখ, মুখ, ঘাড়ে জল দিয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুছে কিউ বাথরুম থেকে বেরোলো। সেই অনাদি অনন্তকালের ভারতীয় নারী, যার কোনো দাবি নেই, তার চোখে আছে কাতর অনুনয়। সামনে এসে দাড়ায়, যেন বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছে সে, আমি তার বিচারক, বিচার প্রার্থী কিউ। চোখের ইশারায় বসতে বলি। হাত বাড়িয়ে তাকে আকর্ষণ করি। সোফায় আমার বুকে এলিয়ে পড়ে। আমি ওর মাথায় চুলে, পিঠে হাত বুলিয়ে দিই, মনে মনে আশীর্বাদ করি কিউ তুমি সুখী হও! তুমি ভালো থাকো, তোমার সন্তান যে আসছে, সেও ভালো থাকুক, তোমায় পূর্ণতা দিক! দীর্ঘ সময় কিউ আমার বুকের আশ্রয় ত্যাগ করেনা, আমি দুহাতে কিউ-এর গায়ে পিঠে মাথায় অন্যমনস্ক হয়ে হাত বুলিয়ে চলি। অর্থাৎ মন মনের কাজ এবং হাত হাতের কাজ করে চলেছে একে অপরের সাথে যোগাযোগ না রেখে বা বিচ্ছিন্ন ভাবে। কামনা শূন্য, আগের মত এ শরীর, কিউ-এর যাদুমাখা শরীর, কোন উত্তেজনার সৃষ্টি করেনা। না আমার, না কিউয়ের। ইচ্ছা হয়না সেই আগের মত কিউয়ের শরীরটাকে আদর করি। মনে আমার অনেক কথার, অনেক ঘটনার উঁকিঝুঁকি। রুচী, রোহিত, রোহিতের সদ্য বিবাহিত স্ত্রী অর্থাৎ আমার পুত্রবধূ, তার পিতৃকুল, দেশে বিদেশে আমার পরিচিত মনীষীবৃন্দ, সংবাদ---মাধ্যম---জানি, আমি কারো কাছ থেকে এ কাজের সমর্থন পাবোনা বরং তারা আমায় এ কাজের জন্য নিন্দা করবে, অসাক্ষাতে ধিক্কার জানাবে। জানাক্। কিউ আমার কাছে সবার বড়, সব কিছুর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান, কিউয়ের সাথে কোনো কিছুর তুলনা করা যায়না। কিউ অতুলনীয়া। আমি সর্বস্বের বিনিময়ে কিউকে গ্রহণ করবো। জ্ঞানতঃ তার প্রতি আমি অবিচার করবোনা। কিউ তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার ইচ্ছাপূরণ আমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা পূরণ, আমি তোমাতে দায়বদ্ধ। আমি তোমায় ভালোবাসি কিউ। ধীরে দুহাতে তালুতে চিবুক স্পর্শ করে ওর মুখ আমার চোখের সামনে তুলে ধরি, ওর কপালে, ঠোঁটে চুম্বন দিই কিউ-এর দুটি চোখ বন্ধ যেন এক অবোধ বালিকা।

রাত্রির নিস্তব্ধতা প্রসারিত হয়। ছোটো আলো জেলে কিউ আমার বুকের ওপর মাথা রেখে ঘুমোয় নিশ্চিন্তে, নিরুদ্বেগে। আমি জেগে থাকি, ঘুম আসেনা, রাত্রি বাড়ে। সমস্ত জীবন একে একে আমার সামনে এসে হাজির হয়। মনে মনে কখনো হাসি, কখনো কান্না পায়, ব্যথায় বুক চিন্‌চিন্ করে। কখনো মনে হয় ব্যর্থ নয়, স্বার্থক এই জন্ম। আজ পর্যন্ত আমি কোনো অন্যায় করিনি, যা করেছি সকলের হিতে। রুচীর স্বার্থ অরক্ষিত রাখার প্রয়াস ছিল পূর্ণ, ত্রুটিহীন। আমাদের দাম্পত্যজীবন প্রথমদিকে ছিল মনোরম। মহানন্দে বিবাহিত জীবনের প্রথম কটি বছর কাটিয়েছি, সাধারণ ভারতীয় পুরুষের মত আমার চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক। আমার জীবনে নারীর প্রতি প্রথম ভালোবাসা রুচীর সাথে--অকৃত্রিম। অথচ কোথায় থেকে কি ভাবে যে রুচীর মানসিক পরিবর্তন ঘটে গেল, ধীরে ধীরে আমার জীবন থেকে রুচী নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল, তার কারণ

আমার কাছে আজো অজ্ঞাত। আমাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো বিবাদ হয়নি, কোনো কঠোর শব্দ আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিনি। রুচী আজো আমার চিন্তার অনেকাংশ জুড়ে আছে অর্থাৎ আজো আমি রুচী হতে বিচ্ছিন্ন নই। রোহিতের সাথে আমার স্বার্থ সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধা, আমি রোহিতের স্বার্থে কিছু করতে পারিনি বা চাইনি বলা ঠিক হবেনা বরং রুচী সর্বদাই রোহিত ও আমার মধ্যে এক কঠিন প্রাচীর তুলে রোহিতকে আমার কাছ হতে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তবুও রোহিত ও আমার মধ্যে মানসিক বন্ধন অটুট। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে, তথা মানবজাতির স্বার্থে বিশেষ করে দরিদ্র, অসহায় নারী ও শিশুর স্বার্থে আমি আজো অক্লান্ত কাজ করে চলেছি। কিউ-এর স্বার্থে, কিউয়ের সুখের নিমিত্তে আমি যা করেছি তা অন্যায় নয়। সর্বোপরি আমার স্বার্থে। আমার আচরণ সমাজের চোখে বিসদৃশ বা অনৈতিক হলেও আমার চোখে কোনো অন্যায় নয়। আমি আমার প্রতি কোনো অন্যায় করিনি। এ বিষয়ে আমার বিবেক কোনদিন দংশন করেনি এখনো করছেনা। অর্থাৎ সঠিক কাজ করেছি।

রাত্রির নিস্তব্ধতা এখন পূর্ণ। নীদ্রায় আচ্ছন্ন নারীপুরুষ, শিশু যুবা, বৃদ্ধ। জানালা দিয়ে লাইট পোষ্টের আলো এসে পড়েছে ঘরের দেওয়ালে, পর্দার ফাঁক গলিয়ে। ঘুমন্ত কিউয়ের মাথা অতি সন্তর্পণে এবং সযত্নে বুকের ওপর থেকে নামিয়ে বালিসে রাখলাম। নিশ্চিন্তে, শান্তিতে নিদ্রায় ডুবে আছে কিউ। আলতো করে ওর কপালে, ঠোঁটে আমার ঠোঁট স্পর্শ করি। নিস্পন্দ কিউয়ের শরীর যেন দীর্ঘদিনের অনিদ্রার পর এই নিদ্রা। এখন আমি ঘুমোতে চাই। ঘুম আসুক আমার সমস্ত শরীর ও মন জুড়ে! পুনর্বার কিউয়ের মুখের দিকে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করি—রোহিতের জন্মের আগে রুচীর গর্ভাবস্থায় রুচী কি এমনি দেখতে ছিল?—মনে পড়ছেনা।

আমার ঘুম ভাঙার আগেই কিউয়ের ঘুম ভেঙেছিল। স্নান সেরেছে। কিউ-এর চেহারায় গতকালের চিন্তার যে সুস্পষ্ট ছাপ ছিল, তার অনেকটাই অপসৃত। সকালের মত ঝকঝকে তাজা কিউ। ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে, সে ইচ্ছা দমন করলাম। পবিত্রতা মাখানো কিউয়ের শরীর, ঘুম ভাঙা বাসি শরীর নিয়ে ওকে আর স্পর্শ করা অনুচিত। কিউ চা দেয়, আমার হাতে ওর হাতের মৃদু স্পর্শ—"ওঠো, চা খাও"। সেই শরীরের মৃদু শিহরণ। উঠে বসি, চা খায়।

চা খেয়ে মুখ ধুয়ে টেবিলে বসি। কিউ খবরের কাগজ পড়ছিল, আমি বসতেই আমার দিকে কাগজ বাড়িয়ে, আঙুল দিয়ে একটা খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোনো একটি বেসরকারি সংস্থার শিশু মৃত্যুর হার এবং কারণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন—এক করুণ ছবি। সঙ্গে সঙ্গে মনে আশঙ্কা জাগে—কিউ এর সন্তান এদের মত হবেনা তো।

ব্রেকফাস্ট সেরে কিউকে নিয়ে বেরিয়ে একজন স্ত্রী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এবং দু একটি নির্দেশিকা নিয়ে ফিরছি। কিছু পরীক্ষা নিরিক্ষা ব্যতিত প্রাথমিক ভাবে ডাক্তারের মতে কিউ গর্ভবতী। প্রাথমিক খবরে কিউ উল্লসিত না হলেও আনন্দিত। ওর চোখে সুন্দর শিশুর প্রত্যাশা। চোখ দিয়ে চেয়ে ওকে আশ্বস্ত করলাম, ভরসা দিলাম। এখন ফিরছি। যথারীতি রাস্তায় গাড়ির ভিড়, মানুষের ভিড়, ফুটপাথ দখলের পর এবার রাস্তা দখল করেছে হকার দল, যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং—গাড়ির সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে, রাস্তা চওড়া হওয়ার উপায় নেই, গাড়ি এগোতে চায়না। কিউয়ের পাশে আমি। খুশি মুখে

সন্দিগ্ধ চোখে মাঝে মাঝে কিউ আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি কি হঠাৎ কিউ মা হবে, এই খবরে চিন্তিত এবং বিরক্ত কিনা—কিউ এব চোখে এই প্রশ্ন। স্বাভাবিক—স্বীয় স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার প্রথম খবর শুনে অনেক স্বামীও প্রাথমিক ভাবে চিন্তিত হয়। কিউয়ের এই সংশয় স্বাভাবিক। চোখের দৃষ্টির সমর্থন, শরীরের স্পর্শে কিউয়ের ইচ্ছায় আমি শুধু পূর্ণ সমর্থনই জানাইনি, আশ্বস্ত এবং উৎসাহিত করেছি, তবুও সংশয় কাটেনি—নাকি কোনো কঠিন পরিণতির কথা চিন্তা করে তার আশঙ্কা, বোঝা যাচ্ছেনা। কারণ গর্ভবতী মায়ের মৃত্যু কিম্বা প্রসবের সময় মায়ের মৃত্যুর হার—এদেশে কম নয়, এবং কিউ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল—তার নিজের সম্বন্ধে আশঙ্কা থাকতেই পারে। আমি ওর কাঁধের ওপর হাত রাখলাম। ধীরে এবং সুনিশ্চিতভাবে উচ্চারণ করলাম—

—আজ হতে তোমার কিউটি বা কিউ নাম মুছে দিলাম। চিরকালের জন্য। মা কিউটি বা মা কিউ শুনতে আমারই খারাপ লাগছে। আজ হতে তোমার নিজস্ব নাম, অর্থাৎ আগের নামে, লাবণী নামেই ডাকবো। লাবণী—লাবণ্যে ভরা।

—অর্থাৎ তুমি আর আগের মত আদর করবেনা, মিষ্টি করে কিউ বলে ডাকবেনা—

—নারে বাবা না। বেশি বেশি আদর করবো—তোমাকে এবং তোমার সন্তানকে—

কিউ ঘুরে আমার মুখের দিকে তাকায়। পরখ করে সত্যি বলছি কিনা। এখানেও সংশয় আমি অভয় দিই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—আমি আছি, আরো কাছে—কাছাকাছি থাকবো! মনে মনে বলি—

—সাবধানে থাকতে হবে। নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলতে হবে। যে কোনো ধরনের অসুবিধা হলে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এই সময় একজন বয়স্ক মহিলা থাকলে ভালো হতো। একজন অভিজ্ঞ মহিলার তত্ত্বাবধানে থাকলে অনেক দিক থেকে সুবিধা হয়, তারা জানে, বোঝে কখন কি প্রয়োজন। মেয়েদের পক্ষে মায়ের কাছে থাকাই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা।

কিউ আমার গা ঘেঁষে বসে আছে, গাড়ি চলছে, নিরুত্তর। গাড়ির আলোয় আলোকিত কলকাতার জমজমাট রাস্তা, ল্যাম্পপোস্টের আলো ম্লান, বিজ্ঞাপনের আলোয় উজ্জ্বল দু পাশের অট্টালিকা, দোকান বাজার। তবুও গাড়ির মধ্যে আলোর স্বল্পতার জন্য কিউয়ের চেহারা অস্পষ্ট।

—বসন্ত তুমি কি রাগ করেছো? কেন জানিনা আমার মনে হল, মনে হল বলা ঠিক হলোনা, অনেকদিন নিজেকে প্রশ্ন করে উপলব্ধি করলাম, আমার নিজেকে; একান্ত আপন একজনকে চাই। তুমি নিশ্চয় জানো, আমি আর কাউকে বিয়ে করবোনা, কারণ আমার পক্ষে নূতন করে কাউকে ভালোবাসা সম্ভব নয় এবং ভালোবাসাহীন বিয়ে করা অনৈতিক এবং অসহ্য। অথচ এমন একজন চাই যে আমার একান্ত আপনার হবে, যাকে নিয়ে অন্ততঃ আমার সময়টা কেটে যাবে, যাকে নিয়ে আমি নিমগ্ন থাকতে পারবো, সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত। অন্ততঃ নতুন একজন কেউ এলে অতীতকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে, অতীত অন্ততঃ আমায় আর আতঙ্কিত করবেনা।

—বেশ। রাগ এখনো হয়নি, মনে হচ্ছে এবার রাগ করতেই হবে।

—তুমি ঠাট্টা করছো? আমি যা বলছি তা কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি।

—আমিও তোমার সব কটি কথা অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শুনছি। রাস্তার যা

নয়েজ—

—বাড়ি গিয়ে বলবে। রুচী আন্টি রাগ করবে? রোহিত—

—জানিনা। তবে এটুকু বলতে পারি এই বয়সেও তোমার নতুনের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। আমি সর্বদাই তোমার হিত কামনা করি। চেষ্টা করি তুমি সুখী হও। যতদিন শক্তি আছে আমি তোমার জন্য আছি। অপরের কথা এখনি বলতে পারছিনা।

গাড়ি ফ্ল্যাটে পৌঁছে যায়। আমি গেট খুলে নেমে কিউকে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করতে চেষ্টা করি। কিউ মৃদু হেসে, আমার সাহায্য না নিয়ে নিজে নামে। আপাততঃ সে শক্ত, শারীরিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

কিউ-এর সন্তান সুস্থ থাকুক। কিউ সুন্দর ও সুস্থ সন্তান প্রসব করুক! আমি যতদিন আছি মা ও সন্তান ভালো থাকুক, এ আমি চাই। কে কি ভাবল, কে রাগ করল, কে মনোকষ্ট পেল, সমাজ নিন্দা করল কি না করল—তাতে কিউ, না, লাবণীর জীবনের কোন পরিবর্তন হবেনা। বেল বাজাতেই ফ্ল্যাটের দরজা খোলে চণ্ডী। জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি—কিউদি ঠিক আছে তো। বলি, হ্যাঁ চিন্তার কিছু নেই দিদির শরীর ভাল আছে। তুমি দিদির দিকে বেশি করে নজর দেবে। যাতে খাওয়া দাওয়া ঠিক মত করে, বেশি পরিশ্রম না করে, বিশ্রাম নেয়—লক্ষ্য রাখবে। তার অনুমান সত্য বলে মনে হচ্ছে চণ্ডীর।

সোফায় বসি। কলকাতায় শহরে গাড়িতেও আরাম নেই। কিছুক্ষণ গাড়িতে চাপলেই ক্লান্তি আসে। কিউ বাথরুমে যায়। পোষাক পরিবর্তন করে। জল দিয়ে মুখ হাত গাল গলা ধুয়ে নিয়েছে—ফ্রেস। রাতের খাবারের দেরি আছে। চণ্ডী কফি করে কিউয়ের কাছে থেকে পরামর্শ নিয়ে কিচেনে চলে যায়। কিউ বসে। সংশয় কেটে গেছে। অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে, ওর চেহারা দেখলে বোঝা যায়। কিউ নিশ্চিন্ত এবং তার স্বপ্ন রূপ পেতে চলেছে তার জন্য সে খুশি এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা তার আচরণে। অনুভব করা যায়।

—আজ থেকে তোমায় কিউ বলে ডাকবো না।

—কেন?

বিস্মিত প্রশ্ন।

—কারণ তুমি যাথার্থ লাবণী বলে। কিউ পর্ব শেষ। কিউ একটা সাময়িক অবস্থা, একটা ব্রেক বা টার্নিং পয়েন্ট, তুমি লাবণী—সেই লাবণী। এটাই তোমার সঠিক পরিচয়।

—বসন্ত, আমি যে তোমার কাছে কিউ হয়ে থাকতে চাই।

—লাবণী যে আরো বেশি সুন্দর, বর্ণময়। শুধু নামে নয়, তোমার প্রকৃতি ও নাম লাবণী সমার্থক এবং যথার্থ। তাছাড়াও লাবণীই তোমার পরিচয়, তোমার নাম। আর কিউ সে তো আমার, একান্ত নিজস্ব অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু লাবনী তো সবার, এই পৃথিবীর, তোমার হবু সন্তানের মা লাবণী, কিউ কেন হবে! তুমি লাবণী, লাবণ্যময়ী, আমার সন্তানের জননী তুমি তো এবার থেকে মা।

—বেশ। তুমি যে নামে ডেকে খুশি হও, সেই নামেই ডেকো। কিন্তু লাবণী নামে যে আমার বড় ভয়। অতীতের লাবণী ভূত যেন বর্তমান-লাবণীর ঘাড়ে না চেপে বসে।

—না সে হবেনা। সে ভয়, সে সংশয় চিরকালের জন্য তোমার মন থেকে কেটে যাবে। তোমার মন নবীনকে আহ্বানের জন্য অধীর। তুমি এখন থেকে তার আহ্বানের জন্য পলে পলে প্রস্তুত হবে। এখন থেকে তোমার হৃদয়ে স্নেহমমতার রোপিত বৃক্ষ

পুষ্পিত হবে, সৌরভ ছড়াবে। স্নেহময়ী, মমতাময়ী হওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে সেই কুমায়ুন থেকে। মাতৃত্ব হঠাৎ বা আকস্মিক কোন অবস্থা নয়, মাতৃত্ব হচ্ছে সাধনা—সাধনায় সে গুণ অর্জন হয়। স্বল্প কালের আয়োজনেই তুমি সাধনায় ব্রতী হলে—স্বার্থক হবে আমার বিশ্বাস।

—তুমি কত কি জানো বসন্ত! তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা কোন ভাষায় জানাবো, বুঝতে পারছি না।

—কৃতজ্ঞতার কোনো অবকাশ নেই। বলতে পারো জীবন নামক বস্তুটির একটি যথার্থ এবং সঠিক রূপায়নের অভিব্যক্তি।

—তুমি বড় কঠিন কঠিন শব্দ বলছ বসন্ত এত কথা জানলে কি করে?

—তা তো জানিনা।

—তুমি দার্শনিক হয়ে যাচ্ছো, বসন্ত।

—দার্শনিক! না-না মোটেই না। তুমি খুশি, তাই আমি খুশি। মানুষ খুশি হলে বেশি কথা বলে। শুধু তাই না, একটা ক্ষেত্রে আমি অন্ততঃ সফল—তোমায় খুশি করতে পেরেছি। আমার সাহচর্যে অন্ততঃ একজন নারী খুশি হয়েছে। তুমি তো জানো, আমার প্রতি রুচীর বিরূপতা, সে খুশি নয়, রোহিতের সাথে মানসিক সংযোগ গড়ে ওঠেনি। সে কারণে এই বয়সে আমি যদি সত্যিই তোমায় খুশি করতে পারি তাহলে বলতে পারবো জীবনে অন্ততঃ আমি একটিবার সফল হয়েছি। কিউকে খুশি করতে পেরেছি, তাকে আনন্দ দিয়েছি। অসহায়, অসুস্থ, নরশিশু এবং দুঃস্থ মায়েদের কথা ভেবে ভেবে, কাজ করে জীবন ফুরিয়ে গেল, তাদের মুখে কবে হাসি ফুটবে জানিনা। সে কারণে তোমার মানসিক শান্তিতে, সুখে আমি তৃপ্ত, আমি গর্বিত। যে কদিন বাঁচবো, এই তৃপ্তিই হবে আমার সান্ত্বনা, আমার বড় পুরস্কার।

অপার বিস্ময়ে ধৈর্য্য সহকারে কিউ আমার কথা শুনছিল। তার দৃষ্টি অপলক, শুনছিল কান দিয়ে নয় হৃদয় দিয়ে, অপলক দৃষ্টি দিয়ে। তার সুখানুভূতি আমায় স্পর্শ করছিল, মর্মরিত হচ্ছিল অস্ফুট কণ্ঠস্বর—"বসন্ত, তুমি সুন্দর, তুমি অত্যন্ত মিষ্টি কথা বলতে পারো"। লাবণীর শরীর ও হৃদয়ের অনুভূতির নামই হচ্ছে প্রকৃত প্রেম। যে প্রেম কোনো বাধা মানেনা, গণ্ডি মানেনা, জাত মানেনা, কুল মানে না—এমনকি বয়সের ব্যবধানও মানতে জানেনা। যে প্রেমকে কোনো নির্দিষ্ট শব্দের শৃঙ্খলে সজ্ঞায়িত করা যায়না। এ যেন হৃদয়ের কোন নিভৃত উৎস হতে উৎসরিত স্বর্গীয় লহরী বা ফল্গুধারা—মৃদু অথচ মধুর, অদৃশ্য অথচ দৃশ্যমান, স্পর্শের বাইরে অথচ স্পর্শের অনুভূতি—যে বস্তুটির জন্য জীবন কাঙাল অথচ মেলে কদাচিৎ।

—লাবণী!

—বলো, আমি শুনছি।

—তুমি সুখী হও!

কিউ-এর দু চোখ ছাপিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। ছোট শিশুর মত আমার, বুকে মুখ গুঁজে দেয়। আমি বাধা দিইনা কারণ এ অশ্রু দুঃখের নয় সুখের।

চণ্ডী সামনে এসে দাড়ায়। কিউ মাথা তুলে, খাবার চাপা দিয়ে রেখে চলে যেতে বলে। ওকে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। চণ্ডী চলে যায়। টিভি খুলে খবর শুনি। নিশ্চিন্তে। কিউ সোফায় গা এলিয়ে দেয়। বিশ্রাম নিক্। বিশ্রামের প্রয়োজন, প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের।

রাত বাড়ে, ঠিক সময়ে দুজনে উঠে, রাতের খাবার গ্রহণ করি। কিউ বাথ্‌রুমে গিয়ে পোষাক পরিবর্তন করে। রাতের হালকা বন্ধনযুক্ত পোষাক। ঘরে হালকা আলো জ্বলছে। আমি কিউকে হালকা আলোয় দেখছি—সুন্দর কিউ এর শরীর, মন্দিরের মত পবিত্র। আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, শরৎকাল, না গরম, না ঠাণ্ডা মনোরম রাত্রি। লাবনী পাশে বসে। হেলান দিয়ে নয়, তার শরীর উর্দ্ধাঙ্গের ভার অর্পণ করেছে আমার বুকের ওপর। লাবনীর গা মাথায়, পিঠে মুখে হাত বুলিয়ে দিই। হালকা চুমু খাবার চেষ্টা করি। কিউ দীর্ঘসময়ে চেপে ধরে থাকে আমার ঠোঁট। সেই উষ্ণতা, সেই মদিরতা, সেই দুটি ঠোঁটের যাদু, আমি আবিষ্ট হই, দীর্ঘক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে এক সময় মুক্ত হই, বিছানায় শুয়ে পড়ি। লাবনী আমার হাতের ওপর মাথা রেখে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমোক, ওর বিশ্রামের প্রয়োজন।

লাবনীর সন্তান হবে। প্রথমে অনুমান করেছিল অভিজ্ঞ চণ্ডী। ডাক্তার দেখিয়ে ফিরেই ওর অনুমানকে সত্য বলে ঘোষণা করি। কারণ এমত অবস্থার চণ্ডীর প্রয়োজন সর্বাগ্রে। চণ্ডীকে লাবনীর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে বলি। চণ্ডী দায়িত্ববান, রাখবেও। ডাক্তারের পরামর্শ মত লাবনী চলবার চেষ্টা করে। গান শেখা আপাততঃ স্থগিত। গান শেখা আপাততঃ স্থগিত খবর শুনে মাষ্টার মশায় বিমর্ষ, মর্মাহত। বলে দিদির গান হবে। ওকে আশ্বস্ত করি—কিছুদিন পর আবার অভ্যাস করবে এবং সেই সময় তাকে পুনরায় খবর দেওয়া হবে। মিষ্টিমুখ করে একমাসের অগ্রিম বেতন নিয়ে সে ফিরে যায়। রোহিত প্যারিস থেকে ফিরে কাজে যোগ দিয়েছে। কখনো সখনো ফোন করে। একদিন ফোনে নানা কথার মাঝে লাবনীর খবর জানতে চাইলে অত্যন্ত সহজ ভাবে আমি লাবনীর কথা রোহিতকে বলি। রোহিত লাবনীর অপ্রত্যাশিত খবরে হ্যাঁ না কিছুই বলেনা। পরের কথাবার্তায় মনে হল ওর গলার স্বর গম্ভীর। অনুমান রোহিত ও লাবনীর অপ্রত্যাশিত খবরে হতচকিত এবং সে আপাততঃ কোনো মন্তব্য করতে চায়না। রোহিত বুদ্ধিমান ছেলে। রোহিত বড় হওয়ার পর থেকেই আমাদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের অবস্থান এবং সম্পর্ক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং সম্পর্ককে সে অস্বীকার করেনা এবং অনুমোদন না করলেও বিরুদ্ধে নয়। তবুও লাবনীর সন্তান হওয়া নিশ্চয় তার কাছে অনভিপ্রেত আমিও এ বিষয়ে পুনর্বার তার সাথে আলোচনা করিনা। রোহিত মন্তব্য করেনি এবং প্রতিবাদ করার ইচ্ছা থাকলেও সে কোনোদিন করবেনা কারণ রোহিতের মানসিক গঠন সে জাতিয় নয়।

রুচীকে কিছু না বললেও রুচী রোহিতের কাছ হতে লাবনীর খবর পায়। রুচী অযথা এ বিষয়ে কোনোদিন আলোচনা করেনি, লাবনীর সম্বন্ধে আগে যে সামান্য কৌতূহল ছিল, এখনো আছে কিনা জানিনা, সে লাবনীর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব। শধু লাবনীর ব্যাপারেই নয়, আমার সাথেও ইদানিং সামান্যতম ও বাক্যালাপ হয়না। কখনো সখনো সাদার্ন এভিনিউয়ে যাই। অল্প সময় থেকেই চলে আসি। বুঝতে পারি রুচী লাবনীর খবরে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছে। স্বাভাবিক কারণ, আমি যা তার স্বামী হিসাবে স্বীকৃত। কোন স্ত্রীই চায়না যে তার স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক হোক, স্বামীর সাথে তার সম্পর্ক থাকুক্ আর নাই থাকুক্। রুচী কোনো কিছু বলেনা, তবুও তার আচরণ ও প্রতিক্রিয়া থেকে অনুমান করি রুচী অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছে। লাবনীর ও আমার আচরণে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। মাঝে মাঝে মনে হয় লাবনীর ব্যাপারে রুচীর সাথে খোলাখুলি আলোচনা করি। কারণ রুচী আমার স্ত্রী, আমার জীবনসাথী, আমরা শপথ নিয়েছিলাম একে অপরকে ভালবাসবো,

একে অপরের সুখ ও দুঃখের সমান ভাগিদার হব। যদিও হতে পারছিনা, আমরা ব্যর্থ দম্পতি। পৃথিবী জানেনা। রুচী জানে, আমি জানি।

লাবনী এ সংসারে এসেছে বা আশ্রয় পেয়েছে আমাদের উভয়ের অনুমতিতে। লাবণীর সাথে আমি সহবাস করায় আমাদের দুজনেরই অনুচ্চারিত অনুমোদন আছে। লাবনীর সাথে আমার মানসিক ও শারীরিক সম্পর্ক রুচী ওয়াকিবহাল, তার আপত্তি ছিলনা। বরং পরোক্ষ সমর্থন ছিল। রুচী ও আমার মধ্যে সম্পর্ক লাবনীর উপস্থিতিতে পরিবর্তন হয়নি। কারণ রোহিতের জন্মের পর থেকে দাম্পত্য সম্পর্কে যে অবনতি হয়েছিল, তারা ধারাবাহিকতা আজো বিদ্যমান। তবুও সামাজিক ভাবে আমরা স্বামী স্ত্রী এবং দায়বদ্ধ। যে কারণে হায়দ্রাবাদে থাকাকালীন রুচী আমার নিয়মিত শারীরিক খোঁজ খবর নিতো। আমিও নিতাম। রোহিতের বিয়েতে আমার উপস্থিতি সে কারণে স্বাভাবিক এবং জরুরী ছিল। সেই রুচী এবার যেন দায়মুক্ত হতে চাইছে। আইনতঃ বিচ্ছেদ না চাইলেও, দায়বদ্ধতা হতে মুক্ত হতে চাইছে। এবং এ বিষয়ে তার আচরণ অনুচ্চারিত এবং অপ্রকাশিত।

মালবিকা মাঝে মাঝে ফোন করে। লাবণী কথা বলে। সুকান্ত ও মালবিকাকে আহ্বান করে একদিন নিয়ে আসা হয়েছিল। খাওয়া দাওয়া গল্প গুজব, মানসদা ও বৌদির কথা, সুকান্তদের পরিবারে এবং গ্রামের বাড়ির মাঠে-ঘাটের গল্প দিনভর করেছে। আমি শুনেছি। সুকান্ত ছেলেটিকে সৎ মনে হয়। শারীরিক পরিবর্তনের চিহ্ন পরিস্ফুট লাবনীর। মালবিকা খুশি কারণ লাবনীদির বর্তমানের জন্য তার বাবা মা দাদা দায়ি। সেই লাবনীদি যদি খুশি হয়, বাঁচার অবলম্বন পায়, তবে মালবিকা নিশ্চয় খুশি হবে। মালবিকা জটিল নয়, সহজ সরল মেয়ে, গোঁড়া নয় বরং উদার, লাবনীর কষ্টের লাঘবে সে প্রীত।

এই ভাবেই দশটি মাস গত হয়। গর্ভের সন্তান পূর্ণতা পায়। লাবনীকে ডাক্তারের নির্দেশে ভর্তি করা হয় এবং লাবনীকেও তার মেয়েকে নিয়ে নার্সিং হোম থেকে ফিরি। বার্দ্ধক্যের ক্লান্তি সাময়িক ভাবে অপসৃত। এছাড়াও সুকান্ত ও মালবিকা প্রচণ্ড সাহায্য করেছে।

একবিংশ অধ্যায়

লাবনী ও আমার জীবনের শেষ অধ্যায়ে সুকান্ত ও মালবিকার প্রবেশ, এই উপাখ্যানে তাদের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঐশ্বর্যদীপ্ত এবং অত্যন্ত হার্দ্যিক। ওদের আচরণ সহমর্মিতা এবং পরকে আপন করার মানসিকতা আমায় মুগ্ধ করেছে। সে কারণে তাদের দুএকটা কথা বলা আমার একান্ত প্রয়োজন।

সুকান্ত ভাল ছেলে। চেহারায় অতি চাকচিক্য বা আচরণে প্রকট শহুরে ভাব না থাকলেও বুদ্ধিমান, গুরুজনদের শ্রদ্ধাভক্তি করে। একদা কলেজ ইউনিয়ন করত। দেশের বিদেশের খবর কিছুটা রাখে। স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ নীতি সম্বন্ধে সে কিছুটা ওয়াকিবহাল। যেমন আমার সাথে আলাপ হওয়ার অনেক পূর্ব থেকে আমার নাম সে কাগজে দেখেছে, আমার কাজের খবর, পুরস্কার প্রাপ্তির খবরও সে কিছুটা জানতো। যে কারণ আমার সাথে আলাপ হওয়াতে সুকান্ত অত্যন্ত খুশি। প্রথম যেদিন মালবিকার সাথে আমার বাড়িতে এসে আমার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় সেদিন সে নিজেকে ধন্য মনে করে এবং আমার প্রতি, আমার কাজের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা। বিনয় সহকারে কথা বলে।

ভাল ছেলে এবং কিছুটা আদর্শবাদি। গ্রামের মানুষের অশিক্ষা, অজ্ঞতা ওকে গ্রামের স্কুলের শিক্ষকতা: পেশা হিসাবে বেছে নিতে সাহায্য করেছে। ডায়মণ্ড হারবারের কাছে একটি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা পেশা হিসাবে পাওয়ায় সুকান্ত গর্বিত। বেশি টাকা উপায় করার মত মানসিকতা বা প্রয়োজনীয়তা তার খুব একটা নেই। গ্রামে যে জমি আছে, যা ফসল উৎপাদন হয়, সাংসারিক জীবনে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত না হলেও চলে যায় সে কারণে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতা পেশা হিসাবে তার কাছে সুখের এবং কাজের, সে অন্ততঃ গ্রামের কাজ কিছুটা করতে পারবে।

তার বাবা একজন কৃষক, জমিতে স্বহস্তে চাষ করে। যে গ্রামে ওর জন্ম, সে গ্রামের কলেজে সেই প্রথম পাশ করেছে, গ্রামের লোক সুকান্তের কথা গল্প করে, একে অপরকে বলে গর্ব অনুভব করে।

আর মালবিকা, ছোট অবস্থায় দেখেছি। ছোটবেলার চেহারা মনে আছে অতিসামান্যই। ছোটবেলার চেহারা দিয়ে আজকের মালবিকাকে চেনা কঠিন, সত্য কথা আমি দেখে চিনতেও পারিনি। লাবনী যেহেতু আগে থেকে ওর পরিচিতি আমায় জানিয়েছিল, আমি মালবিকার চেহারায় মানসদা ও বৌদির চেহারা খুঁজে অনেক কষ্টে বৌদির মুখের চেহারার সাথে মালবিকার মুখের এবং গড়নের সাদৃশ্য লক্ষ্য করলাম। অবশ্য শ্রাবনী বৌদি ঐ বয়সে লাবনীর মত এমন স্বাস্থ্যবতি ছিলনা। বরং শ্রাবনী বৌদি ছিল যথাথ স্লিম। মালবিকা ও শ্রাবনী বৌদির মত হাস্যোজ্জ্বল। লাবনীর সাথে অনর্গল কথা বলছে, হাসছে। ওদের যৌবনচ্ছল হাসি আমায় স্পর্শ করছে, অতিত এসে সামনে হাজির হচ্ছে। এককালে আমরাও কথা বলতে বলতে এমনি সশব্দে হেসে উঠতাম। মালবিকা, বিধাননগরের কলকাতা শহরের একজন বড় ইঞ্জিনীয়ারের মেয়ে, আধুনিকা, শহরে আধুনিক জীবন ধারার এযাবৎ লালিত পালিত সে এক অখ্যাত গ্রামের কৃষক পরিবারের, গ্রামের বধূ হিসাবে খুশি। সুখী। ভাবা যায়না। সময় বদলে যাচ্ছে। রুচী বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। সুখ, দুঃখের অনুভূতির বিভিন্ন মাত্রা পাচ্ছে।

মালবিকা নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে না হলেও দুএক সপ্তাহ পর পর বাড়ি যায়। মাকে বাবাকে দেখে আসে। কর্তব্য পরায়না। ওদের বিয়েতে মানসদা এবং বৌদি স্বীকৃতি না দিলেও মালবিকা ও সুকান্তের তার জন্য কোন দুঃখ নেই। মালবিকা বিধাননগরে মায়ের কাছে গেলে স্নেহময়ী মা খুশি হয়—ছোট এবং একমাত্র আদরের মেয়ে, মানব চলে যাওয়ার পর একমাত্র মালবিকাই ছিল একমাত্র স্নেহ ও আশাভরসার পাত্রী। সেই মালবিকা নিজে বিয়ে করে স্বামীর সংসারে গেছে, কোন বাবা মা খুশি হতে পারে। তবুও মালু আসে বাবা মায়ের খোঁজ খবর করে, খুশি হয়ে মেয়েক পাশে বসিয়ে গল্প করে. গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে পরখ করে—তার মেয়ে মালু আগের মত আছে তো! ইদানিং চোখেও ভাল দেখতে পায়না। মালু আসার খবর আগে পেলে এটা সেটা, যেটা মালু খেতে ভালবাসে, বানিয়ে রাখে, পাশে বসে খাওয়ায়, মালু খায় অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে। মাঝে মাঝে কথার মাঝে মায়ের চোখের জল গড়িয়ে পড়ে, মালুর কষ্ট হয়, মায়ের চোখের জল নিজের শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয়, সে জানে তার বাবা মায়ের মানসিক কষ্টের কথা, কোনদিন সুখ পায়নি তার মা।

মা কথায় কথায় মেয়ের সংসারের গল্প শোনে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় সেখানে তার মেয়ে থাকে কি করে! মাঝে মাঝে মেয়ের সংসার দেখতে যাবার সাধ হয় মেটেনা। ইচ্ছা হলেই কি সকলের সকল সাধ মেটে?—মেটেনা। বিশেষ করে শ্রাবনী বৌদির মত অসহায়

বৃদ্ধার। পরাধীনতা যার জন্মগত অধিকার। মানসদা অর্থাৎ মালবিকার বাবা, ব্যালকুনিতে প্রতিদিনের মত হাতে কাগজ নিয়ে বসে থাকে—যেন তখনো তার কাগজ পড়া শেষ হয়নি। মালবিকা লক্ষ্য করে তার বাবার শরীর দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে। হাত পা সরু কাঠির মত হয়ে গেছে, চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। বাবা বেশি দিন বাঁচবেনা। এতদিন বিয়ে হয়েছে, আজো সে তার মেয়ের সাথে কথা বলতে চায়না। কেন? রাগ না অভিমান না নিজের কাছে, নিজের পরাজয় বলে? তবুও সে নিশ্চিত তার বাবা কথা না বললেও মায়ের ও তার কথা তার বাবা কাগজের আড়ালে সব মনযোগ দিয়ে শোনে।

মালবিকা তার দিদি লাবনীকে ছাড়েনি, তার সাথে সমানে গল্প করে চলেছে এক নাগাড়ে। আর আমার সামনে সুকান্ত, সুকান্তের সাথে আলাপ করছি, মাঝে মাঝে কান পেতে ওদের গল্পও শুনছি, বিশেষ করে শ্রাবনী বৌদি ও মানসদার কথা। বাইরের ঘরে সোফায় সুকান্ত আর আমি, খাবার টেবিলে মালবিকা ও লাবনী দীর্ঘদিন পর চার জনে এক সাথে খেতে বসে কথা, পুরানো কথা, মালবিকা নতুন জীবনের খুশি, সুকান্ত খুশি—বেশ এক সুখকর পরিমণ্ডল, বেশ উপভোগ্য। তবুও সুকান্ত কিছুটা লজ্জায় বিনত, এখনো আত্মীয় হয়ে উঠতে পারেনি, নতুন পরিবেশে, নতুন মানুষের সামনে সেই আপাত লজ্জা ওর চেহারায়।

—তোমার স্কুলটি কেমন? ছাত্ররা আসে?

—ভাল স্কুল। অনেক পুরানো। আমি ছাড়াও আরো দুজন মাষ্টার মশায় আছেন। বড়, টালি দিয়ে ছাওয়া ঘর। দেড়শো—দুশো ছাত্রছাত্রী হবে—গ্রামের ছেলে মেয়ে, বেশির ভাগ গরীব, তবুও প্রাইমারি স্কুলের গ্রামের লোকের ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠায়। একদিন আসুন না, স্বচক্ষে দেখবেন।

—যাবেন কাকু? সেদিন আমিও যাবো। আমি ওর স্কুল আজো দেখিনি।

—ইচ্ছা হয়। এক সময় গ্রামে গ্রামে, ঐরকম স্কুলে বহুবার গেছি, তবে এই বয়সে পারবো! ঠিক আছে, চেষ্টা করব।

এক ঝলক খুশির সুর মালবিকার গলা দিয়ে বেড়িয়ে এল। ভাল লাগলো ওর খুশির কোমল এবং মিষ্টি ইচ্ছাটুকু। কার, কোথায়, কি পরিবেশে, কোন অবস্থায় যে খুশির উৎস লুকিয়ে থাকে এই বয়সেও বুঝতে পারলাম না। জীবন অস্তাচলের পথে. এখনো জীবনের অর্থ বুঝলাম না।

চণ্ডী টেবিলে খাবার পরিবেশন করে। সুকান্তকে নিয়ে টেবিলে বসলাম। সুকান্তের জড়তা কাটেনি। ওকে বেসিনে হাত ধুয়ে নিতে বললাম। চণ্ডী ওদের জন্য লুচি করেছে। গরম ফুলকো লুচি, আমার নিজেরই খেতে ইচ্ছা করছিল। যেহেতু এ সময়ে আমরা খাইনা, আমাদের জন্য চা। লাবনী অবশ্য চায়ের আগে গরম দুখানা লুচি খায়, আমায় খাওয়ার জন্য বলে, আমি ইচ্ছা দমন করি। কথা বলতে বলতে সুকান্ত ও মালবিকা লুচি খায়। অনেক দূর যেতে হবে। বেশি সময় আটকে রাখা যাবেনা। মালবিকা ও সুকান্তকে আসতে বলি, বলি এটা তোমার দিদির বাড়ি। মন চাইলেই চলে আসবে। সুকান্ত খুশি হয়, লাবণী এটাই চাইছিল—ওরা হেসে, এক কথায় রাজি হয়ে যায়। লাবনী অন্ততঃ মাঝে মাঝে কথা বলার লোক পাবে। একা থাকে, এই বুড়োর সাথে।

খাওয়ার পর, মালবিকা ও সুকান্ত প্রণাম করে ফিরে যায়। ওরা ফিরে যাওয়ার পর লাবণী ও আমি চুপচাপ বসে থাকি। নির্বাক। মালবিকা ও সুকান্তের কথা। মানসদার মেয়ে মালবিকা, সুকান্ত, গ্রামের এক কৃষকের ছেলে, সদ্য বিয়ে করেছে, যৌবন ওদের

শরীরে ও মনে, পূর্ণ বসন্ত ওদের হৃদয়ে, সৌরভে মদির। ছোট্ট দাবি—ছোট ঘর, মেঠো, মাঠের সোনালি ফসল, ডোবার মাছ, নীল আকাশ মাথার ওপর এবং প্রকৃতির অকৃপণ হাওয়ায় ওদের সুখের ঠিকানা। অল্পে ওরা সন্তুষ্ট। অথচ সব থেকেও, সুখ স্বাচ্ছন্দ, অর্থ, পরিকল্পিত সংসারে, তবুও শ্রাবনী বৌদি, মানসদার মনে সুখ হলো না। দুঃখের গভীরে হাবুডুবু খাচ্ছে—কখন মৃত্যু এসে সবের ইতি টেনে দেবে ওরা জানেনা।

মেঘমুক্ত শরতের আকাশের ন্যায় নির্মল লাবণীর মন। সংশয়ের কালো মেঘ অপসৃত। কাশফুল যেমন বলে দেয় আনন্দের দেবী আসছে, লাবণীর গর্ভস্থ সন্তান লাবণীর মনে আনন্দের বার্তা বয়ে এনেছে। স্বভাবতঃই উৎফুল্ল। প্রস্তুতি প্রতি মুহূর্তে, আমি লক্ষ্য করছি—ওর চলায় ছন্দ, অচলায় ছন্দ, ওর বলায় ছন্দ, নীরবতায় ছন্দ—ছন্দোময়ী, আগমনি বার্তায় ওর নারীজীবনে আজ শুধু ছন্দই ছন্দ। লাবনীর এ রূপ কোথায় ছিল! আমি আনন্দিত কারণ আমার এক যুগের অধিক সময়ের প্রচেষ্টায় লাবণীকে খুশি করতে পারছি। অতিতের অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদুরিত। পূর্ণতা পেতে চলেছে সে। তার বাসনা তৃপ্ত হতে চলেছে। স্বভাবতঃই আমি লাবণীর এ-পরিবর্তন প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করছি।

টেবিল ছেড়ে সোফায় ফিরে আসি। বসি লাবনীর পাশে। ছোট স্ক্রীনে বাংলা ছবি হচ্ছে। আগেকার দিনের ছবি, সাদা কালোর অস্পষ্ট, সাউণ্ড ও ঠিক নেই—শিল্পীরা উত্তমকুমার, সাবিত্রি, বিকাশ, জহর ও অন্যান্যরা। রিমোট টিপে চ্যানেল বদলে খবরশুনি। প্রায় ঘন্টা খানেক আগে নেমেছে রাতের আঁধার। ঘরে আলো জ্বলছে, বাইরেও শহরের আলোক-মালায় রাতের আঁধার বোঝা যায়না। চণ্ডী নিচে গেছে, নিচে সিকউরিটির কাছে, চণ্ডীর মত আরো দু চার জন্য যায়, ফ্ল্যাটের চার দেওয়ালের বাইরে কিছু সময়ের জন্য মুক্তি, দু চারটে টুকরো টুকরো গল্প, কখনো বাড়ির কখনো ফ্ল্যাটের, কখনো টিভিতে দেখা কোন সিরিয়াল, ছবি বা খেলার কথা, বিড়ি খাওয়া, খৈনি ডলে দাঁতের পাশে গুঁজে দেওয়া ইত্যাদি। ঘণ্টা খানেক গল্পগুজবের পর চন্‌মনে হয়ে যে যার ফ্ল্যাটে ফিরে কাজে লাগবে। চণ্ডী এখন নিচের আড্ডায়।

—মালু ও তার স্বামী সুকান্তকে কেমন লাগলো?

—চমৎকার। মালবিকা কত বড় হয়ে গেছে। বিয়ে থা করে সংসারি! সুন্দর জুটি, আমার খুব ভাল লেগেছে, আশা করি সুখি হবে।

—ঠিক বলেছো বসন্ত। ছ সাত মাস হল ওদের বিয়ে হয়েছে। এতদিন মালুর সাথে টেলিফোনে কথা বলেছি, ওর মুখে ওদের গল্প শুনেছি, আজ চোখে দেখলাম, সামনা-সামনি গল্প করলাম, আমি মুগ্ধ। নূতন পরিবেশে। গ্রামের শ্বশুর বাড়ির সংসারে সুন্দর খাপ খাইয়ে নিয়েছে, মালুর প্রশংসা করতে হয়। শুধু তাই না গ্রামে নূতন বৌয়ের খুব নাম, মালুর শ্বাশুড়ি মালুকে খুব ভালবাসে। বৌমা, বৌমা করে দিনভর অস্থির, যেন বৌমা ছাড়া সংসার অচল।

—সুকান্তকে দেখছিলাম। সবুজ। সৌজন্যবোধ প্রবল। চলো একদিন মালবিকার শ্বশুর বাড়ি ঘুরে আসি।

—খারাপ প্রস্তাব না। তবে এ সময়ে, আমি এত দূরে যেতে পারবোনা। তুমি একা যাও, কোন অসুবিধা নেই, ওরা খুশি হবে। আদর যত্ন করবে।

আপাতত আমারও যাওয়া হবেনা। কারণ লাবণীর প্রতি যত্ন নেওয়া, তার দেখাশোনা করা, নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে আমার

অনুপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। বেশ গল্প গুজবের মধ্যে দিয়ে সময়টা কাটল। নিত্যদিনের একই কাজের ফাঁকে সামান্য পরিবর্তন বাড়ির পরিবেশ বদলে দেয়। টেলিফোন বাজে। টেলিফোনে রোহিত ও বৌমার খোঁজ খবর নিই। হায়দ্রাবাদ থেকে ফেরার পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, লাবণীর পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকলেও মাঝে মাঝে সাদার্ন এভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে যাই, রুচীর সাথে দেখা হয়, যদিও কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয়না তবুও রুচী কোথাও গেলে বা কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে রুচী আমাকে অবগত করে। কিন্তু রোহিতের কাছ থেকে এখন জানতে পারলাম, রুচী উত্তর ভারতে বেড়াতে যাচ্ছে। কলকাতার একটা নামী সংস্থার তত্ত্বাবধানে তার এ ভ্রমণ। আমি জানতাম না। খারাপ লাগল। লাবনীর খবরটা পাওয়ার কারণেই তার এ প্রতিক্রিয়া, স্বাভাবিক এবং তার জন্য রুচীকে দোষ দিইনা। রুচীর প্রকৃতির সাথে তার এই সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। রুচী কোনদিনই মুখর প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করেনি। আজো সে করবেনা। তবুও আমার অজ্ঞাতে তার বেড়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত এই প্রথম এবং তার একমাত্র কারণ লাবনী, আমি নিশ্চিত।

আমার কষ্ট হয়। রুচী একা হয়ে গেল। এতকাল আমার সাথে সম্পর্ক বিরূপ থাকলেও আমার অস্তিত্ব সে স্বীকার করত। আমার মনে হচ্ছে, রুচীর এখন থেকে আমার অস্তিত্ব রুচীর কাছে আর অর্থবহ নয়। আমি একা নই, রুচীর সহায় বা স্বপ্ন বা জীবন ধারণের আশাভরসা রোহিত, রোহিতের সাথেও আগের সে সম্পর্কের পরিবর্তন হতে চলেছে। রুচী রোহিতের বিয়ের পর রোহিত ও বৌমার জীবন থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে। কারণ রুচী জানে রোহিতের এখন স্ত্রীর প্রতি বেশি করে মনযোগি হওয়া উচিৎ এবং তার তাদের দাম্পত্য জীবনে যোগদান অনুচিৎ। একদিক থেকে নিজের সন্তানের সাথে সম্পর্কে শিথীলতা অন্যদিক থেকে লাবনীর সন্তান সম্ভাবনা, রুচীকে অসহায় করে তুলেছে। রুচীর একাকিত্ব আমায় কষ্ট দিচ্ছে, তবুও নিরুপায়। অবলম্বন শূন্য রুচী বাঁচবে কি নিয়ে?

অদ্ভুত মানসিকতা রুচীর। সম্ভ্রান্তবংশের, রক্ষণশীল পরিবারে তার জন্ম এবং আদর্শবাণ অধ্যাপকের সন্তান, অত্যন্ত স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন ছিল আমাদের কিন্তু কেন যে রোহিতের জন্মের পর আমাদের সম্পর্ক অন্য ধারায় বইতে শুরু করলো, জানিনা। তাও রোহিতকে নিয়ে বেশ ছিল, রোহিতের বিয়ের পর রোহিতের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, থাকবে কি নিয়ে? কি অসুবিধা ছিল, ছেলেও বৌমার সাথে শাশুরি কি সংসার করেনা? যৌথ সংসার ভেঙে গেলেও এখনো ছেলে মেয়েরা মা বাবাকে নিয়ে একই পরিবারের সদস্য হিসাবে সুখে ঘর সংসার করছে। রোহিত খুব ভাল ছেলে, মা তার কাছে পরম শ্রদ্ধার, সেই রোহিতের সংসারেও সে থাকবেনা। রুচীর এ মানসিকতার কি কারণ থাকতে পারে জানিনা।

তবে কি রুচীর সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের শুরু? যার প্রস্তুতি দীর্ঘদিনের। রোহিতের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সংসারের আকর্ষণ বা স্নেহের আকর্ষণ এতদিন যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল, রোহিতের বিয়ে এবং লাবনীর সন্তানসম্ভাবনা রুচীর নতুন পথে যাত্রার দ্রুত সূচনা ঘোষণা করল। মাঝে মাঝে রুচীর এই বৈরাগ্য সুলভ মানসিকতার জন্য নিজেকে দোষি মনে হয়। আত্মঅনুসন্ধান করি। সত্যিই কি আমি রুচীর প্রতি অন্যায় করেছিলাম?—না, কোন অন্যায় করিনি। আমি চিরকাল রুচীর স্বাধীনচেতা, আত্মমর্যাদা, শিক্ষা, আদর্শবোধকে শ্রদ্ধা করেছি, আজো করি, তখনো লাবনী আসেনি। রুচী আমায়

প্রকৃত নির্বাসিত করে রোহিতকে আশ্রয় করল, আবেদন, নিবেদন করে হতাশ হলাম, রুচীকে হারালাম। রুচী আমার স্ত্রী, জীবনের একমাত্র ভালবাসার পাত্রী, আমার জীবন থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়া, আমার প্রায় উন্মাদ করে তুললেও আমি কখনো তার সাথে তার ইচ্ছার অমর্যাদা করিনি। আমি নিরবে সহ্য করতে করতে নিঃশেষ হয়ে গেছি তবুও রুচীর প্রতি কোনো অন্যায়, অভদ্র আচরণ করিনি।

সেই রুচীই লাবনী আসার পর ওকে আমার হাতে অর্পণ করে নিশ্চিত হল। বুদ্ধিমতি রুচী জানলো যে লাবনী অন্ততঃ বসন্তের জীবনে রুচীর অভাবের কিছুটা পূরণ করতে পারবে! লাবনীর সাথে আমার সম্পর্ক অনেকটাই অপ্রতক্ষ্য রুচীর ইচ্ছায় এবং সুদূর পরিকল্পনায়, এবং তার জন্য রুচীর অনুমতি নিশ্চয় ছিল। তবে সে ভাবতে পারেনি যে লাবনীর গর্ভে আমার সন্তান হতে পারে! অসহায় রুচী, অন্ততঃ এই অপ্রত্যাশিত সংবাদের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলনা। সে কারণেই হয়তো তার সিদ্ধান্ত আমার সাথে কথা বন্ধ করা, সম্পর্ক ছিন্ন করা, এবং নতুন পথের সন্ধান করা। হয়তো সে কারণে তার তীর্থ ভ্রমণ। তবুও অন্তর্মুখি রুচীর একাকিত্বের কষ্ট আমায় ব্যথিত করে। রুচীর অনুভূতি—আনন্দ, বেদনা চিরকালই অপ্রকাশ্যে। আজো তার তীর্থভ্রমণ সকলের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করার একটি প্রয়াস বলেই আমার অনুমান।

—কি ভাবছো বসন্ত?

—রুচী বাইরে যাচ্ছে।

—বাইরে? কোথায়?—বিদেশে?

—দেশেই। তীর্থক্ষেত্রে।

—একা?

—হ্যাঁ। একা। হয়তো কোনো গ্রুপের সাথে, ট্রাভেলিং কোন এজেন্সির সাথে—সমগ্র উত্তর ভারত।

—কাল সকালে গিয়ে রুচী আন্টির সাথে দেখা করে এসো।

—তুমি যাবে?

—ঠিক হবে? তুমি যা বলবে, আমার কোনো আপত্তি নেই। রুচী আন্টি যদি অন্যভাবে নেয়, বরং তুমি গিয়ে মিট্ কারো, কথা বলো, যদি মনে করো বা রুচী আন্টি যদি আমায় দেখতে চায়—

চণ্ডী ফিরে এসেছে। লাবণী কিচেনে ঢোকে। কিউটি জানেনা রুচী সকলের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাচ্ছে। একা—বড় একা, রোহিত না, আমি তো অনেকদিন থেকেই ওর মন থেকে দূরে চলে গেছি, সে কারণেই হয়তো রুচীর এ ভ্রমণের ইচ্ছা। সংসারে সব থেকেও সংসার হতে বিচ্ছিন্ন। এ জীবন—এ এক তপস্যা। তার ওপর কিউটির এ সংবাদে সে মর্মাহত। কিউকে এ সব কথা বলা যাবেনা। মনে মনে জানে যে রুচী আন্টি কিউটির সমর্থন করবে না।

কিউ দু কাপ কফি নিয়ে কিচেন থেকে ফেরে। কফিতে চুমুক দিই। হায়দ্রাবাদ থেকে ফেরার পর অল্প সময়েই অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। অত্যন্ত দ্রুত ও অভিনব। প্রথমতঃ কিউটির গর্ভধারণ, মালবিকা এবং সুকান্তের সাথে সাক্ষাৎ আলাপ, মানসদা ও শ্রাবণী বৌদির অজানা দুঃসহ জীবনের সাথে মালবিকার মাধ্যমে পরিচিত হওয়া, মুখে না বললেও রোহিতের মনক্ষুণ্ণ এবং সর্বশেষ রুচীর একা একা দেশ ভ্রমণ এই প্রথম। মানুষ নিজেকে ছাড়া অন্যের কথা ভাবতে চায়না। ভাবতে পারেনা অন্যের ও সখ

আহ্লাদ থাকতে পারে, বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

কিউ-এর প্রাথমিক শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলো এখন স্তিমিত, মাতৃত্ব জনিত কারণে তার শারীরিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং স্পষ্ট।

সময় এগিয়ে গেছে। রুচী বেড়াতে যাওয়ার আগে সাদার্ন এভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে একটা রাত কাটিয়েছি। অন্ততঃ রুচী যে একা নয়, সে যেন নিজে অসহায়, একথা অনুভব না করে, সে আমাকে বর্জন করার চেষ্টা করলেও, আমি তাকে পরিত্যাগ করিনি বা তার প্রতি আমার দায়বদ্ধতা আজো বিদ্যমান---একথাগুলো বোঝানো ছিল আমার উদ্দেশ্য। সে কিন্তু অনড়। সিদ্ধান্তে অবিচল। রুচী তার বিষয়ে কোন কিছুই আমায় জানাতে চায়না, তার জীবনে আমার ভূমিকার ইতি। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য বা গন্তব্যস্থল আমার অজ্ঞাত ছিল। আমি ব্যথিত কিন্তু নিরুপায়। ভাববেন না আমার চিন্তা ভাবনায় কোনো কপটতা বা দ্বিচারিতা আছে? আমি নিশ্চিত বলতে পারি, আমি কিন্তু কপট নই, আমার মন আমার অস্তিত্ব আমি জানি দ্বিখণ্ডিত। তবুও আমি মনুষ্যত্বকে অবহেলা করত অপরাগ।

তারপর থেকে সাদার্ন এভিনিউয়ের ফ্ল্যাট আমার কাছে দুঃসহ মনে হয়। ইতিমধ্যে ভ্রমণ সমাপ্ত করে রুচী আবার বেড়িয়ে পড়েছে। যে খবর পেয়েছি অনেক পরে। আমার উৎসাহ আমার উদ্বেগ, আমার কষ্ট মনে মনে পুষেছি—এছাড়া উপায় কি!

মালবিকা নিয়মিত আসা যাওয়া করে। ছোট বোনের মত হলেও হাবভাব বয়স্কা মাসি বা কাকি-জেঠির মত। আসে লাবণীদির সাথে গল্প করে, বাড়ি থেকে লাবণীদির জন্য নিজের হাতে তৈরি করা খাবার, ঘরের মুরগির ডিম, দুধ, ফল নিয়ে আসে, খাওয়ায় রেখে যায়, নিত্য লাবণীদির শরীরের খোঁজ খবর নেয়, নানা উপদেশ দেয়। লাবণী তার এই ছোট বোনটির কথা মন দিয়ে শোনে এবং কথাগুলো মেনে চলার চেষ্টা করে। ওদের মধ্যে সম্পর্ক গাঢ়তর হচ্ছে।

শুনলাম, একদিন কথায় কথায় মালু মায়ের কাছে তার লাবণীদির কথা বলে ফেলেছে। মানসদা এ সংবাদে ক্ষুব্ধ এবং অত্যন্ত অপমানজনক শব্দ আমার প্রতি ব্যবহার করেছে। করুকগে! বৌদি অবশ্য কোনো মন্তব্য করেননি। সুকান্তও আসে, আমার কাছে না, তার দিদির কাছে। লাবণীর সন্তান হওয়ার খবরে একমাত্র ওরা দুজনেই প্রাচণ্ড খুশি এবং মনে প্রাণে সমর্থন করে এবং প্রত্যাশা করে তাদের লাবণীদি নিশ্চয় তার স্বাভাবিক জীবন, ভালবাসায়, স্নেহে, উজ্জ্বল জীবন ফিরে পাবে! প্রকৃত সংস্কার মুক্ত চিন্তায় আধুনিক দম্পত্তি ওরা দুজন। আমার প্রতি ওদের শ্রদ্ধা অমলিন।

লেখাপড়া বন্ধ। বাইরের সাথে যোগাযোগ প্রায় জোর করেই বন্ধ করে দিয়েছি। ইচ্ছা হলে মাঝে মধ্যে নিজের লেখাগুলো বার বার পড়ি। কখনো কখনো লাবণী তার অসমাপ্ত সংগ্রহ গ্রন্থের লেখাগুলো আমার পড়ার টেবিলে দেয়, যতটা সম্ভব দেখা বা সংশোধন পরিবর্ধন করার চেষ্টা করি—আনন্দ পাই। মানুষের জন্য কাজ করার এক জাতিয় তৃপ্তি আছি। আমার কাজে আমি তৃপ্ত হই। মনটা হালকা হয়ে যায়, রুচীর চিন্তা সাময়িক ভাবে দূরে সরে যায়।

ইতিমধ্যে আমি অনেক ভেবে চিন্তে একটা সিদ্ধান্ত নিই। লাবণীর সন্তানের বা আমার সন্তানের প্রকৃত পরিচিতি এ পৃথিবীতে হৌক এটা আমার ইচ্ছা। আমার সন্তান যেন তার মা লাবণীর মত অন্ধকারে শিকড়ের সন্ধানে জীবনকে নিঃশেষিত না করে, সে যেন তার বাবাকে জানেনা, এই গ্লানিমুক্ত হয়।

একটা ছোট খাটো অনুষ্ঠান সুকান্ত ও মালবিকা আমন্ত্রিত, খাওয়া দাওয়া এবং তার সাথে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। একজন স্পেশাল ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে কিউ ও আমি স্বামী ও স্ত্রী হিসাবে সরকারি বিবাহিত দম্পতির তালিকায় নাম নথীভুক্ত করি। লাবণীকে আমার স্ত্রী হিসাবে আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত করি। লাবণীকেও পূর্ব হতে জানানো ছিলনা, না সুকান্ত না মালবিকা—কেউ জানতোনা। চণ্ডীকে সেদিনের মত ছুটী দিয়েছিলাম। চণ্ডী জানলো না। না, জানানোর দরকার নেই। প্রয়োজন নেই ঢাক ঢোল পেটানোর। এবং এ ব্যাপারে ওদের তিন জনকেই সাময়িক ভাবে গোপনীয়তা বজায় রাখতে পরামর্শ দিই। আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী বর্তমান, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি এবং আমরা কেউ চাইও না, এমতাবস্থায় অহেতুক জটিলতা বাড়িয়ে, লাভ নেই। যেহেতু ওরা তিনজনে সাবালক এবং বুদ্ধিমান, ওদের ওপর আমার আস্থা আছে।

রুচী ও আমার মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহজ ও স্বাভাবিক আচরণ সমূহ দীর্ঘদিন অনুপস্থিত, সমাজের চোখে আমরা আদর্শ দম্পতি বলে পরিচিতি, আমরা উভয়ের চাইনা যে আমাদের দাম্পত্য পরিচিত ক্ষুণ্ণ হৌক বা তাতে কোনো বিঘ্ন ঘটুক, সেক্ষেত্রে লাবণীর সাথে আমরা যে দম্পতি হিসাবে নথীভুক্ত হলাম, আইনতঃ অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। অথচ সদ্য সম্ভাবনা লাবণী ও আমার সন্তানের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে আমার এই সিদ্ধান্ত এবং কার্যাকরী হলো।

লাবণী হতবাক, লাবণী বিস্মিত লাবণী আপ্লুত, লাবণীর চেহারার সশ্রদ্ধ বিস্ময় লাবণী দুপায়ে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করল—এই প্রথম। ওর চোখে হাসি এবং জল। ওকে জড়িয়ে ধরলাম, মাথায় আস্তে হাত ছোয়ালাম---বিড় বিড় করে কি বললাম, মনে নেই, বয়স হলে মানুষের এমন হয়, অতি স্বাভাবিক পরিণতি।

বিস্মিত সুকান্ত ও মালবিকা—মালবিকার ছোট্ট মন্তব্য "কাকু তুমি গ্রেট!"

সুকান্ত যেন আশ্চর্য্য কিছু ঘটতে দেখলো, মনে হল সে গর্বিত।

আমি শুধু বললাম—আপাততঃ এই ঘটনাটি আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। এটি লাবণী ও আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, এবং হবু সন্তানের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে এটি আমার দায়িত্ব। অতএব ব্যক্তিগত সম্পর্ক সমাজের কাছে ঢাক পিটিয়ে, মাইক বাজিয়ে বলার মত ঘটনা নয়। এটি একমাত্র আমাদের সন্তানের আইনি সুরক্ষা।

আসলে লাবণী ও আমার মধ্যে সম্পর্ক, আমাদের উভয়ের, উভয়ের প্রতি আস্থা, নির্ভরশীলতা দাম্পত্য সম্পর্কের অনেক উর্দ্ধে। আমরা একে অপরের পরিপূরক, উভয়ে উভয়ের দ্বারা বিকশিত—আইনের ভাষায় এর কোনো সংজ্ঞা হয়না। তাছাড়া মানুষ আইনের উর্দ্ধে, মানবিক সম্পর্ক, আইনি ভাষায় রূপ দেওয়া যায়না। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক আইনের পরিভাষায় তৈরি হয়না। জীবন আইনের উর্দ্ধে, আইন মানুষের জন্য। মানুষ আইনের জন্য নয়। জীবনের তাগিদে একা বা একাধিক জীবন যুক্ত হতে পারে। একজন মানুষের সাথে একাধিক মানুষের যোগ সাধিত হয়। তা কখনো অন্যায় বা অপরাধ নয়। লাবণীর সাথে আমার সম্পর্ক আন্তরিক এবং পবিত্র। তবুও ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ভবিষ্যতের সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করে লাবনী ও আমি দাম্পত্য সূত্রে আবদ্ধ হলাম। কোনো অনুষ্ঠান নয়, আড়ম্বর নয়, সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং পবিত্রতার সাথে আমরা বিবাহিত হলাম। লাবণীর সন্তান প্রসব হতে দেরি নেই।

মালবিকা ও সুকান্ত নিয়মিত যাতায়াত করে, এ যেন তাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে; সাধারণ লোকে প্রায়শঃই বলে থাকে, বর্তমান প্রজন্ম স্বার্থপর, দায়িত্ববান নয়,

তারা মালবিকা দম্পতির মত যুবক যুবতী দেখেনি। ওরা কে আমাদের? কেউনা, বলতে গেলে কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ, প্রথমে ভেবেছিলাম, মালবিকা তার বিয়ের সমর্থনে আমাদের সমর্থক হিসাবে পেতে চাইছে। তা যে সম্পূর্ণ ভুল বুঝতে দেরি হয়নি। ওর মুখ থেকে মাঝে মাঝে মানসদার খবর পাই। মানসদাকে এখনো ভুলিনি, সেই কৈশোর যৌবনের বিস্ময়মাখা স্মৃতি ম্লান হলেও মানসদার প্রতি এখনো আমার দুর্বলতা আছে। মানসদার শরীর একদম ভেঙে গেছে, বলতে গেলে তার চলা ফেরার শক্তিও যেতে বসেছে। মালবিকা মা ও বাবার শরীর নিয়ে খুব চিন্তিত। প্রতি সপ্তাহে সেখানে সে যায়, বাবা মায়ের জন্য বাজার হাট করে দেয়, ডাক্তার ডেকে দেওয়া, ওষুধ পত্র কিনে গুছিয়ে দেওয়া, সব কাজ করতে হয়, নইলে হয়তো তারা অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। সে দাদা, মানবকে জানিয়েছে কিন্তু সেখান থেকে সাড়া মেলেনি। বাবা মায়ের যা অবস্থা, ঐ বাড়িতে একজন স্থায়ি কর্মঠ লোকের দরকার। যে কোনো সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে, তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করার কেউ নেই, একমাত্র টেলিফোনে যদি খবর দেয় তাও ডায়মণ্ড হারবার থেকে আসতে পাঁচ ছ ঘণ্টা সময় লাগবে।

মানবদাকে আসার জন্য লিখেছে। অন্ততঃ মারা যাবার আগে তার বাবা মাকে একবারের জন্য হলেও দেখা উচিৎ। বড় জেদি সে, বাবা বিয়ে দেওয়ার পর সেই যে বাঙ্গালোরে গেছে, এখনো একদিনের জন্যও কলকাতায় ফেরেনি। অভিমান বা বাবা মায়ের বিরুদ্ধে যত ক্ষোভই থাকুক, তবুও বাবা মায়ের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে ছেলে হিসাবে তার দায়িত্ব নেওয়া উচিৎ। শ্বশুর বাড়িতে পর্যাপ্ত সুখে থাকলেও বাবা ও মায়ের জন্য তার মন অশান্ত। গ্রাম্য পরিবেশে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলেছে এখন আর তার গোয়ালে যেতে ভয় করেনা, গরুগুলো চিনে গেছে, গুতোয়না। সেও একদিন নিজের হাতে শ্বাশুড়ির মত গরুর দুধ দুইতে পারবে।

লাবনী খাটে বা সোফায় বসে মালবিকার কথা শোনে। ভালো শ্রোতা লাবনী। মন্তব্য করেনা সে। মানস আঙ্কেল, মানবদার কথা মালবিকার মুখ থেকে শুনেও তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়না। সে এখন শান্ত, উদ্বেগশূন্য, নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর।

নির্দিষ্ট সময়ে লাবনী তার কন্যা সন্তান প্রসব করে যে কথা আমি আগেই বলেছি। প্রসববেদনা শুরু হওয়া, নার্সিং হোমে লাবনীকে পৌঁছানো, মালবিকা ছিল অগ্রগন্যা। লাবনীকে সান্ত্বনা দেওয়া, অভয়দান করা, যত্ন করা, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, ঠিক যেন মায়ের মত আচরণ ঐ ছোট মেয়ে লাবণীর, কি দারুণ বুদ্ধিমতি! আশ্চর্য্য হয়ে যাই ওর গিন্নিপনা দেখে · · কি করে শিখলো!

নার্সিং হোম থেকে লাবনীও বেবিকে নিয়ে ফিরেছে, মালবিকার কোলে সদ্যজাতা তোয়ালে জড়ানো লাবনীর মেয়ে বেবি। তখনো নামকরণ করে উঠতে পারেনি। মালবিকা না থাকলে কোনো মতেই এই সব দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতোনা, পয়সা দিয়ে আয়া রাখলেও তারাও এত কাজ করতো না।

ফ্ল্যাটে ফিরেছে। স্নানটান করেছে মালবিকা ও সুকান্ত, চণ্ডীর বানানো খাবার খেয়েছে সকলে, লাবনীর আলাদা মেনু, এবার ওদের ফেরার পালা, গত চারদিন ওরা দুজনে নার্সিং হোম আর ফ্ল্যাট করেছে। ওদের দুজনের এই অবদান ভোলার নয়। চণ্ডী পারবে তো সামলাতে, না হয় কিছুদিনের জন্য চব্বিশ ঘণ্টার আয়ার ব্যবস্তা করবো। মানুষের মমতা ও দায়বদ্ধতা বা ভালোবাসা, ওদের দুজনের কথা ভাবলে মনে হয়, এখনো আছে। ওরা ভালো থাকুক!

এমনি এক পরিবেশে বেবির জন্ম। রোহিতকে খবর দিই, রুচী নেই, কোথায় আছে জানিনা, রুচীকে জানানো উচিত?। ফোনে বেবির জন্মের খবর শুনে, হ্যাঁ, কেমন আছে, ইত্যাদি অত্যন্ত হালকাভাবে দু একটা কথা ছাড়া কোনো মন্তব্য করেনি রোহিত। যদিও রোহিত ঘটনার অস্বাভাবিকতা উপলব্ধি করলেও তার বাবার, তার মায়ের এবং লাবনীর কথা ও তার অবস্থার কথা নিশ্চয় অনুধাবন করেছে। যদিও একমাত্র বিবাহিত ছেলে রোহিতের পক্ষে এ সংবাদ অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং অশুভ, তবুও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এবং ধারাবাহিকতা বিবেচনা করে সে চিন্তিত। তবুও তার কাছ থেকে আমি প্রত্যাঘাত হইনি।

রোহিত রুচী ও আমার মধ্যে শীতল সম্পর্কের কথা জানে। সে কোনোদিন এ বিষয়ে মায়ের সাথে না আমার সাথে কোন আলোচনা করেনি। আসলে বিষয়টি এমনি ডেলিকেট যে কোনো সন্তানের পক্ষে সে যতই সাবালক হোক না কেন এটা কঠিন, মেনে নেওয়া এ বিষয়ে বড় হওয়ার পর থেকে তার অর্ন্তবেদনা ছিল, তার আচরণ এবং কথার মধ্যে দিয়ে তার এ বেদনার কথা অনুভব করতাম। যে কারণেই লাবনীর ও আমার এক সাথে থাকার মধ্যে সে খুব একটা অন্যায় বলে ভাবতোনা। রোহিত ব্যক্তি স্বাধীনতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস, সে তার মা বাবা বা অন্যের ক্ষেত্রেও কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বিরোধি, সে কারণেই হয়তো লাবনীর সন্তান প্রসবের সংবাদে খুব একটা বিচলিত নয় বলে মনে হলো।

ইদানিং রুচী হাজারিবাগের কাছ কোনো একটা কুষ্ঠাশ্রমের সাথে নিজেকে জড়িয়েছে। সৎকাজ, মানবসেবা, রুচী করুক! নিশ্চয় করুক! দেশভ্রমণের সময় ঐ আশ্রমেরই একজন কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ, অবিবাহিত, নিপাট ভদ্রলোক, তারই আমন্ত্রণে হাজারিবাগের নিকটস্থ এক পাহাড় বেষ্টিত অঞ্চলে সে কুষ্ঠাশ্রমে যায় এবং যোগাযোগ গড়ে ওঠে। রুচী এখন কুষ্ঠাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সেবায় আত্ম নিবেদিত। অদ্ভুত মহিলা এই রুচী, নিজের স্বামীকে না হয় প্রত্যাখান করেছে সামাজিক ভাবে না হলেও বাস্তবে নিজের একমাত্র প্রিয় সন্তান, ছেলে, যার পাশে ছাড়া একটি দিনও থাকতে পারে না, তার বিয়ের পর, তার কাছ থেকে এমন ভাবে দূরে সরে যাওয়ার কারণ বোধ হয়, সকল আপনজনের কাছ থেকে নিজেকে নিয়ে পালিয়ে বেড়ানো বলা যেতে পারে। নিশ্চয় শুনেছি নতুন কাজে তার মন বসেছে, মাঝে মাঝে চিকিৎসার জন্য দুএক জন কুষ্ঠরুগি সাদার্ন এভিনিউযের ফ্ল্যাটেও নিয়ে আসে, আবার চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেই আশ্রমে ফিরে যায়। কুষ্ঠমুক্ত ব্যক্তিদের পূর্ণবাসনের জন্য বস্ত্রশিল্প শিক্ষা, শিল্পের উপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে আশ্রমে ফিরে যায়। কারণ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত অনেকেই রোগমুক্তির পরেও আপন সংসারে স্থান পায়না, তাদের জীবিকার জন্য কুটির শিল্প, অন্তত কিছুটা অর্থ উপার্জনে সাহায্য করে।

ইদানিং মাঝে মাঝে আমার সাথে দেখা হয়, সাদার্ন এভিনিউয়ে এসে হয়তো কয়েকদিন রয়ে গেছে, খবর পেয়ে আমি যাই, আমার কোন নালিশ নেই বরং রুচীর মানবসেবায় নিজেকে যুক্ত করাতে খুশি। যেচে ওর সাথে ওর আশ্রমের ব্যাপারে কথা বলি, জানতে চাই। লাবনীর সন্তান হওয়ার প্রাথমিক খবরে সে যতটা ক্ষুব্ধ ছিল, আজ অনেকটা স্তিমিত এবং রুচী কিছুটা সহজতর। সরল ভাবেই আলোচনা করে একমাত্র লাবনী এবং বেবির সংবাদ ছাড়া। যেন লাবনী ও বেবি বলে কাউকে কোনদিন জানতো না বা আজো জানেনা। আমিও পূনর্বার উল্লেখ করিনা। কারণ যে এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এবং

নির্লিপ্ত, তাকে উত্যক্ত করা অনুচিৎ।

এই বৃদ্ধ বয়সে এই ভাবেই জীবন অন্যধারায় বইতে শুরু করেছে। এক উচ্ছল, উজ্জ্বল, মহাসুখি লাবনী, তার মেয়ে বেবি এবং খ্যাতনামা সমাজসেবক আমি, বসন্ত বসু। মন্দ নয়, বেশ মজার ও আনন্দের জীবন। কঠোর ন্যায় বরং কোমল—সবুজ ধানের সবুজ পাতা অল্প সুখের হাওয়ায় কি অদ্ভুত পরম তৃপ্তির সাথে মাথা দোলায় এবং তৃপ্তি দেয় বিলাসি নজরকে। বেবি বড় হতে থাকে তুলতুলে তিন কিলো ওজনের বেবি চিৎ হতে উপুড় হতে শেখা, হামাগুড়ি দেওয়া, বসতে শেখা, দেওয়াল ধরে দাড়ানো পরে হাটিহাটি পা-পা, খল্‌খল্ করে হেসে ওঠা, খেলনা নিয়ে খেলতে শেখা, বাব্ বা....বাব্-বা, মাম্ মাম্-মা বলতে শেখা, পেনসিল দিয়ে মেঝেতে দেওয়ালে লেখা খাতার পাতায় অ আ ক খ-এ বি সি ডি, বর্তমানে কেজিওয়ানে পড়ে। সর্বক্ষণের সঙ্গী বেবির সাথে এ-বৃদ্ধ, আমি। সন্তান পালন, একটা শিশু, সুখদায়ক-অখণ্ড তৃপ্তি দেয়, আমি তৃপ্ত। তারপর থেকে ব্যস্ত কলকাতার অপরাহ্নের ব্যস্ত পার্ক যেখানে শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দুপুর গড়ালেই পার্কে এসে হাজির হয়, কেউ খেলে, কেউ হাঁটে, কেউ গল্প করে, কেউ আড্ডা মারে, কেউ প্রেম করে, দিনের শেষে কেউ বা ঘরের কথা বাইরে বলে বুকখালি করে। সময় এগিয়ে যায়, কেউ আসতে আসতে আসা বন্ধ করে বা আসা বন্ধ হয়ে যায়, আবার নতুনেরা আসে—বিরামহীন—এ আসা-যাওয়া। আমিও আসি, বেবির হাত ধরে, ফুটফুটে এক সুন্দর শিশু, কংক্রিটের ছাতার নিচে কংক্রিটের বেঞ্চে বসি, গল্প বলি—কেউ শোনে—কেউ শোনেনা, আমার বন্ধু জুটেছে দু-চারজন। নিয়মিত শ্রোতা—এ এক নেশা। এই বয়সে নেশাই পেয়েছে।

মালবিকা আসে। ওর একটি ছেলে হয়েছে—এক বছর বয়স। কিছুদিন ওর আসায় বিরতি ছিল, সুকান্ত আসতো। সুকান্তের কাছ থেকে নিয়মিত মালবিকার খবর পেতাম। ডায়মণ্ড হারবারের গ্রামের স্কুল দেখা হয়ে ওঠেনি। মানসদা মারা গেছেন। মানসদার অসুস্থতার খবর পেয়ে মানব এসেছিল, কিন্তু শেষ দেখা হয়নি। শ্রাবনী বৌদিকে নিজের চাকরিস্থলে নিয়ে গেছে। মানবের বড়ছেলের আট বছর বয়স, বাঙ্গালোরে পড়ে—ইংলিশ মিডিয়ামে, বাংলা শেখা হয়না। মানসদার মৃত্যু শয্যার পাশে একবার গিয়েছিলাম-অন্তরের টানে। শ্রাবনী বৌদিকে চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি, বৃদ্ধ বয়সেও দীর্ঘদিন পর ওদের দেখে কয়েক ফোটা চোখের জল পড়েছে। মালবিকা তখন অর্ন্তসত্বা, সেই অবস্থায় সে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছিল, ওকে সান্ত্বনা দিয়েছি। বাবার মৃত্যু শোকের কান্না আমার সান্ত্বনায় বাধা মানেনি। মানব ও সুকান্ত মানসদার শেষ যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। আমি ঐ শোক সন্তপ্ত পরিবেশে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি, শরীর খারাপ করছিল, ফিরে এসেছি। ফেরার পথে গাড়িতে বসে বৌবাজারের সেই একটুকরো বদ্ধ বাসা, স্কুলের চঞ্চল দিনগুলো মনে পড়ছিল—সব ভোলা যায়না। সেই মানসদা, সেই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, শেষ জীবনে সুখ পেলেনা, ছেলে মেয়ে, ঘর সংসার থাকতেও একা হয়ে গেল—বড় একা—এক বুক ব্যথা নিয়ে চলে গেলেন। গাড়িতে বসে বসেও মানসদার কথা চিন্তা করে চোখের জল বাঁধ ভাঙা জলের মত হু হু করে চোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে গড়াতে থাকলো। চেখে জল, শরীরে অস্বস্তি, গাড়ির এসিতেও আমার ঘাম বন্ধ হয়নি। চণ্ডী ও ড্রাইভারের সহায়তায় ফ্ল্যাটে। ডাক্তারের পরামর্শে বিশ্রাম—মাইল্ড অ্যাটাক্। সাবধান!

লাবনীর শুশ্রষায়, ডাক্তারের পরামর্শে সুস্থ্য হয়ে উঠি, হাঁটা চলা করি—আস্তে আস্তে

পার্ক—বেবির হাতে এক প্যাকেট বিস্কুট ধরিয়ে দিই—দু একটা রাস্তার শিশু ভিক্ষা চায়, বেবি ওদের একটা দুটো করে দেয়। বেবিও শিশু ওরাও শিশু। প্রথম প্রথম বেবি দিতে চাইতো না, এখন ডেকে ডেকে দেয়। বিস্কুট বিলিয়ে সে আনন্দ পায়, কোনো কোনো দিন ভিখারী বাচ্চাগুলোর অনুপস্থিতিতে কৌতুহলি বেবি ওদের খোঁজে, ওদের না দিতে পারলে বেবির মুখ ভার হয়। শিশু মন!

এমনিই একদিন পার্ক থেকে ফেরার পর শরীর খারাপ হয়, অনেক কষ্টে ফ্ল্যাটে ফিরি—খাটে শুয়ে পড়ি, চণ্ডী হাওয়া করতে থাকে, মাধবী ডাক্তারকে কল্ করে।

রোহিতের দায়

এই সমাজ ব্যবস্থা পরিবারের দায় সন্তানের ওপর বর্তায়। যবে থেকে পরিবার প্রথা চালু হয়েছিল সেই অতীত থেকে আজো এ ধারা বর্তমান। বিশেষ করে পুত্র সন্তানের ওপর দায় ভাব অধিকতর, কন্যা সন্তান বিয়ের পর অন্য পরিবারের সদস্যা হিসাবে পরিগণিত হওয়ার ফলে তার জন্মগত বংশের প্রতি বিশেষ দায় ভার থাকে না। তবে সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে পরিবারের বৈশিষ্টের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। আবার অর্থনৈতিক কারণে পরিবারের গঠন বদলে যাচ্ছে—বাবা মা সন্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে একদম মাইক্রো পরিবারের উদ্ভব হতে চলেছে। তবু সন্তানের ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা বিদ্যমান। বাবার অসুস্থতার খবর পেয়েই তৎক্ষণাৎ উড়ে আসতে হয়েছে রোহিত বাসু, বসন্ত বাসুর ছেলেকে, যদিও রক্ষা হয়নি। বাবা দেহত্যাগ করেছেন। অত্যন্ত দুঃসংবাদ।

যদিও বাবার সাথে আমার ব্যাবধান দুস্তর। দ্রুততম যানে মানুষ পাড়ি দিচ্ছে বিভিন্ন গ্রহে উপগ্রহে আমি, রোহিত সদ্য প্রয়াতঃ বসন্ত বাসুর একমাত্র সন্তান ও ছেলে, চেষ্টা করেও বাবার মনের ঘরে প্রবেশের পথ খুজে পাইনি। অবশ্য এর কারণ হিসাবে বাবাকে বা নিজেকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত বা দোষযুক্ত বলে ভাবতে ইচ্ছা করছে না। বাবার মন ছিল উদার, হৃদয় মহান—সাধারণ মনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমি তার একমাত্র সন্তান ছিলাম তবুও সে মনের কাছে পৌছাতে পারিনি, বাবার দিক থেকে যদিও অনাদর ছিল না। না পেরেছেন আমার মা—শ্রীমতি রুচীদেবী, কি কারণে মা বাবাকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন, সঠিক বলতে পারবো না। তবুও অনুমান সংঘাত ব্যক্তিত্বের, পার্থক্য জীবনদর্শনের। বাবা ব্যক্তিত্ববান পুরুষ, মা প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না, প্রবল আত্মমর্যাদা জ্ঞান সম্পন্না অন্ততঃ আমার মাকে আমি যতটুকু জেনেছি বা চিনেছি। নিবিড় সম্পর্ক বলতে যা বোঝায়—মায়ের সাথে আমার সে সম্পর্ক ছিল এবং এককেন্দ্রিক। একমাত্র মায়ের হৃদয়ে স্থান ছিল একমাত্র আমারই। কিছুটা অস্বাভাবিক, তবুও মায়ের মনের খবর আমার জানা ছিল না—সম্ভবত নয়। এটুকু জানতাম যে আমিই তার একমাত্র আপন। স্বাভাবিক কারণে আমি তো মায়ের একমাত্র সন্তান। তবুও মায়ের মন যে আমার অজানা ছিল সেটা নিশ্চিত মায়ের বর্তমান অবস্থান থেকে। আমাদের হতে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য সংসারে, অন্য কাজে না সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, যা আমার স্বপ্নের অতীত। আসলে এ সংসারে কেই বা কার মনের খবর রাখে! সকলেই নিজের নিজের মনের বৃত্ত মনে মনে রচনা করে, সেই বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে, বৃত্তের বাইরে নজর দেওয়ার কথা ভেবে দেখে না, সময় পায় না, সময় বয়ে যায় নিত্য নিয়ত নিয়মবেঁধে। যে কারণেই হয়তো বৃত্তের বাইরে অন্য মনের বৃত্তে প্রবেশ পায়না, অজানা

রয়ে যায়। স্বার্থপর আমরা সবাই, স্বার্থপর সময়ও।

বাবার মৃত্যুর ঠিক পর আমার এই ভাবনা বা উপলব্ধি কিছুটা দার্শনিক সুলভ এবং এই প্রথম। পরিবেশ, পরিস্থিতি মানুষকে ভাবায়, ভাবতে শেখায়। হয়তো পরিবেশের প্রতিফলন আমার এই ভাবনা। জীবনে এ আমার একান্ত এবং নতুনতম উপলব্ধি এবং সংযোজন, যা আমায় সমৃদ্ধ করবে।

মায়ের ছায়াই বা মায়ের দৃষ্টির পরিধির অন্তরালে জন্মের পর থেকে প্রাক বিবাহ পর্যন্ত আমার দিন কেটেছে। বলতে গেলে লেখা পড়ার কারণে হস্টেলের দিনগুলো ছাড়া, বাকি সমস্ত দিন মাস বছর কেটেছে একমাত্র মায়ের কাছে। একমাত্র মায়ের সাথেই ছিল আমার এক মাত্র প্রত্যক্ষ, যোগাযোগ। সংসারে বাবা থাকলেও বাবার সাথে আমার মানসিক যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। তার একমাত্র কারণ মায়ের কথায় বাবা ব্যস্ত লোক, অনেক বড় কাজে তিনি ব্যস্ত থাকেন. তাকে বিরক্ত করো না। সেই শৈশবের দিনগুলো থেকে যে কারণে বাবার কাছে পৌঁছতে পারিনি। বাবার চোখের ভাষা বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না, আজ বুঝি বাবার স্নেহার্দ্র মন সন্তানকে কাছে পাওয়ার প্রত্যাশায় কি ব্যাকুল ছিল। সেই মা কেন যে আমার বিয়ের পর আমায় ছেড়ে দূরে চলে গেলেন, আমি বুঝতে পারি না। মায়ের নতুন পথের যাত্রায় আমি সাথী হইনি, সেখানে মা একা। আমার পথ ভিন্ন। বাবার মৃত্যুর পর তাই আমি একা, যদিও আমার স্ত্রী আমার সঙ্গিণী। তার সাথে আমার ধারণা আমি একাত্ম। বাবা ও মায়ের সাথে আমার স্ত্রীর যোগাযোগের সুযোগ হয়নি, সে কারণে বাবা মা এবং আমার মধ্যে যে যোগসূত্রতা এবং সে সংক্রান্ত ভাবনায় তার ভূমিকা নেই। তাই আজকের আমার ভাবনা সম্পূর্ণ নিজস্ব।

আমি চাই আমার কথা নয়, বাবার কথা, যে কথাগুলো বাবা অসুস্থতার কারণে বলতে পারেননি, এবং যেহেতু বাবা শেষ বয়সে, তার নিজের গল্প নিজের মুখে আপনাদের শুনিয়েছেন, কিন্তু সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই অসমাপ্ত অংশটুকু আপনাদের কাছে পরিবেশন করা একমাত্র সন্তান হিসাবে আমার দায়িত্ব বা দায়ভার বলতে পারেন। যে কোন কাহিনীর শেষ বা সমাপ্তি সকলেই চায়। জীবন চলমান, এবং জীবনের কাহিনীরও ইতি নেই, বলা হয় একটা পর্ব বা একটা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। ইতি বা পরিসমাপ্তি নয়, ইতির পরেও থেকে যায় আরো কিছু বা নতুন কিছু একটা অধ্যায়কে অনুসরণ করে পরবর্তী অধ্যায়। অর্থাৎ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করে পরবর্তী অধ্যায়ের আগমনী বার্তা। যেমন প্রতি সন্ধ্যা অপেক্ষা করে প্রভাতের জন্য। এটাই এ বিশ্বের সত্য। জীবন সেই সত্যের নিগড়ে বদ্ধ।

আমার বাবার অন্তিম কার্য-শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হয়েছে। বাবা একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সে কারণে বাবার অসুস্থ্যতার খবর গোপন রাখা সম্ভব হয়নি। অবশ্য গোপন রাখার কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আমার বা আমাদের ছিল না। অসুস্থতার খবর সংবাদ মাধ্যমের গোচরে আসা মাত্রই, মাধ্যমের দৌলতে দেশের, বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে, ছড়িয়ে পড়ে। শিল্প, সাহিত্য, সমাজ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাবার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে এবং পত্র পত্রিকা, টেলিগ্রাম, মেলের মাধ্যমে বাবার আরোগ্য কামনা করে বার্তা পৌঁছতে থাকে। প্রতিদিন সংবাদ মাধ্যমে বাবার ছবি, জীবনী, বাবার কাজ সহ চিকিৎসা সংক্রান্ত খবর পরিবেশিত হতে থাকে। দেশি, বিদেশী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হতে বাবার চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা ও পরামর্শ চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছাতে থাকে। কিন্তু বাবার স্বাস্থের উন্নতি হয় না বরং অবনতি হতে থাকে ভর্তি হবার

ঠিক সাতদিনের মাথায় বাবা ইহলোক ত্যাগ করেন অর্থাৎ বসন্ত বাসুর মৃত্যু হয়, প্রথম পাতার হেড লাইন হয়ে বাবার মৃত্যুসংবাদ জগৎবাসীর কাছে পৌছে যায়।

সত্যিকথা বলতে কি বাবার কর্মজগৎ নিয়ে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিলনা। এটুকু জানতাম বাবার কাজের জগৎ ছিল অনাহার অপুষ্টি জনিত কারণে শিশুমৃত্যু, প্রসূতি মৃত্যুর তথ্যানুসন্ধান, কারণ নিরূপণ এবং নিবারণের উপায় সম্বন্ধে তথ্য সহ সমস্ত বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা। যে কারণে বাবার কর্মময় জীবন, বিশ্বজুড়ে বিদগ্ধ মহলে স্বীকৃতি এবং বিশ্বসংস্থা কর্তৃক, বাবার তথ্যাদি গ্রহণ এবং পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পিত ভাবে বাবার নির্দেশিত পথ অনুসরণ ইত্যাদি, বিস্তৃতি জানা ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বাবার লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে, সমাদৃত হয়েছে একটি তথ্যসমৃদ্ধ দলিল হিসাবে। জীবিতকালে বিভিন্ন স্থানে বাবার বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি খণ্ডে—যা কিনা আজকের বিশ্ব ব্যবস্থায় অসুস্থ অপুষ্ট শিশু সংক্রান্ত একটি অমূল্য দলিল। সেই দলিলের ওপর আস্থা রেখে ভারতসহ, বিভিন্ন দেশে শিশুদের স্বাস্থের উন্নতি ও শিশুজননীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহিত এবং বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। আর এই সব খণ্ডের প্রকাশ, গ্রন্থায়ন ইত্যাদির মূল উদ্যোক্তা এবং সহযোগি ছিল—শ্রীমতি লাবণী, অর্থাৎ আমার সংমা, প্রয়াতঃ বসন্ত বাসুর মানসপ্রতিমা। হ্যাঁ, লাবণীদি নয়, শ্রীমতি লাবণী খান বাবার আইনসম্মত স্ত্রী। যার সন্তান বেবি। যার বয়স চার বছর অতিক্রম করেছে। আমার বোন। যাকে আমি প্রথম দেখলাম। সুন্দর দেখতে মুখের আদল অনেকটা বাবার মত, গায়ের রঙ মা অর্থাৎ লাবণীর মত—অপূর্ব সংমিশ্রণ।

ওর জন্মের খবর যথাসময়ে পেয়েছিলাম। কিন্তু এক অদ্ভুত মানসিক জড়তার কারণে, বেবির জন্মের খবর পেয়েও, এই ছোট বোনটির প্রতি এক বিরূপ মানসিকতার জন্য বোনটিকে দেখতে আমার ইচ্ছা হয়নি। বরং আমার মন জুড়ে ছিল এক জাতিয় বিদ্বেষ। জানি, এটি আমার মনের অনুদারতা ছাড়া কিছু নয় তবুও আমি তো এই সমাজের সৃষ্ট,আমার মনের গঠন বা আমার ভাবনায় তার ব্যতিক্রম হওয়া কঠিন। কারণে এই সমাজের রীতি, বেওয়াজ বা সংস্কার আমার মজ্জায়। আমার চিন্তাভাবনায় তার প্রতিফলন অস্বাভাবিক নয়। সে কথা অস্বীকার করি কি করে।

মা, আমার মা অত্যন্ত কাছের, অত্যন্ত আপনি ছিলেন, আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবনের দিনগুলো, এমন কি বিয়ে হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণরূপে মায়ের একমাত্র আদরের এবং একান্ত অনুগত ছিলাম। আমার জীবনে ব্যক্তি একই জন—সে আমার মা। মা সমস্ত স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে সম্পূর্ণ মায়ের ছত্রছায়াই আমি বড় হয়েছি। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান আমি। বাবা মায়ের উভয়ের স্নেহ আমি আমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি। বাবার সাথে আমার এক অঘোষিত দূরত্ব থাকলেও বাবার স্নেহের অভাব বোধ অনুভব করিনি একমাত্র মায়ের প্রগাঢ় স্নেহের কারণে।

বাবার প্রতি মা কতটা অনুরক্ত ছিল জানি না, তবে দুজনের সম্পর্কে নিবিড়তার অভাব ছিল আমি অনুভব করতাম সে কারণেই হয়তো পক্ষান্তরে বাবার কাছ হতে মা আমায় দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন, সে কারণেই হয়তো আমার প্রতি মায়ের স্নেহের এই প্রাবল্য বা আধিক্য। বাবার ব্যস্ত জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মা অনুশাষণের দ্বারা বাবার কাছ থেকে আমায় দূরে সরিয়ে রাখতেন। মা চাইতেন না যে আমি মাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসি। মায়ের ভালবাসায় বাবার ভালবাসার

অভাববোধ হয়নি কোনোদিন। অপরদিকে মায়ের আশা ভরসা অবলম্বন ছিলাম আমি। মায়ের জীবনের সবকিছু আমাতে কেন্দ্রিভূত ছিল। মাকে আমি ভালবাসি, প্রচণ্ড ভালবাসি। মায়ের ও বাবার মধ্যে অস্বাভাবিক দূরত্ব আমায় কষ্ট দিত. মনে হত আমার মা এত সুন্দর, সেই মাকে বাবা কষ্ট দেয়। বাবা অন্যায় করে। বাবার ও মায়ের মধ্যে শীতল সম্পর্কের জন্য বাবাকে দোষি ও মাকে নির্দোষ মনে হতো।

এরপর লাবণীদির এ সংসারে উপস্থিতি এবং বাবার সাথে হৃদ্যতা স্থাপনের মধ্যেও বাবার কোনো অন্যায়, আমার মনে হয়নি। কিন্তু বেবির জন্ম গ্রহণ মায়ের নতুন জীবন পথে যাত্রা বাবার প্রতি আমি বিরূপ হই। মনটা কেমন যেন বিষিয়ে যায়। মনে হয় বাবাকে যতটা শ্রদ্ধা করি তিনি ততটা শ্রদ্ধার পাত্র নন্। বাবার এ জাতীয় জীবনবোধকে আমি সমর্থন করি না। সে কারণেই বিগত চার বছর বাবার সাথে আমার দূরত্ব বাড়ে এবং বেবিকে দেখতে আসার ইচ্ছা হয়নি. এবং আমি কলকাতায় আসিনি। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলি।

বাবার কথা ভুলতে চেষ্টা করলেও মাকে আমি ভুলতে পারিনি। আজো মায়ের অভাব বোধ আমায় তীব্র কষ্ট দেয়। আমার বিয়ের পর আমাকে না জানিয়ে এভাবে আমার জীবন থেকে মায়ের সরে যাওয়ায় প্রচণ্ড আঘাত পাই। বিয়ে আমি করেছি ঠিকই, কিন্তু বিয়ে দিয়েছে মা, মেয়ে দেখা, মেয়ে পছন্দ করা, দিন স্থীর করা, বিবাহ সংক্রান্ত সব কাজ একা মা করেছে। বাবা সেখানে যদিও অভিভাবক, প্রকৃত অর্থে অতিথি ছিলেন। মায়ের পাত্রী নির্বাচন, মায়ের সিদ্ধান্তগ্রহণে আমি দ্বিমত হইনি বরং খুশি। আমাদের দাম্পত্য জীবন মধুর। কিন্তু দুঃখ হয় মা কেন আমায় ত্যাগ করল। কেন আমায় মায়ের স্নেহ হতে বঞ্চিত হতে হলো? যদি বিয়ে এর কারণ হয়, আমি জানলে বিয়েতে মত দিতাম না। আমি কোনো মূল্যেই মাকে হারাতে চাইনি। যে কারণে এক সময় মনে হয়েছিল, আমি হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করে মায়ের কাছে ফিরে যাই। সে হয়নি, অহরহ মায়ের জন্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেছি। অসহ্য এ ব্যথার কথা বলে বোঝানো যাবে না আমার এই কষ্টের জন্য ও পরোক্ষ ভাবে বাবাকে দোষি মনে হতো। বাবার প্রতি রাগ হত। মনে হত, মায়ের স্বামী থাকতেও মা একা আর বাবা অন্য মহিলার সাথে ঘর করছেন, সুখে আছেন। প্রশ্ন জাগতো এ কেমন পরিবার! বাবা অন্য মহিলার সাথে সহবাস করছেন। মা স্বামী থাকতেও, স্বামী সম্পর্ক ছিন্ন একা অন্য ঠাঁয়ে, আমি তাদের একমাত্র সন্তান, বাবাও মায়ের কারোর সাথে যোগযোগ নেই—সংসারের তিনজন মানুষ তিনটি ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা। এ এক অদ্ভুত পরিবার! এ এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে আমি বেঁচে আছি।

পরবর্তী সময়ে এই, সব কিছু নিয়ে আমি ভেবেছি। তবুও যথার্থ ব্যাখ্যা পাইনি। মায়ের ছত্রছায়াই ছিলাম, পড়াশুনা করেছি, তারপর চাকরি, হায়দ্রাবাদে, ছাত্র অবস্থায় মা আমার পাশে. চাকরি রত অবস্থায় মা থাকতো আমার কাছে। অভিভাবক বা মায়ের স্নেহে কোনদিনই মনে হয়নি আমি একা, আমার কোনো অভাব নেই, অফুরন্ত সুখ ও শান্তি, ভাবনা চিন্তার বা আত্মসমালোচনা করার অবকাশও প্রয়োজন ছিল না। বিয়ের পর, আমার স্ত্রী প্রিয়ংবদা. অত্যন্ত প্রাণবন্ত, সংবেদনশীলা এবং যথার্থ বন্ধুর মত ব্যবহার. আমায় মুগ্ধ করেছে, অত্যন্ত সুখী আমি। তবুও অজান্তে অবসর সময়ে বাবা, মা ও নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি, অবশেষে ধীরে ধীরে নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। স্ত্রী প্রিয়ংবদা সন্তান সম্ভবা! নিকটেই ওর বাবা মা থাকেন। অত্যন্ত সজ্জন এবং স্নেহপ্রবণ, প্রিয়ংবদার যত্ন আদরে আমি

নিশ্চিন্ত। সকলের যেভাবে জীবন কাটে, আমারও কাটছিল।

আমার মা অত্যন্ত স্থীতধী। প্রচণ্ড বুদ্ধিমতি, ব্যক্তিত্বসম্পন্না। পৃথিবীতে কারোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তার ছিল না। বাবার বিরুদ্ধে কোনোদিনই মাকে অভিযোগ করতে শুনিনি। এমনকি শ্রীমতি লাবণী, যিনি আমার সৎমা, তার বিরুদ্ধে মায়ের কোনো নালিশ নেই। মায়ের যা কিছু ভাবনা---রাগ, দ্বেষ, সুখ, বিলাস, আনন্দে, অপ্রকাশ্যে, মায়ের যা কিছু অনুভূতি, মায়ের নিজস্ব, কোনদিন বন্টন করে ভোগ করেননি তিনি। শৈশবের অনেক কথাই বিস্মৃত প্রায়, তবুও দেখতাম, যদিও সেদিন বুঝতাম না, বাবা ও মা, একই আবাসে, সুন্দরভাবে নিজের জগতে অবস্থান করে। দুটি পৃথক জগৎ তবুও অসুন্দরের স্পর্শ বিন। বাবার জগৎ বাবার কাজে, মায়ের জগতে আমি। বাবা বিদগ্ধ ব্যক্তি, বাবার কাজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত, বাবার এই সুমহান আদর্শের জন্য বাবার প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা। বাবা মা ও আমাকে নিয়ে ছোট সংসারে লাবণী আসার পর সংসারের স্বাভাবিকতা বা বাবা মায়ের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন কোনো পরিবর্তন হয়নি। আজ ভাবি কেন?

লাবণী মা, সেদিনের লাবণীদি, একজন নিষ্পাপ, অসহায়, রোরুদ্যমানা যুবতী, প্রবঞ্চিতা যুবতী লাবণীকে অত্যন্ত স্নেহে যত্নে, সান্নিধ্য দিয়ে বাবা মা দুজনেই তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট ছিলেন। উভয়েই চাইতেন আশ্রিতা নয়, লাবণী একজন তাদেরই লোক। এ এক দীর্ঘ প্রচেষ্টা। লাবণী মা ধীরে ধীরে আত্মস্থ হয় কিন্তু বড় বেশি বাবার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। বলতে গেলে বাবার সাহচর্যে বাবার সান্নিধ্যে সে অতীতের স্মৃতিমুক্ত না হলেও তার মানসিকতা স্বাভাবিক হয়। বাবাও যেন ধীরে ধীরে লাবণী মাকে আশ্রয় করে আপন কাজে মগ্ন হয়। বাবা একজন বিশাল মাপের ব্যক্তিত্ব, আমার পক্ষে তার দরদী হৃদয়ের আসক্তি বোঝা অসম্ভব। তবে একথা সত্য মা ও বাবার অস্বাভাবিক জীবন যাপনের অবকাশে লাবণী মায়ের সাথে বাবার যে সম্পর্ক বা মানসিক বন্ধন সৃষ্টি হয়, তা যেমনি সুদৃঢ়, তেমনি সংবেদনশীল, তেমনি অভিনব--- একে নারী ও পুরুষের মধ্যে এক স্বাভাবিক সম্পর্ক বলে ভাবা ঠিক হবে না। এই উপলব্ধি হতে আমার বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেছে। বাবার ও আমার সম্পর্কের মধ্যে বিরূপতার পরিবর্তে স্থান পেয়েছে জড়তা---এক ধরণের লজ্জানম্র মানসিকতা।

অবশ্য বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্টের পূর্ণমূল্যায়ন এর জন্য মায়ের স্বগোতৃক্তি আমায় সাহায্য করেছে। এই প্রথম মায়ের লেখা তার প্রিয় সন্তান, আমাকে বিশেষ কয়েকটি চিঠি বাবা ও মাকে চিনতে সাহায্য করেছে। এবং মায়ের যে নতুন জীবন পথে যাত্রা শুরু সেও বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষায়। বাবা জানতেন না, মাকে চিনতেন, যে কারণে মা সম্বন্ধে বাবার মূল্যায়ণ আংশিক পূর্ণ।

আমি তাদের সন্তান, আমার দায়, বাবার গল্প আপনারা জানেন, বাবার মুখ থেকে শুনেছেন, আমার মা নির্বাক, তাকে আপনারা চেনেন না, সেই মায়ের কথা মায়ের ভাষায় অংশ বিশেষ রাখলাম। যদিও মায়ের অনুমত নিইনি। মা প্রকাশের আড়ালে থাকতে চায়, তাই যদি কোনদিন প্রশ্ন করে ক্ষমা চেয়ে নেবো। মা ক্ষমা করবেনই!

"দেখো রোহিত তোমার কথায়, তোমার চোখের চাহুনিতে যে প্রশ্নগুলো প্রায়শঃই তোমার মনে উদয় হয়, আজ তুমি পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন, তোমাকে বললে তুমি কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবে, সে কারণে দু এক কথায় আমার নিজের কথা তোমায় লিখলাম। তোমার ও আমার মধ্যে কোনো গোপনীয়তা থাকা উচিৎ নয়। আমি দেখেছি,

সেই ছোট থেকে, তখন আমি কিশোরী, সেই সময় থেকে আমার আচরণ আমার চিন্তার জগৎ, সমবয়সী অন্যের চেয়ে কিছুটা আলাদা। তুমি জানো আমার বাবা ছিলেন শিক্ষা অনুরাগী। বাবা অধ্যাপনা করতেন, অধ্যাপকদের নিয়মিত পড়াশুনা করতে হয়, নিজের বিষয়ের বাইরে, বাবা নিজস্ব বিষয় ছাড়া বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গভীর মনযোগ দিয়ে পড়তেন, বাবার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। আমার বাবার কাছে থেকে বইকে ভালবাসার শিক্ষা আমার। সমবয়সী কিশোরীরা যে সময় স্কুলের পড়াশুনার সাথে খেলাধূলা সিনেমা থিয়েটার, হাসি হৈ হুল্লোড়ে ব্যস্ত থাকতো, আমি একা একা বই নিয়ে বইয়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আনন্দ পেতাম। পড়তে পড়তে, সমাজ, রাষ্ট্র, জীবন সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন একে একে মনের মাঝে দেখা দিত, যে কারণে একটার পর একটা বই পড়ে সেই উত্তরগুলো খুঁজতাম। আজো খুঁজি। আমার মনে হয়, সব মানুষের আত্ম উপলব্ধি অসম্পূর্ণ, কারণ সময়ের সাথে, পরিবেশের সাথে প্রতিনিয়ত মানুষ বদলাচ্ছে সে কারণে আমি প্রতি মুহূর্তে নিজেকে নতুন করে পেতাম। তবে এটা ঠিক, মানুষের সুখ ও দুঃখের অনুভূতিগুলো মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। সেই উপলব্ধি থেকে আমার কামনা বা আকাঙ্খা ছিল সীমিত। অর্থাৎ নিজের জন্য বেশি কিছু চাইনি। আমার বিয়েও আমার ও বাবার যৌথ ইচ্ছায়। বসন্তের বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বসন্তকে বাবা পছন্দ করে আমার সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিয়ের আগে অল্পসময়ের জন্য বসন্তের সাথে মিশে বসন্তকে ভাল লেগেছিল। বসন্ত খুব ভাল। বসন্তকে ভালো বেসেছিলাম। বসন্ত বিশাল, আদর্শবাদি, চিন্তার জগতে বিশ্বের তাবৎ অনাথ, অসহায় শিশুদের আশ্রয়, বসন্তকে আমি শ্রদ্ধা করি। তার কাজকে। সে কারণে তার কাজে বাধা দেওয়া বা অভিষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার কোনো প্রয়াস আমার ছিল না। তবুও বিয়ের পরে বসন্তকে আমি পাগলের মত ভালো বাসতাম। তুমি এলে, তোমাকে নিয়ে ডুবে গেলাম। বসন্তের স্থান তুমি দখল করলে, বসন্তের প্রতি আকর্ষণ ফিকে হতে শুরু করল।"

আমার ধারণা বা অনুমান যে সঠিক, মায়ের এই চিঠিতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বাবার আদর্শ মহান, এবং বাবার কাজের প্রতি মায়ের আন্তরিক সমর্থন এবং সে কাজে বাবার আত্মনিয়োগ, মা সম্পূর্ণভাবে সমর্থনই করতো না বরং পরোক্ষভাবে তার স্বার্থক রূপায়নে মায়ের ছিল নীরব প্রচেষ্টা। যা মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য পূর্ণ। তবুও দাম্পত্য জীবনে মা ও বাবার প্রাত্যহিক জীবন ধারায় অস্বাভাবিকতা মাঝে মাঝে আমার মনে সংশয় নয়, প্রশ্ন জাগতো। যদিও বাবার প্রতি মায়ের যত্ন, সেবা, বা স্ত্রী হিসাবে ব্যবহারিক দায়িত্ব পালনে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি, একই উদাহরণ বাবার ক্ষেত্রেও সত্য। মায়ের কথায়, বাবার প্রতি মায়ের কর্তব্য পালনে কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না। এমন কি লাবণীদি আসার পরে বাবার সাথে লাবণীদির সখ্যতা মা জানতেন, অনুভব করতেন, হয়তো তার জন্য কষ্টও পেতেন, হয়তো তাদের অন্তরঙ্গতা মাকে পীড়িত করত তবুও তিনি কোনদিন প্রতিবাদ করেন নি, বাধা দেননি, এমন কি ঐ বিষয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ করতেও শুনিনি কোনোদিন। কোনো স্ত্রীর পক্ষে, তারই বাড়িতে, তারই চোখের সামনে, তারই আশ্রিতা কোনো মহিলা, তার স্বামীর সাথে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব? প্রতিবাদ না করা সম্ভব? আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। সে কথার প্রচ্ছন্ন উত্তর পাই। মায়ের স্বল্প লেখায়।

''বসন্তের সাথে লাবণীর সখ্যতা, আন্তরিকতা, আর যদি বা কোনো শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে থাকে. আমার কাছে কোনটাই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি, মাঝে মাঝে মনে হতো ওরা হয়তো অন্যায় করছে, একদিন ভুল বুঝবে, সংশোধন করে নেবে। আবার ভাবতাম একজন নারী ও পুরুষ, তারা যদি এক সাথে থাকতে পারে, তাদের মধ্যে যদি হৃদ্যতা তৈরি হয়, এবং যদি প্রকৃতির নিয়মে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়—হতেই পারে। এতে কোনো অন্যায় নেই। তবুও মাঝে মাঝে রাগ হতো, মনে হত বসন্তের সাথে আলোচনা করি। আবার মনে হত শুধু অনুমান নির্ভর করে বসন্তের সাথে আলোচনা করাটা নিজের হীনমন্যতার মনে হতো। মনে হতো আমি ছোটো হয়ে যাবো। সে কারণে মনের কথা মনেই রয়ে যেতো প্রকাশ পেত না। আবার মনে হত, স্বামী হিসাবে বসন্তের আকাঙ্খা আমি পূর্ণ করতে সত্যিই পারিনি, সে কারণে তার ইচ্ছা পূরণে আমি বাধা হবো কেন! সকলের তো সমান যোগ্যতা থাকে না। দোষে গুণে সকলে সমান নয়, হয়তো কিউটির মধ্যে বসন্ত তার পূর্ণতার উপাদান খুঁজে পেয়েছে। আমার মধ্যে পায়নি। সেজন্য বসন্ত বা কিউকে অভিযুক্ত করা বেঠিক এবং রুচিবিরুদ্ধ। এ ছাড়াও কিউটি অসহায় বঞ্চিতা, পিতৃমাতৃ সংযোগ বিচিছন্না ওর প্রতি সামান্যতম সমবেদনা, সামান্য আত্মসুখ বিসর্জন না করতে পারলে আমি মানুষ কিসে! কিউকে স্নেহ করি, ভালবাসি, ওর সুখ চাই। ভাবতাম বসন্তের উদারতায় কিউ যদি সামান্য প্রশ্রয় পায়, ভালবাসার সামান্য স্বাদ পায়, তার দুঃখের উপসম হয়, আমার বাধা দেওয়া অনুচিত। আমি বড়, এই সামান্যতম ত্যাগ আমার করা উচিত। যার জন্য আমার কোন ক্ষতি হচ্ছে না।''

এই হচ্ছে আমার মা, রুচী দেবী প্রাক্তন কলেজ অধ্যাপিকা, সংবেদনশীল মহিলা। মানুষের প্রতি ভালবাসা, মমত্ববোধ, যার নিদর্শন কদাচিৎ শোনা যায়। আত্মমগ্না মা। তার শিক্ষা, জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবন সম্বন্ধে তার নিজস্ব ধারণা এমন একটা স্তরে পৌঁছেছিল যে কিউ-এর প্রতি বাবার কোনো আচরণ মাকে বিচলিত করতো না। আমার বিয়ের পূর্বে, মা হায়দ্রাবাদে আমার কাছে থাকতেন স্থায়ীভাবে, বাবা কলকাতায়, লাবণীদি আর বাবা এক সাথে এক ফ্ল্যাটে থাকতেন, বাবা ও লাবণীতে দুজনে একত্রে বিভিন্ন স্থানে বাবার কাজ উপলক্ষ্যে, এমনকি বেড়াতে যেতেন কাজে যেতেন, তার জন্য মা কোনো কিছু খারাপ বা দোষণীয় বলে ভাবতেন না। বরং মনে মনে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হতেন যে, বাবার এই বয়সে একা একা চলাফেরার করা অপেক্ষা কিউ সাথে থাকলে বাবার সেবা শুশ্রূষা করতে পারবে, প্রয়োজনে শারীরিক ভাবে সাহায্য করবে। লাবণীদিকে বাবার সহচারিণী হিসাবে ভেবে তিনি নিশ্চিন্ত হতেন। সব ঠিক আছে। তবুও মনে হতো, মা স্ত্রী হিসাবে বাবার প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করছেন না। মনে হতো ওদের দাম্পত্য জীবনে নৈকট্যের পরিবর্তে ব্যবধান আছে এবং এই ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেন ধীরে ধীরে ওনারা ক্রমশঃ একে অপর হতে দূরে সরে যাচ্ছে। মনে হতো ওরা যেন প্রকৃত স্বামী স্ত্রী নয় বরং পরিচিত দুই নর নারী। ওদের জীবন যাপন পদ্ধতি অস্বাভাবিক এবং বিসদৃশ। অবশ্য সব কিছুই আমার বাবা মায়ের সম্বন্ধে অনুধাবন এবং আত্মগত, আমি কোনো দিনই এ বিষয়ে বাবা ও মায়ের সাথে প্রত্যক্ষ আলোচনা করিনি এবং মন্তব্য তো দূরের কথা। তবুও মায়ের আচরণে বাবার প্রতি মৌখিক কর্তব্য ছাড়া ব্যবহারিক নিস্পৃহ ভাব আমায় আঘাত করতো।

''কিউ একটি অসাধারণ মেয়ে। বিগত বছরগুলোতে তোমার বাবার যা কিছু কাজ, যা কিছু সৃষ্টি, যা কিছু গবেষণা, তার কৃতিত্ব অনেকটাই কিউয়ের । কোনো একটা সময়ে

হয়তো তার জন্য আমি কিছুটা দায়ী, বসন্তের কাজে সহায়তা করা দূরে থাক, আমাদের একে অপরের প্রতি আচরণ বসন্তকে জীবন বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল, আমি বুঝেও কিছু করতে পারিনি, বসন্তের প্রতি আমার সে আকর্ষণ ছিল না। তোমার জন্মের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বজায় ছিল, এর জন্য আমি অন্যায় বোধ করলেও ছিলাম অনন্যোপায়। আমার এই আচরণে বসন্ত এতটা আঘাত পেয়েছিল যে তার চিত্তের বিমর্ষভাব তাকে জীবন বিমুখ করে তুলেছিল। যে বসন্ত তার গবেষণার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতো এমন কি আমার সাহচর্য্য থেকে অনেক কষ্টে কাজের উদ্দেশ্যে দেশে বিদেশে ভ্রমণ করতো, সেই বসন্ত সবকিছু বিসর্জন দিয়ে হতবাক হয়ে অলস জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আমার চোখের সামনে বসন্তের সৃজনশীলতার মৃত্যুতে আমি কষ্ট পেতাম। আবার কখনো ভাবতাম হয়তো বসন্ত একঘেঁয়েমিতে ক্লান্ত, বয়সের ভারে ক্লান্ত, হয়তো তার একাগ্রতা হ্রাস পেয়েছে, সে কারণে লেখা পড়ায় মন সংযোগ করতে পারছে না, লেখা থেমে গেছে। পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয়েছে আমার প্রথম অনুমানই সঠিক। লাবণী আমাদের বাড়িতে আসার কিছু দিনের মধ্যেই বসন্ত অতীতের কর্মশক্তি, কর্মচাঞ্চল্য ফিরে পায়। এই কারণেই কিউকে আমার ভাল লাগে, মনে হয় আমার মধ্যে যে অভাবটুকু রয়েছে, যা বসন্তকে পূর্ণতা দিতে অসমর্থ কিউ সে পূর্ণতা দিয়েছে। কিউ-এর নারীসত্ত্বা যথার্থ এবং উপযুক্ত।

এ ছাড়াও সমস্ত জীবনের বসন্তের কাজগুলো ছড়িয়ে ছিল অবিন্যস্তভাবে, কিউ অত্যন্ত অধ্যাবসায় সহকারে, কিউ-এর সান্নিধ্যে এবং উভয়ের যৌথ প্রয়াসে, বিগত বছরগুলোকে অনেকগুলো বিষয় ও স্থান ভিত্তিক, সংগ্রহাকারে প্রকাশিত হয়েছে, কিউ না থাকলে তা কোনদিনই হত না, মানব সমাজ এক অমূল্য সংগ্রহ থেকে চিরকাল বঞ্চিত থাকতো। মানবের কল্যাণে বসন্তের সাথে সাথে অলক্ষ্যে কিউ-এর অবদান অপরিসীম। আমি যা পারিনি, কিউ তা পেরেছে। বসন্তের জীবন কিউ-এর সান্নিধ্যে বিকশিত হয়েছে, স্বার্থকতা লাভ করেছে, যে কারণে আমি কিউকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। মনে মনে তার প্রশংসা এবং বসন্তের প্রতিভার স্থায়ী অনুরাগ কামনা করতাম।"

মায়ের মানসিকতার এই দিকটা আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। জানার পর বিস্মিত হই। সাথে সাথে মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। ব্যবহারিক জীবনে বাবা ও মায়ের দাম্পত্য সম্পর্ক যতই শীতল হোক, বাবার প্রতি মায়ের অনুরাগ, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার শিথিলতা কোনোদিনই ছিল না বরং ছিল স্নিগ্ধ অথচ তীব্র। শুধু তাই না লাবণীদি বর্তমানে আমার মা, যার প্রতি আমার মনে জন্মে থাকা সামান্যতম বিদ্বেষ ও আকাশের অস্থায়ী মেঘের মত হাল্কা বাতাসে উধাও হয়ে যায়। মনে হয় লাবণীদি যদি বাবাকে ভালোবেসে থাকে, তা নিখাদ। আমার সৎমা, শ্রীমতি লাবণী বসু শুধু অপরূপা সুন্দরীই নয়, একজন মহিয়সী নারী। করুণাময়ী এই নারী বাবার মত এক অসম বয়সী মানুষকে মমতা দিয়ে স্নেহ দিয়ে, সাহচর্য্য ও সান্নিধ্য দিয়ে এক মহতি আদর্শে মহীয়াণ হতে সাহায্য করেছে। বাবার মৃত্যুশয্যায় লাবণী মায়ের মৃন্ময়ী রূপ, অক্লান্ত সেবা অবর্ণনীয়। কিন্তু আমার নিজের মা, রুচীমা যার লাবণীমায়ের প্রতি মমত্ববোধ এবং বাস্তবসম্মত লাবণী মায়ের কাজের সম্মতি জ্ঞাপনের পর লাবণী মায়ের সন্তান হওয়া এবং আমাকে এত স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে মানুষ করে আমার বিয়ের পর, সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে নতুন করে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ বা ব্রতী হওয়া মায়ের বাবা ও আমাকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়। আমাকে ত্যাগ করার যথার্থ কারণ আমি খুঁজে পাইনি। এই আঘাত অত্যন্ত বেদনাদায়ক, সে বেদনা আমায়

আমৃত্যু কষ্ট দেবে। মনে হয়েছিল সব কিছুর জন্য বাবা দায়ী, লাবণী মা দায়ী। একটা সংসারের সুখ বিনষ্ট করার মূলে লাবণী মা—তাকে কোনোদিন ক্ষমা করবো না। সে কারণেই লাবণী মায়ের কাছ থেকে বাবার অসুস্থতার খবর পেয়েও আমি আসার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রীর কথায় এবং এক মাত্র সন্তান হিসাবে আমার দায়বদ্ধতায় ও বাবার খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ায় আমি আসতে বাধ্য হই। যাইহোক আমার কৌতূহল এবং ভ্রান্তি দূরের সূত্র হিসাবে মায়ের লেখা আর একটা মাত্র চিঠি দিয়ে আমার মায়ের কথা শেষ করবো।

"রোহিত ভেবে দেখলাম, যদিও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দেরী হল, কিউ-এর সমস্ত কাজে আমার মানসিক সম্মতি থাকলেও তার গর্ভে তোর বাবার সন্তান হওয়াকে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না; কিউ-এর সন্তান কামনায় কোনো অন্যায় নেই। আসলে সেও তো একজন নারী, তার কোনো কামনা বাসনা থাকবে না, অসম্ভব এবং অবাস্তব। তার ওপর এই পৃথিবীতে কিউটি একা। বসন্তের অবর্তমানে, ঐ অসহায়া, অনাথিনী, ঘরকুনো মেয়েটি থাকবে কি নিয়ে! সে যদি একটা সন্তান পেয়ে সুখী হয়, হোক্না। বসন্ত যদি সে ইচ্ছা পূরণে ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, সেটা বসন্তের মহানুভবতা বা মানবতার স্বার্থে, অতএব কিউয়ের কোনো অন্যায় নেই।

তোমাকে বা তোমার বাবাকে বর্জন করেছি, সঠিক নয়। অভ্যস্ত পথ পরিহার আমার নতুন পথে যাত্রার জন্য আমার দীর্ঘদিনের অধ্যাবসায়, মানবসেবায় ব্রতী হওয়ার স্বামীজির আহ্বান এবং সর্বোপরি তোমার বিয়ের পর দেশভ্রমণের সময় এক যথার্থ সেবকের-এর সাথে পরিচিত হওয়া এবং তার কথায় তার সাথে সহযোগী হয়েছি। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিনি। বা তোমাদের পরিত্যাগ করিনি। বরং যে কাজে ব্রতী হয়েছি সে কাজের জন্য সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করে উভয় সত্তাকে লালন করার ক্ষমতা এ বয়সে আর নেই। তাছাড়া তোমাদের জীবনে আমার উপযোগিতার আর বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

যাইহোক আপাততঃ নতুন কাজ ভাল লাগছে। তোমরা ভালো থাকো। আমি তোমাদের জন্য সদায় থাকবো।

ইতি আঃ মা

আমার মা, বাবা দুজনেই একটি আদর্শ। যারা আদর্শবান, সাধারণের নজরে তারা অন্যরকম, আলাদা এবং সমালোচনার পাত্র। কিন্তু জীবন ধর্মে সমাজের, শিক্ষার, দেশের বিরাট ভূমিকা আছে। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, সুখ, দুঃখের অনুভূতি সকলের অন্তরে বিরাজমান। একই অনুভূতি, প্রকাশের ভঙ্গিমায় ভিন্ন মনে হতে পারে। সূর্য ওঠার সাথে রাত্রির অবসান দিনের শুরু। কোনোদিন ঝলমলে রোদ্দুর কোনোদিন কুয়াশাচ্ছন্ন, সূর্য কুয়াশার আড়ালে আচ্ছন্ন থাকে, কোনো দিন অঝোর ধারায় বারিবর্ষণ; তবু দিন দিনই। জীবনের সুখ দুঃখ ভালোবাসা দিনের মতই সত্য। প্রকাশের ভিন্নতা থাকতে পারে। বৈচিত্র সেখানেই।

* * * * * *

হায়দ্রাবাদ থেকে দমদমে নেমেই সোজা স্ত্রীকে নিয়ে নার্সিং হোমে। ইনটেনসিভ্ কেয়ার ইউনিটে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে গঠিত একটা টিমের অধীনে চিকিৎসা চলছে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে গতকাল, লাবণী মা তৎক্ষণাৎ গৃহ চিকিৎসককে খবর দেয় এবং উভয়ের প্রচেষ্টায় বাবাকে কলকাতার এই প্রসিদ্ধ নার্সিং হোমে ভর্তি করে।

হাসপাতালের সূত্র ধরে ও সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে দেশ বিদেশে বাবার অসুস্থতার খবর পরিবেশিত সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাবার শারীরিক অবস্থার কথা জানার জন্য ব্যগ্রতা, আরোগ্য কামনা করে বার্তা পৌঁছাতে থাকে। সংবাদমাধ্যম প্রচণ্ড তৎপর হয়ে ওঠে। সমাজের বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি বাবাকে দেখতে আমার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করে, অনেকে দূর থেকে এসে চিকিৎসকরাও বাবাকে দেখে যায়। আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রী দেখতে আসবেন। কেন্দ্রের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ও স্বাস্থ্য মন্ত্রীর আসার কথা আছে। নার্সিং হোম এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডাক্তারের অনুমতি ব্যতিত কারো পক্ষেই ভিতরে ঢোকা নিষেধ। সাংবাদিক ও আলোক চিত্রীর ভিড় নার্সিং হোমের বাইরে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে লিখিত রিপোর্ট নার্সিং হোমের তরফ থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি এখনো লক্ষ্য করা যাচ্ছে না এবং অবস্থা সঙ্কটজনক।

আমরা যখন পৌঁছালাম, বাবার বাক্-রুদ্ধ, জ্ঞান আছে। মনে হল আমাদের দেখে বাবা খুশি হলেন—সামান্য খুশির হাসি মুখমণ্ডলে অল্প সময়ের জন্য। লাবণী মা গতকাল থেকে ঠাঁয় আই সি ইউয়ের বাইরে, অনড়। বেবির দায়িত্ব চণ্ডীর ওপর। লাবণী মায়ের সাথে নিরব দৃষ্টি বিনিময় হল। অসীম সহিষ্ণুতা, অক্লান্ত, অনন্ত দুঃখের মূর্তি যেন। মায়ের কাছ থেকে সব কিছু শুনে, লাবণী মায়ের সম্বন্ধে মনের মধ্যে লাবণীমায়ের প্রতি পরম শ্রদ্ধা পোষণ করেও কেন যেন কথা বলতে, বা দৃষ্টি বিনিময়ে প্রত্যুত্তর দিয়ে ব্যর্থ হলাম। আমার আচরণ আমার নিজের কাছের খারাপ লাগলেও প্রাথমিক এ-মানসিক প্রতিক্রিয়া আমার চারিত্রিক দুর্বলতা ব্যতিত অন্য কিছু নয়। স্বল্প পরেই দেখলাম, অনুশোচনায় আমার নতুন মায়ের চোখে জল। আমার খারাপ লাগছিল, অস্বস্তি হচ্ছিল, তবুও অসহায় নিরূপায় আমি! মানুষ কি সব সময়ে ইচ্ছার যথার্থ রূপ দিতে পারে? কেউ পারে। কেউ পারে না। আমিও পারলাম না।

দ্বিতীয় দিনেও বাবার অবস্থার কোনো উন্নতি নেই। ডাক্তারবৃন্দ কোনো আশার আলোর ইঙ্গিত দিতে পারলেন না। নতুন মা বাবার পাশে। আমি বাবার পাশে, ইশারায় আমার মাকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি বাবাকে জানালাম। মনে হল এই খবরে বাবা কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। বাবার চেহারায় কষ্টের, বিষণ্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট। বাবার বাক্শক্তি রহিত। তবুও তার চোখের ভাষা যেন কিছু বলতে চাইছে। বাবার সংস্পর্শে আমার জীবনের খুব কম সময় কেটেছে। বাবার সান্নিধ্য লাভ আমার জোটেনি বলতে গেলে। একই বাড়িতে বাবা, মা ও আমি আমার শৈশব ও যৌবনের প্রথম দিনগুলো অতিবাহিত করলেও প্রকৃত অর্থে আমি ছিলাম আমার মায়ের সন্তান। আমার সব ব্যাপারেই ছিলেন মা। সে কারণে বাবার চোখের ভাষার অর্থ উদ্ধার করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তবুও অনুমানে মাকে খবর দেওয়ার আমি ইশারায়, গলার স্বর উঁচু করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম অল্প সময়ের জন্য হলেও বাবার নিশ্চিন্ত ভাব, প্রশান্ত চেহারা।

তৃতীয় দিনের বাবার স্বাস্থ্যের খবরের সাথে, বাবার কাজের এবং আমাদের পরিবারের অর্থাৎ মা আমার স্ত্রী এবং আমার খবর সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত হল। নতুন মায়ের খবর নেই। থাকবে কি করে? নতুন মা কে? বাবার সাথে তার সম্পর্কের কথা সংবাদ জগতের অজানা। একমাত্র কয়েকজন বাবার বিশিষ্ট বন্ধু, যদি থেকে থাকে, জানতে পারে। আর জানে মালবিকা, মানসজেঠুর মেয়ে ও তার স্বামী সুকান্তবাবু। এই

মালবিকার কথা ইতিপূর্বে আমার অজানা ছিল। কিন্তু নিয়ম করে দুবেলা নার্সিং হোমে বাবাকে দেখতে আসা, ডাক্তারদের সাথে কথা বলার সূত্র ধরে জানতে পারলাম জানলাম, বাবা ও সৎমায়ের সংসারে এই দুটি মানুষ নতুন সাথী শুধু নয়, পরিবারের অংশ বিশেষ। খবর শোনার সাথে সাথে ছুটে এসেছে। ওদের কাছ থেকে জানলাম, অসুস্থ হওয়ার দিনও বাবা সুস্থ শরীরে বেবিকে সাথে নিয়ে, বেবির হাত ধরে নিত্য দিনের মত ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। বেবি হাঁটতে শেখার পর থেকে এই পার্কে ঘোরা, বেবির হাত ধরে বাবার নিত্যদিনের কর্মসূচির অঙ্গ। পার্কে গিয়ে একটা সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চে বসে এই বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিটি সমবয়সী কিম্বা বিভিন্ন বয়স নরনারী শিশুদের সামনে দেশ বিদেশের শিশুদের, সংসারের, কথায় কথায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা, জীবনের কথা, গল্পের মত করে বলে আনন্দ পেতেন। এই মহান পুরুষের গল্প শোনার শ্রোতার অভাব ছিল না। বয়স হলে মানুষ নিজের কথা বলে তৃপ্তি পায়, আমার বাবা তার ব্যতিক্রম ছিল না। সেদিনও সেই জমজমাট পার্কের গল্পের আসর বাবার শরীর খারাপ হয়, সেখান থেকে বাড়ি হয়ে এই নার্সিং হোম—আজ তৃতীয় দিন।

মাকে খবর দেওয়া হয়েছে। সরাসরি যোগাযোগ না হলেও মা নিশ্চয় খবর পেয়ে থাকবে। মা সাঁওতাল পরগণায় যেখানে আছে, সেখানে এখনো টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। মা যে সংস্থার সাথে জড়িত, সেই সংস্থার কলকাতা অফিসে খবর দিয়েছি, ওরা নিশ্চিত করেছে খবর পৌছে দেবে। দুটি রাত্রির সামান্য সময় সাদার্ন এভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে কাটিয়ে দিনভর নার্সিং হোমে। নার্সিং হোমে এলেই নজরে পড়ে নতুন মাকে। মনে হয় তিনদিন নাওয়া খাওয়া হয়নি, নিথর মূর্তির মত বসে থাকে বাবার পাশে। মালবিকা থাকলে কিছুটা সহজ এবং আশ্বস্ত বোধ করেন। আজ থেকে প্রিয়ংবদা, আমার স্ত্রী ওর পাশে, যদিও ওর শরীর সুস্থ নয়, তবুও আমি খুশি। আমার ইচ্ছা থাকলেও আমি যে কাজ করতে পারিনি, প্রিয়ংবাদ সে কাজ করেছে স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে। যে যাই বলুক একজন নারীর কষ্ট অন্য নারী যতখানি বুঝতে পারে অন্য পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। যাক, অন্ততঃ আমার নিজের লজ্জা নিজের অক্ষমতার লজ্জা কিছুটা দূর হল।

বিকালের দিকে হঠাৎ ডাক্তারদের তৎপরতা বেড়ে যায়। বাবাকে বড় অস্থির দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে গত দুদিনের তুলনায় আজ তিনি অনেক বেশি ক্লান্ত। ডাক্তারদের সাথে সামান্য আলোচনায় বুঝলাম বাবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। হার্ট বিট অনিয়মিত, পাল্‌স রেট কমে গেছে। মা এখনো ফিরলো না। বাবার নার্সিং হোম থেকে সুস্থ হয়ে ফেরা সম্ভব নয় বলে মনে হয়। বাবার পাশে নতুন মায়ের চোখের জলের আভাস, আমার স্ত্রী তার পাশে উৎকণ্ঠা তার চেহারায়। নতুন মায়ের চোখের জল তিনদিনে এই প্রথম। তিনিও বুঝতে পারছেন বাবার শেষ যাত্রা সমাগত। সন্ধ্যার আগে মালবিকা ও সুকান্তবাবু এল, সঙ্গে বছর চারেকের অপূর্ব সুন্দর ফুটফুটে বেবি। কি অপূর্ব সুন্দর পুতুলের মত না পরীর মত তুলনা করা কঠিন। সাধ হচ্ছিল, ওকে কোলে নিই। বেবি সোজা তার মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। চোখের দৃষ্টি বিস্ময়ভরা, হাজারো প্রশ্ন বুঝি সে চোখে। বাবা মাঝে মাঝে চোখ খোলার চেষ্টা করছেন, খোলা চোখের তারা, আমরা আছি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন—কে জানে! নতুন মা বাবার চোখের সামনে বেবিকে নিয়ে গেলেন। বেশ কয়েক সেকেণ্ড বেবির দিকে তাকিয়ে, চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল বাবা বেবিকে আদর করলেন, আশীর্বাদ করলেন।

দিনের শেষ, রাত বাড়লে নতুন মা ছাড়া সকলেই যে যার ঘরে ফিরলাম, অনিচ্ছা

সত্ত্বেও প্রিয়ংবদার শরীরের কথা ভেবে খাবার মুখে দিলাম। কিন্তু ঘুম হলো না, পাশেই শায়িতা প্রিয়ংবদা, আমার স্ত্রী। সব সময় উৎকণ্ঠা এবং দুঃসংবাদের প্রতীক্ষা। মৃদু প্রিয়ংবদার কণ্ঠস্বর—

—তোমার বাবার চেয়ে, বেবির মায়ের জন্য আমার বেশি কষ্ট হচ্ছে। সি ইজ রিয়েলি অ্যান ইনোসেন্ট এণ্ড এক্সেপ্সন্যাল লেডি। আই রেস্পেক্ট্ হার।

—আমি জানি। তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো। তোমার কষ্ট হবে।

প্রিয়ংবদার সন্তান হওয়ার সময় এগিয়ে এসেছে। ও আসতে চেয়েছিল, নিষেধ করিনি সাথে এসেছে। ওর শরীর ভালো নেই। চিন্তা হচ্ছে। আমার চোখে ঘুম নেই, তবুও বিছানায় শুয়ে আছি। অসহায়, পিতৃ মাতৃ পরিত্যক্তা, বাবার অবর্তমানে একা একজন মহিলা—কি প্রচণ্ড কষ্টই না সহ্য করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাবার পাশে বসে আছে—নতুন মায়ের মুখ আমার চোখের সামনে রাত ভর ঘুরতে থাকলো। কি অসাধারণ ভালোবাসা, অবর্ণনীয় আত্মত্যাগ, অপরিসীম শ্রদ্ধা। যার তুলনায় মায়ের অর্থাৎ রুচীমার ও আমার ভূমিকা অত্যন্ত ম্লান, তুলনা করা চলে না। অথচ আমি তো বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। দায়িত্ব পালনে ছুটে এসেছি, কিন্তু কষ্ট স্বীকারে ব্যর্থ—একটু না শুলে পারবো না। এখানেই মানুষে মানুষে পার্থক্য। এখানেই আকর্ষণের তীব্রতা। মানুষ মাত্রেই অনুভূতি প্রবণ, একই অনুভূতি সকলকে সমানভাবে স্পর্শ করে না বা সকলকে সমান ভাবে আন্দোলিত করে না। ইচ্ছা হচ্ছিল, বিছানা ছেড়ে রাতদুপুরে নতুন মায়ের পাশে ছুটে যাই, তার পায়ে হাত ছুইয়ে প্রণাম করি। পারছি না। আমার সামাজিক মন, জাতিয় প্রথা, পুরুষানুক্রমে লালিত সংস্কার আমায় বাধা দিচ্ছে। আমি জানি সমাজের চোখে লাবণী মায়ের সাথে আমার বাবা বসন্ত বাসুর এই জাতিয় সম্পর্ক স্থাপন, বা বিবাহ, সমাজের দরবারে অবৈধ, সমাজের চোখে ভ্রষ্টাচার। আমার শিক্ষিত মন সমাজের চিন্তার ধারাকে বজায় রেখে চলছে, যা প্রথা বর্হিভূত নয়। যে কারণে লাবণী মাকে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে আমার এ দ্বন্দ্ব, বা তীব্র জ্বালা।

সাড়া রাত্রি প্রায় না ঘুমিয়ে এবং অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে—বাবার আসন্ন মৃত্যু এবং লাবণী মা ও বেবির প্রশ্নে দ্বন্দ্ব, ভোর হতে না হতেই দ্রুত নার্সিং হোমে পৌঁছায়। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছেন মৃত্যু নিশ্চিত, শুধু সময়ের প্রতীক্ষা। যিনি আজীবন দুঃস্থ, অসহায়, প্রতিবন্ধী, কোটি কোটি শিশু ও তাদের মায়েদের কল্যাণ সাধনের কাজে বিসর্জন দিয়েছেন, আত্মসুখের কথা বিস্মৃত হয়েছেন, তিনি আপাততঃ নিজের মৃত্যুর বিরুদ্ধে অসহায় লড়াই করছেন—জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে তার অবস্থান। হয়তো কিছু সময়ের মধ্যে বিশ্বের জীব জগতের নিয়মে মৃত্যুকে সম্মান জানিয়ে, এই সূর্য, আকাশ বাতাস, গাছপালা, বাড়ি ঘর, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা—সবকিছুকে বিদায় জানিয়ে ফিরে যাবেন সেই স্থানে, যে স্থান হতে তিনি এসেছিলেন—অসীম অনন্তের মাঝে। এই পৃথিবীর বসন্ত বাসুর জন্য আলো জল, হাওয়া আর ব্যয়িত হবে না, পারবে না দান করতে।

মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে মা, রুচী দেবী হাওড়া থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা নার্সিং হোমে বাবার পাশে। মায়ের উপস্থিতি টের পেয়ে নতুন মা উঠে দাঁড়িয়ে এক পাশে সরে গেছে। তার আগে পৌঁছেছে মালবিকা ও সুকান্ত মণ্ডল। বাইরে সাংবাদিক, দর্শনার্থীর প্রচণ্ড ভিড়। ভিড় সামলাতে পুলিসের গলদঘর্মা অবস্থা। ডাক্তারবাবুদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ, হাল ছেড়ে দিয়েছেন, সংবাদ মাধ্যমে বাবার শরীরের গভীর সঙ্কটের কথা জানিয়েছে।

আজো মালবিকার সাথে বেবি এসেছে। লাবণী মা, আমার স্ত্রী, মালবিকা আমরা সকলে বাবার হসপিটাল বেড ঘিরে, রুচী মা বাবার গায়ে মাথায় অত্যন্ত ধীরে ধীরে নিজের হাত ছোঁয়াচ্ছেন। বাবার শীর্ণ, পাণ্ডুর হাতে হাত বুলোচ্ছেন। নিস্পন্দ শরীর, অক্সিজেনের নল এখনো নাকে গলানো। থমথমে আষাঢ়ের মেঘে ঢাকা আকাশের ন্যায় মায়ের চেহারা—চোখের দৃষ্টি বাবার মুখে নিবদ্ধ, চোখে জল নেই। নিস্তব্ধ বাবার কেবিন কেউ নেই, আমরা ছাড়া। লম্বা সময়ের পর বাবার চোখের পাতা কাঁপতে থাকে, আমরা সকলে মুখের ওপর ঝুকে শেষ দেখার চেষ্টা করি। চোখের পাতা সামান্য খোলো। রুচীমা বাবার মুখের সামনে ঝুকে পড়ে। মনে হল বাবা চিনতে পেরেছেন, বাবা খুশি হলেন। চোখের পাতার সামান্য ফাঁক দিয়ে চোখের দুটি তারা মনে হচ্ছে, কিছু, বা কাউকে খুঁজছে। আমরা বাবার চোখের ভাষা বুঝতে ব্যর্থ হলেও বুঝতে পারেন আমার দুই মা। নতুন মা, বাবার দৃষ্টির সামনে চেষ্টা করছেন, আমাকে রুচীমা লাবণীমা ও বেবির হাত ধরে বাবার দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসে। লাবণী মায়ের চোখে জলের ধারা। তবুও বাবার দৃষ্টি যেন অশান্ত, যেন চেষ্টা করছেন কিছু বলার—পারছেন না তিনি। মা বাবার চোখের তারা অনুসরণ করে আমাকে বাবার পাশে নিয়ে যান। আমার চোখ এই প্রথম অবাধ্য হল, চোখ মুছে বাবার সামনে দাঁড়াই। বেবি কাঁদতে শুরু করেছে। ওকে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিই।

মনে হল বাবা সব দেখলেন, পূর্ণ জ্ঞান আছে বাবার। মনে হল নিশ্চিন্ত হলেন, শান্তি পেল তার আত্মা—শেষ বারের মত এক খুশির আভাস দেখা গেল মরণের দ্বারে অপেক্ষারত আমার বাবার চোখে। ঐ শেষ। মালবিকাদি ও সুকান্তবাবুও দেখলেন ঐ স্বর্গীয় দৃষ্টি। সেই আমাদের শেষ দেখা। বাবা আর চোখ খোলেন নি। ডাক্তারবাবু দেখলেন। ইঞ্জেকশান দিলেন। আধঘন্টা পর বাবার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করলেন। সেখানে উপস্থিত আমাদের পরিবারের সকলে।

বাবার শেষ যাত্রার পূর্বে দেশ বিদেশের চিত্রশিল্পীরা মহান বসন্ত বাসুর ছবি তোলেন। ছবি ওঠে দুই মা, বেবি ও আমাকে নিয়ে পরিবারের ছবি। সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। যা বলার মা বলেছে। দাহকার্য সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সাংবাদিকগণ ঘিরে রইল। ছিল সুরক্ষাকর্মীর দল।

অবসান হল একটি মহান জীবনের, একজন প্রকৃত মানবপ্রেমিকের মহাপ্রয়াণ। মনে হল এই দুঃখের মধ্যেও আমি ধন্য। আদর্শশীলা যার মা, মহিয়সী নতুন মা। দুঃখেও আমার আনন্দ হচ্ছে, গর্ব হচ্ছে। মানুষের সুখের জন্য সমাজ, সমাজের জন্য মানুষ নয়—এই আদর্শকে সম্মান জানাতে পেরে মনে হলো আমি সঠিক কাজ করলাম। প্রিয়ংবদা খুশি.

মানুষের দরবারে

শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের অভাব আজো নেই।...কতজনের খবর আমরা রাখি!...একজন মেয়ের বয়সী মহিলার সাথে, নিজের ছেলে বৌ থাকতো!—ভাবাযায়না।...আগুনের পাশে ঘি থাকলে, গলবে না, হতে পারে না।...জাত-বেজাত বলে, কিছু আর রইলো না।...জানিনা একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছ থেকে ঐ মহিলা কি এমন পেলেন!...তবুও ছেলেকে ভালো বলতে হবে।....ঐ দুঃখেই তো ওনার স্ত্রী গৃহত্যাগ করেছেন। কোনো মহিলার বিশেষ করে উনার মত মহিলার পক্ষে ঐ জাতিয় ব্যাভিচার মেনে নেওয়া

অসম্ভব। তবুও ভদ্রমহিলা মেয়েটিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেননি।....যাই বলো, নিজের স্ত্রী বর্তমানে অন্য মহিলার সাথে বিয়ে না করে সহবাস করা অনুচিত।....কে জানে ঐ মহিলা কেমন ঘরের মেয়ে, নিশ্চয় মালকড়ির জন্য ঐ ভাবে পড়েছিল।....এ ঘোর অন্যায়, এর প্রতিবাদ করা উচিৎ।....ভদ্রলোকের দোষ ছিল!...ঐ সব লেখক শিল্পীদের সামান্য দোষ থাকে।....মেয়ে না পেলে রস পাবে কোথায়!...ঐ শিল্পীটিল্পিদের ক্ষিদে বেশি।....তোর আমার ঘরে হলে, কি হতো ভাব্‌তো?...পাড়ায় মুখ দেখানো যেতোনা, আত্মীয় স্বজনে ছিঃ ছিঃ করতো।....তবুও তো ভালো, এজন দুঃস্থ মহিলার গতি হয়েছে।....যাই হোক বাপু এটা সমাজ বিরুদ্ধ, সামাজিক অনুশাসন সকলের মেনে চলা উচিৎ নইলে সমাজ উচ্ছন্নে যাবে।....সমস্ত জীবন দুঃস্থ শিশুদের জন্য কাজ করে গেছেন উনার অবদান অসীম।...ফ্যামিলি দেখেছো?—যেমন স্ত্রী, তেমন ছেলে! অনুসরণ যোগ্য।....দেশের সমাজ কি বলে দেখো।....

ইত্যাদি, ইত্যাদি, পথে ঘাটে এই জাতিয় মন্তব্য বা আলোচনা, হাটে বাজারে ট্রামে বাসে, শহরতলীর লোকাল ট্রেনে বিভিন্ন বয়সী মানুষের মধ্যে মুখে মুখে ফিরতে থাকে। কলেজে ছাত্র ছাত্রীরা এই বিতর্কের বাইরে ছিলনা। বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম ঘটনাটির মধ্যে এমন কোনো অন্যায় দেখতে পায়না। ছাত্রীরা বরং ভদ্রমহিলা অর্থাৎ লাবণীর প্রতি সংবেদনশীলা, তারা লাবণীর মধ্যে মহত্ত্বের বীজ লুকিয়ে থাকতে লক্ষ্য করে, তাদের অনেকেই মনে করে লাবণীর আত্মবলিদান, চারিত্রিক দৃঢ়তা অনুসরণ যোগ্য। অনেকে বসন্ত বাসুর জীবন যাপনের মধ্যে কোনো অন্যায় খুঁজে পায়না।

শহরের, দেশের বিদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে, সংবাদ মাধ্যমে, ছোটবড় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, প্রধান সংবাদ হিসাবে প্রয়াতঃ বসন্ত বাসুর ছবি, পরিবারের ছবি, রুচীর ছবি, রোহিত, রোহিতের ছবির সাথে লাবণীর ছবি সহ বসন্ত বাসুর জীবনী, তার কাজ তার গবেষণা, আমরণ মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মবলিদানের কথা বিস্তারিত ভাবে প্রচারিত হয়। এতদিন সাধারণ ভারতবাসী প্রয়াত বসন্ত বস্তুকে জানতেন না, চিনতোনা, জানতোনা তার কাজের বিষয় এবং তার পরিধি এবং বিশ্বজুড়ে পরিচিতি ও স্বীকৃতির কথা। জানতোনা পৃথিবীতে এই হৃদয় বিদারক ও ভয়াবহ শিশু মৃত্যুর কথা, প্রসূতি মৃত্যুর কথা, জানতো না তার কারণ সঠিকভাবে, জানতোনা অর্থনৈতিক বৈষম্যের তীব্র ফলের কথা। বসন্ত বাসুর মৃত্যুর পর দেশের মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও অতি সাধারণ মানুষ, স্ত্রী পুরুষ, সাধারণ লোক বসন্ত বাসুকেই জানলো না, জানলো তাদের সঙ্কটময় অস্তিত্বের কথা। জানলো, বিভিন্ন বিশ্বের তাবড় তাবড় বসন্ত বাসুকে স্বীকৃত ও শোকজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে বসন্ত বাসুর মত মহৎ মানুষের কথা। সেখানেই মানুষ থেমে থাকলোনা, বসন্ত বাসুর কাজের প্রতি সম্মান জানানোর সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা বা মন্তব্য। যার কিছু টুকরো টুকরো অংশে উল্লিখিত হলো। যদিও এই ব্যস্ত সময়ে, ব্যস্ত জীবনে এই প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত তাৎক্ষণিক। প্রতিনিয়ত বসন্ত বাসুর কৃতিত্ব অপেক্ষা, তার জীবন নিয়ে মুষ্টিমেয় যুবক যুবতী, গৃহবধূ এবং অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধের দল, স্কুলের গেটে বা পার্কের কোণায় বা রেলস্টেশনে পরিত্যক্ত বেঞ্চে বসে মানসিক খোরাকের ন্যায় আলোচনা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাদের আলোচনা এতই অকিঞ্চিৎকর এবং গুরুত্বহীন যে অচিরেই সেই আলোচনা শুধুমাত্র স্তিমিতই হয়ে যায়না বরং খবরের ভিড়ে হারিয়ে যায় বা ঘটনার পর ঘটনায় অন্যান্য বিভিন্ন খবরের ভিড়ে চাপা পড়ে যায়। এবং স্বাভাবিক ভাবেই বসন্ত বাসু একদিন হারিয়ে যাবে। মানুষ মনে রাখবেনা

বসন্ত বাসুকে। তবুও আশার কথা যে এখনো এমন মানুষ আছে যারা এই ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও, প্রচণ্ড বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতার অবকাশে মানুষের জন্য সামাজিক ভাবে, রাজনীতিগত ভাবে চিন্তা করেন। যেমন চিন্তা করেন কাশ্মীরে হত্যার কথা, উত্তর-পূর্ব ভারতে সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ নিয়ে, ভাবেন পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা, আলোচনা করেন, উত্তোরণের জন্য চেষ্টা করেন। আলোচনা করে ক্রিকেট, ফুটবল খেলা নিয়ে। মানুষের স্বভাবজ ধর্ম, দেশের বিদেশের বিভিন্ন ঘটনার সাথে ওয়াকিবহাল থাকা ইত্যাদি তাদের চিন্তায়, কাজে প্রতিফলিত হয়। চিন্তার উৎকর্ষতা নিত্য বৃদ্ধি পায়। যুগ যুগ ধরে সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্র একটার পর একটা স্তর অতিক্রম করে উন্নততর স্তরে পৌঁছায়। সামাজিক পরিবর্তন সতত সংগ্রাম অথবা সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। যে কোনো পরিবর্তনে একজন সপক্ষে একদল বিপক্ষে থাকবেই। কোনো সৃজনশীলতা বা পরিবর্তন বা অনুশাসন সকলের পক্ষে সমভাবে গ্রহণযোগ্য হয়না।

বসন্ত বাসুর জীবনধারা বা তার জীবনমুখি প্রয়াস স্বভাবতঃই বিভিন্ন মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করবেই। ওপরের মন্তব্যগুলি তার প্রতিফলন। এমনকি অনেকের মন্তব্য শোনা গেছে—গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা হবে, মরবেনা তো কি? ওদের জন্যই তো আমাদের এতো সমস্যা, রাস্তায় ঘাটে মানুষ কিলবিল করছে, ফুটপাথে হাঁটা যায়না, ট্রামে বাসে চড়া যায়না। আমি হলে ওই সব বাবা মাকে জোর করে বীর্যহীন করে দিতাম!

আবার অনেকে বলেন শিক্ষার অভাবে, লেখাপড়া জানলে ওদের এত বাচ্চা হতোনা। দেশের উন্নতি করতে হলে ওদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে আইনের সাহায্যে।

চিন্তার বৈপিরীত্য থাকবেই। মনে আছে সহমরণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রথার আরোপ বা বিলোপের সময় সে সময়ের ঐ মহা মহা মনীষী, সমাজ সংসারকদের এমনি বিতর্কের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মানুষ অভ্যস্ত প্রথার বা নিয়মের বাইরে প্রাথমিক ভাবে পা রাখতে চায়না বা আতঙ্কিত হয়। বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে আজো হয়, বহুবিবাহ লোপ পেলে আজো সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। যদিও ধীরে ধীরে মানুষ সামাজিক কুপ্রথার ফল হৃদয়ঙ্গম করে, কুপ্রথার বিলোপ সাধন করছে। আসলে সুন্দর এবং সুস্থভাবে বাঁচার অনুশাসন প্রবর্তিত হয়েছে মানুষের দ্বারা, সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বারা। এবং সমস্ত অনুশাসনের উদ্দেশ্য জীবনের তাগিদে, মানুষের স্বার্থে এবং ধারাবাহিক পরিবর্তনশীল। যে কারণে পরিবর্তনের বিপক্ষে যারা তারা বসন্ত বাসুর স্ত্রী বর্তমানে অন্য মহিলার সাথে জীবনযাপন, শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন মানবে না। বসন্ত বাসু সমাজের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে যত বড় কাজই করুন না কেন, তার ব্যক্তিগত জীবন যাপনের প্রতি কটাক্ষপাত করবেন বৈকি। কারণ মানুষ তো সব সময় মানসচোখে দেখেনা, দেখে স্থূল চোখে।

দেখুকগে। করুকগে। ওতে প্রয়াতঃ বসন্ত বাসুর কিছু যায় আসে না। বসন্ত বাসুর পরিবারের সদস্যবৃন্দ—স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ বসন্ত বাসুর জীবন-যাপনে কোনো অস্বাভাবিকতা অনুভব করেনা। সন্তান রোহিতের মানসিক দোদুল্যমানতা অত্যন্ত সাময়িক এবং খুব দ্রুত শুধরে নিজেকে সংশোধন করেই নেয়নি বরং বাবার জীবনযাপনকে সুস্পষ্ট সমর্থক করেছে যখন রোহিতের মা বা, রুচী দেবী অসহায় লাবণীর প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং মানবিক আচরণ করেছেন। লাবণীকে প্রয়াতঃ স্বামী বসন্ত বাসুর স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা দিয়ে

সপত্নী হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং স্বামীর কর্তব্যকে অত্যন্ত মহান এবং যথার্থ বলে মেনে নিয়েছেন।

তবুও ঘটনার আকস্মিকতা এবং তাৎক্ষণিক প্রতিফলন থাকবে। শুভবুদ্ধি ও বিচারবোধ সুস্থ চেতনা একদিন জীবনের প্রয়োজনকে যথার্থ এবং উচিৎ বলে গ্রহণ করবে এবং স্থাপন করবে গরিমার সাথে। থাক্ এ বিতর্ক। বরং বসন্ত বাসুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে, যে পার্কে বসন্ত বাসু জীবনের শেষদিনগুলোতে এসে একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে বসতেন, শিশুদের খেলা দেখতেন, দেখতেন ছোট বড়দের সাঁতার কাটা, দু এক জন বৃদ্ধের কাছে নিজের কথা বলতেন সন্তোষে, সেই পার্কে তার স্মৃতিতর্পণ হচ্ছে, দেখিনা কেমন হচ্ছে।

বড় জোর বছর দুই হবে, বসন্ত বাবু তার শিশুসন্তান বেবিকে নিয়ে, তখন বেবি হাঁটতে শিখেছে, কথা বলে আদুরে গলায়, যে পার্কে প্রায় প্রতি বিকালে বেড়াতে যেতেন, এই বছর দুয়েকে বসন্ত বাবুর সাথে পরিচয় হয়েছিল তার সমবয়সী, বা দু চার বছরের ছোট বড় হবে, অবসর প্রাপ্ত আশে পাশের স্থানীয় অধিবাসী। তারা আয়োজন করেছে এই স্মৃতিতর্পণ বা শোকসভা। ওদের সাথে যোগ দিয়েছে কয়েক জন যুবক এবং যুবতী, তারাও ঐ পার্কের প্রায় নিয়মিত ভ্রমণ বিলাসি না হলেও রোমান্স বিলাসি বলা চলে, যারা এসে জোড়ায় জোড়ায় পাশাপাশি কোনো বেঞ্চের কোণা দখল করে কিম্বা বেঞ্চ খালি না পেলে ঘাসের ওপর পুরানো খবরের কাগজ বিছিয়ে বসে একে অপরের মনের কথা শুনতো বা বলতো, বাদাম খেতো হাতের আঙুলের চাপে ভেঙ্গে ভেঙ্গে। ইতিমধ্যে রোহিত বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে ফিরে গেছে কর্মস্থলে। রুচীদেবী তার নতুন সংসারে। যেখানে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত মানুযেরা, সুস্থ হবার পরও নিজের বাসস্থানে আশ্রয় পায়নি, তাদের নতুন ভাবে জীবন যাপন ও কর্মসংস্থান বা জীবিকাব ব্যবস্থা করার উদ্যোগে। মালবিকাই একমাত্র যে তার দিদি লাবণীদির কাছে নিয়মিত আসা যাওয়া করে। লাবণী এখনো তার বসন্তের বিয়োগ ব্যথা কাটিয়ে উঠতে না পারলেও চেষ্টা করছে, বেবি আছে তার ভাবনা কি। রোহিত ও রুচী নিয়মিত খোঁজ খবর রাখে এবং রোহিত তার লাবণী মাকে তার নিজের কাছে পেতে কুণ্ঠিত নয় বরং সে সাদরে গ্রহণ করতে চায়।

অদ্ভুত এক মনোরম, আড়ম্বরহীন পরিবেশ। ধূপ জ্বালানো হয়েছে, ধূপের মিষ্টি গন্ধে পরিবেশ পবিত্র। নির্দিষ্ট কোনো উদ্যোক্তা নেই, সকলেই বলতে গেলে উদ্যোগী। নেই কোনো ছোট বড় নেতা বা উপনেতা। প্রয়াত বসন্ত বাসুর একটি ফটো, সম্ভবতঃ রুচীদেবীর কাছ থেকে উদ্যোক্তরা সংগ্রহ করেছেন, চন্দনচর্চিত, বসন্ত বাসু যেখানে সাধারণতঃ জীবিত অবস্থায় বসতেন, রাখা হয়েছে সেই বেঞ্চের ওপর। পরানো হয়েছে রজনীগন্ধার মালা। পার্কের একটি নির্জন কোণায় মহান বসন্ত বাসু বেবিকে পাশে নিয়ে বসে গল্প বলতেন, জীবনের শেষ দুটি বছর, বলতে গেলে দীর্ঘ কর্মজীবনের পর সামান্য অবসর। যিনি আজীবন তার কাজের মাধ্যমে বলতে চেয়েছিলেন একজন সুস্থ, পূর্ণ বিকশিত মানুষ পেতে হলে, এই বিশ্ববাসীকে, শিশুর উপযুক্ত পরিবেশ অত্যন্ত জরুরী। শিশুর কোমল মনে অত্যন্ত সংবেদনশীল ঘটনা বা আঘাতে শিশুর সুস্থ সবল হওয়ার পক্ষে অন্তরায় হয়, তাদের এই বিশ্বকে জানতে শেখা, জগৎকে চিন্তা শেখার জন্য পরিবেশ ও কল্পনার স্বাধীনতার সুযোগ প্রয়োজন। যদি সে-পরিবেশ থেকে শিশু বঞ্চিত হয়, দেশ একজন সুস্থ নাগরিক থেকে বঞ্চিত হয়, পরিবর্তে দেশ পায় একজন আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণমনা বিকৃত নাগরিক। সেটা যেমন ব্যক্তি নাগরিকের ক্ষতি

তেমনি দেশেরও। তিনি মনে প্রাণে বেবির জন্য সেই রকমই সুযোগ বা পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগী ছিলেন, যদিও রোহিতের ক্ষেত্রে তার স্বপ্ন স্বার্থক করার সুযোগ ছিল। রোহিত একজন সুনাগরিক। সামনে বছর বেবি স্কুলে যাবে মা লাবণীর দায়িত্বে। প্রয়াতঃ স্বামী বসন্ত বাসুর স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যদিও তিনি আপাততঃ রুচী দেবী এবং রোহিতের তত্ত্বাবধানে আছেন এবং থাকবেনও। এই বেবী বিকাল হলেই 'বাবা, বাবা বেড়াতে চলো' 'পারকে চলো' বলে ব্যস্ত হয়ে উঠতো। বসন্ত বাসু তার শিশু মন নিয়ে শিশু বেবিকে নিয়ে পার্কে আসতেন, বসতেন সিমেন্টের বাধানো ছাতার নিচে সিমেন্টের বেঞ্চে। একে একে পরিচিত অর্ধপরিচিত প্রৌঢ় ও যুবদের এই স্মৃতিতর্পণ। আছেন অনুকূলবাবু, পান্নালাল মিত্র, মণিশঙ্কর ব্যানার্জী, সুকুমারীদি এবং অন্য কয়েকজন। সামান্য আলাপচারিতায় নেশার মত গল্প করে গেছেন। তার গল্পে ছিল তার একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অনুভূতি মেশানো—একজন অসাধারণ মানুষের, অতি সাধারণ মানবিক বৃত্তি। আজ যারা এই সভার উদ্যোক্তা, তাদের জীবনেও হয়তো লুকিয়ে রয়েছে এমনি কোনো না কোনো কাহিনী। আর জীবন তো নিত্যই নানা কাহিনীর সৃষ্টি করে এবং নানা কাহিনীব মধ্যে এক একজন চরিত্র হয়ে জীবন নাটকে বিরাজ করে। কেউ প্রকাশ করে অপরের কাছে কেউ বা একান্ত নিজের কাছে। হয়তো সেই প্রকাশের প্রসঙ্গ ভিন্নতর হতে পারে।

এই পার্কে শহরের অন্যান্য আর পাঁচটা পার্কের ন্যায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু যুবাদের সমাবেশ হয়। হাঁটাচলা করে, খেলাধূলা করে, কখনো কখনো বেঞ্চ খালি থাকলে জিরিয়ে নেয়। সন্ধ্যা নামতেই পার্কের অপার্যাপ্ত আলো জ্বলে। পাশ দিয়ে ব্যস্ত কলকাতার যানবাহন ও মানুষেব ভিড়—কানে আসে যন্ত্রের গর্জন এবং মানুষের কোলাহল। এই সন্ধ্যার স্মৃতিতর্পণে, এক কথায় অভিনব এই উদ্যোগে, পার্কের নিয়মিত বিচরণ করে মানুষ যারা এবং মাঝে মাঝে পার্কে যারা আসে তারা ছাড়াও হাজির পথ চলতি কিছু উৎসাহী ব্যক্তিবর্গও। এসেছেন এই সভার উদ্যোক্তাদের কয়েকজন বন্ধু বান্ধব। এসেছে অনুকূলবাবুর দু বছরের নাতি, সুকুমারীদেব বোনের মেয়ে প্রভৃতি। সুকমারীদি বিয়ে করেননি। গ্রামের দিকে কোনো স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, অবসর হওয়ার পর বোনের বাড়ির পাশের বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন। ঝাড়া হাত পা। একবার ভেবেছিলেন বৃদ্ধাশ্রমে থাকবেন, কিন্তু বোনের কথায়, বোনের পাশে রয়ে গেছেন। যারা উদ্যোক্তা তারা বেশির ভাগই চাকরি থেকে অবসর নিলেও সংসারের মায়ায় আবদ্ধ, বাড়িতে বা বাসায় বৃদ্ধা স্ত্রী আছে, কারো কারো ছেলে এবং তার স্ত্রী পুত্র কন্যা আছে।

সভা শুরু হয়, নির্দ্ধারিত সময়ে, ঠিক সাতটায়। মাথার ওপর সংক্ষিপ্ত আকাশ, ইতস্ততঃ তারাদল, আবহাওয়া অনুকূল। চাঁদের আলো থাকলেও বোঝার উপায় নেই। গরম নেই, হাওয়া কখনো সখনো ইঁট কাঠের স্তূপকে পাশ কাটিয়ে আনাগোনা করছে কোনো কোনো গাছের পাতা হয়তো বা সে হাওয়ায় দুলছে। বিষাদের ছায়া প্রতিটি বৃদ্ধের চেহারায় যদিও কেউ কেউ ধোপ ভাঙা পোষাকে মুড়ে রেখেছেন দীর্ঘদিন বয়ে বেড়ানো শুষ্ক ত্বকে ঢাকা শরীর। বিষণ্ণতার কারণ যতনা প্রয়াতঃ বসন্ত বাসু, ততোধিক নিজেদের অনাগত ভবিষ্যতের ভাবনায়। যেন প্রত্যেকেই নিজেদের মরণের বাতাসের স্পর্শ বা আগমনি সংকেত পেয়েছেন বা পাচ্ছেন। তবুও বিষণ্ণতাকে দূরে রাখার আপাত প্রয়াস সকলের, যার জলন্ত উদাহরণ পোষাকের পরিবর্তনে। সুকুমারীদির ছাপা পাড় দেওয়া সাদা পাটভাঙা শাড়ী, তিনিই আজ সভার কাজ পরিচালনা করছেন। তিনি

প্রাক্তন শিক্ষিকা, তার দুচার কথা বলার ক্ষমতা আছে।

কোনো কোলাহল নেই, ব্যস্ততা নয়, গম্ভীর পরিবেশ যা এই সভার মূল উদ্দেশ্যকে মহিমান্বিত করেছে। এমন কি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অস্বাভাবিক নির্বাক এবং উল্লাস বিহীন। অনুকূল বাবু সভার কাজ পরিচালনা করার জন্য সুকুমারীদির নাম প্রস্তাব করেন। উঠে দাড়িয়ে সমর্থন করেন পান্নালালবাবু, একদা বেসরকারি অফিসে চাকরি করতেন। সুকুমারীদি উঠে দাড়িয়ে তার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে সকলকে উঠে দাড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের জন্য অনুরোধ করেন। মোটামুটি সকলে দাড়িয়ে ছিল, যে দুচারজন বসে পড়েছিল, তারাও উঠে দাড়িয়ে মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা জানায় প্রয়াতঃ বসন্ত বাসুর প্রতি। মনে মনে অনেকেই তার আত্মার শান্তি এবং স্বর্গবাস কামনা করেন। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলেন সুকুমারীদি, ঘড়ির কাটা ঠিক ষাট সেকেণ্ড অতিক্রম করতেই তিনি সকলকে নীরবতা ভঙ্গ করে বসবার অনুরোধ জানান। এই পার্কে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে, আলাদা ভাবে বসার ব্যবস্থা করা হয়নি। ছাতার মত ঢাকা আবরণের নিচে সামান্য যে জায়গাটা খালি ছিল, ধীরে সুস্থে বসেন অনুকুলবাবু, পান্নালাল বাবুরা, সুকুমারীদি দাড়িয়ে, তার পাশে দাড়িয়ে বছর সাতেকের তার বোনের ছেলে।

প্রথমে সুকুমারীদি, সভানেত্রী শুরু করেন—

"মাননীয় সুধিবৃন্দ, প্রয়াতঃ বসন্ত বাসুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোক জ্ঞাপন করাই আজ আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য। আজকে এখানে, আমরা যারা উপস্থিত, অনেকেই স্বর্গতঃ বসন্ত বাবুকে জানতেন না বা চিনতেন না। আমিও না। বসন্ত বাবু আমাদের মধ্যে আজ নেই। আবার যিনি বসন্ত বাবুকে দেখেছেন, অনেকেই তাকে চিনতেন না। খবরের কাগজ পড়ে অনেকেই ভাবছেন, আরে ইনিই তো সেই লোক, সেই বিখ্যাত সমাজসেবী।

বেশির ভাগ শ্রোতাই চাওয়া চাওয়ি করে। কে এই বসন্ত বাবু? যাকে আমরা দেখেছি অথচ চিনিনা। ইনিই কে সেই বসন্ত বাসু যার খবর ক'দিন ধরে টিভিতে, রেডিওতে। খবরের কাগজেও বড় বড় করে ছাপা হয়েছিল, ছবি বেড়িয়েছিল!

—আসলে বসন্ত বাবু যে এত গুণী ব্যক্তি ছিলেন, আমার সাথে যার মাত্র কয়েকদিনের আলাপ হয়েছিল, আমি কেন, আমরা কেউই জানতাম না, উনি এত মহান। উনার মৃত্যুর পর খবরের কাগজ পড়ে বুঝতে পারলাম, উনার মহান আদর্শের কথা, উনার জীবনের কথা—আজীবন তিনি দুঃখী শিশু ও অভাগা মায়েদের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।"

—ঠিক যা মনে করেছিলাম তাই, ইনিই খবরের কাগজে ছাপা হওয়া সেই ব্যক্তি। বিশ্ব জুড়ে তার নাম, বিশ্বের বড় বড় নেতা সকল উনার জন্য শোক জ্ঞাপন করেছেন।

—ওরকম অনেক লোকই আছে। কে কার খোঁজ রাখে।

ঐ রকম মন্তব্য করতে করতে দু একজন মালায় ঢাকা বসন্ত বাসুর ফটোর কাছে এগিয়ে দেখার চেষ্টা করে। অল্প আলোয় চেনা দায়। সুকুমারীদি বলেন।

—বন্ধুগণ ধীরে ধীরে একজন একজন করে দেখুন। উনার আদর্শ, যদি আমরা স্মরণ করতে বা পালন করতে পারি, যদি অবোধ শিশুদের প্রতি যত্নবান হই, তবে আগামী দিনের শিশুরা বড় হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমার বক্তব্য শেষ করলাম। এরপর কে বলবেন, আপনাদের মধ্যে থেকে—কেউ বলতে চাইলে বলুন। অনুকূল বাবু, পান্নালাল বাবু, মনিশঙ্করবাবুরা একে অপরের দিকে দেখতে থাকে—এবার কে বলবে? পাশ দিয়ে যেতে যেতে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে—দাদা কি হচ্ছে? কোন

পার্টির?—খুন জখম এত বেড়ে গেছে না! ইত্যাদি কথা বলে হন্‌হন্‌ করে চলে যায়। জমায়েতে উপস্থিত শিশুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলা শুরু করে, যারা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তাদের কেউ কেউ চলেও যায়। কার এত সময় আছে। অবশেষে মণিশঙ্কর ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ান। অনেক বয়স হয়েছে, কোনো এক সরকারি অফিসে বড় পোস্টে চাকরি করতেন, অবসর নেওয়া বারো বছর হয়ে গেল। এখনো ঋজু দেহের গঠন। একমাত্র ছেলে, আমেরিকায় সেটেলড্‌। মেয়ে নাতিপুতি নিয়ে সংসার করছেন গড়িয়ায়। পুরানো হলেও দামি কাপড়ের প্যান্ট, সাদা ফুল শার্ট, মাথার চুল হালকা এবং সম্পূর্ণ পাকা, সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন।

—"প্রয়াতঃ বসন্ত বাবু, কিছুদিন ধরে এই পার্কে আসতেন। সাথে আনতেন ছোট্ট একটা সুন্দর ফুট্‌ফুটে মেয়ে, ঠিক যেন বিদেশি পুতুলের মত—যেমন গায়ের রঙ তেমনি চেহারা, আমার নাতনির বয়সি। ঐ ফুট্‌ফুটে মেয়েটিকে দেখে আমার বড় লোভ হতো, আদর করতে ইচ্ছা হতো। বসন্ত বাবু আসতেন, পার্কে ঘুরতেন আর ঠিক এই বেঞ্চে বসে জিরিয়ে নিতেন। একদিন আমি জোর করে আলাপ করি। আলাপ হবার পর জানতে পারলাম। শিশুটি উনার মেয়ে, বসন্ত বাবুর বৃদ্ধ বয়সেব সন্তান। ভেবেছিলাম উনার নাত্‌নি হবে। তারপর এক এক করে আমাদের সকলের সাথে আলাপ হয়, কি? ঠিক না অনুকুল বাবু?"

অনুকূল বাবু ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানায়। পেছন থেকে কে বলে উঠে উনার দোষ ছিল! হিন্দু ধর্মে দুটো বিয়ে শাস্ত্রসম্মত নয়। এবং দুটি বৌই জীবিত আছেন।

—আগেকার দিনে এরকম অনেক ছিল। উনার তো মাত্র দুটি অনেকের অগুনতি স্ত্রী থাকতো।

—সেদিন আর নেই। দেশের আইন আছে, সমাজের রীতি আছে।

অনুকূল বাবুর সম্মতি নিয়ে মণিশঙ্কর বাবু পুণরায় বলতে শুরু করেন। কারণ শ্রোতাদের মাঝ থেকে দুজনে বলতে শুরু করলে মণি বাবু থেমে যান। কথা বন্ধ হতেই তিনি শুরু করেন—

"সহজ, সরল, অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন বসন্ত বাবু। নিরহঙ্কার। ব্যক্তিগত তার জীবনের কোনো কথা বলতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত ছিলেন না। উনার বিদূষী স্ত্রী থাকতেও—সম্ভবতঃ উনার পারিবারিক জীবন সুখের ছিলনা। সে কারণে বা অবস্থার চাপে উনি বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। যদিও উনার এ কাজ আমি মন থেকে সমর্থন করতে পারিনি, তবুও তার কাজের জন্য, আমাদের তাকে শ্রদ্ধা জানাতেই হবে।"

পান্নালাল বাবু মৃদু প্রতিবাদ করেন।

—"উনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি। একজন অসহায় মহিলাকে উদ্ধার করেন। তার একাকিত্ব দূর করতে, একটি জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তিনি রক্ষা করেন। সেই অসহায়া মহিলা যাতে সামাজিক স্বীকৃতি পায়, সেজন্য বাধ্য হয়ে বিবাহ করেন। না করলে তার ক্ষতি হতো? একেই বলে মানবিকতা, এক মহান আদর্শ।

বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মণিশঙ্কর বাবু কিছু সময় তার বক্তব্য বন্ধ রেখে পান্নালাল বাবুর কথা শোনেন। পান্নালাল বাবু থামতেই তিনি পুণরায়।

—"হ্যাঁ, এ বিষয়ে এক একজনের এক এক মত থাকতেই পারে। আমি কিন্তু সামাজিক অনুশাসণ এবং পারিবারিক ধ্যান ধারণা বজায় রাখার পক্ষপাতি। তবুও আমি কামনা করি তিনি স্বর্গে শান্তিতে থাকুন।"

বক্তব্য শেষ। অনেক জোরে জোরে হাততালি দেয়, আবার কেউ কেউ তালি বাজায় না। মণিশঙ্কর বাবু স্বস্থানে উপবেশন করেন। আবার সামান্য নিরবতা। ধূপ-কাঠি জ্বলতে জ্বলতে ফুরিয়ে আসছে। লোকজন হালকা হচ্ছে। পার্কে সন্ধ্যা নেমেছে, কোলাহল স্তিমিত। সুকুমারীদি বোনপোকে আইসক্রীম কিনে দিলেন। অন্য কোনো বক্তা এগোচ্ছে না।

পান্নালাল বাবু, অনুকূল বাবুরা পাশাপাশি বসে আলোচনা করছেন। অত্যন্ত ধীরে। শহরের কোলাহলে সে আলোচনা শোনা যাচ্ছে না। বলতে গেলে যারা উপস্থিত তারা অনেকেই নিজেদের অতীতের দিকে ফিরে মিলিয়ে নিচ্ছেন, সকলেরই অতীত আছে।

—বসন্ত বাবু সত্যি সাহসি ছিলেন।

—ঐ রকম সাহসের কি মূল্য আছে।

—লুকিয়ে চুরিয়ে অসামাজিক কাজ করার চেয়ে—

—মানবিকতার মূল্য অপরিসীম, মর্যাদা সবার ওপর।

—সমাজকে রসাতলে পাঠিয়ে নয়।

—মানুষের জন্যই তো সমাজ।

—ঠিক বলেছেন কাকাবাবু, আপনি ঠিক। সমাজের মাথাওয়ালাদের যা চরিত্র, কাগজে যে রকম পড়ি।

এক সদ্য যুবক। বৃদ্ধ সকল অবাক হয়ে যুবকটিকে দেখে। সামান্য দাঁড়ি গোঁফ, সবে উঠছে, তরুণই বলা চলে। হয়তো কলেজ স্ট্রীটে কোনো কলেজে পড়ে। দাড়ায় না, তরুণটি, চলে যায়। সুকুমারীদি চোখ মোছেন ধোপভাঙা কাপড়ের আঁচলে, প্রথম যৌবনের প্রেমিক, তার এক মাসতুতো দাদা আত্মহত্যা করেছিলেন, হয়তো তার কথা আজকের এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। সুকুমারীদি আজীবন কুমারী রয়ে গেলেন। বড়দের বন্ধু-বান্ধবীদের অনুরোধ তার পক্ষে রাখা সম্ভব হয়নি।

সভা শেষ হয়ে গেছে। সভানেত্রী নিজের মনে এমনি ব্যস্ত, ভুলে গেলেন সভার সমাপ্তি ঘোষণা করতে। সকলেই যে যার মত চলে গেছে। পান্নালাল বাবু ফটোটি দুহাতে তুলে নিয়ে কপালে ঠেকান।

—আমি ফটোটা রাখি।

সকলেই মৌন, অর্থাৎ সম্মত। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। অন্ধকার নেমে এসেছে প্রথম রাত্রির। বিকালের ভ্রমণকারীর দল, ছোট ছেলে মেয়েরা পার্ক ছাড়ছে, কেউ আগেই গেছে—টিউশানি আছে। সন্ধ্যা রাত্রের নতুন যুগল এসে দখল করবে আধো আঁধার বেঞ্চগুলো, দু একজন দেহোপজীবিনীও থাকতে পারে—তাদেরও করে খেতে হবে। বাদাম ভাজা বিক্রেতারা আসবে, আসবে মালা হাতে, বেলফুল, লুকিয়ে চুরিয়ে নিষিদ্ধ বস্তুও। যানবাহনের আনা গোনা হ্রাস পাবে। হ্রাস পাবে কোলাহল। আকাশ বড় হবে, তারা দল উজ্জ্বলতর, মাঝে মাঝে শীতলতা ছড়াবে মৃদু হাওয়া। কোনো ঘরে শিশুর জন্ম বহন করবে খুশির হাওয়া কোথাও বা দুঃখের বার্তা। কেউ পঙ্গু, অসুস্থ, কেউ বা সুস্থ-পৃথিবী জুড়ে। লেখা হবে শিশুর জন্ম ও জীবন রহস্য আলো ও আঁধারে ঢাকা—হয়তো দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোন বসন্ত বাসু অক্লান্ত প্রচেষ্টায় রত হবে যেন সুস্থ্য শিশু পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে এবং উজ্জ্বলতর করে এই বিশ্ব, হয়তো তার নাম বসন্ত না হয়ে হবে স্ট্যানফোর্ড বা ইয়াং চি। লাবণীর কথা ভাবার লোক নিশ্চয় আগামী দিনেও পাওয়া যাবে। বেবীকে মানুষ করতে রোহিত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বেবী তার বোন। রুচীমা নিশ্চয় বিরল তবে ব্যতিক্রম নয়। লাবণী অদ্বিতীয়া।